বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্ব

বিপ্লব দাশগুপ্ত

অরুণা প্রকাশন
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

অরুণা প্রকাশন : মার্চ, ২০০০

প্রকাশক :
শ্যামল ভট্টাচার্য্য
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

লেজার কম্পোজ :
অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ :
নিম্বার্ক অফসেট
৪এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
অরুণা ভট্টাচার্য্য

ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

আমার লেখা অন্য একটি বইয়ের অংশ হিসেবে প্রথমে এই লেখাটির শুরু হয়। তার উদ্দেশ্যও ছিল সীমিত। পরবর্তী সময়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ফল, প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার ওপর আমার গবেষণা একটি গোটা বইয়ের আকার নিয়েছে। এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখন শুধু প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা নয়। বরং বলা যায়—একটি আধুনিক বাণিজ্য সংস্থা কীভাবে আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার মতো পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পর একটি ঔপনিবেশিক শক্তিতে রূপান্তরিত হল, এই বই সেই প্রক্রিয়ার ওপর একটি সমীক্ষা। যখন এই রূপান্তর ঘটছে তখন বাংলার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল এবং কেন রূপান্তর ঘটতে পারল সেই বিষয়গুলিও আলোচনার মধ্যে এসেছে।

এই আলোচনার প্রধান চিন্তাসূত্রটি লেখকের একান্ত নিজস্ব। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের আনুষঙ্গিক অন্যান্য সূত্রাবলির জোগান এসেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের ওই সংক্রান্ত লেখা থেকে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ডব্লু ডব্লু হান্টার, এইচ টি কোলব্রুক, আর সি মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, যদুনাথ সরকার, সুকুমার সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অসীম রায় ও রিচার্ড ইটনের নাম। এঁদের লেখা আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, আমার ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান সময়ের লেখকদের মধ্যে অশীন দাশগুপ্ত, ওম প্রকাশ, সুশীল চৌধুরী, পিটার মার্শাল, সঞ্জয় সুব্রাহ্মনিয়ম এবং ক্রিস বেইলির লেখা বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিকতার ওপর আমার ভাবনাচিন্তাকে সুসংহত করতে সাহায্য করেছে।

এই বইয়ের প্রস্তুতিপর্বে আমি অনেকের সাহায্য পেয়েছি। নিজে ইতিহাসবিদ না হওয়ার কারণে প্রতিটি পরিচ্ছেদ আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও ইতিহাস বিভাগের যৌথ সেমিনারে। বিভিন্ন সুধীজনকে পরিচ্ছেদগুলির তরজমা পড়তে দিয়েছি। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেমিনার থেকে উঠে আসা বা খসড়ার ওপর দেওয়া নানা ব্যক্তিগত মতামত আমাকে গভীরভাবে উপকৃত করেছে। বিশেষভাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হলেন, ডঃ প্রেমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা ভট্টাচার্য, মনোজ ভট্টাচার্য (সাংসদ), অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য, ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী, ডঃ রণবীর চক্রবর্তী, শ্রী টি এন চতুর্বেদী (সাংসদ), ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী, ডঃ সুরঞ্জন দাস, আরতি দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শতদল দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অজিত দত্ত, অধ্যাপক এম এম দাস (সাংসদ), ডঃ বেলা দত্তগুপ্ত, ডঃ পবিত্র গিরি, অধ্যাপক রতন খাসনবীশ, ডঃ ভাস্কর মুখার্জী, জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক পবিত্র

সরকার। চন্দ্রশেখর হাজরা আমাকে সাহায্য করেছেন বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে দিয়ে। লেখার প্রতিলিপি তৈরি করা এবং টাইপ করার কাজে সাহায্য করেছেন রুণা বিশ্বাস, দীপঙ্কর চ্যাটার্জী ও পাপিয়া সরকার। প্রকাশক কমল সুদ বইটি সম্পূর্ণ করার জন্য অবিরাম তাগাদা দিয়ে গেছেন এবং সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনকে, তাঁর উৎসাহদান ও আমার অন্য বই স্ট্রাকচারাল অ্যাড্জাস্টমেন্ট সহ এই বইটি গ্রহণ করার জন্য।

এই বইয়ের বিভিন্ন অংশ তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য আমি 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইক্লি' ও 'সোস্যাল সাইনটিস্ট্' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ রাজ ও অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েককে আমার ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সম্পাদিত গবেষণাপত্র সংকলনের মধ্যে এই বইয়ের অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। ধন্যবাদ জানাই ইরফান হাবিবের সম্মানে প্রকাশিত 'দি মেকিং অফ হিস্টরি'-র সম্পাদিকা উৎসা পট্টনায়েক কে আমেরিকার বেঙ্গল স্টাডি গ্রুপের প্রকাশনার সম্পাদিকা রমা দত্ত 'সেন্টার ফর আরবান ইকনমিক স্টাডিস'-এর ডিরেক্টর ডঃ পবিত্র গিরি ও মহালয়া চ্যাটার্জীকে আমার ধন্যবাদ জানাই তাঁর সংস্থা থেকে আমার লেখা আরবানাইজেশন অভ্ প্রিকলোনিয়াল বেঙ্গল নামের মনোগ্রাফটি প্রকাশ করার জন্য।

বর্তমান গবেষণার কাজটি করার সময় আমাকে অনেক লাইব্রেরির সাহায্য নিতে হয়েছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরির বিশদ পরিকাঠামো ও পেশাগত দক্ষতার সাহায্য ছাড়া এই বই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। অন্য যে সমস্ত লাইব্রেরির কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি সেগুলি হল কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, 'সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ্ সোস্যাল সায়েন্স'-এর লাইব্রেরি এবং দিল্লির পার্লামেন্ট হাউস'এর লাইব্রেরি।

বইটি লেখার সময় বানানের বিষয়টি একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সঙ্গতি রাখার জন্য জনপ্রিয় বাংলা বানানই এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন Rahr ব্যবহার করা হয়েছে Radha'র স্থলে, Vikrampur-এর বদলে ব্যবহার করা হয়েছে Bikrampur, একইভাবে 'Palas' 'Senas'-এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে 'Pal', 'Sen' এবং 'Brahmin' 'Mughal' ও 'Zamindar'-এর বদলে ব্যবহার করা হয়েছে। 'Brahaman',' Mogol' ও 'Zamidar'। খসড়া কপিতে Mogol বানানের ব্যবহার নিয়ে শোরগোল ওঠায় আমি পরবর্তী খসড়া কপিগুলিতে আবার 'Mughal' বানানেই ফিরে যাই। কিন্তু এখন মূল বইতে আমি 'Mogol' বানানটিই রাখলাম যদিও জানি পাঠকের অনেকেই এই বানানে অনভ্যস্ত।

একইভাবে শহর বা নগরের নামের ক্ষেত্রেও আমি বাংলা বানানই ব্যবহার করেছি। Burdwan, Midnapore এবং Calcutta'র বদলে লিখেছি 'Bardhaman', 'Medinipur' এবং Kolkata। পলাশফুল থেকে তৈরি হওয়া নাম 'Palashi'-তেই ১৭৫৭ সালের বিতর্কিত যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, 'Plassey'-তে নয়।

বানানের দিক থেকে নয়, কিন্তু অর্থের দিক থেকে 'হিন্দু' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে লেখার সময় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আদিতে 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা সিন্ধু নদের ওপারের মানুষদের বোঝাত। এই শব্দের কোনও ধর্মীয় অর্থ ছিল না। ইউরোপীয়রা 'মুসলমান'

শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় থেকেই কিন্তু তারা বুঝতেন না যে কীভাবে ভারতে মুসলমান নয় এমন ধর্মাবলম্বীদের কথা বলবেন। কখনও তাদের বলেছেন ধর্মহীন, কখনও পৌত্তলিক আবার কখনও বা অবিশ্বাসী বা নাস্তিক। কিন্তু কখনওই 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেননি। ব্যবহার করা হতো 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দটি। 'আর্য' কথাটির ব্যবহারও প্রায়শই চোখে পড়ে এখানকার লোকেদের সংস্কৃতি বোঝাতে। রামায়ণে রামকে 'আর্যপুত্র' বলা হয়েছে বা বলা হয়েছে 'নরোত্তম' বা ক্ষত্রিয় বর্ণে জাত —কিন্তু কখনওই তাঁকে 'হিন্দু' বলে বিশেষিত করা হয়নি।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় একশো বছর পেরোবার পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামীদের 'হিন্দু' নামে পরিচিত করা বা হওয়া জনপ্রিয় হয়। ফলে যে সময় 'হিন্দু' শব্দটি দ্বাবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামীরা সাধারণত পরিচিত ছিলেন না, তাঁদের 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা পরিচিত করা উচিত হবে কি না এই নিয়ে লেখার সময় যথেষ্ট সংশয় তৈরী হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক কোনও গবেষণা প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই কাজটি করা হয়নি। কোনও আর্থিক অনুদানও এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজটি করা হয়েছে। এই বইয়ে যে মতামত প্রকাশ পেয়েছে তাব জন্য লেখক নিজেই দায়ী আর কেউ নয়।

বিপ্লব দাশগুপ্ত

সূচি

১

প্রস্তাবনা

পলাশির যুদ্ধ

ভাগীরথীর তীবে, ১৭৫৭ সালের জুন মাসে এক বর্ষামুখর দিনে, পলাশিব আম্রকাননে যে যুদ্ধ ঘটেছিল, ভারতের ইতিহাসেব গতিধারাকে পালটে দিতে সেই যুদ্ধের ভূমিকা অসীম। এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ঔপনিবেশিক শাসন দুশো বছরের জন্য এদেশে তৈরি হল।

ক্লাইভ জিতলেন—কারণ দুই বাহিনীর মধ্যে ঠিকমতো যুদ্ধই হল না। যদি সতিাই যুদ্ধ হত, নবাবের সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সামনে ক্লাইভের বাহিনী দাঁড়াতে পারত কি না সন্দেহ। কিন্তু, নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনানায়ক, জমিদার এবং বণিকদের দিক থেকে ক্লাইভের কাছে অযাচিত সাহায্য এসে পৌঁছাল। যুদ্ধক্ষেত্রে একটি কামান দাগার আগেই যুদ্ধের ফল নির্ধারিত হয়ে গেল।

ঐতিহাসিকদের কাছে বারবার এই প্রশ্ন উঠেছে—এই বিশাল বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী? যাঁরা নবাব এবং দেশের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, কী চাইছিলেন ইংরেজদের কাছে? এমন কিছু যা দিতে নবাব অপারগ ছিলেন? দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলেনি। এই পুস্তকে তার উত্তর খোঁজা হয়েছে।

সংক্ষেপে, এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির দখলে থাকা বস্ত্র বাণিজ্যের বিশাল সমৃদ্ধিতে। এই বাণিজ্য ছিল বৃহদায়তন, আধুনিক, পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান নির্ভর, যৌথ মালিকানা ভিত্তিক। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে ছিল ওদের রাষ্ট্রের সমর্থন। ওরা বাণিজ্যের সঙ্গে বলপ্রয়োগ মিশিয়েছিল। কী করে জলদস্যু অধ্যুষিত সাগরপথে নিজেদের শক্তিতে পাড়ি দিতে হয় ওরা জানত। কূলহীন সাগরে জাহাজ ভাসানোর আধুনিক নৌ-বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি আর গণিত ছিল ওদের আয়ত্তে।

বাংলার ছিল উচ্চমানের উৎপাদন। বাংলার মসলিনের মতো সূক্ষ্ম এবং শিল্পসম্মত বস্ত্র ইউরোপ কোনওদিন দেখেইনি। ইউবোপের ছিল ক্রয়ক্ষমতা, স্বর্ণমুদ্রা। বাংলার ছিল সেই সম্পদ, স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে যা কেনা যায়। কিন্তু এই বাণিজ্য ছিল একপেশে, পরনির্ভরশীল। দুই পক্ষ সমান অবস্থানে ছিল না। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পী আর বণিকদের উন্নত উৎপাদন এবং আর্থিক সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় বাজারে সরাসরি প্রবেশের ক্ষমতা ছিল না। নৌ বিজ্ঞানের সমসাময়িক প্রগতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল। জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে সাগর পাড়ি দেওয়ার সামর্থ্যও তাদের ছিল না। ভারতীয় নাবিকদের পরিচালনায়, ভারতীয় বস্ত্রসম্ভার নিয়ে একটি জাহাজও ইউরোপের কোনো বন্দরে

ভেড়েনি।

উন্নত পণ্যের উপযুক্ত বাজার ভারতীয় বণিকদের সামনে খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি ছিল ইউরোপীয় বণিকদের হাতে—নবাবের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এইভাবে ক্রমবর্ধমান বস্ত্রবাণিজ্য একদিকে যেমন স্বর্ণ সম্পদ আর সমৃদ্ধির সূচনা করেছিল, অন্যপক্ষে এ বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বলও করে তুলছিল। বন্দরে মাল জাহাজে তোলা থেকে শুরু করে, গ্রামের বয়নশিল্পীর কাছ থেকে বস্ত্র সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের বিশাল অংশ, যারা সরাসরি এই বাণিজ্যের সুফল ভোগ করছিল—এরা কখনই চায়নি নবাবের সঙ্গে বিরোধের কারণে ইংরেজ বণিকরা এদেশ থেকে চলে যাক ।

অনেকেই খেয়াল করেন না যে মোগলদের ভারতের আসার কয়েক যুগ আগেই পোর্তুগিজরা ভারত এবং বাংলায় পা রাখে। প্রথম ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাটির এদেশে আসার অনেক বছর পর পলাশির যুদ্ধ ঘটেছিল। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামার অভিযানের ২৫৯টি বছর পর ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ ঘটে। মোগল সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগে, মোগল সম্রাটের সঙ্গে বিরোধের কারণে পোর্তুগিজরা চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপর এদেশে পৌঁছায় ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা। দিনেমার আর অন্যান্য ইউরোপীয়রাও বাণিজ্য সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে এদেশে এসেছিল। পূর্বভারতে প্রথম কারখানা তৈবির ১২০ বছর পর ইংরেজরা পলাশিতে লড়াই করে। ফলে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো বাণিজ্য বিস্তাবে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা বিপুল হয়েছিল এবং বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিতর থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ঐতিহাসিকরাই বলতে পারবেন, কেন তাঁরা এই বিশাল এবং সমস্যাসঙ্কুল পর্যায়টিকে গুরুত্ব দেননি। এই সময় রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মোগলদের হাতে, কিন্তু সারা দেশজুড়ে আর্থিক ক্ষমতা আর জলপথের দখল ইউরোপীয় বণিকদের হাতেই ধীরে ধীরে বর্তাচ্ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে তাঁরা যতটা সময় দিয়েছেন তার সিকি অংশও, এই সময়, বিশেষ করে পলাশির ঘটনার আগের আড়াইশো বছরে ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে ব্যয় করেননি। সম্প্রতি এই সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে। এই বই সেই চেষ্টারই একটি।

তবে এই আলোচনার এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা জানতে চাই সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক আর ঐতিহাসিক পটভূমি, যা ইউরোপীয়দের ক্ষমতা দখলে সাহায্য করেছিল। একদিকে সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র। অন্যদিকে নবোদিত, প্রাণচঞ্চল অথচ করুণাহীন, নীতিবোধশূন্য বাণিজ্যিক পুঁজিবাদীরা—পলাশির যুদ্ধের ফলাফলের পেছনে এর কোনও ভূমিকা ছিল কি? ইউরোপীয় সমাজের দীর্ঘ সাড়ে চারশো বছরের রেনেশাঁস ঋদ্ধ ইতিহাস কি কোনও ভূমিকা নিয়েছিল? সমসাময়িক ইউরোপীয় সমাজ কেমন ছিল? বাঙালি বা ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের নৈতিকতা ও বিশ্বাসের পার্থক্য কী ছিল?

এই পরিচ্ছেদকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে পলাশির যুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে সমকালীন সমাজের বিভিন্ন অংশের স্বার্থের সম্পর্ক এবং বাণিজ্যের

ভূমিকা খোঁজা হয়েছে। এই গ্রন্থটির মূল আলোচ্য এটিই। দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা ইতিহাস আবিষ্কারের উপায় নিয়ে। বিশেষ করে, তাম্রলিপি, মুদ্রা, শিলালিপি, পর্যটকদের বিবরণী, স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষকে ব্যবহার করা হয়েছে ইতিহাসের পুনর্গঠনে। তৃতীয় ভাগে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোন নিরিখে এই আলোচনা করা হবে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। চতুর্থভাগে, এই গ্রন্থে বাংলা বলতে দেশের কোন অংশকে বিবেচনা করা হবে তা স্থির করা হয়েছে। পঞ্চমভাগে, তিনটি খণ্ডে বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনার রূপরেখা আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠভাগে, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হয়েছে।

ইতিহাস সন্ধানের প্রণালী

লিখিত ইতিহাসের অনুপস্থিতি

বাংলার প্রাক্-ঔপনিবেশিক বিকাশ সম্পর্কে বর্তমান খণ্ডে যে আলোচনা করা হয়েছে, সময়ের দৃষ্টিতে তার প্রেক্ষাপটটি বিশাল। কোথা থেকে আলোচনা শুরু করা হবে তা ঠিক করাই কঠিন। বাংলার এই বিশাল সময়কাল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও যথেষ্ট সীমিত। সাম্প্রতিক অতীত সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি। যেমন ধরা যাক, মোগলদের ক্ষমতা দখলের সময়। কিন্তু যতই পিছনের দিকে যাব, আমাদের জ্ঞানের পরিসর তত কমবে। বক্তিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেছিলেন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে। তার আগেব ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকরা অন্তহীন বিতর্কে মত্ত। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ নাম, তাম্রলিপিতে উল্লেখিত স্থাননাম বা জমিদানের তথ্য, মুদ্রায় রাজশাসনের বছর আর তারিখ দেখে অনুমান ভিত্তিক এই ইতিহাস।

বাংলার কোনও প্রামাণিক, লিখিত, তথ্যনির্ভর ইতিহাস নেই। ভারতীয় তথা বাঙালি মেধার কাছে লিখিত ইতিহাস কখনই বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। রাজা ললিতাদিত্যের আমলে কাশ্মীর সম্পর্কে কলহনের বিবরণী, রাজা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে বাণভট্টের রচনা, এতটা না হলেও রাজা রামপালের শাসন বিষয়ে সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা ছাড়া, এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু পাঠযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণী ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। ভারত সম্পর্কে অনেক বেশি তথ্য পাওয়া যায় চীনা, আরব, পারসি এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং পর্যটকদের লেখা থেকে। লোককাহিনির সূত্রে, বংশ পরম্পরায় চলে আসা লোককথার সূত্রেও কিছু তথ্য সংগ্রহ সম্ভব।

এই পরিস্থিতিতে, ইতিহাসকে মুদ্রা, শিলা বা তাম্রপত্রে খোদাই করা তথ্য বা দানপত্র, যত সামান্যই হোক মহাকাব্য, বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, লোককাহিনী আর পর্যটকদের বিবরণী থেকে পুনর্গঠন করতে হবে। অলিখিত অতীতের মূর্তিমান বিবরণীর মতো স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এই বাংলায় খুব বেশি নেই। প্রাচীন নগর, প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, দেবস্থান, প্রাচীর এখানেও রয়েছে। কিন্তু তার এতই জীর্ণদশা এবং নির্মাণের মালমশলা এতই সাধারণ যে কালের আঘাত থেকে সেগুলি নিস্তার পায়নি। প্রকৃতির আঘাত এসেছে নানারূপে। কখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে, ঝড়-বাতাসের রূপ ধরে, কখনও খালি চোখে

দেখা যায় না এরকম কীটপতঙ্গের মাধ্যমে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, এদেশের মানুষ আর রাজাদের ইতিহাস চেতনা ছিল না। অতীতের কীর্তি সম্পর্কে গর্ববোধের অভাব থাকায় সংরক্ষণের কোনও চেষ্টাই ছিল না। বিতর্কিত ঔপনিবেশিক প্রশাসক রিজ্‌লে যথার্থই বলেছিলেন-''আবহাওয়া আর কীটপতঙ্গ অতীতের সমস্ত নিদর্শনকে ধ্বংস করেছে তা ঠিক, কিন্তু, যেটুকু বাকি ছিল তাকে রক্ষা করতে মানুষের কোনও চেতনাই ছিল না। এই শূন্যতার মধ্যে থেকে ইতিহাসকে খুঁজে বার করতে অনুমান নির্ভর হতে হয়েছে''। (রিজ্‌লি, এইচ. এইচ, ১৯৬১ : ৩)।

এই অপ্রতুল সাক্ষ্য থেকে প্রতিভাধর ঐতিহাসিকরা, প্রস্তরলিপি বা মুদ্রা বিশারদরা এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরা যা আবিষ্কার করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য। তাঁদের অবদান আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখা উচিত। কিন্তু সমস্যা হল আমরা সমসাময়িক সামাজিক বা অর্থনৈতিক জনজীবন নিয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারি না, বরং অনেক বেশি জানি তখনকার রাজাদের নাম, রাজবংশের তালিকা আর রাজধানী অথবা সাগর-বন্দরের জীবনযাত্রা নিয়ে। নগরকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে অল্পস্বল্প তাও জানা যায়। অধিকাংশ মানুষ যেখানে বসবাস করত, সেই গ্রাম নিয়ে আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই বললেই চলে।

ইতিহাস সন্ধানের ধারা

ইতিহাস চেতনার অভাব, লিখিত তথ্যের অপ্রতুলতা, ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতির মূল সন্ধানের কাজে একটা বড় সমস্যা। কিন্তু, এ সত্ত্বেও, ভারততত্ত্ববিদ্ ইংরেজ থেকে শুরু করে বহু ভারতীয় ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিত আন্তরিকতার সঙ্গে, সৎ এবং অকপটভাবে ভারতের ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা অতীত উদ্ধারে ঐতিহাসিকরা যে উপায়গুলিকে ব্যবহার করেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাংলার ইতিহাস সন্ধানে, সম্ভবত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল তাম্রলিপি। এই তাম্রলিপিগুলি কোনও মঠ বা ব্রাহ্মণকে দানের প্রমাণপত্র। পূর্বের পাললিক অঞ্চল, উত্তরের অরণ্য অঞ্চল বা পশ্চিমের ঢেউখেলানো ভূভাগ — সর্বত্রই তাম্রলিপির একটি নির্দিষ্ট চরিত্র ছিল। সার্বভৌম সম্রাট সম্পর্কে কিছু, কোন স্থান থেকে তাম্রলিপিটি জারি হল, কোন তারিখে সেটি জারি হল, কীসের দানপত্র, জমি দানের শর্ত কী — এই তথ্য জানা যায় ওই তাম্রলিপি থেকে। নিচের আলোচনায় আমরা দেখব যে, এই তাম্রলিপিগুলি থেকে আর কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও, কীভাবে রাজা এবং শাসক পরিবারগুলির বংশলতিকা তৈরিতে সাহায্য করেছে।

একই রকমভাবে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি থেকেও বহু বিচিত্র তথ্য উদ্ধার হয়েছে। তাম্রলিপির মতোই, এই মুদ্রাগুলিতে থেকে আমরা জেনেছি কোনও রাজার আমলের মুদ্রা এগুলি, কোথা থেকে কবে এবং কেন এগুলি তৈরি হয়েছে। তাম্রলিপির মতোই, এই মুদ্রাগুলি হয়তো তৈরি হয়েছে 'ক' শহরের টাঁকশালে, পাওয়া গেছে 'খ' গ্রামে। এর থেকে সংশ্লিষ্ট রাজার রাজ্যের পরিধি বা সেই রাজত্বের আর্থিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মুদ্রার ধাতু অংশ থেকে বোঝা যায় যে মুদ্রাটি সোনার

না রুপোর, মুদ্রায় ব্যবহার করা ধাতুর পরিমাণ তৎকালীন প্রথাসম্মত কি না, অথবা ধাতুগত মূল্যের সঙ্গে মুদ্রায় লিখিত মূল্যের তফাত রয়েছে। কোনও জায়গায় এক সাথে অনেক মুদ্রা পাওয়া গেলে অনুমান করা যেতে পারে সে অঞ্চলে বাণিজ্যের রমরমা ছিল। কোথায় অল্পস্বল্প বা মেশানো মুদ্রা পেলে অথবা মুদ্রার বদলে কড়ি পেলে ধরে নেওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলটিতে বাণিজ্যের বিশেষ বিস্তার ঘটেনি। মুদ্রায় খোদিত চিহ্ন দেখলে মুদ্রাটি চালু করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর্থিক কারণের বাইরেও আর কিছু আছে কি না জানা যায়। এই মুদ্রাটি কোন ধরনের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে, দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে বাংলার সুলতানের সম্পর্ক, এমন কী স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়েও ধারণা করা যায় মুদ্রাটিতে রাজার সঙ্গে রানির উপস্থিতি লক্ষ করলে।

পাথরের স্তম্ভ বাংলায় বিরল। অশোকের নির্দেশাবলি সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু বাংলাতে তার একটাও দেখা যায় না। বাংলায় পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তরলিপি হল শুশুনিয়ায় উদ্ধার করা প্রস্তরলিপি। এই প্রস্তরলিপিটিতে গুপ্তযুগের সমসাময়িক কোনও এক 'চন্দ্র' নামের রাজার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মগধ বা বাংলার কোনও নায়ক এই 'চন্দ্র' তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মুদ্রা আর তাম্রলিপির মতোই, এই প্রস্তরলিপিরও সমস্যা রয়েছে। কাল তার উপর এমন চিহ্ন এঁকে দিয়েছে যে এই প্রস্তরলিপিগুলির বেশ কিছু অংশের পাঠোদ্ধারই সম্ভব নয়।

স্থাপত্য নিদর্শন থেকেও ইতিহাস আবিষ্কার সম্ভব। পাহাড়পুর, রাজশাহি, মহাস্থানগড় বা বগুড়ার ধ্বংসাবশেষ মৌর্য, গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ। সোমপুরে পালযুগের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব এই বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করে। তৈরির ৬২৬ বছর পরেও টিকে থাকা গৌড়-পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদই সম্ভবত বাংলার স্থাপত্য শৈলীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বর্ধমানের পাণ্ডু রাজার ঢিবি অথবা বহু প্রাচীন, প্রায় ২২০০ বছরের পুরানো, উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রথম যুগের কৃষি ব্যবস্থার নমুনা মিলেছে। ওই অঞ্চলে লোহা গলানো শুরু হয়েছিল, এটা নিশ্চিতভাবে জানা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গ, প্রাচীর, পরিখা বা উপাসনাস্থল নিয়ে বিশাল স্থাপত্য সে সময়ের শাসকদের সামর্থ্যের প্রমাণ। গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ জড়ো করে, হাজার হাজার মজুর লাগিয়ে স্থাপত্য শৈলী গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থাপত্যের উৎকর্ষ এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা তাঁদের সামর্থ্য প্রমাণ করে।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী কিন্তু সন্দেহের বাইরে নয়। এই বিবরণীগুলি অনেক সময় পছন্দ মাফিক আর পক্ষপাতদুষ্ট। এছাড়াও, যখন নিরপেক্ষভাবে এই বিবরণীগুলি রচিত হয়েছে, তখনও, এগুলি সমাজজীবনের একটি বা দুটি ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিবরণীগুলিতে ধর্মীয় জীবন বা বাণিজ্য ব্যবস্থাই গুরুত্ব পেয়েছে। এই পরিব্রাজকরা যেহেতু শহর আর নগরেই ঘুরেছিলেন, তাঁদের লেখায় শহর জীবনের ছায়া পড়েছে বেশি। তাঁদের লেখায় বাংলার লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যের বদলে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, তাঁদের চোখে অদ্ভুত ঠেকেছে এমন ঘটনাগুলি। তা সত্ত্বেও, এই পর্যটকরা যেহেতু পৃথিবীর বহু প্রান্ত, বহু দেশ ঘুরে বাংলায় এসেছিলেন, তাদের লেখায় তখনকার বাংলার সমাজজীবনের চরিত্র সম্পর্কে একটা তুলনামূলক বিবরণ পাওয়া যায়, স্থানীয়

লেখালেখিতে যার অভাব ছিল। এই পর্যটকরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এখানে এসেছিলেন, ফলে তাঁদের আসার সময় বাংলা বা ভারতের বিশ্বসভায় কী স্থান ছিল তারও একটা ধারণা পাওয়া যায় তাঁদের বিবরণী থেকে।

বংশ পরম্পরায় লোকমুখে চলে আসা লোককাহিনি, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অল্পসল্প বদলেছে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষাও পাল্টেছে, কাহিনিগুলিতে সমসাময়িক অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলির প্রভাব পড়েছে। লোকমুখে প্রচলিত এই লোককাহিনির যে লিখিত রূপ আমরা এখন পাই, তার সঙ্গে হয়তো মূল কাহিনির মিল সামান্যই। সে কারণেই এগুলি ততটা নির্ভরযোগ্য না হলেও অন্যান্য নানা সূত্রে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। বংশ কুলজি তো আরও গোলমেলে। এগুলির অধিকাংশই পুরোহিতদের তৈরি - পুরাণের নায়কদের সঙ্গে বাস্তবেব নাযকবা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। লোকসাহিত্য, শিল্প বা সংস্কৃতি ইতিহাস অনুসন্ধানে সাহায্য করতে পারে কিন্তু মূল তথ্যভিত্তি হতে পাবে না।

বর্তমান আলোচনার পদ্ধতি

এই গ্রন্থে আমবা কোনওভাবেই বাংলার ইতিহাস চর্চা করছি না। এর ফলে ঐতিহাসিকরা এ যাবৎকাল বাংলার ইতিহাস নিয়ে যে সব চর্চা করেছেন, আমরা তা থেকে সমৃদ্ধ হয়েছি—তা ব্যবহার করেছি। আমাদের আলোচনা ইতিহাসেব কোনও বিশেষ যুগের বা কোনও রাজবংশের অথবা কোনও সম্রাটের শাসন কালের বিস্তারিত, পরিকল্পিত এবং নিয়মনিষ্ঠ পাঠ নয়। আমরা এই গ্রন্থে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের বা বিভিন্ন ঘটনার ধারাবাহিকতা নিয়ে কোনও আলোচনা করছি না-সে ভার আমরা ছেড়ে দিচ্ছি ঐতিহাসিকদের নিরাপদ হাতে। এই আলোচনায় যে ঘটনা এবং সময় উল্লেখ রয়েছে তা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই আমরা নিয়েছি। যাঁরা এই ঘটনা বা সময়ের সত্যতা বিষয়ে একমত নন, তাঁরা এ সম্পর্কে পেশাদার ঐতিহাসিকদের সঙ্গে বিতর্কে নামতে পারেন, লেখক এ বিষয়ে দায়বদ্ধ নন।

এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য, প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক যুগের আরম্ভ পর্যন্ত বাংলার সমাজ এবং অর্থনীতির ক্রমবিকাশ। এই আলোচনার পদ্ধতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নির্ভর, কারণ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদই হল ইতিহাস অনুসন্ধানের বিজ্ঞান। এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে কোনও গোঁড়ামি বা পুঁথিসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়নি। কার্ল মার্কসের কিছু ভাবনা, যেমন উৎপাদনের এশীয় ধরন, উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে দাসত্বের ভূমিকা অথবা সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ হিসাবে মজুরির গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তন পদ্ধতি অনুসরণ করেই, এই আলোচনায় কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। মার্কস ইউরোপীয় সমাজের প্রেক্ষিতে যে ভাবনা ভেবেছিলেন তাকে হুবহু অনুকরণ করা হয়নি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী? এই প্রশ্নের নানা ˉ ত্তর হয়। খুব সহজে বলা যায় যে, রাজা বা রাজত্বের বিবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার বদলে আরও বড় পটভূমিতে,

অর্থাৎ তখনকার মানুষ, সমাজ, জনজীবন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদার ভিত্তিতেই ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের চোখে, কোনও সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থানই সেই সমাজের 'ভিত্তি'। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনাবলি আরও নানা কিছু সেই বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার 'উপরিকাঠামো'। 'উপরিকাঠামো' শ্রেণি শাসন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বৈধতা দেয়।

এইভাবে দেখলে মনে হতে পারে যে আমরা এক ধরনের একমাত্রিক ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছি। অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে অ-অর্থনৈতিক বিষয়গুলির একটি একমাত্রিক সম্পর্কই যেন ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। কিন্তু লেখকের ভাবনা তা নয়। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে, 'উপরিকাঠামো' 'ভিত্তি'-কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। মোটামুটি এটা বলা যায় যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি ইতিহাসের গতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে কিন্তু কোনও কোনও বিশেষ অবস্থায় নির্ণায়ক নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কতদুর এবং কতটা পরিমাণে অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তা নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে মানবজাতির অভিজ্ঞতার বিশ্বজনীনতাকে আশ্রয় করে। মানুষ, তা সে ইয়োরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকা যেখানকারই হোক না কেন, পবিবেশের প্রতিবন্ধকতা বা সুযোগের সামনে কমবেশি একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। পরিবেশের এই আচরণ কখনও প্রাকৃতিক, কখনও প্রাতিষ্ঠানিক। প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ হয়ে, অস্ত্র ও কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরির জন্য লোহার ব্যবহার - মানব সভ্যতা বিকাশের এই ধারা সর্বত্রই মোটামুটি একই রকম। যে কেউ লক্ষ করলেই দেখবেন, এ বিষয়ে পেরুর সঙ্গে আইভরি কোস্টের বা বাংলার বিশেষ অমিল নেই। বিকাশের এই স্তরগুলি অতিক্রম করতে কোনও অঞ্চলের তুলনায় কোনও অঞ্চলের মানুষের সময় বেশি বা কম লাগতে পারে, কিন্তু বিকাশের গতিধারা সর্বত্রই মোটামুটি একই রকম : বাইরের সমাজের প্রভাবমুক্ত, স্বায়ত্তাধীন। অপরিহার্য সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণগুলি বিচার করলে পাল-সেন-তুর্কি বা মোগল শাসকদের চরিত্রলক্ষণ এক। কিন্তু, তৃণমূলস্তরের উৎপাদকদের কাছ থেকে উদ্‌বৃত্ত আদায় করা প্রক্রিয়ায় তফাতও ছিল। এই আলোচনায় আমরা দেখব যে বহিরাগত সংখ্যালঘুরা, তা সে ব্রাহ্মণ, তুর্কি, মোগল হোক বা পরের যুগে ইংরেজ হোক, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই ধরনের নীতি এবং প্রথা মেনে চলেছে। আমরা জোর দিচ্ছি মিলের ওপর, অভিন্নতার ওপর নয়। মানবসমাজকে কেন্দ্র করে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া তা কখনই এক ধরনের হতে পারে না। বিকাশের গতি বাড়া-কমা অনেককিছুর ওপর নির্ভরশীল। কোনও সমাজ, উন্নততর সমাজের সংস্পর্শে এলে বিকাশের গতি বাড়ে, বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বিকাশ প্রক্রিয়া শ্লথ হয়—কিন্তু ইতিহাসের রথ চলতেই থাকে।

মার্ক্সীয় চিন্তায়, অর্থনৈতিক বিষয়গুলি, শ্রেণি সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে শাসক এবং শাসিত শ্রেণিগুলির সম্পর্ক। রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, বলপ্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে পরিচিত রাষ্ট্রশক্তি, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র-এই সবগুলিই শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষার কাজ করে থাকে। শাসকশ্রেণি, আক্রমণের মুখোমুখি হলেই,

শেষপর্যন্ত এই বলপ্রয়োগের মাধ্যমগুলিকেই নিজেদের শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার করে। কিন্তু এ ধরনের সরাসরি শত্রুতার ক্ষেত্রে সবসময় একটা আশঙ্কা থেকে যায়। সংগঠিত বিরোধী আক্রমনের সামনে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যথেষ্ট নাও হতে পারে। শাসকশ্রেণি সেজন্যই, বলপ্রয়োগের বিষয়টিকে শেষ অস্ত্র হিসাবে রেখে, বলপ্রয়োগ ছাড়াই শাসন ব্যবস্থা চালানো চেষ্টা করে।

'উপরি কাঠামো' শাসকশ্রেণিকে এই কাজেই সাহায্য করে। শাসকশ্রেণিকে শাসন ক্ষমতা অটুট রাখার শান্তিপূর্ণ বিকল্প জোগায়। আয়ত্তাধীন, শোষিত জনগণের মগজ ধোলাই করে শাসকশ্রেণির কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। শাসকশ্রেণির বিশ্বাস, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে, যা শাসকশ্রেণির স্বার্থে, জনগণ নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গ্রহণ করে। সব সমাজেই নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষকে উচ্চবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ, জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা যায়। এই ধরনের মূল্যবোধগুলির প্রভাব বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম। রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অনুসৃত নিয়মাবলি বা আচরণের মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠিত আইনের মাধ্যমে, শাসক শ্রেণি তার প্রভাব বজায় রাখে। কীভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে—কোনটা ঠিক কোনটা ভুল—ভুল করলে শাস্তি আর ঠিক কাজে পুরস্কার—এই মূল্যবোধগুলি সমাজের সমস্ত স্তরে সঞ্চারিত হয়। শিল্প, সাহিত্য বা গণমাধ্যমও, শ্রেণি শাসকদের, সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে নৈতিক এবং আবরণগত সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যতক্ষণ সামগ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব অটুট থাকে, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতায় লাগাম পড়ানো থাকে। শান্তিপূর্ণ উপরিকাঠামো ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা যখন তার কার্যকারিতা হারায় তখনই রাষ্ট্র তার সন্ত্রাসের অস্ত্র প্রয়োগ করবে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে আমাদের বর্তমান আলোচনা বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা প্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের সময় আমরা সবরকম আবেগ, সবরকম অনুভূতি বর্জন করার চেষ্টা করেছি। আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক, দেশাত্মবোধক কোনও অনুভূতি যেন যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করতে না পারে—সে সম্পর্কে সচেতন থেকেছি। এই গ্রন্থে আমরা বিতর্ক এড়িয়ে যাইনি বরং বিতর্কে ভাগ নিয়েছি, উপভোগ করেছি।

বাংলার সংজ্ঞা

ত্রয়োদশ শতকের আগে পর্যন্ত 'বাংলা' বলে যে বিশেষ ভূভাগ বোঝায় তার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশকে নিয়ে যে ভূভাগ তা বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল 'গৌড়'। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের বেশ কয়েক যুগ পরে এক রাজ্যের অধীনে আসে। এরপর যখনই সুযোগ এসেছে, বাংলার বিভিন্ন শাসকরা তাদের নিজেদের সীমানা বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। আজকের ওড়িশা, অসম আর বিহারের কিছুটা ভূভাগে তাদের দখল কায়েম করতে চেষ্টা করেছেন। কখনও সফল হয়েছেন, কখনও হননি। একইভাবে প্রতিবেশী

অঞ্চলের শাসকরাও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বারবার হানা দিয়েছেন। রাজ্যের সীমানা ছিল স্বতঃ পরিবর্তনশীল। পলাশির যুদ্ধের সময় বাংলার নবাবের, বাংলা আর বিহারের এক বড় অংশের উপর আধিপত্য ছিল। ১৭৫০-এর দশকে এক চুক্তির ভিত্তিতে ওড়িশা মারাঠাদের তাঁবে চলে গিয়েছিল। ওই শতকের চারের দশকে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মারাঠা হানা, লুঠপাঠ ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

এই দীর্ঘ সময়ে, পরিবেশগত বহু বদলও ঘটেছে। একটি অঞ্চল সাধারণত নদী, অরণ্য বা পর্বতশ্রেণির পরিচয়ে পরিচিত হয়। নদীর গতিপথ ঘন ঘন পালটে যায়। নতুন আর নিরাপদ স্থানে শহর সরে যায়। পিছনে পরে থাকে বদ্ধ জলা—যা মহামারিকে'ও ডেকে আনে। আবার কখনও সেই অঞ্চল ঘিরে গড়ে ওঠে বনভূমি-তার আশেপাশে জনবসতিও গড়ে ওঠে। নদীর নতুন গতিধারা ধরেও বসতি তৈরি হয়।

নদী ভাঙনে শেষ হয়ে যায় বহু নগর, বহু ধ্বংসাবশেষ। ঢাকা শহরের কাছে, বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ শহর শ্রীপুর এভাবেই 'কীর্তিনাশা'-র প্রবল তরঙ্গে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন কালে, গঙ্গা বিভিন্ন গতিপথ দিয়ে বয়ে গেছে। এরই মধ্যে, মহানন্দার মতো, কোনও কোনও ধারা, পরবর্তী সময়ে স্বতন্ত্র নদীর পরিচয় পেয়েছে। একদা বাংলা আর অসমের কামরূপ জেলার সীমান্ত স্বরূপ করতো নদী আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। এরই তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরী 'পুণ্ড্রবর্ধনপুর'। প্রাচীন আর্যদের চোখে সভ্যতার সঙ্গে 'বর্বর' সমাজের সীমা নির্দেশ করত বিহারের যে 'গণ্ডক' নদী, তাও আজ আর নেই।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, অরণ্য, কৃষি বা বসবাসের জন্য নিয়মিতভাবে নিকাশ হয়েছে। প্রথমদিকে আগুনের সাহায্যে, পরে লোহার অস্ত্রে। কৃষির বিকাশ হয়েছে সর্বত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার সময়েও, ১৭৯৩ সালের শেষ ভাগে, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল অরণ্য।

আমরা কোনও দেশ বা সুনির্দিষ্ট সীমা চিহ্নিত কোনও রাজত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। আধুনিক 'জাতীয়তা' অর্থে কোনও পরিচয়, এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ছিলই না। সময়ের সাথে সাথে, বাংলাভাষা আর সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভবত এই ঐক্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টি'তে সমধর্মিতা এবং একরূপত্বের ধারণার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া খুব গভীর ছিল না। সেই কারণেই, পোশাক-জীবনযাত্রা-অভ্যাস-দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিদেশি শক্তির সামরিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'জাতি রাষ্ট্র' ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পাবে না। কারণ, এই ধারণা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের একটি উপাঙ্গ মাত্র।

এই গ্রন্থের তিনটি খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার

সমগ্র আলোচনাটিকে তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমান খণ্ডটিতে প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়কাল আলোচিত হয়েছে। অন্য দুটি খণ্ডের বিষয়বস্তু ঔপনিবেশিক

এবং উপনিবেশ পরবর্তী সময়কাল। ঔপনিবেশিক শাসনকালের অভিজ্ঞতা বিচারে, এই খণ্ডটির বিষয়বস্তুকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সাধারণত, প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের আলোচনার ক্ষেত্রে, গোটা পর্যায়টিকে একসঙ্গে সমরূপের বিচারে দেখার প্রবণতা থাকে। কেউ কেউ পলাশির অব্যবহিত আগের সময়টিকেই গোটা প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়ের দৃষ্টিতে বিচার করেন। এই আলোচনায়, আমরা, ঔপনিবেশিক যুগের বহু বিষয়ের সূত্র সন্ধান করব প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের গর্ভে।

একই ভাবে, ঔপনিবেশিক যুগের আলোচনা (খণ্ড ২), আমাদের উপনিবেশ পরবর্তী যুগের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে সাহায্য করতে পারে। আজকের বিভিন্ন বিষয়েও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ঘোরতর প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে, রাজ্য পরিচালনায় অর্থ বিভাগের ভূমিকা বা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের নির্বাচন প্রক্রিয়ার কথা বলা যায়। এছাড়া প্রশাসনিক ভাষা ব্যবহারেও উপনিবেশিক শাসনের ছাপ স্পষ্ট। সেই ভাষায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্রে চাকরির জন্য 'ভিক্ষা' চাইতে হয়, সরকারি আধিকারিকরা সর্বদা 'প্রার্থনা'-য় সাড়া দেন। এই ভাষা ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসন চালাতে চালু করেছিলেন—ইংরেজদের নিজের দেশের সরকারি ব্যবস্থায় এই ভাষা চালু নেই। বর্তমান ভূমি আইনের কিছু কিছু ধারার উৎপত্তির সূত্র পাওয়া যাবে ১৭৯৩ সালে চালু হওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে।

তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য সাম্প্রতিক ঘটনাবলি। বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামোন্নয়ন, ভূমিসংস্কার, কৃষি উৎপাদন, পরিবেশ, শিল্পায়ন, নগরায়ণ ইত্যাদি। আমাদের আশা, এই তিনটি খণ্ডে একসঙ্গে, বিভিন্ন বিতর্ক এবং বিরোধ নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদের রূপরেখা

বর্তমান খণ্ডটিতে আলোচনার বিষয়বস্তুকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ১২০৪ সাল পর্যন্ত, তৃতীয় ভাগে ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। চতুর্থভাগে আলোচনার মূল বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। ১৫২০ সাল থেকে, প্রথমে পোর্তুগিজ এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে এই ভাগে। প্রথমভাগটি প্রস্তাবনা, পঞ্চমভাগটি গ্রন্থপঞ্জি। অন্যান্য অধিকাংশ আলোচকদের মতো, এই গ্রন্থে, পরিচ্ছেদ ভিত্তিক কোনও উপসংহার টানা হয়নি। পলাশি যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভূমিকা নিয়ে মূল উপসংহার আলোচনার শুরুতেই পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থভাগে, সমকালীনতাকে বজায় রেখে, প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আলোচনাকে একটি সময়ানুক্রমিক ভিত্তি দেওয়ার জন্যই এটি করা হয়েছে। এরফলে, গোটা আলোচনা যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়েছে, তার থেকে হয়তো কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পটভূমি চিহ্নিত করার স্বার্থে এ কাজ করতে হয়েছে।

২.২ পরিচ্ছেদে আমরা বাংলার সমাজ এবং অর্থনীতির ক্রমবিকাশ নিয়ে চর্চা করেছি। কীভাবে বাংলা, অনেকগুলি আদিবাসী সমাজ পরিচালিত অঞ্চল থেকে একটি সামগ্রিক রাজ্য হয়ে উঠল - এ পরিচ্ছেদে এটাই আমাদের আলোচ্য। আদিবাসী সমাজ থেকে পুরোপুরি এককেন্দ্রিক রাজত্ব হয়ে ওঠার মাঝখানে বহু মধ্যবর্তীকালীন পর্যায় রয়েছে। রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক আইনের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়মকানুন। ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠলেও, ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে সর্বত্র এর মিল নেই। যেরকম, ইউরোপীয় ধারণায় শ্রম এবং ভূমিদাস ব্যবস্থা। দাসত্ব এখানেও ছিল, কিন্তু তাদের ব্যবহার ছিল মূলত গৃহকাজে-ভৃত্যের মতো। প্রাচীন গ্রিস বা রোমের মতো, খনি বা কৃষিখামারে, উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে দাসের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল না।

৩.২ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, ১২০৪ সালে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও, ভূমি ব্যবস্থার প্রথমদিকে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। নতুন শাসকরা কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্থানীয় সামন্ত রাজাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৫৭৫ সালের পর মোগল শাসকরা বাংলার কর ব্যবস্থায় সমন্বয় আনার চেষ্টা করেন। যদিও এ কাজে তাঁরা বিশেষ সফল হননি। এই পরিচ্ছেদে আমরা কৃষকদের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে আলোচনা করেছি। সে সময় জমি, শ্রম, পণ্য বা ঋণ ব্যবস্থার বাজার গড়ে ওঠেনি। জোতদার, ভাগচাষি বা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের কি সে সময় ভিন্ন শ্রেণি হিসাবে কোনও অস্তিত্ব ছিল? উপনিবেশিক শাসকদের একটা তত্ত্ব আমরা যাচাই করে দেখে খারিজ করেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি যে, বাংলা কখনই কোনও কেন্দ্রীয় সার্বভৌম শাসকের অধীনে, রাষ্ট্র সৃষ্ট সেচ ব্যবস্থা সম্বলিত 'সেচ নির্ভর সমাজ' ছিল না। বাংলার অবস্থার সঙ্গে 'উৎপাদনের এশীয় ধরন'-এর ধারণারও অমিল ছিল। যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিয়ে যে বক্তব্য ওই ধারণায় রয়েছে তার মধ্যে বেশ খানিকটা সত্যতাও রয়েছে।

২.৩ এবং ৩.৩ পরিচ্ছেদে, আমরা কীভাবে শহর গড়ে উঠল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কীভাবে শহরের এবং গ্রামের মধ্যে শ্রমের সামাজিক বিভাজন ঘটল তাও আলোচিত হয়েছে এই পরিচ্ছেদ দুটিতে। প্রথম দিকে, শহর এবং গ্রামের মধ্যে ভেদরেখা টানা কঠিন ছিল। বাস্তবে শহরগুলি ছিল বড় গ্রামই। গ্রাম থেকে কৃষি উদ্বৃত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ আর অবশেষে গৌড়ের শাসকের কাছে তা পাঠানো এর উপর ভিত্তি করেই শহরের শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয়েছিল। ধীরে ধীরে শহর হয়ে উঠল চারপাশের গ্রামের মানুষের নানান বিশেষ ধরনের প্রয়োজন মেটানোর কেন্দ্র। এমন প্রয়োজন, যা মূলত পরিমাণের কারণে, কোনও একটি গ্রামে করা সম্ভব ছিল না। যেমন, কোনও যন্ত্র তৈরির. সোনা-রুপোর কাজের, লোহার কাজের, চামড়া বা হাতির দাঁতের কাজের বা কাঠের কাজের কুশলী কারিগরের কারখানা বা দোকানের জন্য গ্রামকে নির্ভর করতে হল শহরের উপর। পরবর্তীকালে, যতই বিভিন্ন কাজের কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ঘটল, বিক্রয় ব্যবস্থা আর নির্মাণব্যবস্থা আলাদা হয়ে গেল। কারিগরদের সমবেত স্বার্থরক্ষার জন্য সংঘ গড়ে উঠল। বাংলার শহরগুলিতে সময় যে কারিগরদের সংঘ গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু পরে সেই সংঘগুলি বিলুপ্ত হয়।

পরের যুগে, চারপাশে প্রাচীর, গড়খাই আর দুর্গ নিয়ে শহরগুলি যথাযথ নগরের

রূপ পায়। রাজারা পারিষদ-সহ শহরেই বাস করতেন। অভ্যন্তরীণ আর বহির্শক্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এই নির্মাণ দরকার ছিল। প্রাচীরবেষ্টিত এই নগরগুলির বিবিধ ভূমিকা ছিল। প্রতিটি নগরের দেখাশোনার জন্য পৃথক রাজকর্মচারীরা ছিলেন! নগর এবং গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক ছিল একদিকে কর্তৃত্বের, অন্যদিকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদিত শস্যের ভাগ থেকে, গ্রামের লোকেদের, কর দিতে হত। একদল জমির মালিক, যাদের সমৃদ্ধির সূচনা কর আদায়কারী হিসেবে, 'জমিদার' বলে পরিচিত হল। সেই যুগটি ছিল নগর কর্তৃত্বের যুগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান নগরের নামেই দেশের পরিচিতি ছিল। কিন্তু, এর পরের যুগটি হল নগরের অবক্ষয়ের যুগ।

নগরের প্রধান আর্থিক বুনিয়াদ ছিল বাণিজ্য। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং নানা কারণে, ইয়োরোপের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সংযোগ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে বাণিজ্যিক ভিত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যতম কারণটি অবশ্যই, ইসলামের উত্থান। এই সঙ্গে। একদা সম্মানিত বণিক সম্প্রদায় তার গুরুত্ব হারালো এবং এরফলে অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতির চোখে ছোট হয়ে গেল। গ্রামে ফিরে যাওয়াব একটা প্রবণতা সৃষ্টি হল এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দানা বাঁধল। মুদ্রা তৈরি বন্ধ হল। ধাতুমুদ্রার চলন কমে গেল। কিছু কিছু ধাতুমুদ্রা যাওবা চালু ছিল তাও ছিল খাদ মেশানো। মালদ্বীপ থেকে সংগ্রহ করা কড়িই হয়ে উঠল বিনিময়ের মাধ্যম। বিশেষ করে পঞ্চম শতকে, শাসক শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষ, জীবন ধারণের জন্য জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই পড়ন্ত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই, নতুন চাষের জমি খুঁজে বাব করায় উৎসাহ দেওয়ার তাগিদে ভূমি দানের পবিমাণ বৃদ্ধি পেল।

এই পরিস্থিতি কিন্তু নতুন নাগরিক শ্রেণি গড়ে তোলায় প্রতিবন্ধক হয়নি। শুরু থেকেই, নগরজীবন বহু শ্রেণিতে বিন্যস্ত ছিল। উচ্চশ্রেণির লোকেবা সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন কাটাত, সাধারণ মানুষের সঙ্গী ছিল দারিদ্র।

১২০৪ সালের পর, শহরগুলি আবার প্রাচীর আব পরিখায় আশপাশের গ্রামগুলি থেকে আলাদা হয়ে গেল। স্থানীয় মানুষের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম এক শাসকশ্রেণির অভ্যুত্থান ঘটল। আরব দুনিয়া আর দিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেব ফলে শহরগুলি উপকৃত হল। ১৪৯৮ সালের পর ইউরোপীয় বণিকরা আসতে শুরু কবল। গৌড়, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও আর সপ্তগ্রাম—এই চতুর্ভুজ জুড়ে তুর্ক-আফগান যুগে বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মোগলরা ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদে রাজধানী শহব গড়ে তুলেছিল। পোর্তুগিজরা তৈরি করেছিল হুগলি, চন্দননগর গড়ে তুলেছিল ফরাসি বণিকরা, দিনেমারদের হাতে গড়ে উঠেছিল শ্রীরামপুর। ইউরোপীয় বণিকদেব মূল বাণিজ্য ছিল বাংলাব বস্ত্রশিল্প ভিত্তিক। ১৬৮০ সালে মোগলবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হওয়াব পর ইংরেজরা কলকাতায় কেন্দ্র তৈরি করল।

২.৪ এবং ৩.৪ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির একটি বিশেষ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা দুরূহ। ব্যাপক অর্থে, সংস্কৃতি বলতে জীবনের সঙ্গে যুক্ত এক বিশাল অংশকে বোঝায়। বাণিজ্য, পোশাক, জীবনযাত্রা, শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা—সবই ব্যাপক অর্থে একটি বিশেষ সংস্কৃতির অঙ্গ। সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতি অর্থে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা এবং বিশ্বাসকে বোঝায়।

আর্য সংস্কৃতি বাংলায় পৌঁছেছে অনেক পরে। মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনকালে। আর্য সংস্কৃতি দুটি রূপে এখানে এসেছে—ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম। তৎকালীন বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে দুটি মতেরই সংযোগ তৈরি হয়। প্রচলিত সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি এই দুটি মতই স্থানীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার কারণে বৌদ্ধধর্মই সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু সে সময়েও, বৌদ্ধধর্মই একমাত্র ধর্ম ছিল না। পাল রাজাদের প্রধানমন্ত্রী সব সময়েই ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। পালবংশের রাজত্বের শেষদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণাও অন্তর্হিত হয়।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন এবং বিলোপের কারণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা দরকার। মঠ কেন্দ্রিক, কঠিন অনুশাসনবদ্ধ ধর্ম থেকে এক ধরনের তন্ত্র নির্ভর হয়ে ওঠাই কি বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ? এই তান্ত্রিকতা, যেহেতু সংসার জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল তাই কি কৃষকদের বিরূপ করে তোলে? কৃষক সমাজের কাছে সংসার জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধধর্ম নগরকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে কি বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং শহরগুলির পড়ন্ত দশায় এই ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়? এই পরিচ্ছেদে আমরা এ রকম অনেকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি। কেউ কেউ বলেন বাংলায় যে ধরনের বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষ ফারাক ছিল না। জাতিপ্রথা চালু ছিল, তাম্রলিপিগুলির ভাষা সর্বক্ষেত্রেই ছিল সংস্কৃত, ভূমিদানের ফলে উপকৃতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ব্রাহ্মণরা। সেন রাজারা সিংহাসনে বসার পর, ব্রাহ্মণ্যবাদকে অকৃপণ অনুগ্রহ করেছেন, জাতিপ্রথাকে দৃঢ় করা হয়েছে, কনৌজ থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসা হয়েছে। স্থানীয় বণিকদের জাতিগত অবস্থানের অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে। সে সময় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম মৃত। শুরু থেকেই, ব্রাহ্মণ্যবাদের কিছু সুবিধা ছিল। ব্রাহ্মণরা জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে পূজিত ছিলেন। গোটা ভারতেই, জ্ঞানের কারণে, বিভিন্ন শাসকরা ব্রাহ্মণদের নিজেদের রাজত্বে বসত করাতে ভূমিদান করতেন। বদলে ব্রাহ্মণরা সেই রাজার কোষ্ঠি তৈরি করে দিতেন। সেই কোষ্ঠিতে রাজার পূর্বপুরুষের জন্মের সঙ্গে কোনও বৈদিক দেবতার সম্পর্ক উল্লেখ করা থাকত। এর ফলে, সেই রাজা যে সম্প্রদায়ের, সেই সম্প্রদায় জাতি মানদণ্ডে উচ্চ বর্গে স্থান পেত। ধরাবাঁধা আইনে সে সুযোগ ছিল না।

আমরা দেখবো যে ব্রাহ্মণরা গোটা দেশজুড়ে ছিলেন। সমস্ত রাজার ক্ষেত্রেই, একই ধরনের পুঁথির সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা রাজ্যশাসন করতেন। ফলে গোটা দেশেই একই রকম ব্রাহ্মণ্য চিন্তা এবং প্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করেছিল। জাতি ব্যবস্থা এবং পুণর্জন্মতত্ত্ব, শাসক শ্রেণিকে শ্রেণিশাসন বজায় রাখতে সাহায্য করত। তাদের সংস্কৃতিই সবার সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াল। নিম্নজাতির লোকেরা রাজা এবং বিভিন্ন বর্গের জমিদারদের শ্রেণিশাসন মেনে নিল। রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখার শান্তিপূর্ণ উপায় হিসাবে সংস্কৃতির ভূমিকা এভাবেই নিশ্চিত হল।

এই যুগেরই শেষভাবে, ভাষা হিসাবে বাংলা আকার নিতে শুরু করে। মাগধি ভাষার গর্ভ থেকে, মূল ভাষার অপভ্রংশ হিসাবে চর্যাপদের বাংলাভাষার সূত্রপাত। চর্যাপদের সময়, সম্ভবত, একই শিকড়ের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার বিশেষ পার্থক্য ছিল

না। কিন্তু সন্দেহ নেই, সংস্কৃত ভাষার একটি জনপ্রিয় বঙ্গীকরণের ঝোঁক ছিল। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও তা স্থানীয় কথ্যভাষার খুব কাছাকাছি। মজার কথা এই যে, বাংলাভাষার শিকড় একটি আর্য ভাষায় - কিন্তু এই ভাষার প্রচলন যে বাঙালি সমাজে তা মূলত অনার্য জনগোষ্ঠী। শাসকশ্রেণির সংস্কৃতিই যে সর্বসাধারণের সংস্কৃতিতে পর্যবসিত হয়—এ ঘটনা তার আরেকটি প্রমাণ।

সংস্কৃত এবং এই ভাষাকে ঘিরে যে সংস্কৃতি তা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। সাধারণ মানুষ নিজেদের সংস্কৃতি নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল। এই সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল পাঁচালি, পুতুল নাচ, লোকগল্প, আলপনা, লোকদেবতা ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল সূত্রগুলি এবং লোকায়ত সংস্কৃতির তুলনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব তারা মেনে নিয়েছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, জাতি শাসন অথবা মৃত্যুর পরের জীবন বা পুনর্জন্ম নিয়ে ধারণার বিরোধিতা তারা করেনি। তাদের হাতে পরে, ব্রাহ্মণ্য দেবতারা এক নতুন লোক চরিত্রলাভ করে, যে মূর্তি বা চরিত্র তাদের জীবন বাস্তবতার খুব কাছাকাছি। বহু লোককাহিনিতে, প্রকৃতিতে তাদের কাছে ভীতিপ্রদ বহু কিছু, যথা, সাপ, বাঘ বা ভূত ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটেছে।

১২০৪ থেকে ১৫৭৫ পর্যন্ত অধিকাংশ রাজারই রাজত্বকাল পাঁচ বছরের বেশি ছিল না। এদের সামান্য কয়েকজনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। এমন কি নিজের ছেলেকেও না। যে কেউ রাজাকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসত। এ ছাড়া, এ সময়ের শাসকরা প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্গনগরে বাস করতেন। একমাত্র বিদ্রোহ দমনেই তাঁরা দুর্গ ছেড়ে বাইরে আসতেন। শাসকরা জবরদস্ত যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু বাণিজ্য বা কৃষিতে তাঁদের উৎসাহ ছিল না। সে দায় তাঁরা সামন্ত রাজাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দুই শতকে, তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়েও বিশেষ উৎসাহ দেখাননি।

ঘন ঘন শাসক পরিবর্তনের ফলে যে অস্থিরতা চলছিল, তখনই ইতিবাচকভাবে, দুটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশ এবং একজন শাসক বাংলার অধিপতি ছিলেন। এই শাসকের পৃষ্ঠপোষণায় আদিনা মসজিদের মতো বিশাল স্থাপত্য সৃষ্টি হয়েছিল। আর একজন স্বাধীন বাংলার অধিপতি হওয়ার জন্য দিল্লির মসনদের প্রলোভন ত্যাগ করেছিলেন। এঁরা বাংলার ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে, আফগানিস্তান বা তুর্কিস্তানের সঙ্গে তাঁদের শিকড়ের যোগ ছিন্ন হয়েছিল। সুযোগ পেলেই দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগও ছিন্ন হয়েছিল। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁরা যুদ্ধ করতেও পিছপা হননি। তাঁদেরই শাসনকালে বাঙালি সত্তার বিকাশ ঘটে। ভাষা হিসাবে বাংলার প্রসার ঘটে। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ শাসক হুসেন শাহ স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করেছিলেন। রাজা গণেশের শাসনকালের উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করা যায়। গণেশ রাজার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল এবং মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের প্রচলিত ধারণামতো, এই যুগে কেবলমাত্র মুসলমানরাই শাসক ছিলেন তা ঠিক নয়।

এই যুগে, মুসলমান শাসকদের বাসনার প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের সংখ্যাল্পতা। তাদের শাসনকালের শুরুতেই তারা অনুভব করেছিলেন যে ক্ষমতা টিকে থাকতে গেলে প্রজাদের

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন এবং সহযোগিতা দরকার। মুসলমান পির এবং অন্যান্য ধর্মীয় যাজকরা ধর্মান্তরকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন চাইছিল। কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে অমুসলমানকে বসানোতেও তাদের আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও শাসকরা অধীনস্থ সংখ্যাগরিষ্ঠকে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বহু অমুসলমানকে উচ্চতম রাজপদেও অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

অতীতে, যেরকমভাবে, সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেয়েছিল, এই যুগে, ঠিক সেইভাবে, আরবি এবং ফারসি ভাষা রাজসভা এবং আদালতের ভাষা হয়ে উঠল। শাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই ভাষা এবং তৎসংলগ্ন আচরণকে গ্রহণ করতে শুরু করল। এই নবোদিত সর্বজনীন সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বসে ব্রাহ্মণরা অধীনস্থ সংখ্যাগুরুদের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদকে ইসলামের বিকল্প বিশ্বজনীন সংস্কৃতি হিসাবে তুলে ধরতে চাইল। নিম্নজাতির মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা কিছুটা হলেও শ্রীচৈতন্যের উদার বৈষ্ণববাদের ফলে ব্যাহত হয়েছিল। নিম্নজাতির মানুষের স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল দুটি ধর্মের কিছু কিছু আচরণগত সাদৃশ্য এবং লোকদেবতার সঙ্গে পয়গম্বরদের এক করে দেখা।

চতুর্থ পর্যায়ের ছয়টি পরিচ্ছেদে বাংলায় ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ৪.১ পরিচ্ছেদে সমসাময়িক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ৪.২ পরিচ্ছেদে চীনা, আরবি, পোর্তুগিজ, ইতালীয়, ফরাসি এবং ইংরেজ—সমসাময়িক বহু বিদেশি পর্যটক বাংলার নানা বিষয়ে যা লিখেছেন তা আলোচিত হয়েছে। অধিকাংশ পর্যটকই ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে পৌঁছবার আগে এখানে এসেছেন। তাঁদের বিবরণী অনুসারে এ দেশের মানুষের খাওয়া পরার অভাব না থাকলেও, সাধারণের জীবনযাত্রায় বিলাসব্যসনের সুযোগ ছিল না। সমাজে অসাম্য ছিল। বাসস্থানের মান ছিল সাধারণ। কিছু জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে পরিবেশগত সমস্যা ছিল। মহামারির কবলে বহু প্রাণহানি নিয়মিত ঘটত।

৪.৩ পরিচ্ছেদের আলোচ্য পোর্তুগিজদের ভূমিকা। ভাস্কো-ডা-গামার কালিকট বন্দরে অবতরণের দুই যুগ পরে পোর্তুগিজরা বাংলায় আসে। পোর্তুগিজরাই প্রথম এদেশে আধুনিক, বৃহৎ, পুঁজিনির্ভর এবং যৌথ মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে। বাংলার মস্‌লিন এদের মাধ্যমে ইয়োরোপের বাজার দখল করে। চট্টগ্রাম আর সপ্তগ্রাম এই দুটি বন্দর পোর্তুগিজদের উদ্যোগেই বিকশিত হয়। সপ্তগ্রাম বন্দর নাব্যতা হারানোর পর হুগলি বন্দর তারা গড়ে তোলে। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তারের জন্য পোর্তুগিজদেব উদ্যোগ তাদের হিংস্রতার জন্য নষ্ট হয়—দাস ব্যাবসা এবং জলদস্যুতা তাদের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে, ১৬৩২ সালে হুগলিতে মোগলবাহিনীর হাতে পোর্তুগিজরা পর্যুদস্ত হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বহুল সংখ্যায় আন্তঃবিবাহের কারণে, একদা শক্তিশালী এই গোষ্ঠী বাংলা থেকে বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস এবং ভাষায় পোর্তুগিজ প্রভাব রয়ে গেল।

৪.৪ পরিচ্ছেদে অন্যান্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পোর্তুগিজ বণিকদের প্রতিস্থাপন করতে ভারত সম্রাট এদের সাগ্রহে স্থান

দিয়েছিলেন। এদের অনেকে পোর্তুগিজদের দেখানো রাস্তা অনুসরণ করত। এদের অনুমোদিত সমুদ্র বা নদীপথে জাহাজ চালাবার জন্য অনুমতিপত্র দিত। অনুমতিপত্রহীন জাহাজ আটকে তার মালপত্র বাজেয়াপ্ত করত। গোমস্তাদের সাহায্যে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করত, বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীদের সহযোগিতা নিত। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিপুলায়তন অস্তিত্বের কাছে ভারতীয় বণিকরা কী নেহাতই ফিরিওয়ালা ছিল, ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কী মোট বস্ত্র বাণিজ্যে তাদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল? পলাশির যুদ্ধে ইউরোপীয়দের বিজয় কি সেই সম্ভাবনায় ছেদ টেনে দেয়? আমাদের আরও জিজ্ঞাস্য, সে সময়, বাংলাব কৃষি পরিস্থিতি কেমন ছিল? বাংলার তৎকালীন কৃষি ব্যবস্থা কি শিল্পায়নের ভার বহনে সক্ষম ছিল। বস্ত্রশিল্প ছাড়া অন্য গ্রামীণ শিল্প বিকাশ কি সম্ভব ছিল? প্রথম শিল্প বিকাশ কি সম্ভব ছিল? প্রথম শিল্পস্থাপন এবং তৎপরবর্তী শিল্পায়নের কী কোনও ভবিষ্যৎ ছিল? আমরা, ইয়োরোপের প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে, ভালোমন্দ—সহ শিল্পায়নের সাংস্কৃতিক পূর্বশর্তগুলি খতিয়ে দেখব এই পরিচ্ছেদে।

৪.৫ পরিচ্ছেদে আমরা ইতালীয় রেনেসাঁস-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছি। ইতালি থেকে শুরু হয়ে, এই নবজাগরণের প্রভাব একশো বছরের মধ্যেই গোটা ইয়োরোপে ব্যাপ্ত হয়েছিল। আমরা লক্ষ করেছি যে, ইয়োরোপে নবজাগরণের ফলে জ্ঞানের তৃষ্ণা বেড়েছিল, প্রচলিত ধারণাকে যাচাই করার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। এই জ্ঞানতৃষ্ণা এবং জিজ্ঞাসা বহু আবিষ্কার এবং সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করেছিল। বাংলায়, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মীয় সন্তদের প্রভাবে, জ্ঞানার্জনের চেয়ে ভক্তিমার্গের সহজপথে ভগবানের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল।

৪.৬ পরিচ্ছেদে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে মোগলদেব দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি দশকের অখণ্ড শান্তির ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের পরিমাণ কীভাবে দিনেমারদের ছাপিয়ে গেল দেখা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে, পলাশি যুদ্ধে নবাববাহিনীর পরাজয়ের কারণ নিয়ে নানা পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের মতগুলিও আমরা খতিয়ে দেখব।

২.১

রাজনৈতিক ইতিহাস
১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চলতি, সময়ানুক্রমিক এবং রাজনৈতিক রূপরেখা। রাজা ও রাজবংশ, রাজত্ব-নির্মাণ, রাজনৈতিক জোট, সাফল্য, ব্যর্থতা মিশিয়ে। ইতিহাসের বিবরণটুকু এখানে আদৌ উদ্দেশ্য নয়—সেটা, ঐতিহাসিকরা অনেক আগেই ভালোভাবে, পেশাদারি দক্ষতায় করেছেন। উদ্দেশ্য, ওই সময়কালের কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো।

শশাঙ্কের আগের পর্ব

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাংলা, মানে আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলিয়ে যে ভূখণ্ড, তা রাজা শশাঙ্কের শাসনের আগে অনেকগুলি দেশে বিভক্ত ছিল। শশাঙ্কর রাজত্ব শুরু সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে। উত্তরে ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, বারেন্দ্র, গৌড়, সঙ্গে কোটিবর্ষ ও কজঙ্গল। পশ্চিম ছিল রাঢ়। দক্ষিণাংশে ছিল বন্দরশহর তাম্রলিপ্ত, পূর্বদিকে ছিল বঙ্গ, আজকের বাংলাদেশের এক বিরাট অংশ; উপকূলবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব ছিল সমতট নামেই অধিকাংশ লোকের কাছে পরিচিত। সমস্ত ভূখণ্ডেই ছিল একাধিক রাজত্ব,[১] গোটা বাংলা বা তার উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে একজন কোনও রাজার নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

৬০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে লেখা 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ বাংলা বা বাংলার মানুষ ও ভাষার প্রথম উল্লেখ রয়েছে। রয়েছে বঙ্গ-এর কথা, সম্ভবত পূর্ব বাংলার কথা, সঙ্গে মগধ ও চেরপাদার কথা (কিথ, আর্থার বেরিডেল, ১৯৬৯ ২/১/১,২: ১৯৯-২০০)। এই উল্লেখের ফলে দুটি জটিলতা দেখা যায়। তারা বঙ্গ ছাড়াও এমন একটা শব্দ ব্যবহার করত যার অর্থ দাঁড়ায় 'পাখির মতো', আর্যদের কানে অদ্ভুত এক ভাষায় বঙ্গের লোকেরা নাকি কথা বলত।[২] দ্বিতীয় জটিলতা তৈরি হয়, বঙ্গের সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক নিয়ে। মগধ নিয়ে বিভ্রান্তি কাটলেও চেরপাদা নিয়ে বিভিন্ন মতামত চালু ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিহারের একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর সূত্রেই চেরাস শব্দটির উৎপত্তি (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০; ৬২)। কিথ ও অন্যদের মতে, কেরালার লোকজনদের কথাই বলা হয়েছে। বাকি গবেষকরা এ ব্যাপারে তাদের কোনও মতামত দেননি।

দীর্ঘদিন ধরে বিহারের গণ্ডক নদীকে সভ্যতা ও বর্বরতার বিভাজনরেখা হিসেবেই ধরা হত। এবং আর্যরা ওই এলাকা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতেন। শতপথ ব্রাহ্মণ লেখা হয়েছিল, সরস্বতী নদীর পাড় থেকে সদানীর নদীর পাড় পর্যন্ত পুরোহিত রহুগুনার সঙ্গে আগুন বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 'বিদেহা মাধব'। তারপর থেকে ব্রাহ্মণরা আর ওই নদী পেরয়নি, কারণ আগুন সেখানে যায় না।[৩]

সদানীরকে[৪] চেনা গেছে গণ্ডক নদী হিসেবে, বলা হয়, আর্যরা গণ্ডক নদী পার হতে চাইত না কারণ নদীর অন্যপাড়ের লোকেরা 'র' উচ্চারণ করত 'ল' হিসেবে। বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলির লেখাতেও দেখি ওরা যে 'র' উচ্চারণ করতে পারে না তার পিছনে এক আসুরিক প্রভাব কাজ করছে বলে আর্যরা মনে করতেন[৫] (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ২৯৩-২৯৪)।

অধিকাংশ পুরাণেই বাংলার কোনও উল্লেখ নেই, পুরাণ লেখা হয়েছিল খ্রিস্ট জন্মের ১০০০ থেকে ৩৫০ বছর আগে। বাংলায় ভ্রমণ করে কেউ জাত খোয়াতে চাইত না। কেননা বাংলায় ভ্রমণ করলে জাত যেত। এই উল্লেখ পাওয়া যায় আদি ও স্কন্ধ পুরাণে (হাজরা, আর. সি., ১৯৭৫, ২০৫; চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ৬২-৬৩)। পুণ্ড্রদের বলা হত দস্যু, বা অন্ত্যজ দস্যু। একই সঙ্গে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিভদেরও উল্লেখ করা হত ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত অর্ধশত সন্তান হিসেবে। (চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র, ১৯৮৭ : ৩১) ভাগবত পুরাণে বাঙালিদের বলা হত অভিশপ্ত আদিবাসী, হুন, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কর, আবির, যবন এবং খস্‌দের সঙ্গে। ('ডেভিড, রিশ, ১৯৬২ : ১৫৩)

জৈনদের আছারঙ্গ সূত্রে উল্লেখ রয়েছে মহাবীরের। তিনি যখন রাঢ়দের দেশে ভ্রমণ করেছিলেন (দে, এস. কে., ১৯৭১, ২৯০, ২৯৩), তখন সেখানে বন্য, বর্ববরা থাকত (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, ১৯৭০ : ৭০-৭১)। মহাবীর রাঢ়ে ভ্রমণ করছিলেন খ্রিস্টপুর্বাব্দ ৬০০ শতকে, মঙ্গলকোটে তার প্রমাণাদি রয়েছে। মহাবীর এই 'অভদ্র' এলাকায় ঘুরে বেড়ালেও বৌদ্ধরা মানুষকে পরামর্শ দিত ওই এলাকায় না যেতে। পালি জাতক এবং ত্রিপিটক-এ ভারতের মহান ১৬টি জাতির মধ্যে বাংলার কোনও অঞ্চলের উল্লেখ ছিল না। উল্লেখ যা ছিল, তা বাইরের লোকদের, বিশেষ করে গ্রিকদের রচনায়। গাঙ্গেয় বদ্বীপের পশ্চিমদিকের বিস্তৃত এলাকার কথা পাই গঙ্গারিদাই রাজ্য হিসেবে। রাজা আলেকজান্দার যোদ্ধা হাতির দলের গল্প শুনে গঙ্গা পার হওয়া থেকে নিরস্ত হলেন। পরবর্তীকালে গ্রিক রাজার দূত মেগাস্থিনিস ভারত সম্পর্কে যে বিবরণ পেশ করেন, তার কথা আমরা জানি প্লিনি, টলেমির লেখা থেকে। মেগাস্থিনিস ভারতের কথা বললেও বাংলা বা তার কোনও অংশ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

যদিও রাজা অশোকের শিলালিপি প্রচুর, কিন্তু সবই প্রায় উত্তর ভারতে পাওয়া যায়, বাংলায় একটাও নেই। মৌর্যযুগ থেকে বাংলার যোগাযোগ একটু একটু করে বাড়তে শুরু করে। ব্রাহ্মীলিপি ছাড়াও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলার সুখ্যাতি রয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গের তাঁতসামগ্রীর জন্য। পুণ্ড্র, কর্ণসুবর্ণের প্রশংসাও ছিল তাতে, এই তিনের মধ্যে কর্ণসুবর্ণর তাঁতবস্ত্রই সেরা বলে কৌটিল্যের অভিমত (কাঙ্গলে আর. পি., ২, ১৯৬৩: ১০৪-১০৫)। বোঝা যায়, বাকি ভারতের সঙ্গে বাংলার কিছু বাণিজ্য ততদিনে শুরু হয়েছে, বিশেষ করে তাঁতবস্ত্রে।

সুদূর অতীতে, সামান্য হলেও, বাংলায় পণ্যসামগ্রীর আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় পেরিপ্লাসের লেখায়। যদিও পরিমাণ ও গুণাবলির বিচারে তার গুরুত্বটা বোঝা যায় না। এটা আশ্চর্যের ও দুঃখের, যে বাংলার প্রথম উল্লেখ বাকি ভারতের কোনও সূত্র ধরে আসেনি, এসেছে গ্রিক সূত্র থেকে। পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সি—এমনই একটি রচনা। যদিও পেরিপ্লাস একটি ছদ্মনাম। এই বই আসলে গ্রিস ও বাংলার বাণিজ্য সম্ভাবনার এক হিসেবনিকেশ। এই নাম না জানা গ্রিক বণিক সম্ভবত থাকতেন কোনও মিশরীয় বন্দরে, ৮০-৮৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। আফ্রিকার উপকূল থেকে ভারত পর্যন্ত সমুদ্রের বিস্তারকেই নাম দেওয়া হয়েছিল ইরিথ্রিয়ান সি। পূর্ব পৃথিবী সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণা ছিল না। ওই সীমানাতেই ছিল নামহীন এক বাণিজ্যকেন্দ্র, গঙ্গানদীর মুখে। লেখক এই বিশেষ বন্দর দিয়ে যেসব পণ্য চলাচল করত সে সবেরও বর্ণনা দিয়েছেন। এই এলাকার মসলিনকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম গাঙ্গেয় মসলিন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ওই পর্যটক (ম্যাকক্রিনডেল, জে. ডব্লু., ১৮৭৯ : ১৪৬-১৪৭; স্কট, উইলফ্রেড এইচ, ১৯৭৪ : ৪৭)। বাকি বিবরণ আমাদের চেনা বাংলার বিবরণের সঙ্গে মেলে না। সেখানে সোনার খনির কথা আছে, স্বর্ণমুদ্রা নির্মাণের কথাও আছে। এক দ্বীপের কথা আছে, যে দ্বীপ একেবারে উদীয়মান সূর্যের নিকটতম ভূমিতে। এই ভূমগুলের একেবারে পূর্ব দিকে। ভারত মহাসাগরের পূর্বদিক ছিল অজানা ও অনাবিষ্কৃত (ম্যাকক্রিনডেল, জে. ডব্লু., ১৯৭৯ : ১৪৭-১৪৯)।[৫] স্বাভাবিক যে, এই জ্ঞানের খুবই সামান্য অংশ সরাসরি অর্জিত, বাকিটুকুর জন্য লেখক বিভিন্ন মাধ্যমের তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন।[৬]

ওই বাণিজ্যকেন্দ্রটি ছিল কোথায়? খুবই সম্ভব যে ওই বাণিজ্যকেন্দ্রই তাম্রলিপ্ত। বড় বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত, গঙ্গা নদীর প্রায় মুখেই। কিন্তু তখন তো গঙ্গার অনেকগুলো মুখ, নদীও অনেকবার বদলেছে তার গতিপথ। কোথায় ছিল এর অবস্থান, তা নিয়ে অনেকরকম তত্ত্ব চালু আছে। কিছু ঐতিহাসিক বলেন যে, এটি গঙ্গ'-ই, গঙ্গারিদাইয়ের রাজধানী নানান গ্রিক লেখকদের লেখায় উল্লিখিত, কলকাতার ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ইছামতীর ধারে বেড়াচাঁপা, এমনই আরও অনেককিছু। ছোট অথবা বড়, এই বন্দরটির দাবিদারের কিন্তু অভাব নেই। আরেক গ্রিক লেখক মনে করেন, এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি ছিল ভারতবর্ষের বাইরে, চীন বা মালাকান উপদ্বীপে (ম্যাকক্রিনডেল, জে. ডব্লু., ১৯৭৯ : ১৪৭; মজুমদার শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯২৭ : ১৭৪ : ১৭৫; ক্যামপোস, জে. জে. এ., ১৯১৯ : ২১)। সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এই গ্রিক লেখকদের লেখা থেকে দুটি পর্যবেক্ষণ বেশ স্পষ্ট। এক, এই বাণিজ্যকেন্দ্রটির মাধ্যমে বাণিজ্য হত যথেষ্ট। দুই, নানা লেখকদের লেখায় বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, এই অঞ্চলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্ত্র তৈরি হত।[৭]

মহাভারতের বিখ্যাত যুদ্ধ, যদি তার কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা থাকে, সম্ভবত ঘটেছিল মৌর্য শাসকদের কয়েক শতাব্দী আগে। পশ্চিমের অঙ্গ আর মগধ, পূর্বের প্রাগ্-জ্যোতিষপুর এবং কামরূপ মহাভারতের সময় ভারতের উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল, বাংলা বা তার অংশগুলি নয় (চৌধুরী, আর. ডি., ১৯৮৭ : ৪১)।

অঙ্গ, যা এখনকার ভাগলপুর আর মুঙ্গের জেলা, অথবা চম্পা নামেও পরিচিত,

শাসন করত, কৌরবদেরই একজন বিখ্যাত যোদ্ধা, কর্ণ। মধ্য বিহারে মগধ, জরাসন্ধের অধীনে ছিল। জরাসন্ধকে সমরযুদ্ধে নামান পাণ্ডবরাই, বিশেষ করে কৃষ্ণ, যিনি আবার দেবতা বিষ্ণুর মানব-রূপ। প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে পাণ্ডবরাই শত্রু মনে করেন। এরা সবাই পাণ্ডবদের কাছে হেরে যান। এই অঞ্চল মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে পাণ্ডব বিরোধী ভূমিকা নেয়। মহাভারতে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে কলিঙ্গ এবং অন্ধ্রের মতো দক্ষিণের রাজ্যেরও নিয়মিত উল্লেখ আছে, বাংলার অংশগুলির চেয়ে (রিশ, ডেভিড, ১৯৬২ : ১৫৩)। সবদিক থেকেই, জাতীয় রাজনীতিতে পাটলিপুত্রে গুপ্ত বংশের রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলা ছিল ভারতের প্রান্ত সীমায়। খ্রিস্টযুগের গোড়ার দিকে বাংলা ছিল আর্যদের অধীনে।[৮]

মহাভারতের মতো মহাকাব্যও বাংলা সম্বন্ধে নীরব।[৯] যদিও প্রাচীন ভারতেব প্রতিটি শহর, ব্যবস্থা, রাজ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। রয়েছে রাজার কথাও। বোঝা যায়, বাংলায় ছিল বিক্ষিপ্ত জনবসতি, কোনও গুরুত্বপূর্ণ শহর বা রাজ্য তখনও হয়েই ওঠেনি। মহাভাবতের বিখ্যাত যুদ্ধের পর মহাকাব্য অনুযায়ী পাণ্ডবদের নায়ক অর্জুনের ঘোড়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের সুবাদেই উত্তর পূর্বের মণিপুর রাজ্যে এসেছিল, সুদূর পশ্চিম থেকে। কিন্তু সেই যাত্রাপথেও বাংলাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিল অর্জুন।[১০] যেটুকু উল্লেখ আছে বঙ্গের পুণ্ড্র বা সমতটের, তার কতটা প্রকৃত আর কতটা পরের দিকে জুড়ে দেওয়া, তা নিয়েও নিশ্চিত হওযা যায় না।

বঙ্গের সঙ্গেই শোনা যায় অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্মর নাম।[১১] এই পাঁচটির মধ্যে অঙ্গকে (পূর্ব বিহার) আর কলিঙ্গকে বাদ দিলে অন্য তিনটি রাজ্যের ভূখণ্ড পরে বাংলা নামে পরিচিত এলাকার মধ্যেই পড়ে। সমতটের মতো উপকূলরেখার সঙ্গে।[১২] (রায়, নীহাররঞ্জন ১৯৯৩ : ৩৫২ : চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, ১৯৭০, ৬৮)

খুব সম্ভবত অতীতে বাংলা, জঙ্গল আর খাল, বিল, জলাভূমিতে ছিল ভর্তি, জনবসতি তেমন ছিল না। মানুষের বসবাসেরও উপযুক্ত ছিল না। কৃষি এবং ধাতু বিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পবিবর্তনের আগে পর্যন্ত (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, ১৯৭০, ৬৮। আর্যদের শিকার আর সংগ্রহের জীবন পদ্ধতি ছিল।[১৩] ছোটখাটো চাষবাস আর পশুপালন ছিল সঙ্গে। মহাভারতের যুদ্ধের আগে যদিও কিছু উন্নতি হয়েছিল ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে, যা অস্ত্রের ব্যবহার দিয়েই বোঝা যায়, তীর, ধনুক, রথের মতো অস্ত্র, ইত্যাদি, তবু জঙ্গল কেটে সাফ করার মতো কিছুই তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কৃষি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তো অনেক দূরের কথা। মহাভারতে দুই অভিজাত প্রতিপক্ষের মধ্যে বিবাদের মূল বিষয়টিই ছিল গোরুর মালিকানা নিয়ে। পাণ্ডবদের প্রথম বনবাস থেকে শুরু করে রাজা বিরাটের কাছে আত্মগোপন করার পর্ব পর্যন্ত একই তো ঘটনাক্রম। বোঝা যায় আর্যদের অর্থনীতি ছিল গোরু-নির্ভর।[১৪] এটা খুবই আশ্চর্যের যে খ্রিস্টাব্দের সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলায় কোনও কৃষকের উল্লেখ অন্তত সাহিত্যে ছিল না। যার একটাই অর্থ, অর্থনীতি আদৌ কৃষিনির্ভর ছিল না (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ২৭২)।

বন্য ঘাস ছিল প্রধান খাদ্য। লোহার আবিষ্কারের পর জঙ্গল কেটে ফেলার কাজে অনেকটা সুবিধা হল। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম বাংলার অজয় নদীর আশপাশের এলাকায় চাষ শুরু হয় । লোহার কুঠারও ব্যবহার করা হতে থাকে

খ্রিস্টাব্দ শুরুর অর্ধ সহস্রাব্দ আগে থেকে। এই দুটির আবিষ্কার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে এই অঞ্চলে বসতি বানাতে উৎসাহিত করেছিল। অস্ট্রিক, মেডিটেরেনিয়ান, মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষদের অভিভাসনের ফলে, মৌর্যপর্বের শেষদিকের আর্যসংস্কৃতি বাংলায় আসার অনেক আগে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, মগধে গুপ্ত রাজবংশের শাসনপর্বের আগে (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০: ৭০; রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩৬)।

গুপ্তবংশের আগে পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস নির্দিষ্ট করে কিছুই জানা যায় না। তখনকার ইতিহাস শিলালিপি, মুদ্রা, জমির দলিল এবং অন্যান্য মাধ্যমে জানতে পারি। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' রচনা করেন গুপ্তবংশের রাজত্বকালের প্রথমদিকে। সেখানে রঘুর হাতে বঙ্গ, কলিঙ্গ ও সুম্মর রাজত্বের পরাজয়ের কথা আছে।[১৫] তাঁর কথায়, বাংলার বিবরণ ধানগাছ, প্রথমে উৎপাটিত পরে অন্যত্র রোপিত হচ্ছে। এই অসামান্য রচনা যখন লিখিত হয়, ধানচাষ তখন বাংলায় সর্বত্রই হয়। চীন থেকে বিশিষ্ট পর্যটক ফা য়ুয়াং যখন ভারতে আসেন, পঞ্চম শতকের শুরুতে, বাংলায় তখন আর্য সংস্কৃতির চলন হয়েছে। তাম্রলিপ্তে ব্রাহ্মণ্য মন্দির, বৌদ্ধ মঠ তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর্য অঞ্চল হিসেবে বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের স্বীকৃতিও এসেছে জৈন উপাঙ্গ থেকে (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, ১৯৭০: ৭৬)।

এবার আমরা বাংলার এলাকাভিত্তিক বিবরণ দেব, প্রধান শহর আর রাজত্বের কথা উল্লেখ করে।

বারেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধন

মৌর্যদের সময় থেকেই বাংলার উত্তর অঞ্চলের একটা দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। পাটলিপুত্রে গুপ্ত রাজবংশের সময় থেকে তা আরও স্পষ্ট। আজকের দুটি জেলা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি সেসময় ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তবে কুচবিহার, দিনাজপুর ও মালদার মতো পশ্চিম বাংলার জেলা আর এখনকার বাংলাদেশের বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা মিলিয়ে পুণ্ড্রদের বাসভূমি ছিল। বিভিন্ন পুরনো বইয়ে, এবং মহাভারতে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিকে পূর্বের করতোয়া অন্যদিকে পশ্চিমের মহানন্দার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা জুড়ে তার ভূখণ্ড। করতোয়া সে সময়কার এক বিশেষ নদী এবং অসমের সীমান্ত।

পুণ্ড্রবর্ধন, গুপ্ত আমলে বাংলার তিনটে অথবা চারটে ভুক্তির মধ্যে একটি এবং সামন্ত প্রধানদের দ্বারা শাসিত হত মৌর্য আমলে মগধের রাজার অধীনে। মহাস্থানে পাওয়া ব্রাহ্মীশিলালিপি থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম কুমারগুপ্তের আমলের একটি তাম্রলিপি দামোদরপুরে পাওয়া গিয়েছিল ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের তাতে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধন ছিল কুমারগুপ্তের অঙ্গরাজ্য।[১৬] ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সবদিক থেকেই এটা ছিল গুপ্ত আমলের বাংলার কেন্দ্র[১৭] (পাণ্ডে, রাজবলি, ১৯৬২ : ৮২-৮৪; মুখার্জি, বি. এন., ১৯৯১ : ৪৬)। বিনয়গুপ্ত ছিলেন আরেক সামন্তপ্রধান। তিনি গুপ্তদের অধীনে এই এলাকা শাসন করতেন। তার রাজত্ব প্রসারিত ছিল ত্রিপুরা পর্যন্ত (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ১১৬, ২৯৮-৩০০, ৩৬১)।[১৮] পুণ্ড্রবর্ধন আর বারেন্দ্র সমার্থক। অথবা প্রথমটির অংশ ছিল দ্বিতীয়টি।

গৌড়

গৌড় একটা দেশের নাম। কিন্তু কখনও কখনও এই নামে একটি শহরের অস্তিত্বের উল্লেখও দেখা যায়। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার পাড়ে। পাল বংশ নিজেদের দাবি করত গৌড়েশ্বর বলে (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ১২১-২২)। যদিও তাদের আরও অনেক রাজধানী বা সামরিককেন্দ্র ছিল। গৌড় ছিল তাদের থেকে আলাদা। মালদা, মুর্শিদাবাদ, আর বর্ধমান-বীরভূমের কিছু অংশ নিয়ে গৌড়। গঙ্গা নদী যেখানে পদ্মা ও ভাগীরথীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তারই কাছে অতীত বাংলার বেশ কিছু রাজধানীও ছিল। বাংলা আর বিহারের সীমান্তের কাছেই নদীর ওই বিভক্তি। গৌড়, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, রাজমহল, কর্ণসুবর্ণ, ওই সব রাজধানী ছিল। সাহিত্য ও লিপিতে উল্লেখ রয়েছে কোটিবর্ষর দেশ হিসেবে, নগর হিসেবেও চালু ছিল। এখনকার পশ্চিম দিনাজপুর আর পুন্ড্রবর্ধনের কিছু অংশ মিলিয়েই ওই রাজ্য (চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র, ১৯৮৭ : ৩২)।

পশ্চিম : গঙ্গারিদাই

প্রাচীন বাংলার বেশ কিছু রাজ্যের কথা আমরা জানতে পারি গ্রিক সূত্র থেকে, খ্রিস্ট জন্মের বেশ কয়েক শতক আগেই। তারই অন্যতম গঙ্গারিদাই। মেগাস্থিনিসের রচনা থেকেই আমরা বেশকিছু তথ্য পেয়েছি। মেগাস্থিনিস গ্রিক রাজা সেলুকাসের দূত হিসেবে এসেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়ান। সেই তথ্য ছাড়াও অন্য গ্রিক রচনার অংশ বিশেষ জুড়েও জানা যায় অনেক তথ্য। এদের মধ্যে প্লিনি ও টলেমির বহু বই আছে। পূর্বের দুটি রাজ্যের কথা জানা যায়। প্রাচ্য-যার রাজধানী পাটলিপুত্র, অন্যটি গঙ্গারিদাই-রাজধানী গঙ্গাই; এমনও শোনা যায় আলেকজান্ডারের মতো বিরাট বিজয়ীও পাঞ্জাব অতিক্রম করে আর পূর্বদিকে এগোনোর কথা ভাবেননি মূলত এই দুই রাজ্যের সামরিক শক্তির কথা চিন্তা করেই। পুরুর সঙ্গে যুদ্ধের পর আলেকজান্ডারের ক্লান্ত যোদ্ধারা আর নতুন যুদ্ধে আগ্রহী ছিল না। যে তথ্য তাদের আরও নিরস্ত করেছিল তা হল, গঙ্গারিদাইয়ের রাজার ৪০০০ লড়াই করতে উন্মুখ যোদ্ধা হাতি আছে (ম্যাকক্রিনডেল, জে. ডব্লু., ১৯৬০ : ৩২-৩৩)[১৯]।

প্রাচ্য বা মগধের প্রকৃত অবস্থান, রাজধানী পাটনার নিকটবর্তী পাটলিপুত্র, নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু গঙ্গারিদাই নিয়ে তোলে। মেগাস্থিনিস থেকে আমরা জানতে পারি, রাজ্যের পূর্বসীমান্তে ছিল গঙ্গা নদী। বোঝা যায় রাঢ় অঞ্চলের কথাই বলা হচ্ছে।[২০] আরও শোনা যায়, নদীর শেষ অংশটুকু বয়ে গেছে গঙ্গারিদাইয়ের মধ্য দিয়ে। গঙ্গারিদাইর রাজধানী পার্থালিশ কোথায় ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন গবেষকরা জানিয়েছেন চারটি বিকল্পের কথা। বর্ধমান, দেগঙ্গার কাছে বেড়াচাঁপা, রাজমহল ও সপ্তগ্রাম। এর মধ্যে বর্ধমানের সম্ভাবনাই বেশি (মজুমদার, শাস্ত্রি, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯২৭ : ১৭৪)।[২১]

তাম্রলিপ্ত

পুরনো সাহিত্যে তাম্রলিপ্তের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজ্য হিসেবে এবং বন্দর শহর হিসেবে ও জনপদ হিসেবেও। তাম্রলিপ্তর প্রশ্নাতীত গুরুত্ব সত্ত্বেও এর রাজা ও প্রশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায় দণ্ডভুক্তি নামে একটি রাজ্যের অংশ ছিল তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত দাঁতন থানার কাছে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল, এমনও অস্বাভাবিক নয়। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের অধীনে এটা ছিল একটা উল্লেখযোগ্য রাজ্য। এটাও সম্ভব যে, তাম্রলিপ্ত এলাকাটি ছিল উপকূল এলাকা সমতটের একটা অংশ। দুর্ভাগ্যক্রমে, ফাহিয়ান বা হিউয়েন সাং, দুই বিশিষ্ট চীনা পর্যটক তাম্রলিপ্তে থাকলেও কেউই এর রাজকাঠামো বা প্রশাসন নিয়ে একটি কথাও লেখেননি (ওয়াটার, টমাস, ১৯৬১; বিল, স্যামুয়েল, ১৯৬৪)।

বঙ্গ

১৪০২ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়, বঙ্গ নামটুকু ব্যবহার করা হত বাংলার পূর্ব দিকটুকু বোঝাতে। যা এখন বাংলাদেশের সমার্থক। এর দুই প্রধান কেন্দ্রের ঢাকা অঞ্চলটি যা চালিত হত বিক্রমপুর বা সোনারগাঁও থেকে অন্যটি বাকলা বা বরিশালের চন্দ্রদ্বীপ। এই ভূখণ্ডের বেশিটাই ছিল দুর্গম এবং ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বৌদ্ধ চন্দ্র রাজারা বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ শাসন করতেন। পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র সকলেরই অতীত যুক্ত ছিল সম্ভবত আরাকানের সঙ্গে (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩৮৯-৩৯০; হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৫ : ৭০)।

সমতট : উপকূল বাংলা

উপকূল বাংলা, বিশেষ করে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, পরিচিত সমতট নামে। ভৌগোলিকভাবে এই এলাকার সঙ্গে যুক্ত চট্টগ্রাম অনেকদিন ধরেই নামকরা বাণিজ্যকেন্দ্র। ইতিহাসে জানা যায়, চট্টগ্রাম আরাকানের রাজাদেরই অধীনে ছিল, বাংলার অংশ ছিল না। আরাকানের রাজাদের কথা বাদ দিলে ত্রিপুরার রাজাই ছিলেন মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, বন্দর এবং আশেপাশের এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ১৬৭০-এর আগে আরাকানদের হাত থেকে চট্টগ্রাম জয় করা যায়নি। মোগলরা, সম্রাট আওরঙজেবের আমলে, চট্টগ্রাম নিজেদের দখলে আনে। কুমিল্লা জেলার অংশ, লালমণি ময়নামতি এলাকা ছিল সেসময় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ (তরফদার, মমতাজুর, রহমান, ১৯৯৫ : ১২; মরিসন, ব্যারিএম, ১৯৬৯ : ৫; ইটন, রিচার্ড এম, ১৯৯৩ : ১২)। মুদ্রা থেকেই জানা গেছে এসব তথ্য। বাংলা ভ্রমণের সময় তাম্রলিপ্ত যাওয়ার পথে য়ুয়াং চোয়াং সমতট ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধ মঠ ও দেব মন্দির দেখতে পান। (ওয়াটার, টমাস, ১৯৬১, খণ্ড ২ : ১৮৭)।

সমতটের আর এক নাম ছিল হারিকেল। সমতটের অংশও হয়ে থাকতে পারে হরিকেল। এমনই উল্লেখ আছে চট্টগ্রামে পাওয়া বর্ধমানপুরার এক বৌদ্ধ রাজার অসম্পূর্ণ তাম্রপত্র থেকে। বর্ধমানপুরা বলতে যদি আজকের বর্ধমানের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে তবে হারিকেল কিছুদিনের জন্য হলেও এই রাজত্বের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে

ছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের একথা কোনওভাবেই মানা যায় না যে, হারিকেল অবস্থিত ছিল সমতট ও ওড়িশার মাঝামাঝি কোনও উপকূলভূমিতে (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৩৪)।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে এমন মত চালু আছে যে, একসময় বাংলার প্রচুর বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে। সম্ভবত মায়ানমারের মাধ্যমে স্থলপথে। কিন্তু এই মতের পক্ষে প্রামাণিক কোনও তথ্য নেই। ব্রাহ্মণ্য ও ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব এই অঞ্চলে লক্ষ করা যেত, এখনও যায়, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কী করে তা ঘটেছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত বা উল্লেখ নেই। ভারত থেকে প্রচুর মানুষের চলে যাওয়ার কোনও ইতিহাস নেই, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বিনিময়ের তথ্যাদিও নেই। একমাত্র বিখ্যাত স্থাপত্য বরবদুর এবং আঙ্কোরভাটের নির্মাণ ছাড়া। ওই দুই ক্ষেত্রে ভারতীয় স্থপতিরা সম্ভবত বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন (জোবার্গ, গিডিয়ন, ১৯৬০ : ৬১; মুখার্জি, বি. এন., ১৯৯৪; রায়, হিমাংশুপ্রভা, ১৯৯৪ : ৫৫২-৫৪)। এই অঞ্চলে ভারতীয় প্রভাবের সমগ্রতার মধ্যে এটুকুও জানা যায় না যে, কতটুকু প্রভাব ছিল বাংলার, কতটুকুই বা তামিল এবং তেলুগু অঞ্চলের।

গ্রিক এবং গুপ্ত শাসনের মধ্যবর্তী পর্বে বাণিজ্য প্রসঙ্গে প্রায় কিছুই জানা যায় না। বাংলার সাধারণ সমাজ সম্বন্ধেও কিছুই না। আছে পাথরের স্তম্ভের কিছু উল্লেখ, যার নানা ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন, কে বলতে পারে রাজা চন্দ্রের প্রকৃত পরিচয়, ঠিক যে রাজার নাম খোদাই করা আছে দিল্লির কুতুবমিনারের মতো লৌহস্তম্ভে। তিনিই কি বাঙালি রাজা চন্দ্র বর্মন, যার নাম বাংলার পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরে খোদাই করা আছে? নাকি তিনি রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, মেহরৌলি স্তম্ভের প্রেক্ষিতে। (পাণ্ডে, রাজবলি, ১৯৬২ : ৮০-৮১; মুখার্জি, বি. এন. ১৯৯২ : ২২)?

গুপ্ত শাসনে বাংলার রাজ্যগুলি

গ্রিক উল্লেখ, পুরাণ, মহাকাব্য ও অন্যান্য মাধ্যমে বোঝা যায় অনেকগুলি রাজ্য, বেশিরভাগই নগরনির্ভর, গড়ে উঠেছিল গুপ্তদের শাসনপর্বে। কোনও একটি বিশেষ রাজত্ব ছিল না, আর প্রত্যেক রাজারই ছিল শক্তিশালী আঞ্চলিক ভিত্তি। আসলে বাংলা বলে কিছুই ছিল না। পুণ্ড্র, সুহ্ম, সমতট আর বঙ্গ ছিল স্বাধীন রাজ্য। ছিল আরও অনেক রাজ্য, যারা নানাভাবে স্বাধীনতা ভোগ করত। ছিল কিছু প্রাক্-রাজ্য, প্রাক্-কৃষি আদিবাসী সম্প্রদায়, জমির একটা বড় অংশ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু কীভাবে তারা জীবনযাপন ও উৎপাদন করত, তা প্রায় কিছুই আমরা জানি না।

যদি শুশুনিয়া পাহাড়ে উল্লিখিত 'চন্দ্র' রাজা চন্দ্রবর্মন হন, তবে তিনিই সেই রাজা যাকে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পরাস্ত করেছিলেন (মুখার্জি, বি. এন., ১৯৯২, ২১)। অনেক অঞ্চলের মধ্যে, উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ছিল নিশ্চিতভাবেই গুপ্তদের অধীনে। সেখানে শাসকের প্রতিনিধিত্ব করতেন এক রাজ্যপাল (মুখার্জি, বি. এন., ১৯৯২, ২২-২৩)।

যশোবর্ধন ছিলেন সে সময়কার এক বাঙালি শাসক। বঙ্গে ছিল যার ভিত্তি। গুপ্ত শাসনের শেষ বছরগুলিতে তিনি একজন পরাক্রান্ত শাসক হিসেবে চিহ্নিত হন।[২২] ষষ্ঠ

শতকের তৃতীয় দশকে, পশ্চিম, পূর্ব আর উপকূল বাংলার বিরাট অংশ একই রাজার শাসনাধীন ছিল, যাঁদের অন্তত তিনজনের নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায়। এঁরা হলেন, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব।[২৩] এই রাজত্ব শেষ হয়েছিল চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের আক্রমণে, ওই শতকের শেষ দুই-তিন দশকে অথবা গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের উত্থানে (মজুমদার, আর. সি., ১৯৭১ : ৪৭-৫৪)।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ দরকার। গুপ্তবংশের শাসনকালেই অনার্যদের ওপর আর্য প্রভাব পড়তে শুরু করে দুটি বিকল্প মাধ্যমে, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্ম। জৈনধর্ম তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি (গুপ্ত, চিত্রলেখা, ১৯৯৪)। চীনা পর্যটকদের রচনায় ইঙ্গিত ছিল যে বৌদ্ধ মঠ তৈরি হয়েছিল বিরাট সংখ্যায়, পূর্বভারতের প্রধান এলাকাগুলিতে। পাহাড়পুরের সোমপুরে ছিল এমন চারটি প্রধান মঠের একটি। ভারতের বাকি বড় বৌদ্ধ মঠগুলি ছিল নালন্দা, বিক্রমশীলা আর ওদন্তপুরীতে।

বাংলা : শশাঙ্ক থেকে পাল

বাংলার রাজাদের মধ্যে প্রাচীনতম যে রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক। তিনি ভারতেব বিরাট অংশের শাসক, থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের বড়ভাই রাজ্যবর্ধনকে পরাস্ত ও হত্যা কবেছিলেন। বৌদ্ধ রচনায় আছে, শশাঙ্ক বৌদ্ধদের ঘোর শত্রু ছিলেন। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদের উত্তর প্রান্তে। তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন (ওয়াটারস্, টমাস, ১৯৬১, খন্ড ২ : ১৯২)।[২৪] অভিযোগ, রাজা শশাঙ্ক পাটলিপুত্রের একটি পাথরের ওপর থেকে বুদ্ধের পদচিহ্ন মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ যেহেতু দেবতা, সেই পাথর স্বমহিমায় সেই পুরনো জায়গাতেই শোভা পাচ্ছে (ওয়াটাবস্, টমাস, ১৯৬১ · খন্ড ২ : ১১৫)। হিউয়েন সাং অথবা য়ুয়াংচুয়াং (বেল, স্যামুয়েল, ১৯৬৪ ; ওয়াটার্স, টমাস, ১৯৬১) আরও অভিযোগ করেন, 'কিছুদিন আগেও রাজা শশাঙ্ক, বৌদ্ধধর্মের শত্রু ও ঘাতক, গয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে, শিকড় উপড়ে জলে ভাসিয়ে দেন, বাকি অংশ পুড়িয়ে দেন।' পরে অশোকের উত্তরাধিকারীরা কেউ কেউ মগধ দখল করতে এসে ওই বৃক্ষ নতুন করে প্রোথিত করেন। বুদ্ধের মূর্তি সরিয়ে শিবের মূর্তি বসানোর চেষ্টা করেছিলেন বলেও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ (ওয়াটারস, টমাস, ১৯৬১, খন্ড ২ : ১১৫)।

শশাঙ্ক প্রথম জীবনে সম্ভবত ছিলেন গুপ্তদের অধীনে এক মহাসামন্ত। খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতকের এক ফলকে, শ্রীহট্টের নিধনপুরে পাওয়া, এই তথ্য জানা যায় (পাণ্ডে, রাজবালি, ১৯৬২ : ২৩৫-২৪০)।[২৫] সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যদিও বলেছেন, সেইমতো, শশাঙ্ক আদৌ গুপ্তবংশের কোনও অভিজাত তরুণ ছিলেন না। নরেন্দ্রগুপ্ত মগধ আর বাংলার স্বাধীন রাজ্য তৈরিও চেষ্টাও তিনি করেননি যাতে শেষ তার কাছে হেরে যেতে হয় তাঁকে (চ্যাটার্জি, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ৭৯)। এটা খুবই সম্ভব যে শশাঙ্ক ছিলেন মৌখারিদের অধীনে এক সামন্তপ্রধান। গুপ্তদের অধীনে নয়। পরে গৌড় এবং মগধ জয় করেছিলেন। তিনি মগধের অধিবাসীও ছিলেন না (দেবাহুতি, ডি, ১৯৯৮ : ৩৭)।

মঞ্জুশ্রী মূলকল্পের ওপর ভিত্তি করে দেবাহুতি দেখান, বেনারস, গয়া, পাটলিপুত্র

দখল করার পর শশাঙ্ক বাংলা জয় করেন। বাংলায় তাঁর শাসন প্রসারিত ছিল কর্ণসুবর্ণ ও মেদিনীপুর পর্যন্ত, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড়ের প্রায় সবটাই। সেখানে তাঁর দুটি মুদ্রাও পাওয়া গেছে (দেবাহুতি, ডি, ১৯৯৮, ৫০)। মলোয়ার রাজাকে সঙ্গী করে শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের বড়ভাই রাজ্যবর্ধনকে পরাস্ত করেন। সেই সময়ের ইতিহাসবিদ বাণভট্ট তাঁর একাধিক লেখায় শশাঙ্ককে গুপ্ত বা নরেন্দ্রগুপ্ত হিসেবে দেখিয়েছেন। শশাঙ্ককে গুপ্ত বংশের একজন হিসেবে দেখানোর ভুল বারেবারেই চোখে পড়েছে (দেবাহুতি, ডি, ১৯৯৮ : ৩৭-৩৯)। বাণভট্টের রচনার চূড়ান্ত পর্বে দেখা যায়, শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল কোথাও নেই (কেইন, পি. ডি., ১৯৬৫: ২৫৮-২৫৯)। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প[২৬] থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক হেরে গিয়েছিলেন কিন্তু নিহত হননি। তাঁকে ক্ষমা করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। যা থেকে বোঝা যায় তিনি গৌড়ের রাজা থেকেই গিয়েছিলেন (দেবাহুতি, ডি, ১৯৯৮ : ৪৮-৪৯, ৫০)। শশাঙ্ক ১৭[২৭] বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, মুখগহ্বরের কোনও অসুখে, যে অসুখে তিনি দীর্ঘদিন দারুণ জ্বরে ভুগেছিলেন। হর্ষ শশাঙ্কের ছেলেকে পরাস্ত করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে নিজের অধীনস্থ সঙ্গী করে নেন (সরকার, ডি. সি. ১৯৮৫ : ২৪-২৫)।

শশাঙ্কের পরে, পালবংশের আগে বাংলা

সে সময়ের মুদ্রায় বাংলার আরেক রাজা জয়নাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। জয়নাগ কর্ণসুবর্ণ থেকে শাসন করতেন। শশাঙ্ক এবং জয়নাগের মুদ্রা একইরকম ছিল। জয়নাগ শশাঙ্কের আগেকার রাজা ছিলেন নাকি পরে এই নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। অবশ্য সম্ভাবনা বেশি শশাঙ্কের আগের সময়ের রাজা হিসেবেই। শশাঙ্ক কোনওভাবেই রাজা জয়নাগের জায়গীরদার ছিলেন না। কিছু ইতিহাসবিদ অবশ্য বলতে চান সেকথাই। দুটি পত্রে অবশ্য উল্লেখ আছে গৌড়ের এক রাজা মহাসেনগুপ্তের, যিনি শশাঙ্কের আগেই কামরূপ আক্রমণ ও জয় করেন। দেবাহুতির বক্তব্য অনুযায়ী, এই রাজাই জয়নাগ যাঁর অধীনে ছিল দক্ষিণবাংলা ও মগধ। তিনি ৬০২-৬০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রয়াত হন। সেই সময়েই শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি হয়েছিলেন (দেবাহুতি, ডি., ১৯৯৮ : ৪১-৪৪)।[২৮]

শশাঙ্কর মৃত্যুর পরেই গৌড়ের পতন শুরু হয়। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ, এবং তাঁর মিত্র হর্ষবর্ধন দুজনে মিলে গৌড় আক্রমণ ও জয় করেন। এমনকি চীনারাও এক তিব্বতী রাজা, সান গামপোর সাহায্য নিয়ে আক্রমণ করেন। আরও আক্রমণ আসতে থাকে। হিমালয়ের শৈল বংশের এক রাজা পুণ্ড্র দখল করেন ৭২৫ খ্রিস্টাব্দে। কনৌজের রাজা যশোবর্মন গৌড়ের রাজাকে হত্যা করেন ৭২৫-৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে এবং বাংলা দখল করেন (সরকার, ডি. সি., ১৯৮৫ : ২৫; শাস্ত্রি, হরিপ্রসাদ, ১৯৬৯ : ১৫)।

তারপর সারা দেশে নিজের রাজত্ব কায়েম করার লক্ষ্য নিয়ে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য আসেন সম্ভবত ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দের পর। কলহনের রাজতরঙ্গিণীতে অবশ্য বাংলাকে জয় করার এসব বৃত্তান্ত আদৌ নেই। কারণ বাংলা হয়তো রাজা ললিতাদিত্যের আংশিক নিয়ন্ত্রণ মেনেই নিয়েছিল (মজুমদার রমেশচন্দ্র, ১৯৭১)। সেই শেষ নয়।

নেপালের লিচ্ছবি রাজা হর্ষ আক্রমণ করে গৌড়ের দখল নেন। তিনি অন্ধ্র, কলিঙ্গ, কোশলও দখল করেন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ৭৭-৮৫)।

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে লেখেন গৌড়ের রাজার কথা, যিনি দেবতা পরিহাসকেশবকে সাক্ষী করে বন্ধুত্ব করেছিলেন কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সঙ্গে। সেই ললিতাদিত্য এবং তাঁর ভাড়াটে গুণ্ডারাই গৌড়ের রাজাকে হত্যা করেন। ফল হিসেবে একদল গৌড়ীয় সেনা পরিহাসকেশবের মন্দির ধ্বংস করতে কাশ্মীরে গিয়ে নিজেরাই আক্রান্ত ও নিহত হন। এসবই ঘটে ৬৯৪-৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে (কলহন, ১৯৭৭, ৪, ৩২৩-৩৩৫)।[২৯] তারপরই সম্ভবত গৌড় বেশ কয়েকভাগে ভাগ হয়ে যায়। (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩৭৯) কলহনের রচনায় আশ্চর্য হওয়ার মতো উল্লেখ 'গৌড়ের এক সাহসী মানুষের'। তার কথা কয়েক শতাব্দী পরেও বিদেশি পর্যটকরা বলেছেন। কলহন বাঙালিদের সাহস, মাতৃভূমি থেকে বেশ দূরের যুদ্ধেও হেরে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়েও, লড়বার দায়বদ্ধতা, প্রভৃতির প্রশংসা করেন। হিউয়েন সাঙের বাঙালি বিষয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে এসবের মিল পাওয়া যায়।

কলহনের ইতিহাসপঞ্জিতে আর এক সগ্রহোদীপক কাহিনি আছে ললিতাদিত্যের দৌহিত্রকে নিয়ে। সেই রাজা তাঁর রাজত্ব এবং সৈন্য, দুইই হারিয়েছিলেন এবং পুণ্ড্রবর্ধনে এসে পৌছান নানা পথ ঘুরে। সেখানে এক সামন্তপ্রভুর মেয়েকে বিয়ে করেন। তারপর শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন শ্বশুরকে গৌড়ের দায়িত্ব পাইয়ে দিতে, অন্য পাঁচজন মহাসামন্তকে হারিয়ে (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ৮৪)। ইতিহাসগতভাবে সত্য হোক অথবা না হোক, এই দুই গল্প ইঙ্গিত দিচ্ছে বাংলার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের, এমনকী, দূরতম কাশ্মীরেরও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের বার্তা পাওয়া যায় ওই সময়েই।

পাল বংশ

৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গোপালকে দিয়ে যাত্রা শুরু হয় পাল রাজবংশের। গোপাল ছিলেন বিনম্র প্রকৃতির।[৩০] এক যোদ্ধা পরিবারের সন্তান, গোপালকে রাজা করে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায় বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষ। পূর্বের কামরূপের রাজা, পশ্চিমের প্রতিহার এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটদের ঘনঘন আক্রমণে অতিষ্ঠ বাংলায় তখন চলছিল এক মাৎস্যন্যায়। পালবংশের শাসন চলে প্রায় ৪০০ বছর। ৭৫০ থেকে ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে। একসময় এই বংশের রাজত্বের ভৌগোলিক সীমানা পৌঁছে যায় উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায়। তারা অবশ্য নিজেদের দখলে থাকা রাজত্বের বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার নিয়ন্ত্রণ চালু করেছিল। বাংলা ও মগধে তারা শাসন করত সরাসরি। কিন্তু অন্য জায়গায় প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিত স্থানীয় শাসকদের হাতে, যারা পালবংশকে নজরানা দিত আর যুদ্ধে সাহায্য করত। উত্তর ভারতে এদের নিয়ন্ত্রণ তেমন নিশ্চিত ছিল না। রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের সঙ্গে ত্রিমুখী সংঘাতে নামতে হয় পাল রাজাদের। পালরাজারা সেই সংঘাতে তৃতীয় স্থানেই ছিলেন। ওই দুই প্রতিপক্ষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে পাল রাজারা নিজেদের বাঁচাতেন।

গোপালের ছেলে ধর্মপাল এই বংশের অন্যতম ক্ষমতাবান রাজা ছিলেন। নিজের

অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রসারের জন্য ধর্মপাল মাঝেমাঝেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব এবং প্রতিহাররাজ বৎসরাজের সঙ্গে। একাধিকবার প্রতিহারের রাজ্যকে হারিয়ে রাষ্ট্রকূট রাজারা গৌড়ের ওপর চাপ কমিয়েছেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা ধর্মপালকেও বেশ কয়েকবার পরাস্ত করেন, কিন্তু সেইসব যুদ্ধ হত পাঞ্জাবের দোয়াবে, বাংলা থেকে বহু দূরে। তাই ওইসব পরাজয় ধর্মপালের ভাগ্যবদল ঘটাতে পারত না। ঘটনাচক্রে, উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ তিনি নিজের অধীনে আনতে পেরেছিলেন। কনৌজ (আগ্রা ও অযোধ্যা) পর্যন্ত যার সীমা। গান্ধার, মদ্র, কুরু, আলোয়ার এবং উত্তর-পূর্বও ছিল তাঁর রাজ্যের ভেতর। শিলালিপি অনুযায়ী, বৎসরাজের ছেলে দ্বিতীয় নাগভর্কের হাতে তিনি দারুণভাবে পরাস্ত হন মুঙ্গেরের যুদ্ধে। কিন্তু, ইতিহাসের অদ্ভুত পুনরাবৃত্তিতে ধর্মপালকে রক্ষা করেন রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের ছেলে তৃতীয় গোবিন্দ, প্রতিহার রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই। তৃতীয় গোবিন্দের প্রতি নিজের আনুগত্য নিশ্চিত করে, তিনি হয়তো প্রতিহার রাজার হাত থেকে রক্ষা পেলেন, কিন্তু সমর্থনের মূল্য দিতে হয়েছিল ধর্মপালকে। শোনা যায়, ধর্মপাল বিয়ে করেছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজার মেয়ে পরাবালাকে, কিন্তু সত্যিই তাঁর শ্বশুর রাষ্ট্রকুটের রাজা ছিলেন নাকি তাঁর অধীনে এক সামন্তপ্রভু ছিলেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না (মজুমদার, আর. সি., ১৯৭১ : ১১১-১১২, ১১৪)।

ধর্মপালের ছেলে দেবপাল (৮১০-৮৫০) ছিলেন তাঁর বাবার মতোই, প্রায় ৪০ বছর তিনি শাসন করেছিলেন। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সাম্রাজ্য তিনি রক্ষা করেছিলেন। যোগ করেছিলেন ওড়িশা ও কামরূপ। তিনি ভোজের রাজাকে পরাস্ত করেন। রাজপুতানার গুর্জর প্রতিহার এবং দক্ষিণের পান্ড্য রাজাকেও হারিয়ে দেন (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১১৪)।

পালবংশের এই তিন প্রধান রাজার পরে রাজত্ব করেন পাঁচজন। ৮৫০ থেকে ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এঁরা হলেন বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। এরা তেমন উল্লেখযোগ্য নন। বড় কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল না এঁদের জীবনে। রাষ্ট্রকূট আর প্রতিহারদের কাছে রাজ্যও খুইয়ে ছিলেন এঁরা। (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১)।

এর পর প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮) রাজবংশের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। পুরনো পাল রাজত্বের বারেন্দ্র অংশ পুনরুদ্ধার করেন। তিনি অবশ্য রাজেন্দ্র চোলের হাতে পরাস্ত হন। শিলালিপি অনুযায়ী চোল বংশ দণ্ডভুক্তির ধর্মপালকে যুদ্ধে হারান, দক্ষিণ রাঢ়ের রণসুর, বাংলার গোবিন্দাচার্যকে হারান (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১)। মহীপালের কাছ থেকে উত্তর রাঢ় জিতে নেন। মহীপালের রাজত্ব অবশ্য ছিল বিহার, বেনারস ছাড়াও বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়। কালচুরিরাজ গঙ্গাদেবের হাতে মহীপাল পরাস্ত হলেও রাজত্ব কিছুটা টিকিয়ে রাখেন, অবশ্য পালবংশের প্রথম তিন রাজার চেয়ে আয়তনে তা ছোট হয়ে যায়। তিনি যে রাজত্ব ধরে রাখতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর প্রতিপক্ষরা সকলেই পরবর্তী ভারতের নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল—যাঁর নাম সুলতান মামুদ (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৩৯-১৪২)।

কলচুরিদের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্য অব্যাহত ছিল। উত্তরপুরুষ নয়পাল (১০৩৮-১০৫৫)

পর্যন্ত গড়ানো যুদ্ধে কলচুরিদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লক্ষ্মীকর্ণ। মীমাংসা অবশ্য হয়নি। বিক্রমশীলার বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশ মধ্যস্থতার দায়িত্ব নিয়ে দুপক্ষকে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য করেছিলেন।

নয়পালের পর অন্য পালরাজাদের আমলেও অস্থায়ী যুদ্ধ মাঝে মাঝেই শুরু হয়েছে। দলিল অনুযায়ী, বঙ্গ বা পূর্ববাংলা সেসময় পালদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ত্রিপুরা বা পট্টিকেরায় নতুন এক রাজ্যের উদ্ভব হয়। পশ্চিমের বাংলা রাঢ় বা বর্ধমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে পালেরা সেই সময়ে। যখন কালচুরিরা বিদায় নিল, এল কর্ণাটকের চালুক্যরা, বাংলাকে যারা বহুবার পরাজিত করেছে, লুণ্ঠন করেছে। বিহারের গয়াও চলে যায় পালদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আঞ্চলিক রাজা হিসেবে শূদ্রকের উত্থানের কথা জানা যায় শিলালিপিতে (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৪৪-১৪৯)।

কৈবর্ত বিদ্রোহ

এইসব আক্রমণের ফলে বাঙলার রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ল, এবং তখনকার মতো পালবংশের শেষ ঘনিয়ে এল। যদিও তা সাময়িক। এবার নিম্নশ্রেণির কৈবর্তদের নেতা দিব্যর নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং নিহত হলেন দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-১০৭৫) (শাস্ত্রি, হরপ্রসাদ, ১৯১০ : ২৬)। কৈবর্তরা সম্ভবত ছিল অস্ট্রিক (চ্যাটার্জি, সুনীতিকুমার, ১৯৭৪ : ১১৪)। কেন তাদের এই বিদ্রোহ, বোঝা যায়। যেভাবে দ্বিতীয় মহীপাল রাজত্ব ১লাচ্ছিলেন, যেভাবে তার নিজেরই দুই ভাই রামপাল ও সুরপালকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক, বিক্ষোভ ছিলই। পালবংশ শেষ হওয়ার পর নতুন রাজত্ব চলেছিল কিছুদিন। তিন কৈবর্ত রাজা দিব্য, তার ভাই রুদোকা, রুদোকার ছেলে ভীমের শাসনে। রামপাল ভীমকে পরাস্ত করে পালবংশের শাসন পুনরুদ্ধার করেন। তিন কৈবর্ত রাজার শাসন অবশ্য সীমাবদ্ধ ছিল উত্তরবঙ্গে (বারেন্দ্র)। রামপাল তাঁর জয়ের আগে পর্যন্ত শাসন করতেন বাকি অংশ। সন্ধ্যাকর নন্দীর বিবেচনায়, ভীম ছিলেন শিক্ষিত, ভাল রাজা। প্রশাসনেও উদারমনস্ক ছিলেন। নন্দী ছিলেন রামপালের প্রশস্তিবাহী কবি। অথচ তাঁর কাব্য রামপালের শত্রু ভীমের প্রশস্তিময়। তিনি বলেন, ভীমের ছিল সার্বিক কাজের জন্য এক উদার, মহৎ মন। খ্যাতির জন্য লোলুপতা বা লোভ ছিল না ভীমের। তাঁর সুনাম এসবের জন্যই ছড়িয়েছিল। দ্বিতীয় মহীপালের কারাগার থেকে তাঁর দুই ভাই কী করে পালিয়ে যান তা জানা যায় না। শোনা যায়, কিছুদিন তাঁর বড়ভাই রাজত্বের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক নিয়মে মারা যান, নাকি স্বেচ্ছায় নিজের ভাইয়ের পক্ষে রাজত্বের দাবি ছেড়ে দেন, নাকি রামপালের হাতেই নিহত হন, তা নিয়ে ধন্দ রয়েই গেছে। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে রামপাল তাঁর নিজের পক্ষে বেশ কিছু সামন্তরাজার সমর্থন তৈরি করে নেন। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজার সমর্থনও আদায় করেন, তারপর দক্ষিণ থেকে নদী পার হয়ে ভীমকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। এইভাবে এক বড় বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। একটা কথা পরিষ্কার যে, সামন্ত রাজারা পালবংশের অধীনেই স্বাধীনভাবে এলাকা শাসন করতেন। এই সামন্ত রাজাদের নিয়েই জোট গড়েছিলেন রামপাল ভীমের বিরুদ্ধে। (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৫২-১৬০; গুপ্ত, চিত্রলেখা, ১৯৯৪ : ২২১)।

দীর্ঘ বিরতির পর রামপালের নেতৃত্বেই (১০৭৭-১১২০) বাংলা আবার সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। ওড়িশা ও কামরূপকে জয় করে। কিন্তু শক্তি ও উদ্যমের একটা বড় অংশ খরচ হয়ে যায় রাজ্যকে দক্ষিণের চালুক্য, ওড়িশার গঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দাচার্যের লোভী নজর থেকে বাঁচাতে। তাঁকে কূটনীতির নানা কৌশল, বিবাহ প্রভৃতির আশ্রয় নিতে হয় (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৬০-১৬৬)। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজবংশের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। শক্তিশালী রাজা কেউ ছিল না বললেই চলে। তাই শক্তিশালী রাজার অভাবে অনেকেই পালবংশের রাজত্বে অনেক অংশ দখল করে নেয় (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১, ১৬৬-১৭২)।

পালবংশ সম্বন্ধে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

বাংলার এক বিশাল এলাকা শাসন করত পালবংশ, কিন্তু বাংলার বাইরে কিছু অনুগত রাজ্য ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশে, বঙ্গ ও সমতটের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধর্মপাল বা তাঁর ছেলের আমলে পালদের কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না। এমনকী পাল শাসনের স্বর্ণযুগেও খড়্গ,[৩২] চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজারা এবং বর্মণ বংশ তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল, নিজেদের মুদ্রাও ছিল তাদের। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং দক্ষিণ উপকূলের সংলগ্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজারা যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছিল। সেন রাজত্বের সময়েও শক্তিশালী আঞ্চলিক রাজারা তৎপর ছিলেন গৌড়ের চারপাশে, আইনগত ও প্রকৃত শাসনক্ষমতাও ছিল তাঁদের।

পালবংশের শাসন এত দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল যে এই পর্বের শিক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা একটু কঠিন। এই চারশতাব্দী ধরে তাদের সামরিক ক্ষমতাও নানাভাবে বদলেছে। কখনও চূড়ান্ত শীর্ষে যেমন ধর্মপালের আমলে জাতীয় স্তরে তারা সাম্রাজ্যবিস্তারের সামরিক ক্ষমতায় পৌঁছেছিল, আবার কখনও উত্তর রাঢ়ের বাইরে তাদের আঞ্চলিক আধিপত্য আদৌ কোথাও ছিল না, এমনও হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়পর্বে অনেক রূপান্তর দেখা গেছে। প্রথম তিন শাসকের ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আইনশৃঙ্খলা ছিল রাষ্ট্রেরই নিয়ন্ত্রণে, উত্তরাধিকার প্রাপ্তিও ঘটে যেত নিয়মমাফিক। একজন রাজা বন্দী করে রাখছেন তাঁর সহোদর ভাইকে, এবং ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছেন এক বিদ্রোহী নেতার হাতে, এসব ঘটনাও দেখা গেছে।

যখন ওরা খ্যাতি ও ক্ষমতার শীর্ষে, তখনও পালবংশ জাতীয় শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার, গুর্জর, চোল, চালুক্য এমনকী গাহাড়ওয়ালারাও জাতীয় পর্যায়ে পালদের থেকে এগিয়েছিল। অবশ্য বাংলার বাইরে বিশেষ করে অঙ্গ এবং মগধে পালদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম ছিল অধিকাংশ সময়ে। কিন্তু অন্য অংশে, পশ্চিমে আর উত্তরে তারা প্রশাসনের ভার স্থানীয় শাসকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১২২)।

এই পর্ব শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ বিশ্বাসে, শেষ হয়েছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের এক তলানিতে পৌঁছে। পাল রাজারা, বিশেষ করে রাজত্বের প্রথম দিকের শাসকরা ছিল বৌদ্ধ। যা আমরা শিলালিপিতে পাই। আবার ধর্মপালের মতো রাজাও ছিলেন, যিনি বৌদ্ধ ধর্মে

বিশ্বাসী ছিলেন। ওদন্তপুরীর মঠ বানিয়েছিলেন, হয় ধর্মপাল অথবা তাঁর ছেলে দেবপাল। এটাও কথিত আছে, সোমপুরে একটি বিহারও নির্মাণ করেছিলেন এক পাল রাজা, সম্ভবত ধর্মপাল নিজে। ধর্মপালকে অনুসরণ করেছিলেন অন্য যে রাজারা, তাঁদের মতোই, নিজের বৌদ্ধধর্মে প্রবল বিশ্বাস থাকলেও, ধর্মপাল এক ব্রাহ্মণকে নিজের মন্ত্রী করেছিলেন, ব্রাহ্মণদের জমিও দান করতেন (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১)। নিজেরা বৌদ্ধ বিশ্বাসের অনুগামী হলেও অন্য ধর্ম, সংস্কৃতি এমনকি শিব ও বিষ্ণুর অনুগামীদেরও বিশ্বাসচর্চা অনুমোদন করতেন। কিন্তু, অন্য অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এসময় জনমানস থেকে বৌদ্ধ ধর্ম তার প্রভাব হারাচ্ছে, খারিজ হয়ে যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যবাদ এসে তার জায়গা নিচ্ছে। একথা যে কেউ বলতে পারেন যে, পাল শাসনের বাংলায় জাতপ্রথা আদৌ শুরু হয়নি।

অর্থনৈতিক কাজকর্ম এসময় তত জোরদার ছিল না। কড়ির ব্যবহার থেকে তা স্পষ্ট হয় (বতুতা, ইবন, ১৯২৯ : ২৪৩-২৪৯; পিরেজ, টোম, ১৯৪৪ : ৯৫)।[৩৩] আগের যুগে তাম্রলিপ্ত ছিল খ্যাতির তুঙ্গে, কিন্তু পালদের সময়ে রোম এবং ইউরোপের অন্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য শেষ হয়ে যায় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণে। তারপরই উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতে অভিযান হয়। বিশেষ করে শক এবং হুনদের আক্রমণ। আরবে ইসলামের উত্থান হয় সেই সময়ে। ভারত মহাসাগরে নৌবাণিজ্যও সেই সময়ে হয়। তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠারও প্রভাব সেই সময় আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরেও পড়ে। এর ফলে, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়াতেও এর প্রভাব পড়ে এবং বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ব্যবসা ও মুদ্রা কমে যায়।

পুরনো সাহিত্যে বিভিন্ন জায়গায় 'চূর্নী' অর্থাৎ সোনা বা রুপোর গুঁড়োর উল্লেখ আছে।[৩৪] বাংলায় রুপো আসে বার্মার আরাকান ও পেগু থেকে। সোনার মূল উৎস ছিল সম্ভবত কামরূপ বা আসাম। (মুখার্জি, বি. এন. ১৯৮২ : ৭১, ৭৫)।

বাংলার উপকূলে প্রথম আরব ব্যবসায়ীরা আসে। সম্ভবত চট্টগ্রাম ছিল সন্দ্বীপ এলাকায়। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দের এক আরব ব্যবসায়ী সুলেইমানের তথ্যাদি থেকে আমরা জানি, আর এক ব্যবসায়ী আর জাইদুল হাসান সুলেইমানেরই অসমাপ্ত কাজ শেষ করেছিলেন। সুলেইমান বালহারা নামে এক রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সম্ভবত ছিল মালওয়ার বল্লভীপুরা। সুলেইমানের মতে এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এলাকা। তিনি আরও এক অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেন, যা সম্ভবত গুজরাট বলেই মনে করা হয় (এলিয়ট, এইচ. এস., ও জন ডসন, খন্ড ১ : ৩৫৪-৩৫৫, ৩৫৮-৩৬১। আরও বলেন তাফান-এর কথা, সেটিও আরাবল্লী পর্বতের কাছাকাছি কোনও এলাকা। তিনি লেখেন, 'এই তিন রাজ্য আসলে রুহমি রাজ্যের সীমানায়। জার্জ বা গুজরাটের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়েছিল। বালহারার সঙ্গেও রাজার যুদ্ধ হয়েছিল জার্জের রাজার মতোই। বালহারা জার্জ ও তাফানের রাজার চেয়ে তাঁর সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল। শোনা যায়, যখন তিনি যুদ্ধে যেতেন তাঁর সঙ্গে যেত পঞ্চাশ হাজার হাতি। তাই তিনি শীতেই যুদ্ধ করতেন কারণ হাতি তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না।' তিনি বাংলার তাঁতশিল্প দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'এদেশে এমন এক জিনিস তৈরি হয় যা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল এই বস্তুটি দিয়ে তৈরি হয় পোবাক, যা একটি আংটির

মধ্য দিয়েও পার হয়ে যায়। সুতো দিয়ে তৈরি এসব জিনিস আমরা দেখেছি।' তারপর সাধারণ বাণিজ্য প্রসঙ্গে বলেন, 'কড়ির বিনিময়ে বাণিজ্য হত। সেদেশে সোনা ও রুপো পাওয়া যেত। সামারা নামে আরও এক ধাতুও পাওয়া যেত তা দিয়ে তৈরি হত। মাদব (এটা কী?—লেখক)'। অন্য অনেকের মতো তিনিও গন্ডার দেখে পুলকিত হয়েছিলেন।

সবদিক থেকেই রুহমিকে মনে হয় চট্টগ্রামের কাছাকাছি কোনও এলাকা। আবার অন্য মতও আছে। এলিয়ট মনে করেন রুহমি বা রাহমা যেহেতু সমুদ্র তীরবর্তী কোনও এলাকা এবং বিশ্বপুরের নিকটবর্তী, তাই ঢাকার কাছাকাছিও হতে পারে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি আরব সাহিত্যে রুহমির উল্লেখ চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, রুহমি আসলে পাল সাম্রাজ্যের গোটাটাই হওয়ারই সম্ভাবনা। রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও একই মত। তবে একটাই সমস্যা। এর রাজধানী সামান্দার, যা চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ এলাকাতেই ছিল, তা অধিকাংশ সময়েই গৌড়ের শাসকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, পাল রাজারা উপকূলের কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন অল্প কিছুদিনের জন্য। কর্তৃত্ব হারানোর পরও তাঁরা এই বন্দর দিয়ে বাণিজ্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১২২; মুখার্জি, বি. এন., ১৯৮২ : ৬৬, ৭৬)।

এই সময়ের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিবর্তনের অন্যতম উদাহরণ হল সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত। রামের সঙ্গে রাজা রামপালের তুলনা করে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। রামচরিত সেই বিরল দৃষ্টান্ত যেখানে মানুষ সেই সময়ের ইতিহাসের কিছু উল্লেখ প্রামাণিকতার সঙ্গে পায়। যদিও নীতিগতভাবে বইটি রাজা রামপালের বন্দনাগ্রন্থ, তবু এতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যাদি আছে। মানুষ, জীবনধারা, রুচি ও অভ্যাস সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে (শাস্ত্রী, হরিপ্রসাদ, ১৯১০)।

পাল রাজত্বের দীর্ঘ সময় সত্ত্বেও, সেই যুগের বড় কোনও স্থাপত্যের নমুনা পাওয়া যায় না। নথিতে জানা যায়, পাল নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ও শহর বড়, প্রসারিত আমলাতন্ত্র নির্ভর ছিল। কৃষি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের একটা বড় অংশ যেত আমলাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে। বাণিজ্যও তেমন সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি। স্থাপত্য নির্মাণের জন্য কোনও টাকা তাঁদের হাতে ছিল না। দীর্ঘদিনের রাজত্ব হওয়া সত্ত্বেও, আঞ্চলিকভাবে রাজত্বের সীমা তত বড় ছিল না। বিশেষ করে প্রথম তিন পাল রাজার পর।

পাল আমলের বাংলায় অন্যান্য রাজত্ব

পাল আমলে বাংলার অন্য সক্রিয় রাজত্বগুলির মধ্যে ছিল, বিশেষ করে পূর্ব ও উপকূল বাংলায়, চন্দ্র,[৩৫] বর্মণ ও খড়্গরা। চন্দ্র রাজারা এসেছিল সম্ভবত আরাকান থেকে। আরাকানের ইতিহাসবিদরা নয়জন চন্দ্র রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বৌদ্ধ বিষয়ে লামা তারানাথের গবেষণাতেও চন্দ্র রাজাদের তালিকা আছে। রয়েছে পূর্ণচন্দ্র আর সুবর্ণচন্দ্রের কথা, তাঁদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা। এছাড়া তাঁদের দুই উত্তরাধিকারী ত্রৈলোক্যচন্দ্র আর শ্রীচন্দ্রের কথা আছে, যারা হরিকেল আর চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল) শাসন করতেন। তাঁদের তাম্রলিপি প্রকাশ করা হত বিক্রমপুর থেকে। তাঁদের উত্তরাধিকারী গোবিন্দচন্দ্র শাসন করতেন দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার একটা বড় এলাকা। কিন্তু তিনি শ্রীচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না সে ব্যাপারে কোনও প্রতিষ্ঠিত তথ্য

পাওয়া যায় না (মজুমদার রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৯২-১৯৭)।[৩৬] সেই সময়ের আরও এক স্বাধীন রাজার নাম জানা যায়, লায়াহাচন্দ্রদেব নামে। সেই রাজা প্রায় ১৮ বছর কুমিল্লা শাসন করেছিলেন দশম শতাব্দীতে, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের মতোই, তারও ব্যাপারে বিশদ কিছু জানা যায়নি (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১, ১৯৩)।

চন্দ্রদের পরেই বর্মণ বংশ[৩৭] পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করে। যাদবরা ছিল বর্মণদের পূর্বপুরুষ। উৎকলের সিংহপুর থেকে তাঁরা এসেছিলেন। বেলাভা তাম্রলিপিতে উল্লেখ ছিল জাতবর্মণের কথা, কৈবর্তরাজা দিব্যর কথাও ছিল। দুজনেই সমসাময়িক। জাতবর্মণ পালদের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যকেও পরাস্ত করেছিলেন। হারিয়েছিলেন কামরূপের রাজাকেও, কিন্তু কলচুরি রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এমন হতেই পারে যে একা একা বিভিন্ন শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার বদলে কলচুরি রাজাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হরিবর্মণ, যাঁর নামোল্লেখ রয়েছে রামচরিত-এ। প্রথমদিকে ভীমের সহযোগী হরিবর্মণ পরে যুদ্ধের পালাবদলে চলে যান রামপালের দিকে। হরিবর্মণ ৪৬ বছর ধরে পূর্ব বাংলা শাসন করেন, বিক্রমপুর ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন খুবই দক্ষ এক ব্রাহ্মণ। সামলবর্মণ রাজা হন হরিবর্মণের পরে, তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। বর্মণরা একাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ব বাংলাকে শাসন করেছিলেন (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৯৭-২০৪)। হরিকেল-এর এক বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেব-এর উল্লেখও পাওয়া যায়, তাম্রলিপিতে (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১৩৪-১৩৫)।

সেন রাজবংশ

পালদের পরবর্তী সেন রাজবংশ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের, পরমত অসহিষ্ণু। কর্ণাটকে উদ্ভূত, ক্ষত্রিয় বংশজাত, সেনরা গিয়েছিল উত্তর ভারতে, আগ্রাসী রাষ্ট্রকূট সেনাদের সঙ্গে। স্থাপন করেছিল একাধিক রাজ্য। একটি মগধে, নান্যদেবের নেতৃত্বে (১০৯৭-১১৪৭), অন্যটি গাহাড়ওয়ালায়, যার রাজধানী ছিল কনৌজ। এমন হতেই পারে, তাঁরা যোগ দিয়েছিল পাল সেনাদের সঙ্গে, 'গৌড়, মালব, খস, হুন, কুলিক, কর্ণাটক, লাট, চোড়, ভাট'-মিলিয়ে এদের ছিল বিদেশি সংযোগ। এই পরিবারের সামন্তসেন-ই সম্ভবত প্রথম বাংলায় এসে পৌছন, কর্ণাটকে বেশ কিছু যুদ্ধ জেতার পর, পশ্চিম বাংলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছেলে হেমন্তসেনকেই প্রথম রাজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮) শাসন করেছিলেন ষাট বছরেরও বেশি সময়, পালদের অপস্রিয়মাণ শাসনের সঙ্গে মিলে। প্রধানত বাংলার পূর্ব প্রান্তেই ছিল তাঁর রাজত্ব। তিনিই একটু একটু করে বিস্তার ঘটিয়েছিলেন সাম্রাজ্যের, সারা বাংলা জুড়ে। তিনি প্রথমে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, তারপর নিজেকে ছড়ান বাংলার অন্যান্য অংশে। তিনিই অন্যতম সামন্তপ্রধান, যিনি ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামপালকে সাহায্য করেছিলেন। পশ্চিমবাংলার শূর পরিবারে তাঁর বিবাহ তাকে এই ভূখণ্ডে নিজেকে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। বাংলা লোককাহিনিতে জনপ্রিয় আদিশূরের গল্পের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। শূর পরিবারে বিজয়সেনের বিবাহকাহিনীতে হয়তো

তার উৎস থাকতেও পারে। সেই রাজবংশের পাঁচ প্রধান রাজা সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেছিলেন দীর্ঘকাল, পরিচিত ছিলেন ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হিসেবে। তাদের ক্ষমতার একটি বড় অংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সুগ্রথিত এক জাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করা হয়েছিল। বল্লাল সেনকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় কনৌজ থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসার জন্য। এইসব ব্রাহ্মণরা এখানকার পুরোহিতদের জায়গা নিয়েছিল এবং বণিকদের সামাজিক মর্যাদা খাটো করে দিয়েছিল। এই সময়পর্বে বৌদ্ধ ধর্মের এতদিনের যাবতীয় বিস্তার ক্রমশ অবশেষে গিয়ে পৌছতে থাকে।

সেন রাজবংশের শেষ রাজা, লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্ক-আফগান বাহিনী বাংলা আক্রমণ করে এবং লক্ষ্মণ সেনকে বাধ্য করে পূর্ব বাংলা ছাড়তে, যে পূর্ব বাংলায় লক্ষ্মণ সেন এবং তার পূর্বসূরিরা কয়েকযুগ রাজত্ব করেছিলেন।

মন্তব্য

১. বি. এন. মুখার্জী হাইড্রোগ্রাফিক ডিভিশনের ভিত্তিতে অঞ্চলকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাঞ্চল (বঙ্গ, রাঢ়, সুম্ম), পদ্মানদী উত্তরাঞ্চল (পুন্ড্রবর্ধন এবং বারেন্দ্র) ভাগীরথী এবং পদ্মার মধ্যাঞ্চল (বঙ্গ) মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চল (সমতট, পট্টিকেরা, হরিকেল), এবং যমুনা ও পদ্মা নদীর মধ্যাঞ্চল। তাঁর মতে (রাঢ়) বাংলার মধ্যেই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, বর্ধমানের কিছু অংশ, বীরভূম, বাঁকুড়া, এবং বাংলার সমুদ্রসন্নীকটবর্তী অঞ্চ ল। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাধারণতঃ অন্যান্য গবেষকরা সহমত প্রকাশ করেন না। (মুখার্জী, বি. এন. ১৯৯২-১৭-১৯), অন্য আর এক মতে বাংলার পঞ্চাংশ হল-রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ, মিথিলা (মহানন্দার এক পশ্চিমাঞ্চল), এবং বাগদী (গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল)।

২. 'এটাই পথ, এই হল উৎসর্গ, এই ব্রাহ্মণ, এটাই সত্য। ফলে এর থেকে মানুষ বিচ্যুত হতে পারে না, এ নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না' (আর ভি, ৮, ১০১, ১৪), 'তিনজন এই নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল। বাকীরা সূর্যের চারপাশে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থান করছে (আরণ্যক ২, অধ্যায়ণ ১, ১-২)। যে শব্দ আসলে ব্যবহার করা হয়েছিল তা হলো 'ভায়ামসি', 'ভিয়াসেস' নয় যা কীথ লেখেন। এই শব্দ বহু সমস্যা সৃষ্টি করে। এই নাম সাধারণত উপজাতির বা বৃক্ষের নাম হতে পারে। 'বঙ্গভগধ' (যেমন কুরু-পাঞ্চলে) দুটো গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে পারে, বঙ্গ ও ভগধ দুটো। পৃথক গোষ্ঠী হলেও একসাথে অথবা একটি অপরটির থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন ভগধ এবং মগধ এক হতে পারে আবার আলাদাও হতে পারে (কীথ, আর্থার বেরিডেল, ১৯৬৯ : ২০০)।

৩. কীথ খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন যে, কেরালার বাসিন্দাদের উল্লেখ আছে 'চিরাপদ' এ, এমনও হতে পারে এই মানুষগুলোই কোন এক সময়ে পূর্ব থেকে শিকড় ছিঁড়ে চলে গেছেন দক্ষিণ পশ্চিমে, অথবা এরা হয়তো কোন আদিবাসী হিসেবেই ছিল পরে তাদের বিলুপ্তি ঘটে। এই সম্প্রদায় গুলি হয়তো, ইতিপূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু বেদের নিয়ম-কানুনগুলো ভাঙ্গে। (কীথ, আর্থার বেরিডেল, ১৯৬৯ : ২০০)

২. একটা মত পাওয়া যায় অসুরদের সম্পর্কে। সেই মত অনুযায়ী, ওরা থাকত নদীর ওপারে এবং আর্যদের থেকে কোন অংশেই কম ছিল না। আর্যদের সঙ্গে এদের যোগাযোগও ছিল।

কিন্তু তাদের কথাবার্তা ছিল অন্যরকমের (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮ : ৯-১০)

৫. অমর সিনহার নাম পাওয়া যায় কারাতায়া নদীর প্রসঙ্গে। এই আলোচনায় অবশ্য এর উল্লেখ আছে কারাতায়া মহামায়া নামে কারাতায়ার বিবরণ এসেছে সাদানীর হিসেবে। (চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র : ৩২-৩)।

৬. বাংলায় জৈনবাদের ওপর খুব বেশি একটা গবেষণা হয়নি। তবে বলা যায় এই ধর্ম এসেছে বৌদ্ধধর্মের আগে এবং খ্রীষ্টপূর্বে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এর কথা শোনা যায়। যদিও ওই সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মের উত্থানের ফলে জৈনধর্মের জনপ্রিয়তা কমে যেতে থাকে। অবশ্য তা সত্ত্বেও বহু ব্যবসায়ী আকৃষ্ঠ হয় এই ধর্মের প্রতি। জৈন ধর্মের চারটি শাখা—পুন্ড্রবর্ধন। কোটিবর্ষ, তাম্রলিপ্ত এবং দাসিঘরবটিকা অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। চিত্ররেখা গুপ্ত অবশ্য দাবী করেন যে, জৈনবাদকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার প্রসারলাভ করে। বেশ কিছু জায়গায় পরে অবশ্য নগ্ন জৈনগুরু তীর্থঙ্কর মূর্তি শিবের উপাসনায় জায়গা কবে নিয়েছে। (গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪ : ২১৬-২২২)

৭. পালিভাষায় লিখিত সূত্রপিটকে যে ১৬টি জায়গার উল্লেখ আছে তাহলে অঙ্গ, মগধ, কোশি, কোশালা, ভাজিস, মল্ল, সুরসেন, চেড়ি, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, অস্যক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ। আবার, জৈন ভগবতী সূত্র অনুযায়ী বঙ্গ ও রাঢ় (রাধা বা লাধা) হল বড় অঞ্চল, তাছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলগুলি হল—অঙ্গ, মগধ, মালয়, মালব, আছা, বাছা (বংশ), কোছা, পদ্ধ, বাজী, মলী, কাশী, কোশালা, অবহ এবং শম্ভুত্তরা (ল, বি, সি, : ১৮৭৬ ৪২—৫৩

৮. কৌটল্যের অর্থশাস্ত্রে (২.১১-১০৪-১৪-১৫) বলা হয়েছে বঙ্গের দুকলা সাদা ও মসৃণ ছিল। পুন্ড্র থেকে আসতো কালো এবং মসৃণ ও জ্বলজ্বলে মণির মতো। সুবর্ণকুণ্ড থেকে আসতো সূর্যের মত রং-এর বস্ত্র, যাছিল মণির মতো মোলায়েম এবং এক মাত্রিক বুনন বা মিশ্র বুনন। এই কাপড়গুলোর মধ্যে কিছু ছিল এক সুতোর এবং কিছু ছিল দুই, তিন, অথবা চার সুতোর। কাসাউমা আসতো কাশী এবং পুন্ড্র থেকে। এদের মধ্যে সুবর্ণ কুণ্ডই সবচেয়ে সেরা, মধুবা, অপ্রান্ত, কলিঙ্গ, কাশী, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষের সুতীবস্ত্র সবচেয়ে ভালো ছিল। (কাঙ্গলে, আর. পি., ১৯৬৩ : ১১৯—১২০)। দুকলার দুটি প্রান্ত ছিল। সুবর্ণকুন্ড ছিল কর্ণসুবর্ণ।

৯. কেউ কেউ ভীমের জয় নিয়ে বলল, আবার কেউ কেউ বলল রাজাদের পরাজয়ের কথা। (মহাভারত, সভাপর্ব, ৩০ : ১৩-১৫)। বঙ্গরা অঙ্গদের, পুন্ড্রদের এবং কলিঙ্গদের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে একটি আদিবাসি গোষ্ঠি হিসবে। (রায়, প্রতাপ চন্দ্র, ভীষ্ম পর্ব, ix/ ৪৬:২৩)

১০. পূর্বভারত বর্বরদের জায়গা ছিল বলে ব্রাহ্মণরা স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে ব্রহ্মার জন্য ওখানে যেতে পারতেন না, ওদের কিছু কাজ অনুযায়ী। (চ্যাটার্জী, সুনীতি কুমার, ১৯৭০ : ৬২-৬৩)। ঐতেরিয় ব্রাহ্মণের একজায়গায় পুন্ড্রদের একটি দস্যু গোষ্ঠি বা মুনি বিশ্বমিত্রের পঞ্চাশ জন অভিশপ্ত ছেলে হিসাবে বর্ণনা করা হয়। (চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র : ৩১)। ভগবত পুরাণে পাই যে হূন, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কর, আবির, যবন এবং খাস—এরা সেই অভিশপ্ত আদিবাসী। বৌদ্ধায়ানে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্রর অধিবাসী এবং বৌদ্ধদের বলা হয়েছে আর্য সংস্কৃতির বাইরে অবস্থানকারী (রায়, নিহাররঞ্জন রায় ১৯৯৩ : ৩৫১-২)। জৈন শাস্ত্র গুলি উল্লেখ করে যে রাঢ়ের লোকেরা ছিল বন্য এবং চ্যাংড়া (চ্যাটার্জী, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ৭০-১)

১১. মৎস পুরাণে বঙ্গর উল্লেখ রয়েছে জনপদ রূপে। এখানকার অধিবাসীরা দানব (অনার্য) হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত ছিল। এই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল নরসিংহর (১৬৩.৭২)। এই নাম অবশ্য দেশের অনেকেই ধারণ করেছেন। (কানটাওয়ালা, এস. জি.,

১৯৬৪ : ৪০৩) অবশ্য একটি দেশের হতে পারে অথবা সেই দেশের লোকেদের।

১২. মৎস্য পুরাণে দানবরাজ্য বালির কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই বালি তার পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র এবং সুহ্মকে সাম্রাজ্য ভাগ করে দেন। এই পাঁচ পুত্র অবশ্য বালির ঔরসজাত নয়। কথিত আছে বালির নির্দেশে তার স্ত্রী, বৃদ্ধ অন্ধ মুনি দীর্ঘতামসের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তার মনস্কামনা অনুযায়ী পাঁচটি সুন্দর ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করে। এরাই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র এবং সুহ্ম (মৎস্যপুরাণ, ৪৮, ২৫, ৫৭, কানটাওয়ালা, এস. জি., ১৯৬৪ : ৮০)। এই ক্ষেত্রে যে সন্তানরা হয় তারা কেউই বেআইনি ছিলেন না, কেন না, রাজা নিজে মুনির সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তাঁকে নানা জিনিসপত্র দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী, মুনিকে বৃদ্ধ এবং অন্ধ দেখে তার পরিচারিকাকে মুনির কাছে পাঠান সন্তান উৎপাদনের জন্য। যখন রাজা রানীর কাছ থেকে সত্যি কথা জানলেন, তাকে ভর্ৎসনা করে আবার পাঠান মুনির কাছে। মুনি তার সমস্ত দেহ দই এবং মধু দিয়ে মাখান এবং রাজা বলেন, না বিরক্তি দেখিয়ে, মুনিকে চাটতে। 'রানি সেইমতো করেন কিন্তু পিছনের অংশ বাদ দেন এবং মুনি বলে পাঁচজন খুব সুন্দর ছেলে হবে, কিন্তু তাদের কোন পিছন থাকবে না। তখন ব্যাপারটা বুঝলেন যে এবং মুনির কথামতো তার সমস্ত দেহ চাটলেন। এর ফলে পাঁচটি সুন্দর ছেলে হল এবং রাজার অভিমান নাতিদের ওপর পড়ল, রানীর পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তান হল। অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম এবং বঙ্গ।' (মৎস্যপুরাণ, ৪৮, ২৫, ৫৭, কানটাওয়ালা, এস. জি., ১৯৬৪ : ৮০) এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য হয়তো আর্য উৎস তৈরি করা। দীর্ঘতামস, বৃহস্পতির ভ্রাতা এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত ও গঙ্গায় নিমজ্জিত, তিনি একটি মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। একটা মত হচ্ছে যে, দীর্ঘতামসকে রাজা বালি তার রাজত্বে ডাকেন। সেখানে তিনি রানীর শূদ্র পরিচারিকাকে বিয়ে করেন এবং তারপর রানীর পাঁচ সন্তান উৎপাদন করেন। (পার্গিটার, এ. ই., ১৯২২ : ১৫৮-৯)।

১৩. আর্যদের ভারতে আগমন নিয়ে একটি ধারণা আছে যে, তারা দুই খেপে আসেন, প্রথমত, বাইরের (যার ফলে মগধী অঞ্চলে ঔপনিবেশিকরণ হয় ; বিশেষ করে পূর্ব দিকে যেখানে দার্দিক প্রভাব ছিল।) এবং দ্বিতীয়ত, ভিতরের (পাঞ্জাব ও তার আশপাশে)। বহু বৈদিক স্তোত্রই বাইরে থেকে আনা হয়, এবং প্রার্থনা সঙ্গীতের ধারার অনেক মিল পাওয়া যায় ঋক্‌বেদ এবং আভেস্তায়, বিশেষ করে তারমাত্রায়। ঋক্‌বেদের দেশান্তর তত্ত্বে জোরালোভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের উপাসনায় কিছু মিল পাওয়া যায়। (যেমন- রুদ্র, শিব বা শম্ভু, হনুমান, বিষ্ণু)। অবৈদিক আর্যদের 'ব্রাত্য' বলা হত, এরা কোন উৎসব বা উৎসর্গের মাধ্যমে আর্য হয়েছিল। (চ্যাটার্জী, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ৩০, ৩৯, ৪১, ৪৬)

১৪. যদিও মহাভারত পড়ে খাদ্য বা খাদ্যাভাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা যায় না, কিন্তু পাণিনি উল্লেখ করেছেন ৩৫ রকমের চালের কথা। এর থেকে অবশ্য দুটো যুগের মধ্যে খাদ্যাভাসের রকমফের লক্ষ্য করা যায় (আগরওয়ালা, ভি. এস., ১৯৫৩ : ১০৫)।

১৫. 'পূর্ব থেকে রাজ্যগুলো যখন কমতে শুরু করেছে, সে (রঘু) তখন মহাসাগরের পার ঠেলে সরিয়ে দিতেই তার হাতের রেখায় তা গভীর হয়ে মিলিয়ে গেল' (কালিদাস, ১৯৮৪ : পঙ্‌ক্তি ৩৪), যারা উৎপাটিত হলেন কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্ব পুরো নষ্ট করতে চাইলেন না তার সামনে, সুহ্মারা ব্যবহার করল নদীবক্ষে ফুলের মতো, (কালিদাস, ১৯৪৮ : পঙ্‌ক্তি ৩৫)। আবার, 'যারা তার পদ্ম-পায় কাছে মাথা নিচু করল এবং যাদের সেই পক্ষে আবার বসানো হল প্রথমে সরিয়ে দিয়ে,' রঘুকে তার সম্মান জানালো নিজের সম্পদ দিয়ে, ধান গাছের মতো যা প্রথমে উৎপাটিত হয় এবং পরে যা বসানো হয় (কালিদাস ১৯৮৪ : ৪৭৫)।

১৬. সভাপর্বে বঙ্গ ও কিরাত এর সঙ্গে পৌন্ড্রদের উল্লেখ আছে। ভীষ্ম পর্ব, দ্রোণ পর্ব ও বনপর্বে

উৎকল, মেকলা, কলিঙ্গ এবং অন্ধ্ররের সঙ্গে পৌড্রকের উল্লেখ আছে। কানিংহাম পুন্ড্রবর্ধনের সন্ধান পেয়েছেন বগুরার মহাস্থান বা মহাস্থানগরের সঙ্গে। বগুরার মহাস্থানে পাওয়া প্রাক্ মৌর্য শিলালিপির অংশবিশেষে বঙ্গের নাম পাওয়া যায় (পান্ডে, বাজবলী, ১৯৬২ : ২-৩, ৮২-৮৪) ঐ অঞ্চল খনন কবে একটি দুর্গ ও পরিখা পাওয়া যায়।

১৭. দামোদরপুর এবং দিনাজপুরে বেশ কিছু তাম্রফলক পাওয়া গেছে, যা বুদ্ধগুপ্তের সময়কার বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি ৪৮২ এ. ডি. এবং অপরটি ৪৭৬-৪৯৫ এ. ডি. বলে ধরা হচ্ছে (পাণ্ডে, বাজবলী, ১৯৬২ : ১০৪-১০৮)।

১৮. শিলালিপিতে তিনি মহারাজা হিসেবে বর্ণিত আছেন, মহারাজাধিরাজ হিসেবে নন। এটা প্রমাণ করে যে তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না। তিনি হয়তো গুপ্তদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন, কিন্তু তার কাজকর্ম তিনি নিজে নিয়ন্ত্রণ কবতেন একজন স্বাধীন রাজার মতোই (মুখার্জী, বি এন. ১৯৯২ : ২২-২৩)।

১৯. আলেকজান্ডার শুনেছিলেন, 'গঙ্গারিদাই, একটি জাতি যাদের অধীনে আছে প্রচুর সংখ্যক বিশালাকাব হাতি ফলতঃ তারা কখনই চাইবে না যে তাদের অঞ্চল কোন বিদেশী রাজার শাসনাধীন হোক। ওই অঞ্চলেব সমগ্রজাতির বিপুল জনসংখ্যা, তার সঙ্গে প্রভূত পবিমাণ হাতির উপস্থিতি—এই দুইয়ে মিলে আক্রমণকারীর চক্ষুস্থির করার পক্ষে যথেষ্ট। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল জয় করে এসেও আলেকজান্ডার গঙ্গারিদাই আক্রমণের চেষ্টা করেননি। গঙ্গার পাড়ে এসে তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন গঙ্গারিদাই এব অসংখ্য লোক জন আর হাতিরপাল ; শুনলেন প্রায় চারহাজাব হাতি সমব শিক্ষায় প্রশিক্ষিত (ম্যাক ক্রিণ্ডলে, জে. ডাব্লু., ১৯৬০ : ৩২-৩৩)।

২০. এই নদীটি (গঙ্গা) বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, প্রস্থেও অনেকটা, সমস্ত জলটা উজাড় করে দিচ্ছে সমুদ্রে। এরই পূর্বপাড়ে গঙ্গারিদাই (ম্যাক ক্রিণ্ডলে, জে. ডব্লু, ১৯৬০ : ৩২)

২১. প্লিনিব উদ্ধৃতি, 'যখন গঙ্গার ওপর দিয়ে যাবেন, প্রথম যে তীরে পদার্পণ করবেন সেটা গঙ্গারিদাই এবং কলিঙ্গর দিকেই একে বলা হত পার্থালিস (প্লিনিয়াস, সেকান্ডাস, ১৯৬২ : ৭) গঙ্গারিদাই-এর সঙ্গে কলিঙ্গ প্রসঙ্গ উঠে আসে দুটোর মধ্যে এত মিল বলেই। যেমন ম্যাকোকলিঙ্গি অথবা মোদোগলিঙ্গি, এগুলো সাধারণত পরিব্যাপ্ত জাতির অংশবিশেষ। কলিঙ্গ (অধুনা ওড়িশায় অবস্থিত), গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণে ভিতর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে, (ম্যাক ক্রিন্ডলে, জে. ডাব্লু, ১৯৬০ : ১৩৪, ১৩৪ এন, ১৩৫ এন)। মহাভারতে তিনবার কলিঙ্গের কথা এসেছে, এবং প্রত্যেকবারই ভিন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে (ম্যাকক্রিন্ডলে, জে. ডাব্লু, ১৯৬০ : ১৩৭ এন, ১৩৮ এন)। গঙ্গারিদাই অর্থাৎ কলিঙ্গের প্রধান শহরকে বলা হত পার্থালিস, এবং এখানকার রাজার ষাটহাজার পদাতিক সৈন্য, একহাজার অশ্বারোহী এবং সাতশ হাতি ছিল বলে মেগাস্থেনিসের বিববণী থেকে জানা যায় (ম্যাক ক্রিন্ডলে, জে. ডাব্লু, ১৯৬০ : ১৩৭-১৩৮)।

২২. ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি গুপ্তযুগের পতন হয়। হুণ আক্রমণ এর অন্যতম কারণ হলেও গুপ্তযুগে সৃষ্ট সামন্ততান্ত্রিকগোষ্ঠীপতিদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগও কম দায়ী নয়।

২৩. সাতটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তাঁরা 'মহারাজাধিরাজ' এর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সাতটি শিলালিপির মধ্যে পাঁচটি পাওয়া যায় 'কোটালিপড়া'এ ; মল্লসারুল (বর্ধমান) এবং জয়রামপুর (বালেশ্বর ওড়িশা)-এ একটি করে। গুপ্ত যুগের পরে তারা শাসন করেছিল ৫২৫ এ. ডি-৫৭৫ এ. ডি. (বিশ্বাস, কৃষ্ণ, ১৯৯৫ : ১৫-১৬)।

২৪. চৈনিক পর্যটকদের বিবরণ এবং সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিত থেকে আমরা শশাঙ্ক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি (চ্যাটার্জী, অঞ্জলি : ১-২)। বিবরণী থেকে জানা

যায় যে, শশাঙ্ক, প্রভাকরবর্ধনকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি, হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং হত্যা করেন। বাণভট্টও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। সম্ভবত এর বিপরীত ঘটনা সত্য হতে পারে, যে, শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের কাছে পরাজিত হয়নি। কারণ, শশাঙ্ক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আমৃত্যু শাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র মানব, গৌড় এবং মগধ আটমাস শাসন করে (রায়, নিহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩৬৯-৩৭০)।

২৫. তাম্রফলকে বর্ণিত হয়েছে কর্ণসুবর্ণকের অধিবাসী হিসেবে জয়নাগকে জমি দান করা হয়েছিল। রোহতাসগড়ে পাওয়া এক শিলমহরে মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের উল্লেখ আছে (পাণ্ডে, রাজবলী, ১৯৬২ : ২৩৬)।

২৬. এই তথ্য থেকে জানা যায় যে, রাজ্যবর্ধন 'সোম'এর মতো পরাক্রমশালী ছিলেন। শশাঙ্কের অপর নাম সোম, যার অর্থ চাঁদ। যদিও এই তথ্যের মধ্যে শশাঙ্ক বিরোধী মতবাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সাবধানতার সঙ্গে রচনা সমাপ্তিতে দুই পরাক্রমশালীর মধ্যে শশাঙ্ক বিবেচিত হয়েছে (দেবাহুতি, ডিয় ১৯৯৬ : ৪৫)।

২৭. মজুমদার অবশ্য তাঁর রাজত্বকালে সময়সীমা দীর্ঘায়িত করেছেন, তা প্রায ৬০৬ এ. ডি. র বেশ কিছু সময় অটো পর্যন্ত। রাজ্যবর্ধন মারা গেছেন ৬৩৭ এ. ডি.। এর কিছু আগে য়ুয়ান চুয়ান গয়ায় এসে একটি বৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ দেখেন। তার অনুমান য়ুযান চুয়ানের গয়া আগমনের সময় শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন, এবং বৃক্ষ নিধনের সাক্ষীও ছিলেন তিনি (মজুমদার, আর. সি. ১৯৭১ : ৩৯-৬৮)।

২৮. খড়্গ সাম্রাজ্য সমতটে ব্রাহ্মণ শাসকদের নীতি অনুসরণ করত। এই সাম্রাজ্যের তিন উল্লেখযোগ্য সম্রাট হলেন—রাজা কহদগদ্যমা, জটাখড়্গ, দেবখড়্গ। এদের সময়কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের কোনো এক সময়ে।

২৯. চতুর্থ তরঙ্গর ৩২৩-৩৩৫ বলে : 'পরিহাস কেশবকে সাক্ষী রেখে গৌড়ের রাজা এবং কাশ্মীরের রাজার মধ্যে সখ্য স্থাপন হয়। তা সত্ত্বেও কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য গৌড়ের রাজা ত্রিগ্রামিকে খুন করেন। গৌড়ের রাজার ওপর যারা নির্ভর করত তাদের মনের জোর দেখে অবাক হতে হয়। যারা তাদের জীবন দিয়ে গৌড়ের রাজার সম্মান রক্ষা করেছিল। তারা দেবী দরজার কাছে দেখা করতে যাবে বলে কাশ্মীরে ঢোকে। কিন্তু একবার ঢুকে তারপর পরিহাস কেশরের মন্দিরে ওরা যায়। ওদের সামরিক গর্বে গরীয়ান হয়ে ওরা রামস্বামীর মূর্তি আটক করে। এবং ওরা দেবমূর্তিকে পরিহাস কেশব-এর মূর্তি বলে ভুল করে। তারা ওই মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। শ্রীনগরের সৈন্যরা আহত করলেও ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি। এই ভালো লোকগুলো, রক্তে ওদের দেহ ভেসে যাচ্ছে, মাটিতে পড়ে গিয়েও মনে হচ্ছিল যেন পাথরের টুকরো। তাদের রক্ত ঝলমল করছে। রক্তের বন্যায় ওদের দেহ যেন পরিহাস কেশবের আশীর্বাদ পেল। ওদের হিরে এবং রুবি ঝলমল করছে। এই পথ—ওই মন্দিব থেকে শ্রীনগর যেন ফুরতেই চায় না, এবং গৌড়েব রাজার প্রতি যে বিশ্বস্ততা ওরা দেখাল তার ফলে ওরা নিশ্চয়ই শান্তি পেল। গৌড়ের মানুষরা যা পেল, ওই সময় তা সবাই পায় না। গৌড়ের দৈত্যদের হইচই নিশ্চয়ই পরিহাস কেশরের মন্দিরকে আরো পবিত্র করল। তার সঙ্গে রামস্বামীর মন্দিরও খালি থাকলেও হয়তো গৌড়ের বীরদের খ্যাতি দিয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল ; (কলহন, ১৯৭৭ : ১৪৬-১৪৭)।

৩০. পালযুগের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, পাল রাজারা তাদের দৈত্যে বা উচ্চ শ্রেণির অহমিকা প্রকাশ করে নি। যদিও পরের দিকে পালবংশের সঙ্গে সমুদ্র দেবতার সম্পর্ক দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত মানসে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (শাস্ত্রী, হবপ্রসাদ, ১৯১০ : ১৫, ৩-৪)

৩১. খালিমপুর তাম্রফলকে উল্লেখ আছে, প্রচণ্ড অরাজকতার জন্য গোপালকে রাজা হিসেবে ওখানকার প্রকিটি (জনগণ) নির্বাচিত করে। যদিও বলা হয় ওখানকার সাধারণ মানুষ তাঁকে নির্বাচিত করেছে, তা সত্ত্বেও এটা অনুমেয় যে সামন্তপ্রভু বা অভিজ্ঞ আমলারা এই নির্বাচনের কারিগর ছিলেন, এ বিষয়টা খুব নতুন নয়, কারণ, কলহণ 'রাজতরঙ্গিনী'তে উল্লেখ করেছেন জালুকার কথা, তিনিও সাতজন আমলার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদেরও 'প্রকিতি' বলা হত। আদিবাসী সমাজে নেতানির্বাচনের এই পদ্ধতি খুবই স্বাভাবিক ছিল (মজুমদার, আর. সি. ১৯৭১ : ৯৬-১১১)।

৩২. আসরফপুরের কাছে ঢাকায় পাওয়া দুটো তাম্রফলকে খড়্গ শাসকদের বিষয়ে দুটো এবং সর্বাণী সম্পর্কিত একটি ছোট তথ্য জানা যায়, খড়্গ শাসকেরা হলেন—খড়্গাদ্যাম, জঠাখড়্গ, দেবখড়্গ এবং রাজারাজা। তাদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার কাছে, এবং শাসনকাল ৬৫০ এ. ডি. ও ৭০০ এ. ডি. র মধ্যবর্তী সময়কালে (বিশ্বাস, কৃষ্ণ, ১৯৯৫ : ১৬)। এঁরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (মহাপাত্র, বিমলচন্দ্র, ১৯৯৫ : ৪৪)।

৩৩. কুড়ি সম্পর্কে মুখার্জীর একটা ব্যাখা আছে, কুড়ি, গোলাকার, ধাতব, মসৃণ মুদ্রা বিশেষ। একটি স্বর্ণমুদ্রা ২০,৪৮০ টি কুড়ির সমান ; আবার ১২৮০ কুড়ি একটি রৌপ্য মুদ্রার সমান (মুখার্জী, বি. এন. ১৯৮৬ : ১, ৪)।

৩৪. পেরিপ্লাস উল্লেখ করেছেন যে, গঙ্গার নীচে সোনার খনি আছে, গঙ্গার পলি ধুয়ে একে পাওয়া সম্ভব নয় (মুখার্জী, বি. এন. ১৯৯১ : ৪৬)

৩৫. ১৩টি শিলালিপিতে চন্দ্ররাজাদের সম্পর্কে অনেককিছু জানা যায়। এদের সময়কাল ৮২৫ এ. ডি. থেকে ১০৩৫ এ. ডি. র মধ্যবর্তী। এরা যুদ্ধ করেছিলেন রাজেন্দ্র চোল এবং কালচুরি রাজা কর্ণর বিরুদ্ধে (বিশ্বাস, কৃষ্ণ, ১৯৯৫ : ২০-২১)।

৩৬. একটি—বিশেষ সূত্রে জানাযায় চন্দ্রদের সঙ্গে রোহতা গিরির যোগাযোগ ছিল। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন রোহতাসগিরি বিহারে, আবার কেউ কেউ মনে করেন এইনাম লালমাটি বা লালমাই-এর সংস্কৃতায়নের ফলে হয়েছে, যা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত (মজুমদার, আর-সি., ১৯৭১ : ১৯৪)

৩৭. দুটো সিংহপুরের কথা আমরা পাই—একটি পাঞ্জাবে এবং অপরটি হুগলি জেলায়। এখন পরিচিত সিঙ্গুর নামে, যেখানে বিজয়সিংহর বাড়ি ছিল। এই বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেন (মজুমদার, আর. সি., ১৯৭১ : ১৯৭-১৯৮)।

২.২
রাষ্ট্রের বিবর্তন

ভূমিকা

আগের অধ্যায়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা তৈরি করতে গিয়ে আমরা রাজা, রাজত্ব, রাজ্য, রাজবংশ, সামন্তপ্রভু ইত্যাদির নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছি। এক আমলাতন্ত্র, কাজকর্মের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভাজন, আঞ্চলিক বিভাজনের বিন্যাস, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মতো পীড়নযন্ত্র, রাষ্ট্রের মুদ্রাব্যবস্থা, রাজার ব্যবস্থা — এসবের মাধ্যমে আমরা কিন্তু সামাজিক বা কৌম জীবনের কিছুই জানতে পারিনি। রাষ্ট্র নির্মাণের আগের দিনগুলিতে তা কেমন ছিল আমাদের জানা হয়নি। রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়ার ফলে যেহেতু নগর নির্মিত হয়, আমরা শহরের কথা জেনেছি, গ্রামীণ জীবনের কথা কিছুই জানতে পারিনি।

এই অধ্যায়ে আমরা গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকাব। বিশেষ করে আমাদের মতের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিবর্তনের প্রক্রিয়াটাও বুঝে নিতে চাইব। শ্রেণিহীন, রাষ্ট্রহীন, প্রাক্-কৃষি এক স্তর থেকে কৃষির সূচনা ও প্রতিষ্ঠা আমরা বিবেচনা করছি।

দ্বিতীয় ভাগে আমরা পরীক্ষা করছি বাংলার অরণ্য অর্থনীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কৃষি, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উদ্ভব কীভাবে শ্রেণি তৈরি করল। তৃতীয় ভাগে প্রতিষ্ঠিত কৃষির এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও স্বীকৃত। চতুর্থ ভাগে পাল ও সেনদের আমলে সামন্ত বাংলার উত্থানের পর্ব দেখানো হয়েছে, ইউরোপের সামন্ততন্ত্র থেকে বাংলারটা কোথায় পৃথক। পঞ্চম পর্বে আছে উপক্রমণিকা, গোটা অধ্যায়ের।

অরণ্য অর্থনীতি

এক কথায় বলতে গেলে, সেকালের গ্রামজীবনের দুই প্রধান ধরন চিহ্নিত করা যায়। অরণ্য অর্থনীতি ও প্রতিষ্ঠিত কৃষি। দুয়ের মধ্যে আমরা দ্বিতীয়টার কথাই বেশি জানতে পারি, কারণ তার বিকাশ হয়েছিল দ্রুত, ফলে সৃষ্টি হয়েছিল নগরের। বিপরীতে, অরণ্য অর্থনীতি অনেক বেশি জায়গা জুড়ে টিকে থাকলেও শহরে পরিণত হয়নি, এই দুয়ের সম্পর্ক ছিল পরম্পরাগত। আগে অরণ্য অর্থনীতি, তারপর প্রতিষ্ঠিত কৃষি। প্রচুর পুরনো দলিলে বিশেষ করে পাণিনি ও কৌটিল্যর লেখায়, অরণ্যভূমির ঔপনিবেশিকতার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে (আগরওয়ালা, ভি. এস. (সম্পা), ১৯৫৩; কাঙ্গলে, আর. পি., ১৯৬৩)।

প্রাক্-ইতিহাস নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন

বাংলার প্রাক্-রাষ্ট্রীয় আদিবাসী সমাজের যা কিছু আমরা জানতে পারি, তার অধিকাংশই নৃতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে, ১৯৫৯ থেকে বাংলার সমভূমি যেখানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মিশেছে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের সঙ্গে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমের মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতে, বিশেষ করে শুশুনিয়া পাহাড় ও সুবর্ণরেখা নদী উপত্যকায় প্রচুর প্যালিওলিথিক, মেসোলিথিক, নিওলিথিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এতে বোঝা যায়, কীভাবে, সময়েব বিবর্তনে, আদিবাসী অর্থনীতি, ছিল যা শিকার ও সংগ্রহ নির্ভর। তারপর এল কৃষি অর্থনীতি। উদ্বৃত্তের জন্ম হল। তামা ও লোহার আবিষ্কার হল সেই সময়ে। পশ্চিমবাংলার এমন ৬০টি নিদর্শন পাওয়া গেছে, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, কখনও এক একর কখনও আট বা নয় একর। শুশুনিয়া চত্বরে ১৮৯৭টি পেলিওলিথিক উপকরণ মিলেছে, বেশিরভাগই কুঠার, মেসোলিথিক উপকরণ পাওয়া গেছে ৫৮২টি, নিওলিথিক ৪০টি। সবচেয়ে অগ্রসর প্রাচীন সমাজের প্রামাণিকতা সবচেয়ে কম (পাল, অনিলচন্দ্র (সম্পা), ১৯৯৬ : ৭, ৪৬)।

বর্ধমানের ভরতপুরের (১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর তৃতীয় প্রাচীনতম স্থান বর্ধমানেব পাণ্ডু রাজার ঢিবি (১১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ), বীরভূমের মহিষাদল (১২৮৫ খ্রিঃ পূঃ)। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে এমন কিছু উন্নততর জীবনযাপনের নমুনা পাওয়া গেছে যা প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জীবনধারার কাছাকাছি। চাল উৎপাদনের আধুনিক সংস্কৃতির যাবতীয় উপকরণই সেখানে পাওয়া গেছে ধারাবাহিকভাবে। প্রাক্-ইতিহাসের সময় থেকে যা বহমান। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-সভ্যতার অগ্রগতি সামান্য কিছু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি। হাতে তৈরি নানা সামগ্রী, ঘরের মেঝের নমুনাও পাওয়া গেছে। প্রধানত প্রোটো-অস্ট্রালয়েড মানুষজনের খাদ্য তালিকার মধ্যে ছিল ভাত, মাছ, শুয়োরের মাংস, কচ্ছপের মাংস, হরিণের মাংস। ১৪টি নরকঙ্কাল থেকে জানা যাচ্ছে, নিজেদের আবাসগৃহেই তাদের সমাধিস্থ করা হয়েছিল। আজকের মতো দাহ করা হয়নি বা সমাধিক্ষেত্রে কবরস্থ করা হয়নি। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন এখানকার সাঁওতালদের চেয়ে লম্বা এবং লম্বাটে মাথাওয়ালা (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭ : ১৫৮-১৬০; গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪: ১৩-১৪; মুখার্জি, এস. সি., ১৯৯৪ : ৮৩-৮৪)।

কৃষির মতোই, বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার বাংলায় প্রচলিত ছিল অনেক আগে থেকেই। পাণ্ডু রাজার ঢিবি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে ৬টি লোহার গাদের উপবৃত্তাকার চুল্লি পাওয়া গেছে। একই জিনিসের বাসনপত্র পাওয়া গেছে বীরভূমেব হেতমপুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায়। বোঝা যায়, পাণ্ডু রাজার ঢিবির মানুষজন ৭০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই লোহা গলানোর জ্ঞান অর্জন করেছিল। ঢাকার সংলগ্ন এলাকা বোলপুরের কাছে বাহিরি, বর্ধমানের মঙ্গলকোট, আসামের নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প-পূর্ব সময়েই লোহা গলানোর কাজ চলত। হাতিগাড়ায় লোহার তৈরি কুডুল পাওয়া গেছে (মুখার্জি, এস. সি., ১৯৯৪ : ৮৩-৮৪; চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭ · ১৫৮)। ছোটনাগপুর অঞ্চলে, মেদিনীপুরের শিলদহের কাছে তামার খনির সন্ধান পাওয়া

গেছে। 'তাম্রলিপ্ত' মানে তো তামা দিয়ে মোড়া। বাঁকুড়ার রানিবাঁধেও একই নিদর্শন পাওয়া গেছে। ওড়িশার সম্বলপুর, পুরুলিয়া, ধানবাদ, সিংভূমে পাওয়া গেছে সিসা ব্যবহারের চিহ্ন। সোনা-রুপোর সঞ্চয় নিয়ে সন্দেহ হত, যদি না আসাম এবং ছোটনাগপুর এলাকার নদীর বালিতে সোনা খোঁজা চলত। সিংভূম-ময়ূরভঞ্জ সীমান্তে ছোট হলেও স্বর্ণখনন চলত। এসব সত্ত্বেও খনিজ এবং তার ব্যবহারের জ্ঞান সীমিত ছিল কিছু অঞ্চলের কিছু মানুষের মধ্যে (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৪ : ১৫৫-১৫৮; মুখার্জি, এস. সি., ১৯৯৪ : ১০৮)।

কৃষি এবং খনিজ ব্যবহার বাদ দিলে, বাংলা সমাজ সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় ব্যবহৃত মাটির বাসনপত্রের নমুনায়। এইসব মাটির বাসনপত্রে আবার এলাকাগত বৈশিষ্ট্য ছিল, কোথাও কোথাও বেশি ব্যবহার হত। মাটির তৈরি জিনিসপত্রের গায়ে ছিল সমৃদ্ধ চিত্রকলা, ছিল টেরাকোটার চিত্র। রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী নাটশালে, কাছাকাছি এলাকায় পাওয়া গেছে মাছ ধরার ছিপ। আরও অন্যান্য যন্ত্রাদি (দত্ত, অশোক, ১৯৯৫ : ২২, ২৫৩)।

রাষ্ট্রহীন এবং রাজতান্ত্রিক সরকার

কীভাবে এসব প্রাক্-রাষ্ট্রীয় অরণ্য সমাজ কাজ করত, কীভাবে একটা স্থায়ী কৃষি সমাজের দিকে তারা গেল, কীভাবে রাষ্ট্র গড়ে উঠল এসবেব সরাসরি হদিশ পেতে আমরা কোনও ইতিহাসের সূত্র বা উৎস পাই না। কীভাবে এসব আদি সমাজ শাসিত হত তাও জানি না। কিন্তু জানি, উত্তর ভারতের সন্নিহিত এলাকার তুলনামূলক বিশদ প্রামাণিকতা থেকে, বিশেষ করে বৌদ্ধ সাহিত্য উৎস থেকে, যে রাজতন্ত্র সার্বজনীন হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত একধরনের প্রজাতান্ত্রিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। শতাব্দীকাল ধরে রাজতন্ত্র ও প্রজাতান্ত্রিক শাসন একই সঙ্গে টিকে ছিল[১] (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৬৩)। কোথাও কোথাও প্রজাতন্ত্রগুলোতে ক্ষমতা ছিল গোষ্ঠীর হাতে, যেমন ছিল পুরুর হাতে, যিনি আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যৌধেয়দের মধ্যে সরকার ছিল ৫০০০ জনের একটি সংঘের হাতে, লিচ্ছবিদের ক্ষেত্রে তা ছিল ৭৭০৭ জনের হাতে। এই প্রজাতন্ত্র তৈরি করেছিল একটি সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীকে, যারা একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। গ্রাম পরিষদ কাজ করত স্বাধীনভাবে। অন্যান্যদের মধ্যে ছিল বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের প্রতিনিধিত্ব (আল্টেকার, এ. এস., ১৯৭২ : ১০৯-১১৩, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬)। ঋক্‌বেদ রচনার সময় থেকেই আদিবাসীদের সভা বা সমিতি ছিল, এদের পরামর্শ ও সহায়তা নিতেন রাজা। সেই সময়ে, রাজার প্রভাব একজন মর্যাদাবান আদিবাসী গোষ্ঠীপ্রধানের চেয়ে বেশি ছিল না। এমন কি মহাভারতের সময়ে শাসকরা ছিল প্রধানত মেষপালনে জড়িত। দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি লড়াই হয়েছিল গরু নিয়ে। কৃষি স্থায়ী হওয়ার পর জমি থেকে আয় হয়ে উঠল রাজপরিবারের আয়ের অন্যতম বড় উৎস। রাজার সংজ্ঞাও বদলে গিয়ে দাঁড়াল, যিনি জমি থেকে প্রভূত আয় উপভোগ করেন। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধগ্রন্থ সূত্র নিপাত-এর (থাপর, রমিলা, ১৯৮৪ : ১৫৫; ঘোষাল, ইউ. এন. ১৯৭২ : ৭)। বিভিন্ন জঙ্গল এলাকার নামের শেষে যুক্ত হল 'ভূম' শব্দটি, যেমন বীরভূম। ভূম অর্থ ভূমি বা জমি (ব্লকসান, এইচ, ১৯৮৮ : ১৬)।

আমরা আরও দেখতে পাই, বাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কাজ করলেও অনেক সম্প্রদায় বা সমাজ কাজ করত প্রজাতন্ত্রের মতো। কিন্তু উর্ধ্বতন রাজাকে দিতে হত আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা। এই বিবর্তন বাংলাতেও ঘটেছিল। যেমন, প্রাচীন তাম্রলিপি অনুযায়ী, জমির অনুদান অনুমোদন বাংলাতেও দেখা গিয়েছিল। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অধিকার ছিল, বিশেষ করে জমি সংক্রান্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে (শর্মা, আর. এস., ১৯৬৫ : ১০৪)।

এমন বহু আদিবাসী গোষ্ঠী ও সমাজ টিকে আছে এখনও। বাংলা তো বটেই, সারা পূর্ব ভারতে তারা ছড়িয়ে আছে। এইসব সমাজে এখন দেখা যায় তাদের জীবনযাপন আগের মতো নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সমাজ ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছে নানা আর্থিক লেনদেনে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারও এসেছে। আদিবাসী সমাজ দ্রুত তাদের নিজস্বতা হারাচ্ছে। যদি কেউ ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকান, যদি দেখেন ১৩০-১৪০ বছর আগে, যখন আধুনিক নৃতাত্ত্বিকদের প্রথম দলটি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, তাদের জীবনধারা নিয়ে লিখল, বিশ্বাসের জগৎ আর লোকাচার নিয়েও লিখল তখনও এইসব সমাজের চেহারা পাল্টায়নি। কিন্তু পরে তারা আধুনিক গবেষকদের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছে গিয়েছে। তারা রাজতন্ত্রের সঙ্গে সহাবস্থানে সমতলে স্থায়ী কৃষির অভিজ্ঞতা পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে, এসবের প্রভাব তাদের মধ্যে পড়েছে।

ব্রিটিশ গবেষক ও প্রশাসকদের তথ্য প্রমাণে জানা যায়, যে এইসব সমাজ শাসন করা কঠিন ছিল। উন্নত সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল, বেশিটাই শিকারি ও শিকারের। তারা অপেক্ষা করত ফসল পেকে ওঠাব এবং তারপর ওই ফসল ছিনিয়ে নিত উপত্যকা ও অন্য অসমতল অঞ্চল থেকে। ব্রিটিশ প্রশাসকরা এদের সামলাতে হিমশিম খেত। তাই অনেক সময়ে ওদের হাতে রাখবার জন্য ওদের নেতাদের কিছু মাসোহারা দিত। এইভাবে ওদের সরকারের অংশ করা হত।

বনভিত্তিক আদিবাসী সমাজের অর্থনীতি টিকে ছিল প্রতিষ্ঠিত কৃষির পাশাপাশি। আদিবাসী অর্থনীতির নানাভাবে বিবর্তন ঘটেছিল। তবে আসল কথা হল, এসব সমাজ তা সে পশ্চিম আফ্রিকাতেই হোক অথবা উত্তর-পূর্ব ভারত অথবা মেক্সিকোয় হোক, তা প্রায় একই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

ঝুম চাষ

এইসব আদিবাসী সমাজে, শিকার ও সংগ্রহ করার স্তর থেকে কৃষি উৎপাদনের দিকে যাত্রা নিম্নমানের শস্য দিয়েই শুরু হল। ঝুম চাষের পথ ধরেই এ যাত্রা শুরু হল (হান্টার, ১৯৭৬, খণ্ড:৭ : ৩৪২)। ঝুম চাষের জন্য জঙ্গল কাটা, পোড়ানো, মাটিও ওলটপালট- এসবই হল। ধাতুবিদ্যার উন্নতি ঘটল। কৃষির সরঞ্জাম তৈরির প্রয়োজনে, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, ধানের বীজ তৈরিতেও তা কাজে লাগল।

গ্রামজীবন ছিল প্রান্তিক ও চলমান। মগধে গুপ্ত শাসনের সময় থেকে যখন ব্রাহ্মণরা বাংলায় এল, তাদের বাসস্থান নিশ্চিতভাবেই ছিল বনাঞ্চলে, যদিও চরিত্রে চলমান। এইরকম পরিবেশে, 'গ্রাম'-আজ যাকে বলে, তখন তা ছিল না। রাজবংশী পরিবারের একটি বিশেষ উপ-সম্প্রদায়ের নাম, এমনকী ১৮৭০ সালেও ছিল পালিয়া, যার অর্থ

ভবঘুরে। ধীমল আর মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'গ্রাম' বলে কোনও শব্দই ছিল না (হান্টার, ডব্লু ডব্লু ১৯৭৬, খণ্ড : ৭, ৩৪২)। এই আধা-যাযাবর গোষ্ঠীগুলির জীবনে 'গ্রাম' শব্দটির বদলে 'সম্প্রদায়' অনেক অর্থবহ শব্দ, যতক্ষণ না গ্রাম বলতে নির্দিষ্ট এলাকা না বুঝিয়ে চলমানতা বোঝাচ্ছে। কোনও শ্রেণিগত পার্থক্য ছিল না, রাষ্ট্র তৈরির প্রয়োজনও ছিল না। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও, উত্তরবঙ্গে গ্রাম ছিল না। যা ছিল তা হল জোতদারের জমি ঘিরে ঘরবাড়ি (সান্যাল, চারুচন্দ্র, ১৯৬৫ : ১৩)।[২] শৃঙ্খলা আনতে বা বাইরের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে গোষ্ঠীপতিরা সক্ষম লোকদের নিয়ে অস্থায়ী লড়াকু বাহিনী তৈরি করত। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে সংঘ বানাত আদিবাসী পঞ্চায়েতের মতো, সমকালীন সাঁওতাল বা বাগদিদের মধ্যে যেমন দেখি। অর্থনীতি ছিল সরল, আত্মনির্ভর, প্রয়োজনের পরিমাণও ছিল কম। অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রব্যাদি বিনিময় চলত। সেখানে কাজভিত্তিক বিভাজন বা বিশেষজ্ঞতা ছিল না। প্রত্যেক পরিবার ছিল স্বাবলম্বী, এক একটি পবিবারের যা যা দরকার সেই সব সেই পরিবারই তৈরি করত। যেমন পোশাক অথবা মাছ ধরার জাল অথবা শিকার বা যুদ্ধের সরঞ্জাম (মিঁয়াসু, ক্লড, ১৯৭১ : ৬০)।[৩]

কৃষিতে কিছু অগ্রগতির পর, চাষবাসের কাজ ছিল বেশিটাই পারিবারিক। অবশ্য অরণ্য সাফ করার কাজ করা হত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। গোষ্ঠীর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণেব মধ্যে গ্রামের জমিগুলি বিভিন্ন পরিবারের দায়িত্বে দেওয়া হত, আলাদা আলাদা চাষের জন্য। সাময়িকভাবে টুকরো জমি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে গোষ্ঠীপতি নিজে বিতরণ করতেন, পরিবারের প্রয়োজন ও আয়তন বিবেচনা করে, সামর্থ্য বিবেচনা করে, যাতে সব পরিবারই এই অসম জমিতে সমানাধিকার পায়, ভাল জমিতেও পায় কিছুদিনের জন্য, যাতে কোনও বিশেষ জমির ওপর কেউ নিজের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে (বাডেন-পাওয়েল, বি. এইচ., ১৯১৩ : ৮৪, ৮৮-৮৯; কোসাম্বি, ডি. ডি., ১৯৬৫ : ১৯৭)।

ওই চাষ প্রতি বছর বদলাতো। প্রতিবছর এক পরিবারকে এক নতুন জমি বণ্টন করতো মোড়ল। তার পরের বছর আবার নতুন জমি চাষ করতে হতো। ঝুম চাষ বলতে যা বোঝায়। ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অসম্ভব। চাষহীন একটি জমি, বহু বছর পড়ে থাকার পর, আবার নতুন করে চাষ শুরু হতো। জঙ্গলপোড়া ছাইয়ে জমির উর্বরতা এক বা দুবছর রক্ষিত হত। তারপর আবার নতুন চাষের জন্য অন্য জঙ্গল সাফ করা হত, আগেরটি বাতিল করে। পুরনো জমিটি ফেলে রাখা হত কয়েক বছর, যাতে তার উর্বরতা ফিরে আসে। তখন মানুষজন আবার ফিরে আসত পুরনো জমিতে। জমি ফেলে রাখা হত পঁচিশ বছরের মতো। উত্তরবঙ্গে কীভাবে চাষ বদল হত বা ঝুম পদ্ধতিতে চাষ হত তার বিবরণ দিয়েছেন হান্টার। হান্টার বলেছেন ১৮৭০ সালেও ঝুম চাষই ছিল চাষের প্রধান পদ্ধতি। যতদিন না স্থায়ী কৃষি এসে এই গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক চেহারায় পরিবর্তন আনে। সেসময় জনসংখ্যা ছড়িয়ে পড়েছিল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এবং জমি-মানুষ অনুপাত ছিল বিশেষভাবেই অন্যরকম। মানুষ জমির পরিমাপ করতেই জানত না। এই চাষ প্রকৃতিকে কোনওভাবে বিব্রত করেনি। লোহা দিয়ে তৈরি খন্তা বা খুরপির ব্যবহার হতো সরু ছুরির ব্যবহার হত ফসল কাটার জন্য, চাষের জন্য। হাল বা লাঙলের ব্যবহার জানা ছিল না (এরিং, ডি, ১৯৭২ : ৫৫-৫৯)। চরিত্রের দিক থেকে বাংলার আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বিশ্বের অন্যসব এলাকার

আদিবাসী সমাজের কোনও মৌলিক পার্থক্য ছিল না।

এই ধরনের কৃষিকাজে মালিকানা থাকত গোষ্ঠীর হাতে। পরিবারকেন্দ্রিক উৎপাদনের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানার চলও ছিল। গাছপালা কাটা, তারপর সেই কাঠকুটো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে চাষবাসের জায়গা প্রস্তুত করার কাজে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সবাই হাত লাগালেও, জমি খোঁড়াখুঁড়ি থেকে শস্য উৎপাদন, সব কাজের ভার থাকত পরিবারগুলোর ওপর। ওই সময় পুরুষ ও নারীর ওপর আলাদা আলাদা কাজের ভার ছিল। শিকার করা, গাছে উঠে ফলমূল পাড়া এবং বড় বড় গাছ কাটার কাজের ভার পড়ত মূলত পুরুষদেব ওপর। মেয়েদের কাজ ছিল কাঠকুটো জড়ো করে তাতে আগুন দেওয়া, জমিতে বীজ বোনা, চারা রোয়া বা রোপণ করা। শস্য দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য গোলাজাত করে রাখার দায়িত্বও ছিল মেয়েদের। জঙ্গল থেকে ফলপাকুড় এবং অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করা, নিড়ানি দিয়ে জমি খোঁড়াখুঁড়ি এবং শস্যের যত্ন নেওয়ার কাজ ছেলেদের থেকে বেশি করত মেয়েরাই। বসরাপ, এস্থার, ১৯৭০ : ১৭-১৮)। যৌথ প্রয়াসই ছিল গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র। কোনও কোনও সমাজে এমনকী, কুকুরের জন্যও সমান অংশ বরাদ্দ হত (জাভেদ, আলম, ১৯৯৩: ১৪ ; ফার্নান্ডেজ, ওয়ালটার, ১৯৯৩ : ৫৪)।

প্রধান এবং প্রবীণ সভা

গোষ্ঠী পর্যায়ে একজন প্রধান বা মোড়ল জাতীয় ব্যক্তি থাকতেন, যিনি গোষ্ঠীকে পরিচালনা করতেন।[৪] সম্ভবত এই কাজে তাঁকে সাহায্য করত প্রবীণের দল, যাকে বলা হত জনপদিন (আগরওয়ালা, ডি.এস. ১৯৫৩ : ৯১)। পরে যেটা পঞ্চায়েত হিসেবে পরিচিত হয় (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩১৮)। প্রধানকে বিচারক, প্রশাসক ও সেনা-কর্তা—একসঙ্গে নানা দায়িত্ব সামলাতে হত (ফার্নান্ডেজ, ওয়ালটার, ১৯৯৩ :৫৫)। এক-একজন পূর্বপুরুষেব উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বংশ পরিচয় ও আত্মীয়তা জানতেন। সবচেয়ে প্রবীণ জনই গোষ্ঠীপতি বা প্রধান হতেন। প্রবীণতমকে সম্মান জানানো হত কিছুটা আত্মীয়তার কারণে কিছুটা তাঁর প্রাজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার জন্য। গোষ্ঠীর ইতিহাস সবচেয়ে ভাল জানতেন এই প্রবীণরা। তাই চাষবাস থেকে যুদ্ধ - সবেতেই তাঁদের পরামর্শ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবীনরা বিশেষভাবে সম্মান করত প্রবীণদের। গাছ কাটার মতো কায়িক শ্রম বা যুদ্ধের কাজ করত নবীনবাই। প্রধানের ক্ষমতা সেভাবে নির্দিষ্ট ছিল না। বিভিন্ন সমস্যায় তাঁকে প্রবীণসভার সঙ্গে নিয়মিত আলোচনাতেও বসতে হত। তবে 'জন'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাবাদের যেসব ভাষ্য আছে তার মধ্যে যে অতিরঞ্জনও আছে, তা তাদের ইতিহাস ঘাঁটলেই জানা যায়। সেখানেও নানা স্তরভেদ ছিল (মিঁয়াসু, ক্লড, ১৯৭০; ৬০; ভেগাস, ফিলিপ, ১৯৯২: ১৮২; বসু, অমিতাভ, ১৯৯৩ : ২৪০)।

নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভবত পঞ্চায়েত নির্বাচিত হত না এবং নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে নিয়মিত বসতও না। গোলমাল, বিতর্ক ইত্যাদি দেখা দিলে সালিশি করাই ছিল পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ। প্রতিটি জনজাতিরই নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত ছিল। মোড়লের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত প্রবীণসভা। মোড়ল কোনও বিতর্ক মেটাতে না পারলে বা সন্তোষজনক সমাধান দিতে না পারলে, অনেক ক্ষেত্রেই

গোষ্ঠী ভেঙে কোনও কোনও অংশ বেরিয়ে যেত। তারা অন্যত্র গিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি গড়ে তুলত (বাডেন-পাওয়েল, বি. এইচ. ১৯১৩ : ৬৮, ৮৪, ৮৮-৮৯)।

স্থায়ী বসবাস

পরবর্তী পর্যায়ে কৃষিকাজ যখন পারিবারিক মালিকানায় চলে গেল, তখন চাষবাসে আরও উন্নতি করার প্রয়োজন দেখা দিল। ভ্রাম্যমাণ আদিবাসি গোষ্ঠি জঙ্গলে এক জায়গায় চাষ করতো, তারপর সেই জমিকে বিশ্রাম দিতে চলে যেত অন্য জায়গায়। এইভাবে তারা পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়াত জঙ্গলে। নতুন ধরনের কৃষিকাজে সেটি হওয়ার জো রইল না। এর জন্য বছরের অনেকটা সময়ই এক জায়গায় থাকতে হত। কারণ চাষবাসের সঙ্গেই জড়িত থাকত আনুষঙ্গিক নানা কাজ। চাল এবং লোহা — এই দুই আবিষ্কার এক জায়গায় স্থিরভাবে বসবাস করার ক্ষেত্রে বিস্তর সাহায্য করল। লোহা দিয়ে কৃষিকাজের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরির পাশাপাশি গাছ কাটার যন্ত্রপাতিও তৈরি হতে থাকে। কৃষিকাজের কারণেই পাওয়া যেতে লাগল উদ্বৃত্ত ফসল। গ্রাম আর চলমান রইল না, স্থায়ী হল।

কৃষিকাজে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জমি খোঁড়ার জন্য নিড়ানির বদলে তৈরি হল লাঙল। শস্য উৎপাদনে মেয়েদের বদলে পুরুষরা লেগে পড়ল কাজে। বিশেষত যেখানে ঠিকা শ্রমিকদের নিয়োগ হত এবং চাষবাস ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং বাণিজ্যিক কৃষিক্ষেত্রে উন্নত অঞ্চলে বসতি অন্য অঞ্চলের চেয়ে আয়তনে বড় হত (বসরাপ, এস্থার, ১৯৭০ : ১৯, ২৪, ২৬, ৩০)। অরণ্য অর্থনীতি-নির্ভর সমাজগুলোর অবস্থান ছিল মোটের ওপর একই মানের। কিন্তু কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি তাদের মধ্যে ব্যবধান দিল বাড়িয়ে। তবে তাদের মধ্যে কারও বৃদ্ধি বেশি হল কেন বা কম হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর মেলা কঠিন। কারও ক্ষেত্রে হয়ত ভৌগোলিক অবস্থান, যেমন কোনও নদী বা জলের উৎসের অবস্থান, জমির দারুণ উর্বরতা অথবা কারিগরদের কুশলতা সুবিধা দিয়েছে।

উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে নানাভাবে বাণিজ্যিক কাজে লাগিয়ে এক গোষ্ঠী এগিয়ে গেছে অন্য গোষ্ঠীর থেকে। এর ফলে অন্য গোষ্ঠী থেকেও অনেকে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে চলে এসে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এবং পরে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করে দিয়েছে। ফলত পুরনো গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট উত্তরাধিকারী হিসেবে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল, যে সরলতা ছিল, তা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। যে কোনও কারণেই হোক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ গ্রাম্য সমাজের নৈতিকতার মান শিথিল করে দিতে থাকে (মিঁয়াসু, ক্লড, ১৯৭১ : ৬১)। দলে দলে বহিরাগতরা এলেও গ্রামীণ কাঠামোয় গ্রামের প্রথমদিকের অধিবাসীদের সম্মান ছিল আলাদা। তারা বিশেষ সুবিধাও ভোগ করত। যেমন তাদের কুঁড়েগুলো ছিল গ্রামের একেবারে মধ্যিখানে। তাদের বেড় দিয়েই বহিরাগতদের কুঁড়েগুলো তৈরি হত ধাপে ধাপে। কেন্দ্রীয় বাসস্থানগুলো থেকে অন্য বাসস্থানগুলোর দূরত্ব দেখেই নির্ণয় করা যেত, সেই গ্রামে তারা কবে এসেছে (ব্যাডেন-পাওয়েল, বি.এইচ., ১৯১৩ : ৭১, ৮৮-৮৯)। এইভাবেই জনসংখ্যা, উৎপাদন এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গেছে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সমাজজীবন।

বিকাশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা ছিল। সে সময় জন্ম ও মৃত্যুর

হার নির্ঘাত অনেক বেশি ছিল। ফলে সার্বিকভাবে জনসংখ্যার হার কমই ছিল। যে সব গোষ্ঠীর মৃত্যুর হার ঠেকিয়ে রাখতে পারত, তাবা অন্যদেব তুলনায় সম্পন্ন হত দ্রুত। এর জন্য তাদের আরও জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাস এবং কুঁড়ে নির্মাণ করে চৌহদ্দি বাড়াতে হত। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জায়গা বাড়াতে হত। সে জন্য জঙ্গল সাফ করতে হত, এ ছাড়া চাষের জন্য লাগত অতিরিক্ত জমি এবং সেই জমিতে কাজ করার জন্য পুরুষ-নারী। জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এলাকার সীমানা বাড়ানো এবং পড়ে-থাকা জমি ব্যবহার করাব ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করত। এটাই হয়ত বহুবিবাহের অর্থনৈতিক কারণ হতে পারে[৫] (বোসবাপ, এস্থার, ১৯৭০ : ৩৭)।

উত্তর ভারতের বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্র

বাংলার আদিবাসী প্রজাতন্ত্রের পূর্ব রূপ কী ছিল তার সমর্থনে কোনও নথিপত্র আমাদের হাতে নেই। কিন্তু বিহারের বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে যে বৌদ্ধ নথিপত্র আছে, তা থেকে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি। আমরা এটা বলতে পারি না যে বাংলার আদিবাসী প্রজাতন্ত্র ছিল হুবহু বিহারের মতো। এটা হতেও পারে, নাও পারে। পৃথিবীর সব জায়গার সামাজিক-রাজনীতিক বিকাশের সূত্রটা একই রকমের, তা সে পশ্চিম আফ্রিকা হোক, ত্রিপুরা হোক বা বাংলা হোক। বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্রের কথা তুলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকেব সামনে সেই বাংলাকে তুলে ধরা যখন সেখানে কোনও রাজা নেই, রাজ্য নেই, নেই শ্রেণি কিংবা জাতপাত।

গৌতম বুদ্ধ ওই রকমই কোনও এক প্রজাতন্ত্রে জন্মেছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে আদিবাসী প্রজাতন্ত্রের যে যোগ ছিল তার প্রমাণ বিনয় এবং সুত্রপিটকের মতো বৌদ্ধ সাহিত্যেই রয়েছে। এই সাহিত্যে যেসব জাতকের গল্প আছে, তাতে সপ্তম থেকে চতুর্থ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত মানুষের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূত্র থেকেই আমরা জানতে পারি যে প্রজাতন্ত্রগুলো চালাত 'সভা' এবং 'সমিতি'গুলো। এরা যেখানে আলোচনায় বসত তাকে বলা হত 'সংঘাগার'। অনেক গ্রামবাসী থাকত প্রজাতন্ত্রের অধীনে, তাকে বলত 'গাম'। জাতকের গল্প অনুযায়ী এই গ্রামের লোকসংখ্যা হতে পারত ৩০ থেকে ১০০০। বাবা, মা, ছেলেমেয়ে, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, স্ত্রী, নাতি-পুতি-সবাইকে নিয়েই হত একটা পরিবার বা 'কুল'। গ্রাম-এর চারপাশে থাকত পশুচারণ ভূমি, অরণ্য এবং অপরিচ্ছন্ন জঙ্গল। এই সব অরণ্য থেকে মানুষ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনত অথবা তাদের ক্যারাভ্যান সরিয়ে নিয়ে যেত। পশুচারণভূমিতে চরত ছাগল এবং গরুমোষ। সাধারণভাবে পশুদের দেখাশোনা করার জন্য নির্দিষ্ট লোক ঠিক করা থাকত। তারা সকালে গরু নিয়ে গিয়ে মাঠে চরিয়ে আবার বিকেলে যার যার পশু তাকে ফেরত দিত (রীস ডেভিডস্, সি.এ.এফ., ১৯৬২ : ১৭৪)।

আগেই বলা হয়েছে বাসগৃহগুলো থাকত একই জায়গায়, বৃত্তাকারে। সেই বৃত্তের বাইরে পাঁচিলের পরে থাকত গাম-এর কৃষিযোগ্য জমি, যাকে বলা হত 'খেত'। পশুপাখিরা যাতে কৃষিজমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট না করতে পারে তার জন্য বেড়া দেওয়া হত, ফাঁদ পাতা হত। পাশাপাশি ফসল পাহারা দেওয়ার লোকও থাকত। চাষবাস হত সমবায় প্রথায়। ব্যক্তিগত জমি ভাগ করা হত আল দিয়ে। বেশিরভাগ জমিই ছিল

আয়তনে ছোট, যাতে পরিবারগুলো সহজে তা সামলাতে পারে। তবে কোনও কোনও ব্রাহ্মণের হাজার একরেরও বেশি জমি থাকত। যেটায় চাষ করতে লাগত ৫০০ লাঙল ও ভাড়া করা শ্রমিক। ধান এবং সাত ধরনের শস্য ছাড়াও উৎপাদন হত আখ, ফলমূল, সবজি এবং ফুল (রীএস ডেভিডস্, সি.এ.এফ., ১৯৬২ : ১৭৮)।

গ্রামীণ সমাজে 'ভোজক' বলে একজন সর্দার জাতীয় লোক থাকত। সে লোকের কাছ থেকে বকেয়া টাকা এবং জরিমানা আদায় করত। শস্যাগার, জলাশয় বা বাগান তৈরি বা রাস্তা মেরামতির ব্যাপারে গ্রামবাসীরা মোড়লের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত, তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করত, সে সময় ক্রীতদাসের চল ছিল। তবে ক্রীতদাসেরা ভাড়া-করা শ্রমিকদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত। তাদের স্থান ছিল উঁচুতে। ক্রীতদাস-প্রথা চালু হয়েছিল নানা কারণে। যেমন যুদ্ধবন্দি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ক্রীতদাস হত, কেউ হতো ঋণের কারণে, কেউ আসত স্বেচ্ছায়। বিচারে শাস্তি পেয়েও ক্রীতদাস হতে হত অনেককে। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে ক্রীতদাসেরা নিজেদের মুক্ত কবে নিত। এই ক্রীতদাসদের খনিতে বা কৃষিকাজে লাগানো হত না। ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেব মাত্র দুটো নজির মেলে।

এই ধরনের হীন কাজ করার জন্য তাদের শাস্তি দেওযা হত না। ওই সময় বহু ধরনের বাণিজ্য ও পেশার সৃষ্টি হয়। অনেক নির্বিবাদী গোষ্ঠীর লোকও তীর-ধনুক তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল। অনেকে শস্য মাড়াই ও বাছাইয়ের কাজ করত, কেউ কেউ কাঠের কাজ, এমনকী, নৌকো-জাহাজও তৈরি করত। এ ছাড়াও ছিল গরুর গাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি। কেউ ছিল স্থাপত্যে যুক্ত। চামড়ার কাজে লিপ্ত লোকজনও ছিল (রিস ডেভিডস্, সি.এ.এফ., ১৯৬২ : ১৭৮-১৮৩।) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও কিছু সময় গণতান্ত্রিক সভাগুলো কাজ করে গিয়েছে। ধর্মসূত্রে গৌতম বলেছেন, কৃষি, ব্যবসা, পশুপালন, সুদ খাটানো ইত্যোদি কাজ প্রত্যেককে নির্দিষ্ট কবে দেওয়া উচিত রাজার। সবার হয়ে কথা বলার অধিকার একমাত্র রাজারই থাকে। এ থেকে মনে হয়, এই গোষ্ঠীগুলো নিজেদের ব্যবসার জন্য কিছু নিয়মনীতি তৈরি করে ফেলেছিল। এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করত সংশ্লিষ্ট সমিতি (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৩১০)।

গ্রাম্য জীবন নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার অভিজ্ঞতা

পশ্চিম আফ্রিকার অরণ্যবাসী এবং আংশিকভাবে স্থায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা চালিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকেও বাংলার উপজাতি প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পশ্চিম আফ্রিকায় গ্রাম্য সমাজে শ্রেণিভেদ ছিল না। সেখানে পার্থক্য গড়ে দিত বয়স, পেশাগতভাবে এগিয়ে থাকা, কতগুলি গবাদি পশু আছে, জাত ইত্যাদি। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের চিত্রটাও প্রায় একই রকম ছিল বলে জানা গিয়েছে হেনরি মেইন এবং কয়েকজন পণ্ডিতের গবেষণা থেকে (মেইন, হেনরি, ১৮৭১)। তফাতটা এখানেই যে, পশ্চিম আফ্রিকায় শহর-অর্থকেন্দ্রিক চাষ-আবাদ এবং খনিশিল্প গড়ে উঠলেও পাশাপাশি এই ব্যবস্থাটা এখনও প্রায় একই রকম রয়ে গেছে (আমিন, সমির, ১৯৭৭ : ২৯, ৩৩)।

এই ধরনের আফ্রিকান সমাজে বয়সের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। একটা বয়সসীমার পর মানুষ যুদ্ধে অংশ নিতে পারে না। এই কাবণটাকে হেনরি মেইন বড় করে দেখালেও (১৮৭১ : ১২৪), এর মুল কারণ ছিল বয়স্কদের নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, এইটা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হত। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা শুরুর অনেক আগে, দশম শতাব্দীতে, প্রবীণতার প্রাধান্য খর্ব হতে থাকে। অনেক পেশা, যেখানে উত্তরাধিকার নিয়ে কোনও বিরোধিতা ছিল না, সেখানে বিরোধিতা শুরু হয়। জন্ম হয় রাষ্ট্রের। যেমন মালি, সোংহাই অথবা আসান্তি সাম্রাজ্য। রোমের মতো দাসপ্রথা না থাকলেও, বাংলার মতোই ওখানে রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে দাসেদের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষ বা বাংলার মতো ক্রীতদাসেরা রাজা বা অমাত্যদের বাড়িতে ফাইফরমাশ খাটত। কোনও ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকত না। উৎপাদনের ব্যাপারটা সংগঠিত করত গ্রামীণ সম্প্রদায়। উপজাতিদের বাধ্যত আইন মেনে চলতে হলেও, ইউরোপীয় সামন্তপ্রথা একে বলা যায় না। পরবর্তীকালে দখল করা গ্রামে পরাজিত গ্রামবাসীদের তাদের প্রভুদের অধীনে থাকতে হত বেশ কিছুদিন। ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে মিল না থাকলেও এর সঙ্গে ইউরোপের সার্ফ প্রথার সঙ্গে সাযুজ্য ছিল অনেক। এই সার্ফ প্রথায় ক্রীতদাসের মতোই দায়বদ্ধ থাকত কৃষক। এমনকী জমি হস্তান্তর হলে এবাও জমির সঙ্গে হস্তান্তরিত হত (আমিন, সমির, ১৯৭৭ : ৩৩- ৩৬)।

উত্তর ভারতের মতোই গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত গ্রাম-প্রধান। তাকে সাহায্য করত প্রবীণদের নিয়ে গঠিত সংসদ। পরিবারগুলোর মধ্যে যার যেমন প্রয়োজন, তাকে সেইভাবে জমিও বিলি করত গ্রাম-প্রধান। কিন্তু প্রধান স্বেচ্ছাচারী হলে গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙন ধরত। অনেকে দল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত। জমি যতদিন মানুষের আনুপাতিক ছিল, ততদিন এই ধরনের জমির মালিকানা ও বণ্টন ব্যবস্থা চালু ছিল। পর্যাপ্ত জমি থাকার কারণে এক-একজনকে জমি হস্তান্তর করতে হত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে।

বহুদিন পর একজন যখন আবার তার জমি ফেরত পেত, তখন সেই জমি হত চাষের উপযোগী। তাতে আগের চাষের কারণে জমি যেটুকু নষ্ট হত, তার কোনও চিহ্ন থাকত না। এইসঙ্গে যোগ হত, খনির মজুরি বা অন্যান্য অতিরিক্ত আয়, যা জমি কিনতে এবং তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বসাতে সাহায্য করত। লোক যত বাড়ল ততই পুনর্বণ্টন কমল, এবং জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল হল। এর ফলে শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে উঠল মালিক।

স্থায়ী কৃষিকর্ম : সর্বভারতীয় চিত্র

জমির ব্যক্তিমালিকানা বৃদ্ধি

গ্রামের জমি জরিপ সরকারের বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেই পড়ে। অনেক কাল আগে, বাংলার একটা বড় অংশের জমিই যখন জরিপ করা হয়ে ওঠেনি, কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে জমি-জরিপ কীভাবে করতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখেছিলেন (কাঙ্গলে, আর.পি.১৯৬৩, খণ্ড ২ : ৬২-৬৭)। পূর্ব ভারতে এই অর্থশাস্ত্রই নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করত। জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে কৌটিল্য রীতিমতো গোঁড়া হলেও কৃষি উৎপাদন

বৃদ্ধির কাজে শূদ্ররা বৈশ্যদের সঙ্গে কাঁধ মেলাক, সেটা তিনি চাইতেন (কাঙ্গলে, আর. পি., ১৯৬৩, খণ্ড ২ : ৮)। সেই সময়ের গ্রিক নথিপত্র থেকে জানা যায়, কৃষিকাজকে এতটাই সম্মান করা হত যে, যুদ্ধের সময়ও শত্রুরা কৃষকদের ক্ষতি করত না (ম্যাকক্রিণ্ডল, জে.ডাব্লু., ১৯৬০;৩৯)।

আগে জমি ছিল গোষ্ঠীগত সম্পত্তি, জমির ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। মৌর্য রাজত্বের সময় অবশ্য রাজা নিজেকে সব জমিরই মালিক বলে দাবি করত এবং উৎপাদিত শস্যের এক-চতুর্থাংশ প্রণামী হিসেবে নিত (ম্যাকক্রিণ্ডল, জে.ডাব্লু., ১৯৬০ : ৩৯-৪০; গোপাল, এল, ১৯৮০ : ৪২-৪৩)। গ্রিকরা বিস্তীর্ণ জমিকে (সীতা) রাজার বলে ভুল করেছিল, এমনও শোনা যায় (কোসাম্বি, ডিডি., ১৯৬৫ : ১৪৮-১৪৯)। যখন মানুষ যখন জঙ্গল সাফ করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে, সে সময়ও মনুও জরিপের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৭৯)। সেই থেকে মানুষের মনে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ঢুকতে থাকে (ইম্যানুয়েল, টেরি, ১৯৭২ : ৬১)।

যত সময় যেতে থাকে, জমির ব্যক্তি মালিকানাও বাড়তে থাকে। জমির সীমানা নিয়ে গোলমাল সম্পর্কে আলোচনায় কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে 'স্বয়ম্' কথাটা ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তি মালিকানা ক্রমে এমনই পর্যায়ে যায়, যে একজন চাষী তার জমিকে পাট্টা দিতে পারত, বিক্রিও করতে পারত। অধিকারের সীমা এতটাই প্রসারিত হয়েছিল যে, রাজা যদি কাউকে কোনও জমি দান করত বা তিন পুরুষ ধরে কোনও পরিবার কোনও জমি ভোগ করত এবং সে/তারা যদি সেই জমিকে সযত্নে রাখত তাহলে সে জমি তার/তাদেরই হত (সরকার, ডি.সি., ১৯৬৬ : ১৩)। সেখান থেকে কেউ তাকে/তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করলে, তা ফৌজদারি আইনে অপরাধ বলে গণ্য হত। অধিকার এবং নামপত্র—এই দুটোই ছিল মালিকানার উপাদান। পাণিনির সমসাময়িক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৈয়াকরণ কাত্যায়ন জমি-বিতর্কের কতগুলো কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলো হল : আরও জমি দাবি, নিজের চেয়ে অন্যকে কম পরিমাণ জমি দেওয়ার দাবি, ভাগ চাওয়া, নিজের ভাগ থেকে দিতে অস্বীকার, জোর করে অধিকার আদায়, সীমারেখা বাড়ানো। এই সব ঘটনা থেকে নিশ্চিত বোঝা যায় যে যিশুর জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ভারতে জমি ব্যক্তি মালিকানায় যেতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ জমির অধিকার, ব্যবহার এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে নানা ধরনের গোলমাল দেখা দিতে শুরু করেছিল। মনু জমির ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে মালিকানার অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, অন্যের জমিতে বীজ ছড়ালে সে জমি তার হয়ে যায় না। সেই বীজ থেকে উদ্ভূত ফসলেরও সে মালিক হয় না। সে ফসলের মালিক, যার জমি তার। নারদপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে জমির সীমানা লঙ্ঘন এবং আনুষঙ্গিক জরিমানার ঘটনার কথা উল্লেখ আছে (গোপাল, এল, ১৯৮০ : ৪৬-৫৩)। এসব থেকে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, প্রাচীনকালে ওই সব বই লেখার সময়ে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার ভালো রকম চালু ছিল।

রাষ্ট্র গঠন

প্রায় সর্বত্রই প্রজাতন্ত্র থেকেই জন্ম হয়েছিল রাজন্য প্রথার এবং জমির গোষ্ঠী মালিকানা বদলে গিয়েছিল ব্যক্তি মালিকানায়। বিবর্তনের এই ধারাটা বাংলা, বিহার বা দক্ষিণ আফ্রিকা, সর্বত্রই একই চেহারার। শুরুটা সব জায়গাতেই কৃষিকাজ দিয়ে। এক জায়গায় স্থায়ীভাবে চাষবাস শুরু হতেই যারা সরাসরি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের শস্যাদি উদ্বৃত্ত হতে শুরু করে। পরিবারগুলোর হাতেই উৎপাদনের রাশ চলে যেতেই জমির ওপর গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ আলগা হতে থাকে (কোসাম্বি. ডি.ডি., ১৯৬৫ : ১০১)। জমি কীভাবে ব্যবহৃত হবে, কোন চাষ হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করতে থাকে পরিবারই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে গৃহপতি বা পরিবারের কর্তার ক্ষমতাই বাড়তে থাকে। সম্পদের মালিকানা এবং ব্যবহার আর গোষ্ঠীর হাতে থাকে না। পর্যায়ক্রমে জমির হস্তান্তর বন্ধ হতে থাকে, কারণ ভাল জায়গায়, ভাল জমি একবার চাষ করলে সে আর ছাড়তে চাইত না। পর্যায়ক্রমিক হস্তান্তর কমতে থাকার আর একটা কারণ মানুষ ও জমির অনুপাতের অবনমন। জমির দখল রাখতে দলপতিকে ঘুষ দেওয়াও শুরু হয়।

যারা শক্তিশালী ছিল, বেশ উর্বর অথবা ভাল জায়গায় জমি পেয়ে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তারাই বেশি লাভবান হত বেশি। শুরুতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতাবানদের হাতে চলে যেত সম্ভবত সমগ্র গোষ্ঠীর স্বার্থবক্ষার্থে। এর ফলে একটা শ্রেণি তৈরি হয়, যাদের নিজেদের জন্য আর চাষবাসের কাজে হাত লাগাতে হয় না। তারা গোষ্ঠীর সার্বিক স্বার্থরক্ষার ব্যাপারেই শুধু মাথা ঘামাতে থাকে। সার্বিক স্বার্থরক্ষা বলতে বোঝাত লুণ্ঠনকারী যাযাবর শ্রেণির (নোম্যাড) হাত থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদকে রক্ষা করা। এই যাযাবররা অর্থনীতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল হলেও যুদ্ধে ছিল দারুণ পটু। আক্রমণকারী মেষপালকরা যেখানে গতি আর ক্ষমতায় ছিল দ্রুত, কৃষিজীবীরা ছিল ধীরগতি। ফলে আক্রমণকারীদের হাত থেকে গোলাজাত ফসল বাঁচাতে কৃষিজীবীদের প্রয়োজন হত রক্ষাকারী দল এবং একজন নেতার (ক্লিসেন, হেনরি জে.এস. ও পিটার স্কালনিক, ১৯৭৮ : ১০)।

এসব কারণে প্রধানের ভূমিকা নতুন মাত্রা পায়। কারণ তাকেই লড়াকু বাহিনী নিয়ে আক্রমণ ঠেকাতে নামতে হত। ক্রমে ক্রমে রক্ষকই হয়ে ওঠে লুণ্ঠনকারী। তার অধীনে থাকা পালোয়ানরা হল সেনাদলের আদি রূপ। তীর-ধনুক, বর্শা জাতীয় অস্ত্রে সজ্জিত এই দলই পরবর্তীকালে ছোট আকারের রাষ্ট্রের চেহারা নেয়, গোষ্ঠী-ধর্মের ওপরে। এই দল সম্ভবত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মাসুল আদায় করত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। এটাই পরে রাষ্ট্রের কর আদায়ের চেহারা নেয়। গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য গ্রামবাসীরা যে স্বেচ্ছায় উদ্বৃত্ত ফসল তাদের হাতে তুলে দিত এমন নয়, অনেক সময় শাসকরা রাজস্ব বা কর হিসেবে জোর করেও তা আদায় করত। যে উদ্বৃত্ত ফসল বাইরের লোকেদের হাত থেকে বাঁচানো হত, তা চলে যেত নিজেদের গোষ্ঠীরই খপ্পরে। এই থেকেই জন্ম হয় শ্রেণির। সামাজিক-রাজনীতিক সাম্যবাদ বদলে যায় শাসক এবং শাসিতের লেনদেনে। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা সমাজের বুকে বৈষম্যের সৃষ্টি করে (কোহেন, রোনাল্ড, ১৯৭৮ : ৬৭)।

খণ্ড রাষ্ট্র

গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ এক লাফে হয়নি। বিভিন্ন সমাজে মধ্যবর্তী পর্যায়ের স্থায়িত্ব ছিল বিভিন্ন রকম। এক এক পরিস্থিতিতে তার আকৃতি-প্রকৃতিও ছিল একেক রকম। সাউদল একেই খণ্ডরাষ্ট্র (সেগমেন্টারি স্টেটস) বলেছেন।[৬] শব্দটার মধ্যেই তার অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ খণ্ডরাষ্ট্র ছিল অনেক। প্রত্যেক উপজাতি গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আইন, জমি-ব্যবহার, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার বিবাদ নিরসন আইন সবই ছিল আলাদা আলাদা। এই অবস্থায় রাষ্ট্র বলতে বোঝাত, আলগা ভাবে সংযুক্ত অনেকগুলো স্বয়ংশাসিত গোষ্ঠীর সমাহার। কতকগুলো সার্বজনীন নিয়ম ছিল, যা খণ্ড রাষ্ট্রের সব খণ্ডই মেনে চলত। গোষ্ঠীগুলোর সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকার পেছনে কাজ করত পারস্পরিক স্বার্থ এবং বাইরেব শত্রুকে মিলিতভাবে ঠেকিয়ে রাখার দায়। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য তৈরি হওয়ার সুযোগ ছিল খুবই কম। ছোট খণ্ডগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সংগঠনেরই অনুকৃতি। এই সমস্ত সমাজে স্বল্পকালীন উৎপাদন ক্ষমতাসহ স্বয়ম্ভরতা ছিল সাধারণ নিয়ম এবং কায়িক শ্রমই ছিল শক্তির মূল উৎস (ইম্যানুয়েল, টেরি, ১৯৭২ : ৯৭)। নড়বড়ে মনে হলেও এই খণ্ডিত কাঠামোগুলোই বহু কাল টিকে যেত, পেরিয়ে যেত, অসংখ্য অন্তর্বর্তী পর্যায় (সাউদল, এ.ডাব্লু., ১৯৫৩: ২৬০)।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজগুলো চলে যেতে থাকে রাজার নিয়ন্ত্রণে, এবং অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান রাজ্যের অধীন হয়ে কাজ করতে থাকে। সম্পদের মধ্যে যা ছিল সবচেয়ে দামি, সেই জমি, চলে যায় রাজার দখলে। রাজা তার পছন্দমতো জমিগুলো নিয়ে যা মন চায় করতে পারত। তবে জমিগুলো গ্রামীণ সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল, রাজা শুধু রাজস্ব আদায় করত, যে ওই জমিতে কৃষিকাজ করত সম্পত্তির অধিকার প্রথাগতভাবে তারই ছিল।[৭] এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কিন্তু ঘটনা হল, রাজার অধীন যে জমি ছিল, সেগুলোকে রাজা তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারত। ইচ্ছামতো কাজ করার জন্য তার হাতে ছিল রাষ্ট্রযন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রের যেমন সীমানা নির্ধারিত আছে, সে সময় তা ছিল না। একজন রাজার হুকুম যতটা পর্যন্ত চলে, সেটাই ছিল তার রাজ্যের সীমানা (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ২০১-২০৩,২১৪,২১৫)।[৮]

কোচবিহার : এক খণ্ড রাষ্ট্র

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের কোনও এক রাজত্ব সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, সেটুকু দিয়ে প্রথম দিকে বাংলার রাজ্যগুলো কেমন ছিল সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ষোড়শ শতকের গোড়ায় গ্রাম প্রধান হরিয়া মণ্ডলের ছেলে বিশু কোচ উপজাতিগুলোকে একত্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্য তৈরি করে। সে-ই হয় সেই রাজ্যের রাজা। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থক। বাংলায় তখন মুসলিম শাসন ছিল, তিনি ছিলেন তার বিরুদ্ধে। বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজে নিজের পরিচয় বা সামাজিক অবস্থানকে বড় করে তুলতে ব্রাহ্মণরা তাদের আদিপুরুষ হিসেবে কাল্পনিক কোনও বৈদিক দেবতার নাম জুড়ে দিত। সমাজে গণ্যমান্য ক্ষত্রিয় হিসেব নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে বিশুও সেই পদ্ধতির আশ্রয় নেন। প্রচার করা হচ্ছে যে বিশুর মা অলৌকিক উপায়ে শিবের দ্বারা গর্ভবতী হয়। সে কারণে তারা শিবের বংশধর। সেই কোচ রাজ্যের ১২টা কোচ

পরিবারের প্রধান ১২ জন পলাতক ক্ষত্রিয় রাজকুমার হিসেবে চিত্রিত হয়, যারা কামরূপের পার্বত্য এলাকায় গিয়ে মেচ উপজাতির মহিলা বিয়ে করে সেখানেই আস্তানা গড়ে ছিলেন/(ইটন, রিচার্ড এম., ১৯৯৩ : ১৮৭)। ভারতবর্ষের নানা অংশে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই 'সংস্কৃত্যায়ন'-এর প্রবণতা দেখা গেছে। উদাহরণ হিসেবে রাজপুতদের কথা বলা যায়। সামাজিক গুরুত্ব পেতে কিছু ব্রাহ্মণের সাহায্যে এরা নিজেদের উচ্চ বংশজাতদের তালিকাভুক্ত করে নিয়েছিল। বিশু এবং তার পুত্র নরনারায়ণ তাদের সম্প্রদায়ের এই পরিবর্তন সম্পর্কে উৎসাহী ছিল।[৯] (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭৪ : ১১৮-১২০)

বিশুর রাজত্বকালে আশপাশের রাজ্যগুলো বেশ উন্নতি করে ফেলেছিল। ফলত সে উন্নত বাজ্যগুলোর মতো করেই নিজের শাসনব্যবস্থাকে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ওই সময়েই অর্থনীতিতে টাকা চলে আসে, চাষবাসের ক্ষেত্রে নিড়ানির জায়গায় লাঙল চলে আসে। কোচেরা ছিল এক বংশীয় জাতি। তারা রাজাকে বশ্যতার নিদর্শন হিসেবে করভি (শ্রম) দিত। এই পদ্ধতিটা তারা শিখেছিল আসামের অহমিয়াদের থেকে। চারজন কৃষিজীবীকে নিয়ে একটা দল তৈরি হত। সেই দলের একজন রাজার কাজ করবে, বাকি তিনজন জমি দেখাশোনা করবে—এই ছিল নিয়ম। তবে এই নিয়মটা কতটা কার্যকর ছিল সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সাধারণভাবে প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজস্ব আদায় পদ্ধতি যা-ই হোক, গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী অস্থায়ী গ্রামজীবনে রাজা হস্তক্ষেপ করত না। সামন্তপ্রথা উঠে গেলেও এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয় না। তবে সাম্মানিক প্রদানে প্রভাব পড়ে। গ্রামীণ সামন্তপ্রথা এইভাবেই ধরে রেখেছিল গ্রাম্যজীবনকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দক্ষিণা দেওয়ার ব্যাপারটা ছাড়া সমাজের নিচু তলায় এর কোনও প্রভাবই পড়ত না। কখনও কখনও প্রাত্যহিক জীবনে রাজ্যের কঠোর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হত।

মুঘলরা কোচবিহার দখল নেওয়ার পর ইসলাম খানের সময় জমিকে ২০টি রাজস্ব বৃত্তে ভাগ করা হয়েছিল, কৃষিকাজের ওপর কর চাপানোও হয়েছিল। কোনও কোনও জায়গায় রাজস্ব আদায়ের জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজস্ব আদায় নিয়ে জোরাজুরি করার কারণে কৃষকরা খেপে ওঠে। ফলে বাধ্য হয়েই মোগলদের রাজস্ব নীতিকে পরিবর্তন করতে হয়। দু' ধরনের রাজ্যের মধ্যে সঙ্ঘাত ছিল নিয়মিত, রাজ্য গড়ে ওঠায় মোটের ওপর দু'ধরনের বিকাশ প্রক্রিয়াই চলত। প্রথাগতভাবে একটাকে আরেকটার বশ্যতা মানতে হত। যখন জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের একটা কেন্দ্রীয় পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করছে, তার কয়েক দশক আগেও রাজ্য বলতে তেমন কিছু ছিল না। যা ছিল তাকে বড় জোর রাষ্ট্রাংশ বলা চলে (ইটন, রিচার্ড এম, ১৯৯৩ : ১১৮-১৯০)।

সামগ্রিকভাবে বাংলায় স্থানীয় বড় মাপের গোষ্ঠীপতিরাই ক্রমশ রাজার চেহারা নিয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে পুরোহিততন্ত্র। রাজারা যে এই সব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে খুব বেশি উদ্বৃত্ত আদায় করতে পারত না, তা তাদের সম্পত্তি দেখেই বোঝা যায়। উদাহরণ হিসেবে বর্তমানের ঝালদার রাজার বাড়ির কথাই উল্লেখ করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঝালদার মতো উপজাতি 'রাজা'রা গ্রামের মোড়লদের কাজই করত। ওদের মূল কাজ ছিল কোনও সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বা এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের

গণ্ডগোল মেটানো, ছোটখাট সেনাবাহিনী তৈরি করে ওরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করত।[১০]

আরেকটি প্রসঙ্গ : মল্লভূম

বিষ্ণুপুর এবং বাঁকুড়ার কাছাকাছিই ছিল মল্লভূম। ছোটনাগপুর মালভূমির লাল মাটির অঞ্চল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার পাললিক অঞ্চলের মধ্যবর্তী অরণ্য অঞ্চলই ছিল এর অবস্থান। আকবরের রাজত্বকালেই মল্লভূম চলে আসে পাদপ্রদীপের আলোয়।

পালেদের আমলে চাষের ক্ষেত্রে জঙ্গলের সামন্ত প্রভুরা যে পুরোপুরি স্বাধীন ছিল, তা নয়। রামপালের সহায়তায় জঙ্গল-প্রধানরা একটা সংঘ গড়ে তুলেছিল। সেই সময় দেশে সাঁওতাল, কোরা, ভূমিজ, বাউড়ি, বাগদি, ডোম, মাল, লোহার, হারি প্রভৃতি নানা উপজাতি সম্প্রদায় বাস করত। এই সব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সত্তা ছিল। নিজেদের গোলমালও এরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলত (সান্যাল, হীতেশরঞ্জন, ১৯৮৭ : ৭৩-৭৭)।

রাজ্যে সেনাকর্তা, সেনাবাহিনী এবং বড়সড় রাজস্ব দপ্তর থাকলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে একদম নিচুতলায় শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কোনও ভূমিকাই প্রায় থাকত না। কারণ সেটা চলত উপজাতি প্রথায়। জমি কতটা, কী পরিমাণে আছে ইত্যাদির কোনও মাপজোক হত না। রাজা জানতই না তার অধীনে কত পরিমাণ জমি আছে, এবং সেই জমি কাদের মধ্যে কীভাবে বন্টিত। সম্পর্কগুলো তখন ছিল পুরোপুরি ব্যক্তিগত এবং বিশ্বাস-নির্ভর। জমির স্বত্ব হিসেবে কোনও কাগজপত্রও তাই দেওয়ার চল ছিল না (সান্যাল, হীতেশরঞ্জন, ১৯৮৭ : ১১৭-১১৯)।

কিছুটা ছন্নছাড়া ভাব থাকলেও, রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব যেখানে ব্যয় হত রাজ-প্রতিষ্ঠান খাতে, তিনের চার ভাগ চলে যেত সেনাকর্তাদের ভোগে। সীমিত সামর্থ্য নিয়েও রাজধানী বিষ্ণুপুর এমনিতে সুরক্ষিত ছিল। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এই সুরক্ষা মারাঠি আক্রমণ থেকে ওদের রক্ষা করতে পারেনি (সান্যাল, হীতেশরঞ্জন, ১৯৮৭ : ১২০-১২১)

এর কেন্দ্রে ছিল কিছু সম্পন্ন গ্রাম, ও দেওয়াল-ঘেরা মাটির বাড়িই ছিল দুর্গ। 'রাজা' ওই দুর্গে বসবাস করত।

ধ্রুপদী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে রাজতন্ত্রের পক্ষে ব্যাখ্যা

দেশের অন্যান্য অংশে যখন প্রজাতন্ত্রকে হটিয়ে রাজতন্ত্র জায়গা করে নিচ্ছে, তার আগে থেকেই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলায় ছিল। আর তাতে রাজতন্ত্রের পক্ষে অনেক সাফাইও ছিল। এ কথাটার এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, কারণ বাংলায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কয়েক শতক পরেও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সেই যুক্তিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। আর্য-প্রভাব যখন মগধের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলায় ঢুকছে, পাটলিপুত্রে তখন গুপ্ত বংশের রাজত্ব, তখন বাংলার সব রাজা এবং রাজপুত্রের কাছেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব ছিল অবশ্য পাঠ্য। এর জন্য অবশ্য ধন্যবাদ প্রাপ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদেরই।

শক্ত হাতে একজন কেউ হাল না ধরলে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, ভেঙে পড়বে নিয়মকানুন—এটাই ছিল রাজতন্ত্রের সমর্থনে সবচেয়ে বড় যুক্তি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, একসময় রাজ্য বলে কোনও জিনিসই ছিল না। সেই যুগে প্রতিটি মানুষই সুখে জীবনযাপন

করত। তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয় এবং পাপের উদয় হয়, তখন শৃঙ্খলা আনবার জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করে আর উপায় রইল না (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ১৯৭)। একদা দেশ যে রাজাহীন ছিল, সে কথার উল্লেখ আছে মহাভারতের শান্তি পর্বে। সেখানে বলা হচ্ছে, 'একদা সেখানে কোনও শাসক শ্রেণি ছিল না। ছিল না রাজা, দমনকারী এবং দমিত। শুভবুদ্ধি থেকেই লোকে একজন আরেকজনকে দেখত' (গাঙ্গুলি, কিশোরীমোহন, মহাভারত, ১৯৯৩, খণ্ডত, শান্তিপর্ব, খণ্ড ২ : ১২২)।

কিন্তু এই চিরসুখী অবস্থা চিরস্থায়ী হয় না, লোকেরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করে। তারা ক্রমশ লোভী হয়ে উঠতে থাকে; তাদের যা নেই তা পাওয়ার চেষ্টা শুরু করে। আরেক ধরনের আবেগও আশ্রয় করে, যার নাম লালসা। লালসার সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় ক্রোধ এবং ক্রোধ থেকে বুদ্ধিনাশ। প্রাজ্ঞ ভীষ্মের মতে যা অনিয়ন্ত্রিত যৌন প্ররোচনার উৎস (গাঙ্গুলি, কিশোরীমোহন, মহাভারত খণ্ড ৩, ১৯৯৩)। সুতরাং সেখানকার অর্থনীতি ও সমাজের পতন ঠেকাতে রাজার নেতৃত্বে শক্তিশালী সরকার গঠন করতেই হয়। রাজতন্ত্রের পক্ষে মৎস্যপুরাণ-এর যুক্তি হল, রাজা না থাকলে দেশে অনাচার শুরু হয়, দুর্বলরা ধ্বংস হয়, বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলতে থাকে অর্থাৎ দুর্বল পীড়িত হয় সবলের হাতে। বিপথগামী হয়ে যাওয়ার কারণে রাজা ভেনাকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ ঋষিরা। কিন্তু এর ফলে দেশে অরাজকতা দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কা থেকেই ভেনার শরীর থেকে সৃষ্ট হয় রাজা পৃথুর (১০.৬-৭, ১৬৫.৩ কান্টাওয়ালা-র উদ্ধৃতি, ১৯৬৪ : ১০৩-০৪)।

কিংবদন্তি অনুযায়ী মনু ছিল প্রথম রাজা। কিন্তু প্রথমে মনু সিংহাসনে বসতে রাজি ছিল না। লোকেরা তাদের উৎপাদিত শস্যের একের ছয় অংশ এবং ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য ও সোনার এক দশমাংশ দিতে রাজি হলে, মনু সিংহাসনে বসে। এ থেকেই বোঝা যায় এক ধরনের সামাজিক চুক্তিই রাজন্য প্রথার জন্ম দিয়েছিল। রাজা, প্রজাদের স্বার্থ দেখত এবং বিনিময়ে প্রজারা আনুগত্য স্বীকার করত এবং রাজকর দিত। রুশোও ঠিক এই কথাটাই বলতেন (ক্লিসেন, হেনরি জে.এম.ও পিটার স্কালনিক, ১৯৭৮; গোপাল এল., ১৯৮০ : ৬১)।

বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের শুরুতে রাজাকে সম্ভবত নির্বাচন করা হত। কিন্তু নির্বাচন করত কারা? সেটা অবশ্যই আজকের মতো প্রাপ্তবয়স্কদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে হত না। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকা ছিল না। সম্প্রদায়ের মধ্যেকার কয়েকজন ক্ষমতাবান লোকই বেছে নিত কে রাজা হবে। কুলপতি, বিশপতি জাতীয় ক্ষমতাবান লোকেরাই যে রাজা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কুলিন পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই সাধারণত রাজা হিসেবে বেছে নেওয়া হত। তবে এর ব্যতিক্রমও ঘটত। যেমন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মাৎস্যন্যায় শুরু হলে বড়রা গোপালকে রাজসিংহাসনে বসায়[১১] (প্রসাদ, বেণী, ১৯৫৮ : ২৯, ৩৯, ৯৫; আলতেকার, এ.এস. ১৯৭২ : ৮০-৮১)।

দণ্ডের ধারণা

সরকারের প্রতীক ছিল দণ্ড। কারণ বিপথগামীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে দণ্ড বা লাঠিই ছিল ওষুধ (প্রসাদ, বেণী, ১৯৫৮ : ২৯, ৩৯, ৯৫)।[১২] মনু ঘোষণা করেছিলেন : 'প্রজাদের শাসন

করে দণ্ড, এই দণ্ডই আবার রক্ষা করে তাদের; যখন সবাই ঘুমোয় দণ্ড তখন অতন্দ্র। তাই পণ্ডিতদের মতে দণ্ড নিজেই হল ধর্ম'। রাজ্য শাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য ছিল : এর প্রয়োগের মধ্যেই আছে রাজনীতির বিজ্ঞান, উপযুক্ত হাতে পড়লে এ দিয়ে যা নেই তার দখল নেওয়া যায়, যা আছে তা আগলানো যায়, বৃদ্ধি পাওয়া জিনিস সংবক্ষণ করা যায়, যা আছে তার বৃদ্ধি ঘটানো যায়। তিনি আরও বলেছেন, বেদ, অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিজ্ঞান — এই তিন বিজ্ঞানের উৎস নিহিত আছে দণ্ডের মধ্যে (কাঙ্গল, আব.পি., ১৯৬৩, খণ্ড ২ : ১০-১১)।

কয়েক শতাব্দী পরে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের সম্রাট এটাকে আরও জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন 'স্বামী-স্ত্রী ঘনিষ্ঠতা, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক, যোগীর ইন্দ্রিয় দমন, নিচু জাত এবং উঁচু জাতের পার্থক্য, চাকরের যত্ন সহকারে প্রভুর স্বার্থরক্ষা করা—সব কিছুর মূলেই রয়েছে রাজার শাস্তির ভয় (টি.ডি. মহালিঙ্গম-এর গ্রন্থের উদ্ধৃতি)।' জাতিপ্রথাকে ধরে রাখা ছিল রাজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজাকে দেখতে হত প্রতিটি জাত যেন নিজেদের কাজকর্ম ঠিকঠাক করে, জাতপাতের নিয়ম না লঙ্ঘন করে। জাতপ্রথা না মানলে শায়েস্তা করত সদা তৎপর দণ্ড (মহালিঙ্গম, টি.ডি., ১৯৫৫ : ২৪)। ব্রাহ্মণদের ভক্তি এবং তাদের সেবা করা এবং বর্ণাশ্রমকে ধরে রাখাই ছিল রাজার সবচেয়ে বড় ধর্ম (মৎস্যপুরাণ, ২১৫.৫৮-৫৯ যুক্ত)।[১৩]

তবে কৌটিল্য এ বলেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে রাজাকে দণ্ডের ব্যবহার করতে হবে বিচক্ষণতার সঙ্গে। এর খুব বেশি ব্যবহার আতঙ্ক তৈরি করে, খুব কম প্রয়োগে তৈরি হয় অরাজকতার। দণ্ডের ভয় না থাকায় সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার চালাতে পারে (কাঙ্গলে, আর.পি., ১৯৬৩, খণ্ড ২ : ১০-১১)। সুরক্ষিত শহর, শহরের বহিরাঞ্চল, খনি, সেচকার্য, অরণ্য, পশুপাল ও বাণিজ্য পথ — অর্থশাস্ত্র মোটামুটিভাবে এই সাতটা ক্ষেত্র ঠিক করে দিয়েছিল কর আদায়ের জন্য। তবে জোরাজুরির ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছিল, রাজার উচিত পাকা ফলটা পাড়া। বণিকদের থেকে কর আদায়ের ব্যাপারে একই কথার উল্লেখ রয়েছে মহাভারতে।[১৪] মনুও বলেছেন, রাজার কখন ওই কর বসিয়ে নিজের প্রজাকে ধ্বংস করা উচিত নয় (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ২৬-৩৫)।

অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে রাজতন্ত্রের সমর্থনে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই 'বিশৃঙ্খলা' বলতে তাঁরা কী বুঝিয়েছেন, কী থেকে অরাজকতার সৃষ্টি এ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই বলেননি। কিন্তু তাঁদের মন্তব্যও তার প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, উদ্বৃত্ত ফসলই ছিল গোলমালের কারণ। ফসল বন্টনের ক্ষেত্রে কেউ লাভবান হত, কেউ হত না। যারা বঞ্চিত হত বা কম পেত, তারাই ঝগড়া-মারামারি শুরু করত। আর যারা বেশি পেত তারা তা প্রাণপণে আগলাবার চেষ্টা করত। রাজ্য তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সবাইকে সুশৃঙ্খল রাখত। রাজা ও তার মন্ত্রিসভাই এটা করত। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণরা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণিরই অংশ/(মৎস্যপুরাণ, ২১৫.৫৮-৫৯ যুক্ত)।

উদ্বৃত্ত খাদ্য : রাজ্য গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত

গোষ্ঠীগুলো যখন আকারে ছোট ছিল, তাদের চাহিদাও ছিল কম, প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনত। ফলে সকলে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকতে পারত (ক্লিসেন, হেনরি জে.এম.ও পিটার স্কালনিক, ১৯৭৮ :

১৮)। কিন্তু ঘুরে ঘুরে চাষ করার বদলে জঙ্গল পরিষ্কার করে যেই স্থায়ীভাবে চাষের প্রচলন হল, জমির আয়তন বাড়তে লাগল। বড় জমি চাষ করতে লোকও লাগত বেশি। এই সময়ে এক গোষ্ঠীর একজনের সঙ্গে আরেকজনের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। স্থায়ী চাষে বেশি খাদ্য উৎপাদন হত, লোকে মাথাপিছু বেশি খাদ্য পেত। এর ফলে লোকেদের স্বাস্থ্য ভালো হত, যার ফলে শারীরিক ক্ষমতা যেমন বাড়ত, বাড়ত যৌনকর্মও (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৭৫ : ৫১, ১৩৬)। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থান সঙ্কুলানের জন্য জমির পরিমাণ আরও বাড়াতে হত (ক্লিসেন, হেনরি জে.এম. ও পিটার স্কালনিক (সম্পা), ১৯৭৮ : ১৩)।

বাসস্থানের পরিধি যেনতেন প্রকারে বাড়াতে গিয়ে শুরু হল সীমানা যুদ্ধ (থাপর, রমিলা, ১৯৮৪ : ১৫৭)। ফলত দাসপ্রথা তৈরি হল, জিতে নেওয়া জায়গাগুলোর নিয়ন্ত্রণ আর এক বংশের হাতে থাকত না (ক্লিসেন ও স্কালনিক (সম্পা) ১৯৭৮ : ৭)। পরাজিত লোকজনেদের আর নির্দিষ্ট কোনও উত্তরাধিকারী থাকত না। নানাভাবে তারা নানা গোষ্ঠীর মধ্যে মিশে যেত। রাজ্যই হয়ে উঠত এই বহুত্বের প্রতিপালক এবং এর ফলেই গোষ্ঠীগুলি তাদের সমতা হারিয়ে ফেলে। উপজাতি জনপদগুলো আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকত। (থাপর, রমিলা, ১৯৮৪ . ১৫৮)। কিন্তু বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি সামগ্রিক গোষ্ঠী সংস্কৃতি গ্রহণ না করেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া হলে রাজ্য তা মিটিয়ে দিত। শাসক শ্রেণির সংস্কৃতি অর্থাৎ বৃহত্তর সংস্কৃতির সঙ্গেই বিরাজ করত অসংখ্য উপ-সংস্কৃতি বা অন্য কোনও ছোট মাপের সংস্কৃতি। এই দুই সংস্কৃতির মিলনেই তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সার্বজনীন সংস্কৃতি (কোহেন, রোনাল্ড, ১৯৭৮ : ৬০, ৬৫-৬৬)।

একটা ব্যাপার খুব মজার যে, রাজ্য গঠনের জন্য শাসকশ্রেণি যে দমনমূলক নীতি অবলম্বন করে, তার কথা ধ্রুপদী ভারতীয় সাহিত্যে যেমন আছে, তেমনই মার্কসবাদেও আছে। কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য হল প্রথমটার ক্ষেত্রে একে নানাভাবে সমর্থন করার চেষ্টা আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা শ্রেণি শাসনের অন্যতম পন্থা বলে এর নিন্দা করা হয়েছে।

রাজার ঐশ্বরিক অস্তিত্ব

ধ্রুপদী সাহিত্যগুলোর মোদ্দা কথা ছিল, রাজ্য হল দমনকারী যন্ত্র। এটা যত মজবুত, শক্তিশালী হবে তত ভালোভাবে রাজা রাজ্য দেখতে পারবে। এটাই ছিল মূলনীতির ধর্মনিরপেক্ষ দিক। রাজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে পৃথিবীতে রাজা ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি, অরাজকতা দেখা দিলে ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে সে-ই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ · 14-15, ৩১; লুই, ড্যুমন্ট, ১৯৭০ : ৭১)। মৎস্যপুরাণের মতে, ব্রহ্মা নানা ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন 'দণ্ড'কে প্রয়োগ করতে (কান্টাওয়ালা, এস.জি., ১৯৬৪ : ১০৪)। রাজার যতই দেবত্ব থাক, সে যদি অযোগ্য, অত্যাচারী হয়, তার বিরুদ্ধে প্রজা-বিদ্রোহও অনুমোদন করা হয়েছে পুরাণে। উদাহরণ হিসেবে রাজা ভেনার কথা বলা যায়। তার অধার্মিক আচরণ, জাতিপ্রথা ভাঙবার চেষ্টা ধর্মাত্মাদের এতটাই রুষ্ট করেছিল যে, তারা তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে এবং তার জায়গায় সিংহাসনে বসায় তার পুত্র পৃথুকে (মৎস্যপুরাণ, ১০.৪)। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকা থাকছে না, যা করার করছে তাদেরই মধ্যেকার একদল

ধর্মাত্মা ব্যক্তি (আলতেকার, এ.এস., ১৯৭২ : ৯০-১০১)।

এই ধরনের বিদ্রোহের ঘটনা অবশ্য খুবই কম। সাধারণভাবে প্রজারা রাজাকে মান্য করে চলত। পাশাপাশি রাজাও উপজাতি সভা এবং সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত নিত। রাজা এবং পুরোহিত শ্রেণির মধ্যে একটা আঁতাত গড়ে উঠেছিল। পুরোহিতের সাহায্যে রাজাকে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল। যদিও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পুরোহিতরাই ছিল সর্বেসর্বা। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপারে তারা রাজার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা সব সময় এক জোট হয়েই থাকত (ড্যুমন্ট, লুই, ১৯৭০: ৬৫)। ক্ষত্রিয় নয় এমন শাসকরাও এটা অনুসরণ করত। আমরা দেখেছি, কোনও উপজাতি গোষ্ঠীপতি জয়লাভের পর পুরোহিতদের ডেকে পাঠাত। এই পুরোহিতরাই জমিজমার বিনিময়ে রাজার ক্ষত্রিয় কুলপঞ্জি তৈরি করে দিত। আদি পুরুষ হিসেবে ধরা হত কোনও দেবতাকেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আদিপুরুষ নির্বাচন করা হত শিবকে।

দণ্ডকে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্যই রাজার দেবত্ব আরোপ করা হত। সরাসরি দমন-প্রক্রিয়ার চেয়ে এটা আরও কার্যকর ছিল, লোকে সহজেই রাজাকে মেনে নিত। কারণ রাজা সাধারণ মানুষ ও নিয়মনীতির উর্ধ্বে। ফলে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। অনুগত সমাজেই প্রধানকে কিছু কিছু জাদুকরি কাণ্ড ঘটাতে হত এবং মৃতদেহ নিয়ে তপস্যা করতে হত (কোহেন, রোনাল্ড, ১৯৭৮ : ৬২-৬৪)। দেবত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকিও ছিল। রাজার দৈব ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম ছিল বৃষ্টি নামানোর ক্ষমতা। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি নামানো ছিল তার চরম পরীক্ষা। ব্যাপক খরা হলে লোকে ধরে নিত ঈশ্বরের রাজার ওপর আস্থা নেই অথবা ঈশ্বর রাজার কোনও কাজে অসন্তুষ্ট। খরা সেই পাপের শাস্তি। এ ব্যাপারে ভারতীয় রাজাদের মতোই অবস্থা ছিল পৃথিবীর অন্য দেশের রাজাদের। পূর্ব আফ্রিকার রাজাদেরও বৃষ্টি আনয়নকারী বলে ধরে নেওয়া হত (সাউদল, এ.ডাব্লু., ১৯৫৩ : ৯৫; ড্যুমন্ট, লুই, ১৯৭০ : ৭৩; প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৬৯)।

দণ্ডের কর এবং ব্যয়

দণ্ডকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন হত অর্থের। তাই রাজতান্ত্রিক ভাবনায় অর্থের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে রাখা হত।[১৫] উৎপাদিত শস্যের একের ছয় শতাংশ, গবাদি পশুর এক পঞ্চমাংশ পড়ত রাজার ভাগে — এই ছিল অর্থ শাস্ত্রের নিধান। দমন-যন্ত্র, যেমন পুলিস, সেনাবাহিনী এবং আমলাদের পুষতে হত নগদ বা অন্য কিছুতে আদায় করা কর থেকে। আমলাদের নগদ টাকা দিতে হত (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ১-৬, ১০, ৪৫, ৪৯)। এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির রাজকর্মচারীদের মাইনের ফারাক হত আকাশ-পাতাল। নিচু শ্রেণির কর্মীরা যেখানে পেত বছরে ৪০ পান, উচ্চশ্রেণিরা পেত ৪৮০০০ পান (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৬৫ : ১৫৩)।

রাজন্যপ্রথা শুরু থেকেই ছিল দমনমূলক এবং শোষণকারী। রাজার ভাগ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনও নীতির বালাই ছিল না। বণিকদের কর দিতে হত নগদে, চাষীদের উৎপাদিত শস্যের ভাগ দিতে হত। এ ছাড়াও বলি দেওয়ার জন্য পশুও সংগ্রহ করা হত। যজু সংহিতায় রাজাকে বলা হয় প্রজাদের খাদক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বৈশ্যদের সম্বন্ধে

বলা হয়েছে, এরা অন্যের জন্য নিজেকে বলি দেয়, অন্যের খাদ্য হয়, এবং স্বেচ্ছায় অন্যের অধীন হয় (৭,২৯)। ব্রাহ্মণরা অবশ্য 'বলি' থেকে ছাড় পেত। 'বলি' বলতে যজ্ঞবেদিতে পশুহত্যা বোঝালেও, এক্ষেত্রে বলির অর্থ হল কর বা রাজস্ব (ঘোষাল, ইউ.এন. ১৯৭২ : ১১-১২)। নানা ধরনের কর ছাড়াও রাজার নিজস্ব খামার থেকেও আয় হত। আমরা আগেই দেখেছি এই জমিকে বলা হত, 'সীতা'। এই সীতা জমির অনুপাত এতটাই বেশি হত যে, গ্রিকরা ভেবেছিল রাজাই বুঝি সমস্ত জমির মালিক (কোসাম্বি, ডি.টি., ১৯৬৫ : ১৪৮-১৪৮)। জোর করে কাজ করানোর প্রথা তখনও চালু না হলেও, যারা জঙ্গলে পশু চরাতে যেত তাদেরও রাজাকে কর দিতে হত। কারণ রাজাই তাদের নিরাপদে জঙ্গলে যেতে দিচ্ছে (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ৫০-৫১)। মনুর আদেশ ছিল, যন্ত্রবিদ, কারিগর এবং শূদ্রদের প্রতি মাসে একদিন রাজার জন্য কাজ করা উচিত (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৮০)। প্রাচীর ঘেরা শহর ছিল কর আদায়ের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র।[১৬] রাজস্ব বাড়ানোর জন্যই জমির পরিমাপ করার দরকার পড়ত। এই কারণেই বাংলার সেন রাজারা নল দিয়ে জমি জরিপ করত (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ৩৪৯)।

রাজ্যের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ভূমিকা

রাজ্যের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি, ধর্ম অথবা অঞ্চল ভিত্তি করে যে সীমানা নির্ধারিত ছিল, তা মিলিয়ে যেতে থাকে। প্রজাদের কাজকর্ম এবং লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এক সার্বজনীন রাজ্যনীতি অনুসারে। ইতিমধ্যেই অষ্টম শতকের মাঝামাঝি চলে আসে পাল রাজত্ব। তার চার শতক পরে পুরোপুরি আমলাতন্ত্র ভিত্তিক সামন্তরাজ[১৭] শুরু হয়ে যায় সেন রাজাদের আমলে। তবুও সেই সময় রাজতান্ত্রিক সামন্ত রাজ্যগুলো সব জায়গায় একই রকম শক্তিশালী ছিল না। মনে হয়, প্রত্যেকেরই নিয়ন্ত্রণের একটা কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল, যেখানে প্রত্যক্ষ নজরদারি চলত, প্রয়োগ করা হত সার্বজনীন আইন। পাশাপাশি দূরবর্তী কিছু অঞ্চল ছিল যেমন, অরণ্য অঞ্চল, সেখানে রাজশাসন অতটা আঁটোসাঁটো ছিল না। ওই জায়গাগুলো উপজাতি প্রধানরাই নিজেদের মতো করে শাসন করত। যদিও রাজা বা সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্য থাকত। বিদ্রোহী কৈবর্ত্য রাজের সঙ্গে লড়াইয়ে ভীম, রামপাল তাদের সাহায্য নিয়েছিল।

রাজাকে ন্যায়বিচারের প্রতিভূ বলে মনে করা হত। বহু বিবাদের মীমাংসা তাকেই করতে হত। বাংলার রূপকথার বহু গল্পেই দেখা যায় যে, লোকেরা রাজার কাছে বিচার চাইতে গেছে। এ ব্যাপারে বাংলার রাজাদের সঙ্গে অন্য জায়গার রাজাদের কোনও প্রভেদ ছিল না। এমনকী, সলোমনের মতো রাজাও ছিল। অন্য বিচারকেরাও ছিল। তারা রাজার অবর্তমানে বিচার করত বা জেলাশহর বা ওই জাতীয় দূরবর্তী জায়গায়, যেখানে রাজা স্বয়ং যেতে পারত না, সেখানে অন্যরা বিবাদ মেটাত। ছোটখাটো অপরাধ আঞ্চলিক স্তরেই মিটিয়ে ফেলা হত। কিন্তু বড়সড় অপরাধের বিচার হত রাজসভায়। বিচারকাজে রাজাকে সহায়তা করত একদল আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণ। একদম নিচু স্তরে কুল (বংশ পরিচয় সূচক) আদালতও ছিল। অপরাধের মাত্রা সম্ভবত খুবই কম ছিল। সেজন্যই স্মৃতিতে হাজত-আধিকারিক জাতীয় কারো উল্লেখ নেই (আলতেকার, এ.এস., ১৯৭২ :

২০৩, ২৪৭-২৫১)। ধর্মসূত্র এবং অর্থশাস্ত্রের নিধান মেনেই বিচার হত। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই যে, ওই সময়ের আইনে সমানাধিকার বলে কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করার জন্য শূদ্রের হাত কেটে নেওয়া হত, কিন্তু বিপরীতক্রমে ব্রাহ্মণের বেলায় তা ঘটত না। বর্ণ, জাতি এসব মেনেই বিচারক তার রায় দিত। বিচারব্যবস্থাটা এমনই ছিল (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ১২১)।

'গ্রামিক' বা গ্রামপ্রধান নির্বাচিত হত বংশানুক্রমে। তাকে বিভিন্ন নথিপত্র রাখতে হত, হিসেব রাখতে হত কে কত পাবে। চাষবাস থেকে শুরু করে নানা ধরনের কাজের আয়োজন করতে হত, দুর্ভিক্ষ হলে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হত, আর গোলমাল মেটানোর কাজ তো ছিলই। গ্রামিককে স্থানীয়ভাবে একজন হিসাবরক্ষক সহায়তা করত , পরামর্শ দিত গ্রামের প্রবীণরা, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকার তো ছিলই। গ্রামিককে গ্রামের নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হত।

রাজ-ব্যয়

মৎস্যপুরাণ (২২০.১৯), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য নথিপত্রে রাজ-ব্যয়ের মোটামুটি সাতটি মূল ক্ষেত্র ছিল। সেগুলো হল : রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, রাজকোষ, দণ্ড এবং মিত্র রাজ্য (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ১২৭-১৪৯)। সৈন্যদলের মধ্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, হাতি তো ছিলই, থাকত বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার। ফলে বিশাল সৈন্যদল পুষতে রাজকোষের অর্ধেকটাই খরচ করতে হত (আলতেকার, এ.এস., ১৯৭২ : ১৯৫; মহালিঙ্গম, টি.ভি., ১৯৫৮ : ১৯৬)।এর সঙ্গে ছিল গুপ্তচর। গুপ্তচররা আশপাশের রাজ্যের খবরাখবর রাখত। নিজের রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে বিশেষত সরকারি কাজে জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটছে সে খবরাখবর গুপ্তচর নিয়মিত পৌঁছে দিত রাজার কানে। রাজকার্যের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুপ্তচরদের সম্পর্কে শান্তিপর্বে ভীষ্ম একথা বলেছেন, কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রেও উল্লেখ করেছেন (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৫১)।[১৮]

এর পরেই ব্যয়বহুল ক্ষেত্র ছিল আমলাতান্ত্রিকতা রক্ষা। সামন্ত প্রথার বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এই খাতে খরচও বাড়তে থাকে। এই খরচের মধ্যে পড়ত রাজ রন্ধনশালা, ভাঁড়ার, কর্মশালা ও পণ্যদ্রব্যের গুদাম। অর্থশাস্ত্রের সময় আমলাতন্ত্রের বিস্তার ছিল ভালোই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হল : প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি, সমাহর্তা (কর-সংগ্রহ কর্তা), সন্নিধাতা বা কোষাধ্যক্ষ, প্রধান বিচারপতি এবং ভাণ্ডার-কর্তা। সরকারি কর্মীদের অনেককেই কর দিতে হত না। সে সময় খনি, জমিজমা, হাতি, পুরোহিত এবং হিসাব দেখাশোনার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। কৌটিল্য আমলাদের মধ্যে বদলি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গ্রামসভার হাতে ক্ষমতা দেওয়ারও বিরোধী ছিলেন তিনি (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ১২৭-১৪৯)।

তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খরচ হত বেশি তার মধ্যে ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, যেমন ঈশ্বর এবং পূর্বপুরুষের পূজা, ব্রাহ্মণদের দানধ্যান। এছাড়াও ছিল দুর্বল, বয়স্ক অসহায় এবং দুর্ভিক্ষ বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন। খরার সময় জনগণকে খাদ্য এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ছিল শাসকদের অন্যতম কাজ। মৌর্য আমলে যে বছর ভালো ফসল হ[illegible] সেই ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ 'কোষ্ঠাগলস' বা বিশেষ গুদামে অসময়ের জন্য মজুত

রাখা হত (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১)। গৃহপালিত পশু, পাখি, সাপ ছাড়াও জোর করে নিযুক্ত শ্রমিকদের শিবিরের জন্যও কিছু খরচ করতে হত। বিভিন্ন জলাশয়, জলাধারগুলোর দেখাশোনা, নির্মাণের জন্য একজন কর্তা থাকত, এছাড়া নদী দেখাশোনার জন্য নদীপাল তো ছিলই। এই ব্যাপারটায় শাসকরা খুবই গুরুত্ব আরোপ করত (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ২২৯-২৩১)।

বহু আগেই এটা বোঝা গিয়েছিল যে, দণ্ড এবং জাতিভেদ প্রথা দিয়ে শাসকরা নির্বিঘ্নে শাসন চালাতে পারবে না। তাই শাসকদের নানা উন্নয়নমূলক কাজও করতে হত। জমি অধিগ্রহণ করে, তাকে সমান করে, চাষবাসের উপযুক্ত করে দেওয়া — মহাভারত অনুযায়ী, এটা ছিল রাজার জনপ্রিয়তা অর্জনের কার্যকর উপায়। পাশাপাশি জলাশয় বা হ্রদখনন এবং চাষীদের বীজ ধার দেওয়া হত। আগুন, বন্যা, সাপ, বাঘ, ইঁদুর, রোগ এবং রাক্ষসের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিতে হত রাজাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার ব্যাপারটাও গুরুত্ব পেত। দানধ্যান অনুমোদন পেলেও প্রচণ্ড সঙ্কট ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি অনুমোদন পেত না। সেচ এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন — এই দুটো ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপের পরামর্শ দিয়েছে অর্থশাস্ত্র। খরার বছরে অর্ধেক দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৪৫-৪৬, ১১৪-১১৭)।

রাষ্ট্রশক্তি, ওরিয়েন্টাল ডেসপোটিজম ও হাইড্রোলিক সমাজ

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার শাসকরা অনেক বেশি প্রজানুরঞ্জক ছিলেন। সুয়োরানি এবং দুয়োরাণির উল্লেখ থাকলেও বাংলার রূপকথাতেও অত্যাচারী রাজার কথা খুবই কম।

বাংলার সমাজকে 'জলগতিকেন্দ্রিক' (হাইড্রলিক) বলা যায় না। এখানকার সংঘবদ্ধ সেচকার্য চালানোর জন্য 'ওরিয়েন্টাল ডেসপোটিক' সরকার গঠনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। ওই ব্যাপারটা প্রধানত আফগানিস্তান, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো অনুর্বর অঞ্চলের ক্ষেত্রেই ছিল যথাযথ। এখানে শক্তিশালী এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অধিষ্ঠিত সরকারই পাহাড়ি ঝরনা অথবা ভূগর্ভস্থ নদীর মতো জলের উৎস থেকেই সমতলে জল এনে দিতে পারত। এটাকে গড়ে তোলা বা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আশপাশের বড় বড় গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ লোককে নিয়োগ করতে হত।

জলপ্রবাহের জন্য তারা যে ভূগর্ভস্থ নালা তৈরি করত সেগুলো প্রতি বসন্তে বরফ গলে গিয়ে এবং জলের তোড়ে ধুয়ে যেত। ফলে প্রতি বছর এর ব্যাপক মেরামতির দরকার পড়ত। যারা এই কাজ করত, তাদের এই কাজের সঙ্গে সরাসরি নিজেদের স্বার্থের তেমন একটা যোগ থাকত না। ফলে তারা যে স্বেচ্ছায় এ কাজে হাত লাগাত, এমন নয়। ফলত জীবনদায়ী এই কাজ চালু রাখতে প্রশাসনকে কিছুটা জোর খাটাতেই হত। তার মানে এ নয় যে, সব বড় আকারের সেচ কার্যই সার্বভৌমত্বের জন্ম দিয়েছিল। তবে হাইড্রোলিক ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখতে ওরিয়েন্টাল ডেসপোটিক শাসনের প্রবণতা থেকেই যায় (মার্কস, কার্ল, ১৮৫৩ : ৭১-৭২; উইটফোগেল, কার্ল, এ, ১৯৭৫ : ১২,

৩৭৩-৩৭৪, ৩৮৩)।

বাংলায় অসংখ্য নদীনালা, তার ওপর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত তো রয়েছেই। ফলত এখানে ওই ধরনের বিস্তৃত সেচব্যবস্থার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সারা বছরই বৃষ্টির জল পাওয়া যেত। তাই বড় ধরনের সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হত না। ছোটখাটো সেচকার্য বা রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে কিছু মজুর জোর করে বা পয়সা দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া ব্যাপারটা আদৌ যে ঘটত না, তা নয়। কিন্তু তার পরিধি ততটা ছিল না যে একটা শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে দেখা দেবে। বহু অনুর্বর অঞ্চলে যে ওরিয়েন্টাল ডেসপোটিজম শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা বাংলায় কখনও দেখা যায়নি। তবুও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, সেচকার্যের ব্যাপারটা শাসকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৯] তাদের তাই বাঁধ, জলাধার ইত্যাদি তৈরি করতে হত। মার্কসের মতে সরকারি পর্যায়ে সেচকার্যই ছিল অন্যতম মুখ্য বিভাগ। অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হল গৃহমন্ত্রী, যার প্রধান কাজ ছিল কর আদায় এবং যুদ্ধমন্ত্রী, যাকে যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারটাকে দেখতে হত। সেচ ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল খুবই উচ্চমানের। এর জন্য পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন হত। এই কাজে বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নেওয়া হত (উইলকক্স, উইলবার, ১৯২৮)।[২০]

বাংলায় সামন্ততন্ত্রের উত্থান

বাংলায় উপজাতি গোষ্ঠী এবং তা থেকে রাজ্য ব্যবস্থার অন্তর্বর্তী পর্যায়গুলো ঠিক কীরকমভাবে হয়েছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট টুকরো অঞ্চল থেকেই রাজ্যের উৎপত্তি। এই টুকরো অংশগুলোয় একই বর্গের লোকজনের বাস ছিল। ছোটছোট দলগুলোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন চালু ছিল। বড় অঞ্চলে, যেখানে বিভিন্ন বর্গের লোকজন একত্রে থাকত, কিছু সার্বজনীন আইন মেনে চলা হত। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ছোট অংশগুলোই হয়ে ওঠে সামন্ততান্ত্রিক। যার মূল প্রোথিত ছিল কৃষিকাজে এবং জমিদারিতে, ছিল বড়সড় আমলাতন্ত্রও। বাজারি লেনদেনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই পরিবর্তন আসেনি। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমি অন্যাকে বিক্রি করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, তবে এটা ঘটত প্রশাসনের মাধ্যমে। শাসকের হিতের জন্য যে ব্রাহ্মণদের দিয়ে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করানো হত, তাদের জমিদান করার রেওয়াজ তখন ভালোরকমই ছিল (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৭০-২৭১)।

জমি বিক্রি বা দানের প্রমাণ হিসেবে তামার ফলক পাওয়া যায়। ওই তামার ফলকে কখন কাকে জমি দেওয়া হয়েছে তা লেখা থাকত। এ থেকে রাজ্য কাঠামোর বিবর্তন, এর আমলাতান্ত্রিক পরম্পরা, আঞ্চলিক বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্থানীয় বয়স্কদের (কাউন্সিল অফ এলডারস) ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা বোঝা যায়, পাশাপাশি আমলাতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত এবং রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধিরও প্রমাণ মেলে।

মৌর্য আমলে রাজ্য কাঠামো কেমন ছিল সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। মহাস্থান, বগুড়া থেকে ওই সময়ের যে প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, তাতে 'মহামাত্র'

নামে এক সরকারি পদের উল্লেখ আছে এবং সেই সঙ্গে যে সব উপদেশ আছে, তাতে বোঝা যায় মৌর্যশাসিত ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর মধ্যে কাঠামোগত সাদৃশ্য ছিল (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৬৪)। গুপ্তযুগের যে প্রচুর সংখ্যক তাম্রলিপি পাওয়া গেছে, তা থেকে সেই সময়ের শাসনপ্রণালীর সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এতে সবচেয়ে যে বড় অঞ্চল তাকে বলা হয়েছে 'ভুক্তি'। সম্ভবত এটা হল কোনও প্রদেশের সমতুল। এরপর ছিল—বিষয় (জেলা), মণ্ডল, বীথি এবং গ্রাম (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৬৫)।

তাম্রলিপি থেকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি এবং দণ্ডভুক্তি—এই তিনটি ভুক্তির কথা আমরা জানতে পারি। এর প্রথমটা উত্তরবঙ্গকে বুঝিয়েছে। পরের দুটো পশ্চিমবাংলা, রাঢ় অঞ্চল। বর্ধমানভুক্তি সম্ভবত এখনকার বর্ধমান এবং দণ্ডভুক্তি হল মেদিনীপুরের জেলা শহর দাঁতন। কোনও কোনও মতে, দাঁতনকে ভুক্তি বলা হলেও আসলে ওটা ছিল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এক মণ্ডল।

বর্ধমান যে ভুক্তি ছিল, তার পক্ষে প্রমাণ পাওয়ার পর, গ্রিক নথিতে গঙ্গারিদাই বলে যে অঞ্চলের উল্লেখ আছে, তা যে অজয়ের কাছাকাছি বর্ধমানেরই কোনও অঞ্চল, সেই দাবিরও সমর্থন মেলে। পাশাপাশি জানা যায়, দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল তাম্রলিপ্তর বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর। রাজা শশাঙ্ক এই দণ্ডভুক্তি থেকেই দু-দুটি মুদ্রার প্রচলন করেন। তাম্রলিপিতে চতুর্থ একটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার সদর দপ্তরের নাম ছিল 'নব্যবকসিকা', কিন্তু সেই জায়গাটা যে ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় না (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৭১)।[২১] সেন আমলে কঙ্কগ্রাম নামে আরেক ভুক্তি গড়ে ওঠে। এটা সম্ভবত মুর্শিদাবাদ-সহ রাঢ়ের উত্তর অংশ এবং কজঙ্গল এবং রাজমহল-সহ পুণ্ড্রব দক্ষিণাঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল। এই ভুক্তিটা সম্ভবত বর্ধমান ভুক্তি ভেঙেই তৈরি হয়ে থাকবে (মজুমদার, রমেশও বসাক, রাধাগোবিন্দ ১৯৭১, ২৭১, ২৭৮)। পরের পর্যায়ে এই বিভাজনগুলো কিছুটা দ্ব্যর্থক। তবে সব সময় না হলেও 'বিষয়' ছিল 'মণ্ডলের' ওপরে।

আঞ্চলিকস্তরে দেখাশোনার দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানের ওপর থাকত তাকে বলা হত 'অধিকরণ' (ওই, ২৭১, ২৬৫-২৬৬)। সব অধিকরণই যে একই রকম ছিল, তা নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে, লোকসংখ্যার তারতম্যে অধিকরণের চেহারাও অন্যরকম হত। প্রাচীন লিপি থেকে দুটো অধিকরণের কথা জানা যায়, যার প্রধান হল 'কায়স্থ'। এই কায়স্থ বলতে বর্ণ বোঝাত, না, যে প্রধান করণিক তাকে বোঝাত অবশ্য সে ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। সমসাময়িক কবি শূদ্রকের সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ উল্লেখ আছে, সংঘ সভাপতি এবং প্রধান করণিক অধিকরণকে সাহায্য করত। কোনও কোনও লিপিতে বলা হয়েছে প্রধান কারিগর, অগ্রণী ব্যবসায়ী, সংঘ-সভাপতি এবং মুখ্য করণিকরা ছিল অধিকরণের সদস্য (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ২৬৮-২৬৯; প্রসাদ, বেণী : ২৭২)।

মৃচ্ছকটিকে অধিকরণের বিচারের দৃশ্য আছে। এ থেকে অনুমান করা হয়, এটা কোনও অঞ্চলের কার্যনির্বাহের পাশাপাশি, অপরাধ বিচারের আদালত হিসেবেও কাজ করত (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১, ২৬৬-২৬৭)। ওই সময়ে প্রবীণদের সমিতি 'মহাত্তারা' ও তাদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিত। ওই সময়ে

'পুস্তপাল'রা সমস্ত নথিপত্র রাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করত। কোনও জমি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে পুস্তপাল তার নথিপত্র যাচাই করত। তাম্যপত্র ছিল মালিকানা নির্ণয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যাচাই করে নেওয়ার পর পুস্তপাল ছাড়পত্র দিত, জমির মালিককেও তাকে পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিতে হত। এমনটা হতে পারে, কিছুটা নিচু পদের হলেও মহাত্তারা শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থও দেখত। তবে এর পক্ষে তেমন জোরদার প্রমাণ মেলে না। মনুস্মৃতি অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামেরই একজন প্রধান (গ্রামিক) থাকত। অনেক সময় ১০, ২০, ১০০ বা ১০০০ গ্রামের জোটেরও একজন গ্রামিক থাকত। প্রাচীন লিপিতে ১০টি গ্রামের একজন প্রধান থাকার উল্লেখ আছে (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৬৫: ১৪৯; মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১)।

'পালসাত্রিকদাক'য় পাওয়া এক তাম্রলিপিতে গ্রামীণ প্রশাসনকে মহাত্তারা, অষ্ট কুলাধিকরণ, গ্রামিক এবং গ্রামবাসী (কুটুম্বিন) — এই চারভাগের কথা বলা হয়েছে। আটটি কুল[২২] অথবা আটজনকে নিয়ে গঠিত স্থানীয় আদালতের দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত অষ্টকুলাধিকবণ-এর ওপর। লিপি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একের ছয় অংশই ছিল রাজহিতে, এর ব্যয় বহন কবত রাজাই (মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৭০:১২৮)

ধর্মাদিত্য-য় পাওয়া লিপিতে 'বিষয়াধিপতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। যার হয়ে কাজ করত অধিকরণ। 'বিষয় মহাত্তারা'দের অবহিত রাখা হত। 'ধর্মাদিত্য বি' লিপি জানাচ্ছে, অভিযোগকারীরা যেত গ্রামীণ প্রশাসনের অধিকরণ বিষয়-এ। এটাতে থাকত প্রবীণতম কায়স্থ, ন্যায়সেনা এবং কিছু পুরোধা মানুষ। এ ও বি, দুটি লিপিতেই বলছে, 'কুল্য' জমির দাম ঘোষণা করার পর অধিকরণ তাকে পাঠাত পুস্তপালের কাছে, জমির সীমা এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য। নির্দিষ্ট মূল্য দিলে জমি হস্তান্তরিত হত (মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৭০ : ১৩৩)। একাধিক জমির অনুমোদনের সময় ব্যাপারটা একই রকম ছিল।

নন্দপুরে পাওয়া লিপি থেকে জানা যায়, বিষয়পতি করমুক্ত গ্রামের অধিকরণকে অর্থের বিনিময়ে জমি দেওয়ার জন্য বলে। অধিকরণ এ ব্যাপারে ছাড়পত্র নেয় হস্তপালের কাছে। ছাড়পত্র পেলে অধিকরণ অর্থ জমা নিয়ে জমির সীমারেখা চিহ্নিত করে দেয়। সম্ভবত এ সব ক্ষেত্রে গ্রামের প্রবীণদের দিয়েই তৈরি হত অধিকরণ। এই তাম্রলিপিতে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হল — এক ব্রাহ্মণ এক পরিত্যক্ত জমির জন্য জেলা আদালতে আবেদন দাখিল করে। প্রবীণদের সভা জানায়, জমিটা খন্দে ভরা, বুনো জন্তুতে ভর্তি। এই জমি থেকে রাজার কোনও লাভ হবে না, রাজস্বও পাওয়া যাবে না। তাই এটা ব্রাহ্মণকে দেওয়া যেতেই পারে। (এর সঙ্গে 'কানা গরু বামুনকে দান'-এর বিস্তর মিল পাওয়া যাচ্ছে।) অধিকরণে করণিকদের সরকারি সদস্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পরিত্যক্ত জমি দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে আছে, এমন কোনও কথা পুস্তপাল যে বলেছে, তার উল্লেখ ওই লিপিতে নেই (মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৭০ : ১৩৩)।

শাসকদের বিভিন্ন পর্যায়

একজন শাসক কতটা অঞ্চল শাসন করছে, তা দিয়েই সে কোন পর্যায়ের শাসক তা নির্ধারণ করা হত। এর সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় তার স্থানও বিবেচিত হত।

স্বাভাবিকভাবেই সার্বভৌম রাজ্যের শাসক পেত সর্বোচ্চ সম্মান। সার্বভৌম থেকে শুরু হয়ে উপাধি শেষ হত রাজা-য়। সার্বভৌম শাসককে বলা হত 'মহারাজাধিরাজ'। আরও অন্যান্য গালভরা নামও ছিল।[২৩] তারপর ছিল মহারাজা, রাজা ইত্যাদি। রাজার পরের যে সমস্ত পদ, তার সঙ্গে 'মহা' শব্দটা জুড়ে দেওয়া হত। যেমন মহাসামন্ত, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতিহার, মহাপিলুপতি ইত্যাদি। প্রশাসনের অন্যান্য বরিষ্ঠ পদাধিকারী ছিল কুমারামাত্য, উপরিল, আয়ুক্তক, দূতক, বিশ্বপতি ইত্যাদি (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৬৫-২৬৬)। রাজত্বের আযতনের সঙ্গে এই সব বর্গীকরণ থাকলে বোঝা যেত সেই সময়ে সামন্তরাজ্য হিসেবে তা কতটা উন্নত ছিল।

পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে জমির গড় মাপ ছিল ছোটছোট। সেগুলোকে স্থানীয় ভাবেই শাসন করা হত (মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৭০ : ১২৭)। সপ্তম শতকের গোড়ায় শশাঙ্কর মতো শক্তিশালী রাজাদের উত্থানে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। জ্ঞানীমণ্ডলী বা অধিকরণের সম্মতি ছাড়াই শাসকরা জমি অনুদান দিতে পারত। বৃহত্তর রাজ্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটা আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় বড় জমিকে টুকরো করেও বিলি হতে থাকে (মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৭০ : ১৩৯-১৪১, ১৪৭)।

এই জমি অনুদান মানে এই নয় যে, তখন গ্রামে কেনা-বেচার জন্য জমি পাওয়া যেত। তাম্রপত্রে লেখা জমিগুলো ছিল শহর অথবা আধা-শহর অঞ্চলে। জমি দেওয়া হত মূলত ধর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য অথবা ব্রাহ্মণদের।

পালযুগে প্রধানমন্ত্রী, যাকে মন্ত্রী বা সচিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। এই পদে বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণরাই বসত। একইভাবে লিপিতে যুবরাজ ও রাজপুত্রদের কথাও বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে স্বাধীন ছোট শাসক বা প্রজাতন্ত্রের চেয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এবং রাজবংশের উদ্ভবেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও প্রায় চার শতকের পাল রাজত্বের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নানা তারতম্য দেখা গেছে। প্রথম তিন পাল রাজার পর সম্ভবত আঞ্চলিক সামন্ত অথবা মহাসামন্ত অথবা রাজন, রাজন্যক, রাজানক এবং রানাকাস, যেভাবে নানা নামে তারা বর্ণিত হয়েছে, সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাতে মনে হয় এরা প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসন চালাত। লিপিতে তাদের ভাষাই তার প্রমাণ দেয় (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৭৩-২৭৫)।

পাল যুগে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল,[২৪] প্রশাসন পদ্ধতি আরও জটিল হয়ে ওঠার কারণে, যেমন রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত 'রাজাস্থানীয়', শান্তি ও যুদ্ধ বিভাগ দেখাশোনার ভার ছিল 'মহা-সন্ধিবিগ্রহ'র। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছিল অমাত্য অথবা রাজামাত্য। এছাড়াও 'দূত' পদ তৈরি হওয়া থেকেই বোঝা যায় রাজ্য আয়তনে, গুরুত্বে বাড়ছিল। রাজ্য রাজনীতিতে দূতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্গরক্ষক বা প্রধান দেহরক্ষী পদ থেকে বোঝা যায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হচ্ছিল। এরই সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ লোক নিয়োগ হত। যাদের বলা হত অধ্যক্ষ (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৭৭)। সেন রাজত্বে ধর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল খুব বেশি। এ ব্যাপারে পুরোহিতরাই ছিল মূল কার্যনির্বাহী, পাশাপাশি তারা মুদ্রা বিভাগের দায়িত্বও পালন

করত। তাদের বলা হয় 'মহা-মুদ্রাধিকারী'। পদবি হিসেবে বাংলায় এখনও এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'মহা সর্বাধিকারী' রীতিমতো প্রচলিত (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১)।

রাজস্ব এবং উদ্বৃত্ত

বড়সড় প্রশাসন চালাতে গেলে চাষীদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত ফসল আনার দরকার ছিল। চাষীরা যে তাদের কষ্টার্জিত ফসল স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়ে দিত এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ফলে বিপুল পরিমাণ ফসল আদায়ের জন্য বেশ বড়সড় পরিকাঠামোই গড়ে তুলতে হত। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রাজস্ব আদায় করতে বলপ্রয়োগের দরকার পড়ত। ভাগ, ভোগ (ফল, ফুল, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি নিয়মিতো জোগান) কর (সাধারণত সম্পত্তি কর), হিরণ্য (নগদ), উপরিকর (অস্থায়ী বসবাসকারীদের কাছ থেকে নেওয়া মাসুল) ইত্যাদি নানা খাতে সংগ্রহ করা হত রাজস্ব। বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তাদের যেমন বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, বীথিপতি প্রমুখদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার থাকত (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৭৭-২৭৮)।

চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসলের একের ছয় অংশ দিত। কাঙ্গলে সেটা যে সংগ্রহ করত তার নাম ছিল 'ষষ্ঠ আধিকারিক'। ভোগ জাতীয় কর আদায় করত 'ভোগপতি'। বিশেষ ধরনের কাজের, যেমন চৌরধারণিকা (চোরডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করা), সৌলিকা (আমদানি ও প্রবেশ কর সংগ্রহকারী), দশাপরাধীকারিক (ফৌজদারি অপরাধ করলে যে জরিমানা করে), তাইক (খেয়া পারাপারের ভাড়া সংগ্রহকারী) ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত করও রাজ্যবাসীকে দিতে হত। জমি জরিপ, বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিসি কাজের জন্যও একই ধরনের কর্তাব্যক্তি থাকত। সেন রাজত্বকালে সাপ্তাহিক হাট তত্ত্বাবধায়ক পদ 'হট্টপতি'র সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেন এবং বাংলার অন্য সব রাজাই রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মেনেই কাজ করত। এমনকি গোয়েন্দা ব্যবস্থাও সেখানে থেকে নেওয়া (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৮২-২৮৩)।

উৎপাদিত শস্যের একের ছয় শতাংশ কর হিসেবে দিতে হলেও, অনেক লিপি থেকেই জানা যায়, রাজার ক্ষমতা ছিল কর কম করার বা মকুবের। পাল রাজত্বে রাজস্ব নীতি সুসম ছিল না, ওই সময়ের তাম্রলিপি থেকে এ ব্যাপারে খুব বেশি জানা যায় না। মাৎস্যন্যায় নিয়মে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে সম্ভবত আরও অনেক ফড়ে জাতীয় লোক ছিল। পাল এবং সেন রাজারা রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নির্দিষ্ট মানে আনার চেষ্টা করেছিল[২৬] (গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪ : ৫৮৪)। পরিত্যক্ত জমি, সাধারণের রাস্তা এবং গবাদি পশু চলাচলের রাস্তা করের আওতায় না পড়লেও চাষের জমি ও অনাবাদী জমির করের আওতায় পড়ত, তা সে বাস্তু জমি হোক বা না হোক। অরণ্য অঞ্চল, বন অথবা বীটপ অনেক সময় [illegible]গের জন্য ছাড় দেওয়া হত (গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪ : ৫৮৫-৮৬)। সেন রাজত্বে ধান, অন্যান্য শস্য, বাগান এবং অন্যান্য চাষ, যেমন পান, সুপুরি ইত্যাদির জন্য আলাদাভাবে কর ধার্য হত। রাজকুমাররা তাদের ভাগের জমি থেকে পাওয়া রাজস্ব উপভোগ করত (গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪ : ৫৮৭-৫৯০)।

সেনাদল

পাল এবং সেন, এই দুই যুগেই সেনাদলের গুরুত্ব ছিল অসীম। সেনাপতি অথবা মহাসেনাপতির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান, যেমন পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও উট বাহিনী ছিল। ছিল কোটপাল (দুর্গরক্ষা), জাহাজ এবং প্রান্তপাল (কুচকাওয়াজ পরিদর্শক)। ধর্মপালের সময়ে গৌড়, মালব্য, খাস, কুলিক, হুন, কর্ণাট, লাট, বোল প্রভৃতি নানা উপজাতি থেকে লোক নিয়ে মস্ত সেনাদল গড়া হয়েছিল (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৭৮, ২৭৯)।

রণনীতির ব্যাপারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছিল দিগ্‌দর্শক। শত্রুশিবিরে গুপ্তচর দিয়ে বিরোধ লাগান, চুপিচুপি শত্রুশিবির ধ্বংস, গুপ্তঘাতকের সাহায্যে সেনাপ্রধানকে হত্যা, আগুন বা বিষ প্রয়োগ করা সমেত রাজ্যের সীমা কূটনীতির সাহায্যে নির্ধারণ, শত্রু শিবিরের অবস্থান জানা, পদাতিক, অশ্বারোহী ইত্যাদি দিয়ে আক্রমণ করা বা ঠেকান, এই সবই ন্যায্য বলে মনে করা হত। যুদ্ধের আগে শত্রুর সামর্থ্য নির্ণয়, দুর্বলতা জানা ইত্যাদি কীভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশিকা তা থেকে পাওয়া যেত (কাঙ্গলে, আর.পি. ১৯৬৩, খণ্ড ২ : ৪-৫)।

মোটামুটিভাবে বাংলায় শাসনের দুটো ভাগ পাওযা যায়। তাম্রলিপি এবং প্রশাসক-আমলাদের কাজের ধরন থেকে বাংলাকে পূর্ণবিকশিত সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য বলে মনে হয়। এটা কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় অংশের ছবি। তার বাইরে, মানে প্রান্তিক অঞ্চলে, বিশেষত অরণ্য অঞ্চলে, ছোটছোট গোষ্ঠী নিজেদের মতো আলাদা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পাল এবং সেন, দুই যুগেই এ ব্যাপারটা দেখা গেছে (সাউদল, এ, ১৯৮৮ : ৫২-৮২; চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ . ১৮৯)।

জমিদান, সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ

ব্রাহ্মণদের জমিদান করার ব্যাপারটা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই দানের চরিত্র নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। জমিটা বরাবরের জন্য ব্রাহ্মণদের হয়ে যেত, না কিছুকাল পরে আবার তা রাজার জমি হিসেবেই চিহ্নিত হত, এ ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। রক্ষাকারীর ভূমিকা পালনের জন্যই সম্ভবত রাজাকে রাজস্ব দেওয়া হত। অধিগ্রহণ বা দানের ব্যাপারে রাজ্যের সব জমির ওপরে রাজার অধিকার ছিল, না শুধুমাত্র রাজজমি 'সীতা'র ওপরে ছিল, সে ব্যাপারটা খুব একটা পরিষ্কার নয়। প্রায় একইভাবে ব্রাহ্মণকে দান করা জমি থেকে ব্রাহ্মণ শুধু রাজস্ব আদায় করার অধিকারী ছিল, না জমির স্বত্বই তার ছিল এ ব্যাপারটাও স্পষ্ট নয়। দান হিসাবে গ্রহণ করা জমির ওপর গ্রহীতার যে প্রত্যক্ষ অধিকার ছিল, এমন প্রমাণ তাম্রলিপিতে অনুপস্থিত। মনে হয়, দান-করা জমিতে আগে থেকেই যারা চাষবাস করত, তাদের অবস্থান একই থাকত। দান-করা গ্রামের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ছিল। গ্রামবাসীদের ওপর তার প্রভাব পড়ত না। আসলে এই চুক্তির ব্যাপারটা খুব বড় বা জোরদার ছিল, এমন নয় (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ১৯৩)।

আনকোরা জমি দানের ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল বাংলায় সামন্ত প্রথা আসার সময় থেকে, অনেক পণ্ডিতই এমন মনে করেন। তার আগে সমাজজীবনে শহরের প্রভাব

ছিল বেশি। তারপর নানা কারণে শহর অর্থনীতি দুর্বল হতে থাকে। শহরের মূল তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি হল জিনিস কেনাবেচা এবং তৈরি, তৃতীয়টা হল ধনী এবং শক্তিশালীদের বাসস্থান। প্রথম দুটো ক্ষেত্র দুর্বল হলেও, গ্রামের উদ্বৃত্ত থেকে আদায় করা রাজস্বের জোরে তৃতীয়রা, মানে ধনী-শক্তিশালী সম্প্রদায় টিকে যায়। এদের নিয়ে পরের অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করা যাবে।

সামন্ত প্রভুদের ঠিক নিচের স্তরে প্রশাসন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হল সামন্ততন্ত্রের ধ্রুপদী, অমার্কসীয় ব্যাখ্যা। এই বিকেন্দ্রীকরণ পর পর নিচের ধাপেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাজা নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্রথম স্তরের সামন্ত প্রভুদের কাছ থেকে উপঢৌকন, আনুগত্য পেত। সামন্তপ্রভুরা এটা করত তার নিচের পর্যায়ের লোকের ওপর। এই পর্যায়ের একদম তলায় থাকা কৃষিজীবীদের রক্ত, ঘামের বিনিময়ে উৎপাদিত শস্যের উদ্বৃত্ত তুলে দিতে হত অনুৎপাদনশীল শ্রেণির হাতে।[২৭] পরজীবী শ্রেণির বিলাসব্যসন, খেলাধুলা, শিল্প বা যুদ্ধের জন্য তা ব্যবহৃত হত।

সামন্ততন্ত্র নিয়ে মার্কসীয় ব্যাখ্যা ছিল এর বিপরীত। তাতে ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শোষিত কৃষকের অধিকার ছিল না বললেই হয়। সম্পর্কটা ছিল নির্ভরতার এবং অর্থনীতির, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ। ভূস্বামীকে জমির ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেই ভূস্বামীদের ভাড়া আদায় করতে হত। ভূস্বামীদের হাত থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে বাঁচার সুযোগ ছিল না। যারা পালাত, প্রশাসন তাদের ধরে নিয়ে এসে ভূস্বামীদের হাতে তুলে দিত। জমি তখন পর্যাপ্ত ছিল, তা নিয়ে ভূস্বামীদের ততটা মাথাব্যথা ছিল না, যতটা দুশ্চিন্তা ছিল কৃষককে নিয়ে। একজন খেতমজুরের শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রণ করত ভূস্বামী। এবং যে বেশি দাম দেবে তার জন্য শ্রম দেব, এমন প্রথাও ছিল না। শ্রমশক্তির বাজার বলে তখন কিছু ছিল না।

আর এস শর্মা সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুটো ভাগের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল রাজনীতি নির্ভর আর চাষবাস ছিল অর্থনীতি-নির্ভর (শর্মা, আর.এস., ১৯৬৫ : ১)। অনেকেই অবশ্য এর বিরোধিতা করে বলেন, দায়বদ্ধ কৃষকদের দিয়ে কাজ করানোর প্রথাটা (সার্ফডম) একটা নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো থেকে উঠে আসা রাজনীতি নির্ভর ব্যবস্থা, নিছক অর্থনীতি নির্ভর নয়। দুটো সংজ্ঞাকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করলেও দুটো সংজ্ঞাকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করার কিছু যৌক্তিকতা আছে। প্রথম সংজ্ঞাটার কথাই ধরা যাক। জমি দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য তার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়ে যায়, তারপর সেখানে বসতি স্থাপিত হলে, তার শাসন-অধিকারও পেয়ে যায় এবং শেষমেশ চোরেদের এবং পরিবার, সম্পত্তি বা ব্যক্তির ওপর হামলাকারীদের শাস্তি দেওয়ার অধিকারও তারা অর্জন করে। ভারতে কিছু ক্ষেত্রে দান হিসেবে পাওয়া জমি অন্যকে দেওয়া যেত, অন্য সব ক্ষেত্রে তা করা যেত না। এই জমিগুলো মূলত ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ ইত্যাদি কাজের জন্যই দেওয়া হত। এবং তাঁরাই এর দেখাশোনার জন্য সময় দিত (শর্মা, আর, এস., ১৯৬৫ : ২-৭)। সামন্ততন্ত্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক প্রধানদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। পালযুগের লিপি থেকে জানা যায়, কোনও গ্রামের প্রধানকে বলা হত 'গ্রামপতি', তেমনই

দশটা গ্রামের যে প্রধান সে ছিল 'দশগ্রামিক'। কৌটিল্য ৫, ১০, ২০০, ৪০০ এবং ৮০০ গ্রামেরও প্রশাসনিক প্রধান পদ অনুমোদন করেছেন। অন্যদিকে মনু উল্লেখ করেছেন ১০, ২০, ১০০ এবং ১০০০ গ্রামের প্রধানের কথা। এর তুলনায় পাল যুগে প্রধানরা খুবই ছোটছোট অঞ্চল দেখাশোনা করত। কৌটিল্য উচ্চ পর্যায়ের প্রধান এবং ছোট মাপের প্রধানের বেতনের বিরাট পার্থক্যের দিকটাও উল্লেখ করেছেন। একজন যেখানে পেত ৪৮ হাজার পান, অন্যজন মাত্র ৬০ (শর্মা, আর.এস., ১৯৬৫ : ৭-১০)। পাল যুগের বেতন পার্থক্য জানা যায় না।

দান হিসেবে পাওয়া জমি থেকেই এক ধরনের ভূস্বামিত্ব শুরু হয়। যদি সেখানে আগে থেকেই কৃষকদের বাস থাকে, তবে ব্রাহ্মণরা তাদের কাছ থেকে ভাড়া তা নিতে শুরু করল। আর সেই জমি পরিত্যক্ত হলে ব্রাহ্মণরা কৃষকদের দিয়ে তা চাষ করিয়ে নিত। পূর্ববঙ্গের আসরফপুরে পাওয়া তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, পঞ্চম শতাব্দীতে বিস্তৃত কৃষিজমির মালিক হয়ে উঠেছিল মন্দিরগুলো। নালন্দার সংঘ চলত ২০০ গ্রাম থেকে পাওয়া রাজস্বে। ইসিং-এ বিবরণী অনুযায়ী, বৌদ্ধ সংঘগুলো কৃষকদের ষাঁড় এবং জমি দিত এবং সাধারণত তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত শস্যের একের ছ' ভাগ নিত। সম্ভবত আধা-ভাড়াটে চাষিরা লাঙল, বীজ, সার এবং অন্যান্য জিনিস নিজেরাই দিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাল রাজত্বে জোর করে খাটানো শ্রমিক বলে কিছু ছিল না। কিন্তু শ্রমশক্তি যে মুক্ত ছিল, তা নয়। কারিগরদের দায়বদ্ধ শ্রমিকই বলা যেত। তারা অবশ্য রাজার জন্য নয়, শ্রম দিত দানে-পাওয়া গ্রামের প্রধানের জন্য (শর্মা, আর. এস., ১৯৬৫ : ৪৪-৫২, ৫৯, ১২১)। ভাড়া এবং কখনও দায়বদ্ধ শ্রমিকদের (ফোর্সড লেবার) সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটেদের সৈন্যদল পোষার জন্যও বিশেষ কর দিতে হত। গ্রহীতা তাদের ওপর বিচার এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ফলাত (শর্মা, আর.এস., ১৯৬৫ : ৫২-৫৩)।

সরকারি কাজের মূল্য জমিদানের মাধ্যমে দেওয়া যখন চালু হয়, সেটাই বাংলায় সামন্ত শাসনের চূড়ান্ত পর্যায়। বিগ্রহপালের আমলের তাম্রলিপিতে এর উল্লেখ আছে। পূর্ববাংলায় বর্মণ এবং চন্দ্ররা খুব সম্ভবত পালেদের সামন্ত ছিল। পালেরা অনুদান হিসেবে যে জমি দিত, তার চৌহদ্দির কোনও মাপ ছিল না। সম্ভবত অরণ্য অঞ্চলের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যই এটা করা হত। সেনেদের আমলে অনুদান জমির নকশা পাওয়া যায়। এর কারণ হিসেবে মনে করা হয়, চাষ করার মতো অনাবাদী জমি আর ছিল না। দান গ্রহীতার, অন্য উপনিবেশ করার ক্ষমতা যে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছিল, সে কথা জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে পাওয়া তাম্রফলক থেকে। নগদ অর্থ নেওয়া এবং সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারটাও তাতে উল্লেখ করা হয়েছে (শর্মা, আর.এস. ১৯৬৫ : ১৬০-১৬১, ২১০-২১১, ২২১, ২৪২)।

উপসংহার

প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলায় কোনও একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা, সদা গ্রাহ্য ছিল না, এই বক্তব্য দিয়েই এই গবেষণাপত্র শুরু হয়েছে। আমরা প্রধান দু'ধরনের চাষের

কথা পেয়েছি এবং অরণ্য অর্থনীতি ও স্থায়ী কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গ্রামজীবনের যোগ পেয়েছি। অরণ্য অর্থনীতি ও স্থায়ী কৃষিকাজের মধ্যে অবশ্য নানা পর্যায় আছে। অরণ্য অর্থনীতি, যার মধ্যে বিনিময়ের ব্যাপারটা ছিল না, সে সম্পর্কে যতটা জানা গেছে, তার চেয়ে স্থায়ী কৃষি-নির্ভর গ্রাম এবং তা থেকে গড়ে ওঠা শহর সম্পর্কে একজন অনেক বেশি জানতে পারে। স্থায়ী কৃষিকাজের দিকে যাওয়ার একটা ঝোঁক অরণ্য অর্থনীতির ছিল, তবে বাংলার বিভিন্ন অংশে এটা ঘটেছে নানা গতিতে।

ধান এবং লোহা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এবং দক্ষিণ থেকে মেলানিড, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব থেকে মোঙ্গল এবং পশ্চিম থেকে অস্ট্রিকরা না আসা পর্যন্ত বাংলার জলাজঙ্গলে মানুষের বসতি গড়ে ওঠেনি। শুরু থেকেই শবর এবং কিরাত ছাড়া, কৈবর্ত (জেলে) এবং গোপ (পশুপালক) সম্প্রদায়ের লোকেরাই গ্রামবাংলায় বাস করত।

গোষ্ঠীগতভাবে জমির অধিকার, পরিবারগুলো পর্যায়ক্রমে একের পর এক পেত, এ ব্যাপারে বয়স ও লিঙ্গগত অবস্থান মানা হত। জঙ্গল কেটে চাষবাসের উপযোগী করার কাজটা গোষ্ঠীর সবাই হাত লাগিয়ে করত, কিন্তু চাষবাস করত পরিবারগুলো। বড় বড় গাছ কাটার মতো কাজ করত পুরুষ, আর চাষবাসের কাজে অংশ নিত মূলত মেয়েরাই। হাতের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল পরিবারগুলোর মধ্যেই। এগুলো তাদের আত্মনির্ভর করে তুলত। তবে এর উৎপাদনের জন্য প্রশাসকদের তরফ থেকে তাগাদা আসত। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই এক প্রধান থাকত, তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করত প্রবীণের দল। কেউ নিজেদের মূল গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বা পালিয়ে গেলে, জঙ্গল সাফ করে নতুন বসতি স্থাপন করত।

এখনকার যে উত্তরবঙ্গ এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল, সেখানে অরণ্য অর্থনীতি চলত। লোকেরা বিভিন্ন সময়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বাস করত। এই ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীগুলো ছিল ছোট এবং পরস্পরের আত্মীয়। এই ধরনের ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী পশ্চিম আফ্রিকা এবং তদানীন্তন উত্তর-পূর্ব ভারতেরও দেখা যেত।

এরই উল্টো দিকে স্থায়ী কৃষিক্ষেত্রে তখন অনেক উন্নতি ঘটছিল। যেমন নিড়ানির জায়গা নিয়েছিল লাঙল, মেয়েদের চেয়েও ছেলেরা বেশি করে কৃষিকাজে যুক্ত হচ্ছিল, পাশাপাশি গ্রামের সীমানাও নির্ধারিত হয়ে গেছিল। ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শস্য চাষ করা হত। এবং চাষের কাজে লাঙল, কাস্তে এবং বলদকে কাজে লাগান হত। তখন জমি ছিল প্রচুর, তাই জমির চেয়েও খেতমজুরের গুরুত্ব ছিল বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশীলতাকেও বাড়াতে হয়, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত লোকশক্তিরও প্রয়োজন হতে থাকে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন এসব স্থায়ী গ্রামগুলোর স্পষ্ট কাজের বিভাজন-সহ যে চিরাচরিত, অপরিবর্তনীয়, সরল ছবি তুলে ধরেছিল, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল ছিল খুবই কম। এশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে মার্কসের যে ধারণা, তার সঙ্গেই এর মিল পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থায়ী কৃষিব্যবস্থাই জাতপাত, দলপতিত্ব, বিক্রিবাটা, ভোগদখলের অধিকার ইত্যাদি কারণে কৃষিজীবীদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। ধাতু না পাওয়া যাওয়ার কারণে আর্থিক লেনদেন শুরু না হলেও, মালদ্বীপ থেকে আমদানি করা কড়ি, স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক লেনদেনে ব্যবহার করা হত।

বাংলার গ্রামীণ ব্যবস্থার সঙ্গে ইউরোপীয় ধাঁচের বহু ক্ষেত্রেই মিল পাওয়া যায় না। দাস প্রথার কথাই ধরা যাক। এথেন্স, রোম প্রভৃতি জায়গায় ক্রীতদাসেরা উৎপাদনে সক্রিয় অংশ নিত। প্রায়শই বড় মাপের গঠনকাজে এবং কৃষিক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগানো হত। বাংলায় দাস ব্যাপারটা ছিল অনেকটা শহরে বাড়ির চাকরের মতো, শুধু মনিবকে ছেড়ে যাওয়ার অধিকারটুকুই তাদের ছিল না। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমিক ভাড়া দেওয়া, যেটা বাংলায় ছিল না। তবে অন্য কিছু কিছু ক্ষেত্র, যেমন ব্যক্তিগত নির্ভরতা, অর্থনীতি-বহির্ভূত বলপ্রয়োগ, খণ্ড খণ্ড অংশে আলাদা আলাদা সামন্তরাজ স্থাপন, অধিকার ফলাতে জমিদারের ধর্মকে ব্যবহার ইত্যাদিতে বাংলার সঙ্গে ইউরোপের মিল পাওয়া যায়। যেহেতু বাংলায় কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যবস্থার দরকার ছিল না, তাই 'ওরিয়েন্টাল ডেসপোটিজম' বলেও কিছু এখানে ছিল না। এজন্য অবশ্য ধন্যবাদ প্রাপ্য বর্ষার। প্রশাসন ছিল বিকেন্দ্রীভূত, তাই নানা চেহারায়, নানা মাপে জমিদার ছিল প্রচুর।

মন্তব্য

১. খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ১৬টা প্রধান জনপদের মধ্যে চারটি সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। তার দুটোতে ছিল উপজাতি গোষ্ঠীশাসন এবং বাকি দুটোতে রাজতন্ত্র। (ডিডি কোসাম্বি, ১৯৬৫ : ১২১-১২২)

২. ১৯৫১ সালেও জলপাইগুড়ির ৭৭৬টি গ্রামে ১৮৮২১৫টি পরিবার ছিল। তার মানে প্রতি গ্রামে প্রায় ২০০ পরিবার। উত্তরবঙ্গের অন্য জেলায় ছিল কম। কোচবিহারে ১১৯৮ গ্রামে ১৪৫৪৬৯ পরিবার এবং দার্জিলিঙে ৩৪০টি গ্রামে ২১১২৬টি পরিবার ছিল। (সান্যাল চারুচন্দ্র, ১৯৬৫ : ১৩)

৩. দিনাজপুরের দামোদরপুর থেকে পাওয়া ৪৮২ খ্রিস্টাব্দের তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, গ্রামের প্রধানকে বলা হয় গ্রামিক। সে ছিল গ্রামে বাজার প্রতিনিধি। (পাণ্ডে রাজবলী, ১৯৬২ : ১০৪-১০৫)

৪. বাউড়ি বা বাগদিদের, যারা স্থায়ীভাবে চাষবাসের কাজ শুরু করেছে অল্পদিন আগে, মধ্যে এ ধরনের উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। এদের পঞ্চায়েত এখনও নিজেদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ নিয়েই তৈরি। সাঁওতালদের মধ্যে এখনও সম্প্রদায়ের সব অংশের প্রতিনিধিকে নিয়ে (ষোলো আনা) পঞ্চায়েতের সভা ডাকার চল বাধ্যতামূলক। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে এখনও এই সভা হয়। এই উপলক্ষে সারাটা দিন এবং রাতে শিকার করে এবং বিস্তর আনন্দফূর্তিতে মেতে ওঠে। বাংলা ছাড়াও বিহার, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসে বিভিন্ন অংশের বিবাদ-বিতর্কের নিষ্পত্তি করে।

৫. এই ধরনের বসতি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রকে মূলত শূদ্র কৃষিজীবীদের নিয়ে আসতে হত। ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি দেওয়া হত। হিসাবরক্ষক, গোপ, স্থানিক, হাতি-প্রশিক্ষক, বৈদ্য, অশ্ব-প্রশিক্ষক, বাহক ইত্যাদি নানা বিভাগের প্রধানদের জমি দেওয়া হত। যদিও সেই জমি বিক্রি বা বন্ধকের অধিকার তাদের দেওয়া হত না। জীবনধারণের জন্যই কর্ষণোপযোগী জমি দেওয়া হত। চাষ না করে জমি ফেলে রাখলে, তার কাছ থেকে জমি নিয়ে নেওয়া হত। সেচকার্যই ছিল মূল কাজ। যারা এর সঙ্গে যুক্ত থাকত তাদের জমি, রাস্তা, গাছ কারিগরি যন্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হত। যৌথ সেচ ব্যবস্থায় যারা যোগ দিত না, তারা নিজেদের শ্রমিক এবং বলদ নিয়ে আলাদা থাকতে পারত। অনাবাদী

জমিকে গবাদি পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত।

৬. খণ্ড রাজ্যগুলোতে ছোটছোট অংশগুলোকে পিরামিডের মতো বিন্যাসে ধরে রাখার জন্য বিশেষ রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হত। ওপরের স্তরে তাদের মধ্যে যে বিরুদ্ধতা দেখা দিত, তা ছিল শেষমেশ লাগোয়া অসম্পৃক্ত দলগুলোর মিলিত বিরুদ্ধতা। (সাউদাল এ ডব্লু, ১৯৫৩ : ২৬০)

৭. রাজ্য গঠিত হয়নি এমন সমস্ত সমাজে খণ্ডিত সীমারেখাই ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের মূল ভিত্তি, এ থেকে এমন ধারণা করাটা মোটেই উচিত নয়। চট্টোপাধ্যায়ের মতে খণ্ড রাজ্যের (সেগমেন্টারি স্টেট) বৈশিষ্ট্য ছিল :
   (১) সীমিত আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব। কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যেত, এর প্রভাব কমও তত এবং প্রায়ই প্রথাগত কর্তৃত্ব হিসেবেই টিকে থাকত।
   (২) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আপাত-স্বায়ত্তশাসন-সহ কেন্দ্রীভূত শক্তির উপস্থিতি;
   (৩) প্রশাসনিক কাঠামোর পিরামিডের পুনরাবৃত্তি এবং সীমানা-কেন্দ্রিক কাজকর্ম;
   (৪) কেন্দ্রে চরম ও একচেটিয়া বৈধ শক্তির অনুপস্থিতি;
   (৫) সীমান্তের আনুগত্য পরিবর্তন (চট্টোপাধ্যায় ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ২১৩-২১৪। সাউদাল এ ডব্লু, ১৯৫৩ : ২৬০)।

৮. প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কেন্দ্রমুখী-খণ্ডিত দ্বিবিভাজন কতটা বাস্তবসম্মত; কেউ কেউ বলেন, চূড়ান্ত ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিপরীতধর্মী নয়। একই পরিকাঠামোর দুটি ভিন্ন মুখ। সময়ের চাহিদা অনুসারে কেন্দ্রীয় এবং বিকেন্দ্রীকৃত ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। খণ্ড রাষ্ট্রের এই ধারণায় গলদটি হল, লুঠতরাজ বা অন্যভাবে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই জন্য স্থায়ীত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট উল্লেখ এই ধারণায় নেই। সামন্ততান্ত্রিক নৃপতি শাসিত রাষ্ট্র গঠনের আগে এই খণ্ডরাষ্ট্রগুলি কীভাবে কাজ করত, সে সম্পর্কেও এই ধারণার প্রবক্তারা নীরব।

৯. আসামের অহম জাতি এবং তিব্বতি-বার্মিজ আদিবাসী, অর্থাৎ বোরো-রা ১৭৯০ সালে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণরা এদের জন্মপঞ্জী তৈরি করতে গিয়ে, এদের আদিবাসী রমনী হিড়িম্বার গর্ভে উৎপন্ন, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের বংশধর বলে বর্ণনা করেছিলেন (মারটিনা, সোফিয়া এ, ১৯৭৮ : ৩৪২)। সংস্কৃত্যায়নের প্রক্রিয়ায় এরা হিন্দু দেবতা ও বিশ্বাসকে আত্মস্থ করে (গুহ, অমলেন্দু, ১৯৮৭ : ১৫৬)। একই ধরনের সংস্কৃত্যায়ন প্রক্রিয়ায়, আরেকটি বোরো পরিবার ভুক্ত সম্প্রদায় কাছারি-রা, নিজেদের হিড়িম্বার বংশভূত বলে দাবী করে এবং আরাধ্য দেবতা হিসাবে কাছাই কাজির, যা রণচণ্ডিরই অন্যরূপ, আরাধনা করতে শুরু করে (ভট্টাচার্য, জে.বি., ১৯৮৭ : ১৮১)। সংস্কৃত্যায়নের এই প্রক্রিয়া আদিবাসীদের জাতি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।
   সংস্কৃত্যায়নের নানা স্তর ছিল। প্রথম স্তরের লক্ষণ ছিল, গোমাংস ত্যাগ। খাওয়ার জন্য শূকর ও মুরগি পালন। দ্বিতীয় স্তরে ছিল, অ-হিন্দু দেবতার আরাধনা পুরোপুরি অথবা কিছুটা ত্যাগ করে হিন্দু দেবতার আরাধনা। তৃতীয় পর্যায়ে নিজস্ব গোষ্ঠী পরিচিতি বর্জন। চতুর্থ পর্যায়ে আর্য ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ। সংস্কৃত্যায়নের শুরুতে সংশ্লিষ্ট সমাজ অন্য খাদ্যাভ্যাসের সমাজের সঙ্গে একসাথে আহার বর্জন করত (মজুমদার, ডি.এন., ১৯৭২ : ২৬৩-২৬৮)।

১০. প্রজাদের সঙ্গে চেহারার কোনও পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও, রাজার উদ্ভব কীভাবে হল, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলা হয়েছে।

১১. বাংলায় গোপালের ক্ষেত্রে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, অনেক পরে হলেও, আসামের

রাজার ক্ষেত্রে যুক্তি বিন্যাসেও তার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। "এই দেশটি 'তাই' আর দাস-এ ভর্তি। তারা ভাল-খারাপের ফারাক বোঝে না। অন্যের সম্পত্তি আর বউ জোর করে কেড়ে নেওয়া এদের স্বভাব। তুমি (রাজা-লেখক) শক্ত হাতে এদের শাসন কর"। 'তাই'-রা লাঙল ব্যবহার করত, অন্যরা ব্যবহার করত নিড়ানি। রাষ্ট্র, অধিকাংশ জমিকে লাঙল চাষের আওতায় আনতে এবং শাসনব্যবস্থায় স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল (গুহ, অমলেন্দু, ১৯৮৭ : ১৫৩)।

১২. মৎস্যপুরাণে যে সাতটি কৌশলের উল্লেখ রয়েছে 'দণ্ড' তার মধ্যে অন্যতম। অন্য ছয়টি হল; সাম, ভেদ, দান, উপেক্ষা, মায়া এবং ইন্দ্রজাল (মৎস্যপুরাণ ২২২.২)।

১৩. তিনি যখন সূর্যের মতো, কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তিনি যখন চন্দ্রের মতো, সকলে তাঁকে দেখে মোহিত হয়। যমের মতো তিনি ধর্ম এবং মৃত্যুর প্রতীক, বন্ধু এবং শত্রুর প্রতি সমান নির্মম। বরুণের মতো তিনি পাপীকে বন্ধন করেন, অগ্নির মতো তিনি অপরাধীকে ধ্বংস করেন। পৃথিবীর মতো তিনি সকলকে সাহায্য করেন। ইন্দ্রের মতো, চারমাস তিনি বৃষ্টিধারায় ভূমি সিক্ত করেন। সূর্য যেমন জল শোষণ করে, তিনি সেভাবে কর আদায় করেন। বায়ু দেবতার মতো, গুপ্তচরের সাহায্যে তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন (মৎস্যপুরাণ ২২৬.১, কান্টাওয়ালা, এস.জি., ১৯৬৪ : ১০৪-২০৫ উদ্ধৃতি)।

১৪. মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, উৎপাদনের একের ছয় অংশ সাধারণভাবে কর হিসাবে প্রদেয়। বণিকরা তাঁদের বিক্রি, ক্রয় এবং লাভের হিসাবে কর দেবেন। কারিগররা কর দেবেন তাঁদের উৎপাদনের মুল্যের উপর। রাজাকে নিপীড়নমূলক কর আদায়ে বিরত থাকার পাশাপাশি আপদকালে কর ব্যবস্থা স্থগিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৫১-৫৪)।

১৫. "রাজকোষ এবং সৈন্যবাহিনী রাজার শক্তির উৎস। আবার রাজকোষ সৈন্যবাহিনীর শক্তির উৎস, সকল কর্তব্যের উৎস সেনারা। প্রজাদের শক্তির উৎস কর্তব্য পালন" (মহাভারত, দ্বাদশখণ্ড, ১৩০, ৩৫)।

১৬. দুর্গশহরের কর ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জরিমানা, যা, পিলখানা, দেহপসারিণী, নির্মাণস্থল এবং কারিগর ও হস্তশিল্পীদের সংঘের কাছ থেকে আদায় করবে 'নাগরিক' বা নগরপ্রধান, 'দেবতাধ্যক্ষ' বা মন্দির রক্ষক, 'মুদ্রাধ্যক্ষ' বা শিলমোহর এবং ছাড়পত্র সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ১২৫)।

১৭. সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, বিপুল উদ্বৃত্ত সহ সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থার অস্তিত্ব তার পূর্বশর্ত (জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ১০)।

১৮. মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেছেন, প্রতিটি গ্রামের একজন মুখ্য থাকবেন। ১০টি গ্রামের আরেকজন প্রধান হবেন। ১০০টি গ্রামের প্রধান হবেন শতপতি। ১০০০টি গ্রামের প্রধানের নিজস্ব সংস্থানের জন্য একটি ছোট শহর থাকবে। এই শহর থেকে তিনি ফসল, সোনা এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করবেন। মনুর ভাষ্যে গ্রামপ্রধান গ্রামে উৎপন্ন খাদ্য, পানীয় এবং ইন্ধনের ভাগ নেওয়ার অধিকারী। ১০টি গ্রামের প্রধানের দখলে থাকবে ১ কুলা জমি, ২৫টি গ্রামের প্রধান পাবেন ৫ কুলা জমি। ১০০টি গ্রামের প্রধান কোনও একটি গ্রামের গোটা কর তার দায়িত্বের বিনিময়ে প্রাপ্য (প্রসাদ, বেণী, ১৯৬৮ : ৪৯-৫০, ৭৮)।

১৯. কৃষকদের জলসেচ ব্যবস্থা কর ব্যবস্থার মধ্যে ছিল কি না সে বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। অর্থশাস্ত্রের একটি অংশে উল্লেখ রয়েছে, শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে যে জমিতে সেচ

করবে তাকে ফসলের এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে। বলদের সাহায্যে বা কাঁধে করে জল এনে যে সেচ করবে তাকে দিতে হবে এক চতুর্থাংশ। জল তুলে সেচ করলে দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ। নদী, হ্রদ, পুকুর বা কুয়ো থেকে জল নিয়ে চাষ করলে দিতে হবে এক চতুর্থাংশ। এল. গোপালের মতে, এই বক্তব্য সম্ভবত রাজার জমির জন্য। অন্যত্র জলসেচের জন্য কোনও কর লাগত না (গোপাল, এল., ১৯৮০ : ১৭০, ১৭৯)।

২০. বাংলায় গঙ্গার দুটি মূল শাখার একটি ভাগীরথী সম্পর্কে একটি প্রচলিত লোকবিশ্বাস হল এটি রাজা ভগীরথের উদ্যোগে কাটা খাল। খনার বচনে ভাগীরথী নদীকে 'ভগার খাল' বলে উল্লেখ রয়েছে। যার অর্থ, ভগীরথের খাল।

২১. এটি বোধহয় ভুক্তি তালিকাভুক্ত নয়। একে বড়জোর উপরিকার অধীনস্থ প্রশাসনিক কেন্দ্র বলা যায়। অন্যান্য ভুক্তিগুলির মধ্যে বিহারের তিরা-ভুক্তি ও শ্রীনগর-ভুক্তি এবং অসমের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-ভুক্তির উল্লেখ মেলে (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৭১, ২৭৩)।

২২. কুল অর্থে যে জমি চষতে ১২টি বলদ ও দুটি লাঙল লাগে (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৬৯)।

২৩. উদাহরণস্বরূপ, বিজয়সেনকে বলা হত 'পঞ্চধিকরণপারিকা', 'পুত্যপারিকা' এবং 'পুরপালপাবিকা' (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৬৫)। গুপ্ত সম্রাটরা নিজেদের 'পরম-দৈবতা', 'পরম-ভট্টারিকা' এবং 'মহারাজাধিরাজ' হিসাবে অভিহিত কবতেন (মজুমদার ও বসাক, ১৯৭১ : ২৭২)।

২৪. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নগদে বা ফসলের ভাগে-দুভাবেই কর দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে (কাঙ্গলে, আর.পি., ১৯৬৩, খণ্ড ২ : ৩০২)।

২৫. কৃষকের মালিকানা থাকলেও, জমির উপর সার্বভৌম অধিকার ছিল রাজার। এস. গোপালের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এল. গোপাল। তাঁর মতে, প্রাপ্ত পাঠ এই তথ্যের অনুকূল নয় (গোপাল.এল., ১৯৮০ : ৮৮-৮৯)।

২৬. জোবার্গ উল্লেখ করেছেন যে, নগরজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ছিল এক বিশাল সংখ্যক অ-কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এবং উচ্চবর্ণের শিক্ষিতজনের অস্তিত্ব। গ্রামীণ বা প্রাক্-শহরে সমাজের তুলনায়, এই সমাজে একটি সুবিন্যস্ত অথচ অনমনীয় শ্রেণি কাঠামো এবং বয়স, লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক কর্ম বিভাজনের অস্তিত্ব ছিল। একটি ক্ষুদ্র অথচ সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণী গোটা সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখায় সাহায্য করত (জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ১১)।

২৭. অতীতে মাপ নিতে 'হস্ত' এবং 'নল' বা মাপকাঠির ব্যবহার ছিল। এতে মাপের ক্ষেত্রে হেরফের ঘটত। একটি নয় ভাঁজের মাপকাঠির আটটি দৈর্ঘ্যের মাপকে বলা হত 'অষ্ট-নবক-নলা'। 'হস্ত' অর্থ একজন সৎ রাজকর্মচারীর হাতের মাপ। এই মাপ ১৮ থেকে ২১ ইঞ্চি পর্যন্ত হত। জমির মাপের ক্ষেত্রে ১ পতাকা ছিল ৫ কুল্যাব্যাপের সমান। ১ কুল্যাবাপ ৮ দ্রোণবাপের সমান, ১ দ্রোণবাপ ৫ আধবাপের সমান। এর অর্থ. এই মাপের জমি চাষ করতে যথাক্রমে এক কুল্যা, এক দ্রোণ বা কে আধবা বীজধান লাগত। ১ কুল্যাবাপ ১২৮-১৬০ বিঘার সমান, ১ দ্রোণবাপ ১৬-২০ বিঘার সমান। বীজ পোঁতার বদলে বীজ ছড়ানোর প্রেক্ষিতে ধরলে এই মাপ এক-চতুর্থাংশে দাঁড়াবে (গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪ : ৫৭৫-৫৭৯)। স্থানবিশেষে এই সংজ্ঞার হেরফের ঘটত। সব রাজাই, করের ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলতেন (ওই; ৫৮)।

২.৩

শহরের উৎপত্তি
১২০৪ সাল পর্যন্ত

ভূমিকা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা বলতে গ্রামকেই বোঝাত। কিন্তু আমরা ওই সময়ের গ্রামের চেয়েও শহব সম্পর্কে বেশি জানতে পারি। এই জানার ব্যাপারটা তুলনামূলক, কারণ আমাদের শহর সম্পর্কে জানার ব্যাপারেও বিস্তর সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এলাকার বিস্তৃতি বা তাতে কত মানুষজনের বাস, এই হিসেবে শহরের (সিটি বা আরবান) সংজ্ঞা নির্ধারণ মোটেই সহজ ছিল না। শহরের লোকসংখ্যা এবং এলাকা সম্বন্ধে সরকারি নথিপত্রে বা সাহিত্যে বাড়িয়ে বলার একটা প্রবণতা আছে।[১] '১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম আদমসুমারি হয়। সেই থেকেই ভারতীয় পণ্ডিতরা, ভারতীয় জনগণনার সংজ্ঞা অনুযায়ী, শহর বলতে জন ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে ৪০০), পেশা (তিনের চার অংশ অ-কৃষিজীবী) এবং সংখ্যা (৫০০০) দিয়ে হিসাব করে আসছেন। এই সংখ্যাগুলো যে অলঙ্ঘনীয় ছিল তা নয়। তবে বড় শহরের চরিত্র নির্ধারণে কার্যকর সংজ্ঞা হিসেবে এই নির্দিষ্ট মাপকাঠি মেনেই চলতে হত। বিভিন্ন দেশ তাদের আদমসুমারির প্রয়োজনে আলাদা আলাদা মান নির্ধারণ করত।

এখানে আমরা যে সব শহরের কথা আলোচনা করব তা আদমসুমারির বহু শতাব্দী আগেকার। পাঠকদের আর একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে, তা হল 'শহর' শব্দটা। এটাকে এখানে খুবই সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে নগরকে শহরের সমার্থক ধরা হচ্ছে। ভারতীয় জনগণনা কর্তৃপক্ষ শহর বলতে ১ লক্ষ বা তার বেশি লোকের বাসস্থান বোঝান। তার কথা এখানে ধরা হচ্ছে না। আমরা যে সব শহরের কথা আলোচনা করছি, বর্তমানের নিরিখে তারা নেহাত ছোট, যার মধ্যে জমি-সহ গ্রামের নানা বৈশিষ্ট্য ছিল।

সংজ্ঞা যা-ই হোক না কেন, অর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভূমিকার ক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ে শহর ছিল বহুলাংশে আলাদা। শহর ছিল একটা কেন্দ্রবিন্দু। শহরের আকার এবং গুরুত্ব ও বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থির ছিল না। সময় যত গড়িয়েছে বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে সম্পর্ক (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৭৩, ১৮৩-১৮৪)।

বেশিরভাগ শহরের অবস্থান ছিল নদীর ধারে। নদীর গতিমুখ বদলের সঙ্গে শহরও সরে গেছে অন্যত্র। উদাহরণ হিসাবে গৌড়ের কথা ধরা যায়, যার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। এটা দেখেই বোঝা যায় কয়েক শতাব্দী জুড়ে একই নামে এই শহর রয়ে গেলেও, নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর অবস্থানও সরে

গেছে। এই শহরের সীমানা তেমনভাবে নির্দিষ্ট ছিল না, তাই অঞ্চল হিসেবে ধরলে জনসংখ্যার তারতম্য হত। একটা শহর ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে অথবা কীভাবে চার পাশের গ্রাম থেকে শহরের সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে, তা নির্ধারণ করা মোটেই সহজ ছিল না। এখনও যে ব্যাপারটা সহজ তা নয়।

যে নদীর পাড়ে শহর গড়ে ওঠে, সেই নদী মরে গেলে ক্রমশ বেড়ে ওঠা শহরের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। কয়েক দশকের মধ্যেই বদলে যায় তার বাণিজ্য-ভাগ্য। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক শতক ধরে দাপিয়ে রাজত্ব-করা শহর সপ্তগ্রাম, শেষমেশ পরিণত হয়েছিল এক মামুলি গ্রামে। পলাশির যুদ্ধের কয়েক দশক পরে মুর্শিদাবাদের কালেক্টরের কাছে মুর্শিদাবাদকে বাংলার রাজধানী বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, সেটা তখন বড়জোর একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মেদিনীপুরের এক ছোট্ট অংশের নাম দাঁতন। এক সময়ে এই দাঁতন যে 'ভুক্তি'র কেন্দ্রস্থল ছিল এবং সম্ভবত তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল এই রাজ্যেরই অধীন, তা এখন আর কে বিশ্বাস করবে? অথবা তমলুকের কথাই ধরা যাক। প্রাচীন এই সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্ত আজ থেকে ২৩০০ বছর আগে, মৌর্য রাজত্বকালে গ্রিকদের নজর কেড়েছিল।

এই অধ্যায়ে নানা তথ্যের সাহায্যে এখন যেটা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ, তার শহর-বসতির বিবর্তনের ইতিহাসের মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে বাংলায় কীভাবে শহর বিকাশ লাভ করেছে সেটা দিয়েই শুরু হবে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা। তৃতীয় পর্বে তাম্রলিপি থেকে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে শাসন পর্ব-সহ বাংলায় নগরায়ণের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। চতুর্থ পর্বে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণাদির সাহায্যে দেখা হবে, শহরগুলোর পূর্ণবিকশিত রূপ কেমন ছিল। ওই সময়ে বাংলার স্থাপত্য কেমন ছিল, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে পঞ্চম পর্বে। ষষ্ঠ পর্বে টানা হবে সিদ্ধান্ত।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে নগরায়ণ

নগরায়ণ, খনিজ এবং কৃষিজ উদ্বৃত্ত

ভারতে যে কোনও ধরনের নগরায়ণের কথা বলতে গেলেই শুরু করতে হয় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো দিয়ে। সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে-ওঠা এই শহর গড়ে উঠেছিল আর্যদের আগমনের আগেই। নগরায়ণের কোনও ঐতিহ্য তাদের ছিল না। এই নগরায়ণ সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, হরপ্পাবাসীরা লাঙলের ব্যবহার জানত, ধান এবং তুলোবীজের ব্যবহার জানত। তারা যে কৃষিজ উদ্বৃত্ত তৈরি করে ছিল, সেটাই নগরজীবনকে গড়ে তোলে (ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ৭)।[২] রীতিমতো বিস্ময়কর নগর পরিকল্পনা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিকাশ এবং বাহরিন, মেসোপটেমিয়ার মতো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করলেও, সিন্ধুতীরের অধিবাসীরা খালের সাহায্যে চাষ করত না। তাদের ভারী ধরনের লাঙলও ছিল না। কোনও কোনও মতে, সিন্ধু-শহরে একটা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণি ছিল, যাদের বলত পণি, আর্যরা যাদের একটুও পছন্দ করেনি। সে কারণেই তারা হরপ্পাকে ধ্বংস

করে। অন্যদিকে মহেঞ্জোদড়ো ভস্মীভূত হয় আগুনে (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৬৫ : ৭৯-৮০; জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ৪১)।

কোনও জায়গায় থিতু হয়ে চাষবাস শুরু করতে আর্যদের প্রায় হাজার বছর লেগে গিয়েছিল। তারপর তারা নিড়ানির পরিবর্তে লাঙলের প্রচলন শেখে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন একটা বস্তুগত ভিত্তি পায় এবং শহরের বিকাশ ঘটতে থাকে (জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ৫৮)। মহাভারতে কুরুবংশ যেখানে থাকত তার নাম হস্তিনাপুর। 'পুর' শব্দটাই শহর কথাটাকে প্রকাশ করে। মহাকাব্য মহাভারতে গবাদি পশুর জন্য যুদ্ধ, জঙ্গলে যতটা সময় কাটানোর বর্ণনা এবং ফলমূল আহরণ এবং পশুহত্যা করে খাওয়ার যে সরল খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় আর্যদের কৃষিকাজের সঙ্গে তেমন যোগ ছিল না, যতটা ছিল পশুপালনের সঙ্গে। ধান, গম বা তুলো তাদের অপরিচিত ছিল। এমনকী, তারা লাঙলের ব্যবহারও জানত না (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৩১)।

পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি বিকাশের বহু উল্লেখ মেলে। পাণিনির সময়ে, অর্থাৎ ৬০০ সাল খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৩২ ধরনের শস্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যার অন্যতম হল 'সালি' ধান। সেদ্ধ করা চালকে বলা হত 'ভকত্ত', যার সঙ্গে এখনকার ভাতের মিল পাওয়া যায়। পাণিনি ৬ ধরনের সিদ্ধ চালের কথা বলেছেন (অগ্রওয়াল, ভি. এস. ১৯৫৩: ১০২)। অর্থশাস্ত্রের সময়ে কৃষিকাজ যে আরও সুসংবদ্ধ ছিল তা-ই নয়, অব্যবহৃত পড়ে থাকা জমিতে নতুন বসতি স্থাপনের বিপুল তোড়জোড় লক্ষ করা যায় (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৬৪)।

এই বিবরণ থেকে জমিকে কী কী কাজে ব্যবহার করা হত তা আমরা জানতে পারি। যেমন গ্রামে 'বস্তু' (বসতজমি), 'ক্ষেত্র' (কৃষিজমি) এবং 'গোচর' (গবাদি পশুপালন ক্ষেত্র)—এই তিন ধরনের জমি ছিল। আর ছিল চারপাশের বন। বিশেষ করে বাংলা এবং আসামের ক্ষেত্রে গভীর জঙ্গলে বসতি স্থাপন করায় মূল সমস্যা ছিল যন্ত্রপাতির। যা দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করা যেত। বড় বড় গাছ কাটার মতো যন্ত্রপাতি তখনও তৈরি হয়নি। অন্য অনেক বিষয়ে উন্নত হলেও সিন্ধু সভ্যতার সময়ে লোহার ব্যবহার ছিল অজানা। ফলে জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন উপনিবেশ গড়ার কাজটা খুব বেশি এগোয়নি। আর্যরা বসতি স্থাপনের জন্য জঙ্গলে আগুন লাগাত। কিন্তু বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে লোহার ব্যবহার শিখে ফেলায়, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে শুরু করে (ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ৫,৯; ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৬২-৬৪)।

আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পত্তন হতে থাকে শহরের (থাপর, রমিলা, ১৯৭৮
:
১৫৮)। পোড়ানো ইট ও ছাপ-মারা মুদ্রার চল হরপ্পার সময় থেকেই হয়ে আসছে। ওই সময়ে আর একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া যায়, তা হল সিরামিকের জিনিস, যা নর্দার্ন পলিশড গ্রে ওয়্যার বা এন পি ডব্লু বলে পরিচিত। সদর দপ্তরগুলি শহর

হিসাবে পরিচিত হতে থাকে। অন্যদিকে যে দেশে যারা থাকত, তাদের নামেই পরিচিত হত সেই দেশ। যেমন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত অথবা কোশাম্বি। পালি সাহিত্যে এ ধরনের ৬০টি শহরের নাম আছে। কিন্তু নগরায়ণের রমরমার সময়েও শহরগুলো ছিল খুবই ছোট (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৯৬-১৩৪, ১৩৯)।

লৌহ-শিল্পের শুরু হিসাবে এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা আরেকটু ভালোভাবে বলতে গেলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়কে ধরা হয় (থাপর, রমিলা, ১৯৭৮: ১৫৮)। ভারতের রাজনৈতিক শক্তি যে উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যদেশ থেকে পূর্বে, লোহা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ছোটনাগপুর মালভূমির কাছাকাছি চলে আসে, বোঝা যায় সেটা এমনি-এমনি নয় (কোশাম্বি, ডি. ডি. ১৯৭৫ : ১৫৫)। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র মস্ত শহর হিসাবে বিকশিত হয়, অত বড় শহর সে সময়ে আর দুটো ছিল না।

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের পর তৃতীয় পর্যায়ে নগরায়ণের বিকাশ ঘটে মৌর্য রাজত্বকালে এবং তারপর (৩২২-১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। নগরায়ণ আরও গুরুত্ব পায় মৌর্য রাজত্বের শেষে। শুঙ্গ এবং কুষান রাজত্বে (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৭৭-৭৮, ৮০)। স্থাপত্য বিকাশলাভ করে। রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচিত হয় এই সময়েই, পাটলিপুত্র শহরকে কেন্দ্র করেই। অর্থশাস্ত্রে 'লোহাধ্যক্ষ' নামে একটা পদের কথা বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পদাধিকারীর কাজ ছিল খনির কাজ পরিচালনার ব্যাপারে নিয়মনীতি ঠিক করা এবং আয়ের জন্য কর চাপানো। লোহার ওপর ভর করেই প্রগতির চাকা গড়িয়েছে এটা ঘটনা। কিন্তু সেই সময়ে লৌহকার এবং স্বর্ণকার দুজনেরই সময় এবং দক্ষতা যুদ্ধাস্ত্র তৈরির মতো কাজেই অপচয় হয়েছে (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৯৬-১৩)।

ধাতুবিদ্যা এবং নগরায়ণের ব্যাপক প্রসারের জন্য দরকার ছিল আরও কৃষিজ উদ্বৃত্ত। ফলে বর্ণাশ্রম প্রথাকে শিথিল করা হয়, যাতে বৈশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রও কৃষিকাজে হাত লাগাতে পারে। উল্লেখ্য, তখন বৈশ্যরাই কৃষিকাজ করত। ব্রাহ্মণদের কৃষিকাজে 'হাতগন্ধ' করার অনুমতি দেওয়া হলেও, মূলত তাদের দিয়ে দেখাশোনার কাজই করানো হত। কায়িক শ্রমের জন্য শ্রমিক ভাড়া করে আনা হত। গ্রিক নথি থেকে জানা যায় যে, সে সময় কৃষিকাজ পেশা হিসাবে দারুণ সম্মানজনক ছিল। যুদ্ধের সময় কৃষিকাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে ব্যাপারে দু পক্ষই সতর্ক থাকত (ম্যকক্রিণ্ডেল, ১৯৬০ : ৩৯)।[৩]

শহর কেন?

একটা শহর নানাভাবে বেড়ে ওঠে। সরকারিভাবে সুপরিকল্পিত এবং স্থপতিদের দিয়ে তৈরি এমন শহরের কথা কদাচিৎ শোনা যায়। (মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের কথা আলাদা। অনার্য শিল্পী ময়দানবকে দিয়ে পাণ্ডবরা শহরটিকে তৈরি করিয়েছিল সুপরিকল্পিত শহর হিসেবে, এবং ফলে কৌরবদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহর গড়ে ওঠার মূলেই গ্রাম। এক বা একাধিক গ্রাম মিলিত হয়েই বড় শহরের চেহারা নিত। তবে কেন কিছু গ্রাম শহর হয়ে উঠত, বাকিগুলো হত না, সেটা অনুমানের

বিষয়। অনেক সময় হয়তো কাছাকাছি ছিল তীর্থস্থান, কেউ হয়তো ছিল দুটো নদীর সঙ্গমস্থলের ধারেকাছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর অথবা কৃষিজীবী কিংবা ব্যবসায়ীদের উপস্থিতির কারণেই সেই গ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত। রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বের কারণেও বহু গ্রাম পরিণত হত শহরে। যেমন 'স্কন্দবার' (বিজয়ী শিবির)।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা। বহিঃশত্রুর হাত থেকে সারা রাজ্যের লোককে নিরাপত্তা দিত শহর। সে সময় রাজ্য শত্রুর হাতে চলে গেলেই শুরু হয়ে যেত অত্যাচার, ধর্ষণ, দাসত্ব এবং অবনমন। ফলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই, রাজা যাতে তাদের রক্ষা করার কাজটা ঠিকমতো করতে পারে, সেই প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করত নাগরিকরা। উঁচু-পাঁচিল দিয়ে শহর ঘেরা, পরিখা কাটা, কাদা পাথর ইত্যাদি মিশিয়ে দুর্গ তৈরি করা-এ ছিল পৃথিবীর প্রায় সব শহর সুরক্ষারই অন্যতম ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গ তৈরি হতো শহরের মধ্যস্থলে। তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ—এই দুটো শহর এই দিক থেকে অন্যদের চেয়ে একদমই আলাদা ছিল, এই শহর দুটোর চারিদিকে প্রাচীরঘেরা ছিল না (জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ৯১; চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৮২, ১৮৬)। কবিকল্পনায় যে সব মস্ত শহরের কথা পাওয়া যায়, বাস্তবে শহর মোটেই তত বড় ছিল না। রাজ্যের প্রাচীর বা প্রাসাদও গগনচুম্বী হত না। তবুও সীমানা প্রাচীর, দুর্গ, তীর্থস্থান সব বড় শহরেই থাকত (ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ৪৮-৫১)। চীনের প্রাচীরের ধারেকাছে না এলেও কিছু কিছু প্রাচীর যে উল্লেখযোগ্য ছিল না, তা নয়। যেমন অজাতশত্রু রাজগৃহের যে প্রাচীর তৈরি করিয়েছিলেন, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। এটি ছিল ১২ ফুট উঁচু, ১০ ফুট চওড়া এবং লম্বায় ছিল প্রায় ২৫ মাইল (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৯৬-১৩৪, ১৩৯)।

শহরের মূল কর্মকেন্দ্র ছিল দুর্গ। রাজসভা, রাজ-পাকশালা, রাজ-গুদাম, রাজ-কর্মশালা এবং জোর করে খাটানো শ্রমিকদের শিবির-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো এর মধ্যেই থাকত। পাশাপাশি বিরাট সৈন্যবাহিনী সামলানো এবং তাদের ঘোড়া, হাতি, রথ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপুল অর্থ খরচ করা হত (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ২০৫-২০৬)। সামরিক কারণেই শহরের শিল্প, বিশেষ করে অস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল খুবই। কোহেন দেখিয়েছিলেন, সমস্ত প্রাক্-রাজ্য গঠনেই, একই জিনিস ভাঙা এবং গড়ার ব্যাপারটা লক্ষ করা গেছে। রাজ্য গঠনের পর এ ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেনাদলের কাজ ছিল দুটো। বাইরের শত্রুর হাত থেকে রাজ্যবাসীকে বাঁচানো এবং ছোট ছোট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সুবিধাভোগী শাসকদের বিক্ষুব্ধ লোকেদের হাত থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় ব্যাপারটাই ছিল 'দণ্ডের' প্রয়োজনীয় উপকরণ, এটাই ছিল রাষ্ট্রের দমনমূলক ব্যবস্থা, যার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এর সঙ্গে ছিল গুপ্তচর, যারা ঘুরে ঘুরে অসন্তোষ বা বিদ্রোহ কোথায় কীভাবে দানা বাঁধছে তার আগাম খবর এনে দিত। দুর্গ ছিল কর-আরোপের এক বড় কেন্দ্র (ঘোষাল, ইউ.এন. ১৯৭২ : ৩৫)।

নির্মাণ

শহর এবং গ্রামের ভেদরেখার প্রতীক ছিল প্রাচীর। নগর মানে অনেক গ্রামের সমষ্টি বা গ্রামের উন্নত রূপ শুধু ছিল না। ব্যাপারটা ছিল তার চেয়েও বেশি। এর সব কাজ নিচু পর্যায়ে অনুসরণ করা যেত না। কেন্দ্রে যে প্রশাসনিক কাজ হত, তার সব কাজ অন্যান্য অংশে অনুরূপভাবে করা যেত না (কোহেন, ১৯৭৮ : ৩৫-৩৬)। শহর ছিল শ্রমের সামাজিক বিভাজনের এক নতুন পর্যায়।[৪]

নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারটা এবং শাসক শ্রেণির বাসস্থান হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি শহরের আরেকটা কাজ ছিল গ্রামের অর্থনীতির মান নির্ধারণ করে দেওয়া। গ্রামের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থনীতির প্রসার ঘটে, কাজে বৈচিত্র্য দেখা দেয এবং বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কৃষিকাজ জীবনধারণের মূল উপকরণ হলেও অন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন পোশাক, বাসনকোশন, লোহা এবং রুপোর রান্না সরঞ্জাম, কাঠের কাজ ইত্যাদির জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হতে থাকে। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পের আবির্ভাব হতে থাকে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন হয় নতুন পেশাদারিত্ব আর বিশেষজ্ঞতার। শৌখিন তাঁত বস্ত্র, কাঠ, চামড়া অথবা ধাতুর জিনিস, অরণ্যজাত জিনিস যেমন তেল, মধু প্রভৃতি জিনিসপত্রের চাহিদা যে সে সময় খুব বেশি ছিল তা নয়। কারণ অত বড় গ্রামই ছিল কম। তাই জমিতে নিজের ভরণপোষণের মতো ফসল ফলিয়ে, বাকি সময়েই লোকে এই সব শিল্পকর্মে নিয়োজিত হত। অনেক গ্রামের লোক এক হয়ে বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্মে হাত লাগাত, ব্যাপারটা এমনটাও হতে পারে। গ্রামের প্রয়োজনীয় কোনও কাজ, যা গ্রামে করা সম্ভব ছিল না, তা হত শহরে, এবং আশপাশের সমস্ত গ্রাম সেই সুবিধেটা পেত। শহরই আশপাশের গ্রামকে একটা অর্থনীতিক মাপকাঠি জোগাত। একটা কোনও গ্রামের পক্ষে যার জোগান দেওয়া যেত না, যেমন রাজমিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, কর্মকারের কাজ ইত্যাদি তা শহরের বাজারে পাওয়া যেত। কৃষি এবং শিল্পের এই মেলবন্ধনই গ্রামের অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করে তুলেছিল। জাতকের কাহিনি থেকে জানা যায়, শহরকে বেষ্টন করে থাকা গ্রামগুলোতেই থাকত কারিগররা (ঘোষ, এ, ১৯৭৩ : ৫৪। সমস্ত তথ্য দেখে মনে হয় কারিগররা শহরে কাজ করত, থাকত এসে গ্রামে। এই শিল্পীরা সীমিত ক্রয়ক্ষমতার গ্রামীণ খদ্দেরদের জন্য যেমন জিনিস তৈরি করত, তেমনই শহরের উচ্চবিত্ত খরিদ্দারদের, যারা সোনা ও অন্যান্য দামি ধাতুর অলংকার কেনায় আগ্রহী, জন্যও জিনিসপত্র তৈরি করত।

বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোয় কৃষিজীবী, কারিগরদের জেলে এবং গবাদি পশুপালকদের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনই প্রয়োজন ছিল বিপুল সংখ্যক সামাজিক ভৃত্যের। এদের মধ্যে পুরোহিতরা ছিল একদম ওপরে, তারা পুজোআচ্চা করত। একদম নিচে ছিল ডোম, যাদের কাজ ছিল শবদেহ পোড়ানো। এর মাঝামাঝি অনেকেই ছিল যাদের দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা ছিল বিশেষ বিষয়ে, যেমন হিসাবরক্ষক, ধোপা, নাপিত, গ্রামপ্রহরী ইত্যাদি। গ্রামের সার্বিক স্বার্থরক্ষার জন্য দান অথবা ক্ষতিপূরণ হিসেবে গ্রামীণ সমাজ প্রথমদিকে কারিগর এবং গ্রামীণ ভৃত্যদের জমি দিত বলে অনুমান করা হয়। জমি দানের পাশাপাশি

সম্বৎসরের কাজে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু দেওয়ার চল ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি ক্রমশ মুদ্রাকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে থাকে, বিনিময় হার আরও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারটা গ্রামজীবনের গভীরে প্রবেশ করে। এই সময়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য পরিবারগতভাবে ভৃত্য ও কারিগরদের অর্থ দেওয়া হত।

শুরুতে কারিগররা জিনিস তৈরি করত, বেচতও তারা। পরে বিশেষজ্ঞতার ব্যাপারটা এসে যাওয়ায়, শহরে এই দুটো কাজ এর ফলে আলাদা হয়ে যায়। জিনিস বিক্রির ক্ষেত্রে নানা পর্যায় তৈরি হয়, সেই বাণিজ্য-শৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে পড়ে অনেকে। শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে আরেক ধরনের শ্রম-বিভাজন দেখা দেয় এর ফলে।

বিক্রিবাটা

শহরে ছিল ধনী এবং শক্তিশালী লোকেদের বাস। ফলে এখানে ভালো মতো কেনাবেচা হত, কিন্তু তা সত্ত্বেও শহরের মানুষ তার পাশের অঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত আদায় করত। সেই উদ্বৃত্ত গুদামে রাখা হত এবং আরও বড় শহরে পাঠানো হত। তাদের থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ পৌঁছে যেত একদম উঁচু স্তরে, রাজার কাছে। এই দুজনের মাঝে শাসকদের একটা চেইন ছিল, যারা শস্যের ভাগ নিত। গ্রাম থেকে শহর, উদ্বৃত্ত শস্যের এই ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার জন্য দরকার পড়ত এমন জায়গার, যেখানে তা মজুত রাখা যায়। যেখানে থেকে একাংশ আঞ্চলিক স্তরের শাসক এবং ভোক্তাদের মধ্যে বণ্টন করা যায় এবং একটা অংশ ওপরের দিকে, রাজধানী শহরে, পাঠানো যায়।

এই ধরনের জায়গাগুলো গড়ে ওঠে বৃহত্তর গ্রাম বা শহরগুলোতে। এই বিনিময় ব্যবস্থা শহরের বাজার, উৎপাদকদের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেয় (ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ৫২)। জাতকের প্রথম দিকের গল্পে ৫০০ থেকে ১০০০টি যানের ক্যারাভানের উল্লেখও পাওয়া যায়। এই ক্যারাভান চিনি, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কেনাবেচা করত। কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও কেনাবেচা যে ভালো মতন হত, তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। বৈদিক যুগ থেকে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয়ে আসছে, সেগুলো ব্যবহৃত হত। (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৬৯-৭০, ৭৩)। বাজার বিকাশের আর একটা বড় কারণ হল, শহরের বাজারগুলোয় নানা তথ্যেরও আদান-প্রদান হত, যা গণ্ডগ্রামে বসে তখন পাওয়ার জো ছিল না।

কেনাবেচা শুরু হয় শহরে। কিন্তু শহর যেখানে গ্রামে গিয়ে মিশেছে, সেই সীমানা এলাকাতে সরতে থাকে বিকিকিনির হাট। ক্রমশ তা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায়। এবং শহরের সীমানা এলাকাটাই শেষমেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, শহরের ভেতরের চেয়ে। শহরের অর্থনীতির সঙ্গে তার নিবিড় যোগও তৈরি হয়। এর ফলস্বরূপ শহরের এলাকা আয়তনে বাড়তে থাকে। সীমানা যেই বাড়ে, অমনি বাজার নতুন সীমানার দিকে সরে যায়, তখন সেটাই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আবার নতুন করে শহরের সীমানা-পাঁচিল ঠিক করতে হয়। এই ভাবে সারা বিশ্বেই শহর আয়তনে বেড়েছে।

পার্থক্য

এটা মনে রাখা উচিত, ভারতে রাজ্য গঠন প্রক্রিয়াটা সে সময় এমন জায়গায় পৌঁছয়নি যে শহরকে তার চার পাশের গ্রাম থেকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। শহরগুলো এমন প্রান্তিক ছিল যে গ্রাম সহজে শহরের সঙ্গে মিশে যেত। জঙ্গল, গ্রাম ও শহর—এই ছিল তিনটে ভাগ। কিন্তু এই তিনটের মধ্যে ঠিকঠাক ভেদরেখা টানার ব্যাপারটা তখনও সহজ ছিল না, সেটা সম্ভব হয়েছিল পরের দিকে। তুলনামূলকভাবে শহরকে গ্রামের থেকে আলাদা করা যেত তার শ্রেণি দিয়ে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপস্থিতি দিয়ে। যেহেতু কেনাবেচা ছিল শহরের অন্যতম কাজ, তাই এখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শহর নতুন নতুন শিল্প এবং পেশাকে আকর্ষণ করত। জনসংখ্যার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আমলাতন্ত্র। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে তাকে রাজা বা অন্য কোনও নামে ডাকা হত। শহরে এই রাজাকে ঘিরে থাকত পরামর্শদাতা, পুরোহিত, পুলিশ, সেনারা।

শহরে জনসংখ্যার বড় অংশটাই ছিল গরিব। এরা ছিল অসংগঠিত, বেশিরভাগই ভূস্বামীদের খেদিয়ে দেওয়ার কারণে ছোটখাট কাজকর্ম করত। কিছু কিছু শিল্প বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল শহরের অভিজাত শ্রেণির জন্য, যেমন স্বর্ণকার ও তাঁতি। যাদের হাতের কাজ ভালো ছিল না, তারা থাকত গ্রামে, এবং তারা গ্রামীণ সম্প্রদায়েরই অংশ ছিল। শহরে শিল্পী-কারিগররা ছিল ব্যক্তিগত উৎপাদক এবং বিক্রেতা।

গ্রাম-শহরের সম্পর্ক

গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব শহর যবে থেকে তৈরি হয়েছে, তবে থেকেই।[৫] শহর ছিল ক্ষমতাবান আর ধনী লোকেদের বাসস্থান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও দেশ পরিচিত হত তার প্রধান শহরের জন্যই। কৃষিজ উদ্বৃত্ত ভোগ করার এবং বিক্রিবাটা করার জন্যই সুরক্ষিত শহরে এনে রাখা হত। এবং উদ্বৃত্ত সঞ্চালনের জন্য গ্রাম থেকে কর এবং ভূমি রাজস্ব আদায় করত শহর। আমরা আগেই জেনেছি উদ্বৃত্ত ফসল গুদামজাত করা এবং বণ্টনের জন্য শহরে বর্গীয় ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের লোকের কাছে শহরের লোকেরা ছিল অত্যাচারী আর শহরের লোক গ্রামের লোককে গেঁয়ো, কুৎসিত হিসেবে দেখত। যেহেতু শহরে তাদের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খুব ছিল, তাই ব্রাহ্মণরা শহরে সমাজকে ভালো চোখে দেখত না (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৬৯-৭০, ৭৩, ১৯০-১৯২)।

গ্রাম উৎপাদন করত, শহর ভোগ করত—এই ছিল মোদ্দা কথা। উত্তরবঙ্গের ছোট সমস্ত অঞ্চল, মহাস্থানই হোক বা রোম এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলই হোক, শহর-গ্রামের সম্পর্ক ছিল শোষণমূলক এবং নির্ভরশীলতার। শহরের লোকের শিকড় ছিল গ্রামেই। কিন্তু কয়েক পুরুষ শহরে বসবাস করার কারণে, শহরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনই দৃঢ় হয়ে ওঠে। সদ্য শহরে প্রবেশকারীদেরই তাদের উৎসের প্রতি জোরালো টান থাকত।

শহর-জীবনে ভোগই ছিল মুখ্য। কারণ এখানকার লোকেরা ভালো খাবার এবং শৌখিনতার জন্য ব্যয় করতে পারত। শহরে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য গ্রামের উদ্বৃত্ত

উৎপাদনকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। পর্যাপ্ত অবসর সময় পেয়েছে বলেই শহরের লোকেরা এ ব্যাপারে মন দিতে পেরেছিল (ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ৫৫)। গ্রামের লোকের থেকে নিজেদের জীবনযাত্রার মান আরও উঁচু করতে শহরের লোকেরা এমন সব নতুন বিলাস দ্রব্যের দিকে ঝুঁকল, যেমন হাতির দাঁত, মূল্যবান রত্ন বা চন্দনকাঠের তৈরি দুর্মূল্য জিনিস, যা গ্রামের ধনী লোকেদের কাছেও সুলভ ছিল না।[৬]

বাৎস্যায়ন তাঁর কামশাস্ত্রে অমর করেছেন শহরের যৌনজীবন। শহরে নির্লজ্জভাবে যৌনলালসা মেটাতে পতিতাদের নাচ, গান, বাজনা, অঙ্কন ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকল, যা কোনও গ্রাম ভাবতেই পারত না। এইসব মহিলাদের, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ধনুর্বিদ্যা, তলোয়ার চালানো, ব্যায়াম, তর্কশাস্ত্র এবং রসায়ন বিদ্যা শেখানো হত। তার পরও কেন পতিতাবৃত্তি করা ছাড়া ওই সব মহিলাদের আর কোনও গতি ছিল না। এটা কেন হত, তা ছিল বিস্ময়ের। কামসূত্রে বাংলার কথা বলতে গিয়ে, এখানকার শহরে অভিজাত শ্রেণির উদ্দাম যৌনজীবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ১৬৮-১৬৯ রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩১৯, ৩৬১)। এর মধ্যে দিয়ে এক নতুন শহুরে ধনী সম্প্রদায়ের উদয় হয়েছে, যারা প্রধানত ছিল বণিক এবং আমলা। যাদের পক্ষে ওই বিলাসবহুল জীবনযাপন সম্ভব ছিল (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ১২৫)।

শহরের মধ্যে রোজগার, জাত ইত্যাদির ভিত্তিতে লোককে আলাদা করা হত। জর্জ বার্নার্ড শ-ও তাঁর 'আ লা পিগম্যালিয়ন'-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে উচ্চারণ এবং ভাষা শহরের অভিজাত শ্রেণির আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিত। একইভাবে ভারতেও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বৈষম্য করা হত উচ্চারণ এবং কথা বলার ভঙ্গীতে। (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১; জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০)।

কৌটিল্য তাঁর শহর পরিকল্পনায় গণিকাদের জন্য যেমন জায়গা নির্দিষ্ট করেছিলেন, তেমনই কষাইখানারও উল্লেখ করেছিলেন। কষাইখানার উল্লেখ দেখেই বোঝা যায় মাংস খাওয়ার চল খুবই বেশি ছিল। সমাজ যত শহুরে এবং জটিল হতে থাকে, শাসকরা নতুন নতুন জিনিসের স্বাদ পেতে থাকে। পাখি, সরীসৃপ এবং বুনো ও গৃহপালিত পশুর জন্য অভয়ারণ্য তারই একটা প্রমাণ। (কাঙ্গল, আর.পি., ১৯৬৩, খণ্ড ২; ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ২০৫-২০৬)। পাটলিপুত্র প্রাসাদে পাথর এবং খোদাই করা কাজ ছিল। এছাড়াও হাড় এবং হাতির দাঁতের জিনিস, কাঠ, চামড়া, মাটির জিনিস, সুগন্ধী, সোনা ও রুপো পরিষ্কারের জন্য অম্ল ও ক্ষার ইত্যাদির অস্তিত্ব শহরের ধনী শ্রেণির শৌখিনতা এবং ক্রয়ক্ষমতার প্রমাণ (ঠাকুব, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৯৬-১৩৪, ১৩৯)।[৭]

ধর্মনিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক শহর-জীবন

শহর ছিল নানা উৎস থেকে আসা এবং নানা পেশার লোকজনের বাসভূমি। ধর্ম উৎসব-অনুষ্ঠান এই বিভিন্ন মানুষকে এক করত। বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ, উন্নত ভাস্কর্য জাতীয় জিনিস শহরের লোককে দিত বিশেষ পরিচয় যা নিয়ে তারা গর্ব করত। এ সবের জন্য জায়গা অনুদিত হত। এর সঙ্গে ছিল খেলাধুলা ও বিনোদন। উঁচু খাড়া কাঠামো, স্মৃতিস্তম্ভ,

ক্রীড়াঙ্গন, রাস্তা, নালা ইত্যাদি দেখে সেই সময়ের কারিগরি দক্ষতা, জ্যামিতি এবং অঙ্কের জ্ঞানের নমুনা পাওয়া যায়। শহর বিকাশের ক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতিরও ভূমিকা ছিল। (চাইল্ড ভি গর্ডন, ১৯৬৫ : ৩-১৭; ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ২৩-২৪; জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ২৭-৩১, ৩৯)।

তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে আত্মীয়-নির্ভর গ্রামীণ সমাজের চেয়ে শহরের জীবন ছিল মূলত নৈর্ব্যক্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। নগরে বসবাসকারীরাই নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত হত। নগরবাসীর মধ্যে অভিজাত শাসক শ্রেণি, পুরোহিত, প্রশাসনিক লোকজন ছাড়াও বৈদ্য, আইনজীবী, শিক্ষক, কেরানি এবং হিসাবরক্ষকরাও ছিল। আর ছিল সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি। নিজেদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা দিয়ে রোগ সারানোর দাবি-জানানো ব্রাহ্মণদের প্রতিপক্ষ ছিল বৈদ্যরা, যারা রোগের উপসর্গ, লক্ষণ দেখে ওষুধপত্র দিত। শুধু এই কারণেই নয়, চিকিৎসকেরা যেভাবে রোগীর রক্ত, বিষ্ঠা, থুথু ইত্যাদি নিয়ে নাড়াঘাঁটা করত এবং হতদরিদ্র লোকেদের সঙ্গে মিশত, ব্রাহ্মণদের কাছে তা ছিল রীতিমতো ঘৃণ্য। শহরের অর্থনীতি ও সমাজের প্রয়োজনে যারা ধর্মনিবপেক্ষ পেশার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের সঙ্গে, যারা শহরেও ডাকিনী বা জাদুবিদ্যা চালানোর চেষ্টা করত, ছিল চরম রেষারেষি (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ১৮৪, ১৪৯-১৫৯)।

বিমূর্ততা সত্ত্বেও অঙ্কশাস্ত্র ভারতবর্ষকে বিশ্বে অগ্রণী করে তুলেছিল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট আবিষ্কার করেন পাই-য়ের। শূন্য-সহ ভারতীয় সংখ্যাও সার্বজনীন হয়ে ওঠে। আরাবিয়া হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে। রসায়ন প্রথমে ওষুধ-বিজ্ঞান হিসাবে বিকাশলাভ করে পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রের সময়ে বিপথচালিত হয়ে বিষ-বিজ্ঞান হয়ে ওঠে। টেরাকোটার সৃষ্টি হয় শহরেই (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ১৯৭-২০৫, ২১৫-২১৬)।

শহর জীবনে ধর্মের কোনও ভূমিকা ছিল না, এটা ভাবলে ভুল হবে। উলটে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সত্ত্বেও শহর-জীবনে ধর্মস্থানের গুরুত্ব ছিল খুবই। জ্যোতির্বিদ্যার চেয়ে জ্যোতিষের প্রতি শহরের মানুষের আগ্রহ ছিল বেশি। শহর জীবনের মূল যেহেতু গ্রামেই, তাই শহরের লোকেরা তাদের পুরনো সংস্কার বশত ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মন্দির নির্মাণের জন্য জ্যামিতির প্রয়োজন হত, তাই এই বিদ্যার উৎস ছিল ধর্মীয় (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১)। এ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। রাজকীয় খরচখরচার অনেকটাই ছিল মন্দির নির্মাণ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য, আর এটা হত মূলত শহরাঞ্চলে। ভারতীয় শাসকরা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেও, মিশর, পশ্চিম আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় যেমন মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চল ছিল, তা তাদের মধ্যে ছিল না। কায়রো থেকে ২৫ মাইল দূরে সাকারায় মৃতদের স্মরণে যেরকম মস্ত পিরামিড তৈরি করেছিল, ভারতে তেমন কিছু দেখা যায় না।

নাগরিক প্রয়োজন এবং নাগরিক সংস্থাসমূহ

শহর প্রশাসন কেমন চলত তা বোঝা যায় পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী এবং জঞ্জাল পরিষ্কার

রাখার ব্যাপারটা লক্ষ করলে। বাংলার যেসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হত সেখানে পানীয় জলের সমস্যা প্রায় ছিল না। বিশেষভাবে সংরক্ষিত পুকুর থেকেই পাওয়া যেত পানীয় জল। রোমে যেমন পাহাড়ি ঝরনা বা নদী থেকে নালা কেটে জল নামিয়ে আনতে হত, বাংলায় তার দরকার পড়েনি। নদীর জল উপচে শহরে ঢুকে পড়ে অসুবিধের সৃষ্টি না করে, এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হত। যেখানে বৃষ্টি কম হত বা সারা বছর জল ধরে রাখার মতো জলাশয় ছিল না সেখানে কিছুটা সমস্যা দেখা দিত। বাংলার শহর পরিকল্পনায় পয়ঃপ্রণালী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রোম এবং অন্যান্য শহরে জঞ্জাল সরানোর যেমন সুব্যবস্থা ছিল বাংলায় এই প্রয়োজনীয় দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এই কাজটা করানো হত একদম নিচু শ্রেণির লোকেদের দিয়ে, যদিও তাদের শহরের মধ্যে বাস করার অধিকার ছিল না, তাদের অস্পৃশ্য মনে করা হত। শহরের এক পাশে, সাধারণত নদীর ধারে, কোনও জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হত মৃতদেহ সৎকারের জন্য।

শহর-জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন দেখার জন্য বিশেষ প্রশাসনিক দপ্তর ছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রাচীন শহরেই কম-বেশি স্বয়ংশাসিত প্রশাসন ছিল (জোবার্গ, গীডিয়ন, ১৯৬০ : ৬৯, ৭৩)। এই স্বয়ংশাসিত কর্তৃপক্ষকে বলা হত 'অধিকরণ'। শহরের গণ্যমান্য লোক, যেমন কারিগর, বণিক, আমলা এবং নাগরিক ও বিচারবিভাগীয় লোকেদের নিয়ে গঠিত হত। ফৌজদারি অপরাধ বা জমিজমা নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করত অধিকরণ। জমি হস্তান্তরের ব্যাপারেও এর অনুমতি লাগত। শূদ্রক রচিত সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ অধিকরণকে সাহায্যকারী সংঘ সভাপতি এবং তার সহকারীদের কথা আছে। অধিকরণের মুখ্য সদস্য হিসাবে নামী কারিগর, বড় বণিক, সংঘ সভাপতি প্রমুখের কথা জানা যায় বিভিন্ন লিপি থেকে (ঘোষাল, ইউ.এন., ১৯৭২ : ২৬৮-২৬৯)। বড় শহরে এই স্বয়ংশাসন ছিল পূর্ণমাত্রায় (আলতেকার, এ.এস., ১৯৭২ : ১৩৫)। গ্রিক সূত্রে জানা যায়, পাঞ্জাবের বহু শহর শাসিত হত তাদের নিজস্ব আদালত এবং বিচারক দ্বারা (আলতেকার, এ.এস., ১৯৭২ : ৩২৩)। উপজাতি প্রজাতন্ত্রের কথা বাদ দিলে, এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন রাজনৈতিক-সামাজিক সমতাবাদের অস্তিত্বের কথা জানান দিলেও না, রাজকীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে চিহ্নিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতিরা ক্রমশ জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, এমন কি শহরেও।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলে এই স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো কমজোরি হতে থাকে এবং আমলাতন্ত্রের প্রভাব বাড়ে।

কারিগর ও বণিক সভা

শহর-প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কারিগর সমিতি। রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে এই সমিতি ছিল স্বয়ংশাসিত এবং গণতান্ত্রিক। সমিতির সাধারণ সম্মেলন হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে। যারা খুব জোরে কথা বলত অথবা অন্যকে কথা বলতে দিত না, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। সমিতির প্রতিদিনের কাজকর্ম দেখাশোনা করত ২-৩ জন কর্মনির্বাহী। সমিতি ব্যাঙ্কের মতোই কাজ করত, টাকা রাখত, ধার দিত। সমিতির লাভ যার যেমন অবদান, তদনুযায়ী

বণ্টিত হত (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ১৩৫-১৩৭)।

কারিগর এবং বণিকদের নানা ধরনের সমিতি ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল নিজস্ব সদস্যদের স্বার্থ দেখা। সদস্যদের সমিতির নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। শিক্ষার্থীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ কীভাবে দেওয়া হবে অথবা প্রশিক্ষণের সময় বড়রা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কীরকম আচরণ করবে, নিয়মকানুনের মধ্যে তারও উল্লেখ থাকত। সমিতির অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল, ক্রেতাদের জন্য দাম নির্দিষ্ট করা, প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রিত করা, দিনমজুরদের মজুরি নির্ধারণ, ওজন ও গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে কি না দেখা।[৮] বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারেও সমিতি নজর দিত।[৯] একজন কারিগরের মূলধন ছিল বাড়ি, তার দক্ষতা, তার যন্ত্রপাতি এবং বংশানুক্রমিক ক্রেতার দল। একজন কারিগর তার মৃত্যু বা অবসর নেওয়ার আগে উত্তরাধিকারীকে নিজের দক্ষতা, জ্ঞান এবং যন্ত্রপাতি, কর্মশালা সবই দিয়ে যেত (মার্কস ও এঙ্গেলস্, ১৯৭৯: ৪৪)।

সমিতিতে বিশেষজ্ঞতার ব্যাপারটা তেমন ছিল না। কে তৈরি করছে এবং কে বেচছে এই নিয়ে পার্থক্য করা হত না। শিল্পীরা যখন তাদের হাতে-গড়া জিনিস পেশাদার দোকানদারদের হাতে বেচার জন্য দিত, তখনই বিশেষজ্ঞতার প্রশ্ন আসে। ইতিপূর্বে সব কারিগরকেই পুরো কাজের ভার নিতে হত, এমনকী, নিজেদের যন্ত্রপাতিও তৈরি করে নিতে হত। কলকারখানার শ্রমিকদের মতো তাদের কাজে অবশ্য একঘেয়েমি ছিল না, এটাই ছিল ভালো দিক। তাঁরা তাদের কাজকে ভালোবাসত, কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল, তার উৎকর্ষের প্রতি দায়বদ্ধও ছিল (মার্কস ও এঙ্গেলস্, ১৯৭৯ : ৪৪-৪৫)

সমিতির মধ্যে আরেক ধরনের বৈপরীত্য ছিল, যার কথা খুব কমই বলা হয়। একদিকে ছিল গ্রাম থেকে একা শহরে চলে আসা, চালচুলোহীন, অদক্ষ শ্রমিক, যারা পরস্পরকে চিনত না, এবং যাদের দরাদরি করার ক্ষমতা ছিল না। বিপরীতে ছিল সংঘবদ্ধ সুবিধাভোগী শ্রেণি, যাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। গ্রাম থেকে নিম্নবর্ণের কৃষকদের শহরে চলে আসার অন্যতম কারণ ছিল জমিদারের অত্যাচার বা জাতিভেদ প্রথার বাড়াবাড়ি। অসংগঠিত এবং অদক্ষ বলে শহরেও যে তারা খুব ভালোভাবে থাকত তা নয়। তা সত্ত্বেও অন্য দিনমজুরদের সঙ্গে মেশার চেয়ে তারা তাদের মালিকদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করত, স্বপ্ন দেখত ভবিষ্যতে বড় কারিগর হওয়ার। (মার্কস ও এঙ্গেলস, ১৯৭৯ : ৪৩-৪৪)। যে মালিকের অধীনে কাজ করত সেই পরিচয় ছাড়া আরেকটা পরিচয় তারা খুঁজে পেত, শহরে বসবাসকারী তার গ্রামের স্বজাতির মধ্যে।

পতঞ্জলি বসতিকে চারভাগে ভাগ করেছেন—গ্রাম, ঘোষ, নগর ও সমবাহ। 'গ্রাম' বলতে বোঝাত গ্রামকে এবং 'ঘোষ' ছিল খোঁয়াড় সমেত মেষপালকদের বসতি। 'নগর' বলতে বোঝাত শহর। 'সমবাহ' ছিল নিগম অথবা বাজার-শহর। সম্ভবত এটা ছিল শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি কোনও অবস্থা, অনেকটা এখনকার মফস্বলের মতো। শহর আজকের মতো অতটা বিচ্ছিন্ন ছিল না। এখানকার শ্রমবিভাজন ছিল বেশ জটিল এবং পেশাগত বিশেষজ্ঞতা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতি এখানে ছিল বেশ উন্নত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিল কমজোরি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল হালকা, নৈর্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রক

সংস্থার ওপর নির্ভরতা ছিল বেশি, ধর্ম ও কুসংস্কার বিশ্বাসে তেমন জোর দেওয়া হত না। সর্বোপরি ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল পর্যাপ্ত (ঘোষ, এ., ১৯৭৩ : ৩৮)।

ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের সাহিত্যে নগরায়ণের ব্যাপারটা উল্টোমুখী হয়ে পড়ার জন্য সমিতির উল্লেখ তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তার কারণ সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ায় কারিগররা আবার জমিতে ফিরে আসে। এর অনেকগুলোই, পেশাদার সংগঠন থেকে অনমনীয়, বংশানুক্রমিক এবং জাতভিত্তিক হয়ে পড়ে (কোসাম্বি, ডি. ডি. ১৯৬৫ : ১৯৬; ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ১৬৪)।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নগরায়ণ

বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজ্য গঠনের আগের পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নিগম বলতে বোঝানো হয়েছে ছোট শহর বা গ্রাম-শহরের মাঝামাঝি কোনও অবস্থাকে এবং বড় মাপের বলা হয়েছে নগর। দুর্গকে উল্লেখ করা হত পুর হিসেবে। হিসাবে নগরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যেমন ১৬০০০ গ্রামের মধ্যে নগর ছিল মাত্র একটা। নগরায়ণ পদ্ধতি যে খুবই ধীবগতির ছিল, এ থেকেই তা বোঝা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ছটা মহানগরের উল্লেখ আছে— সাবিথি, চম্পা, রাজগহ, সাকেত, কোশম্বী এবং বারাণসী। পরে উল্লেখযোগ্য হয়ে-ওঠা 'কুশীনর' কে বলা হয়েছে 'নাগরিকা' মানে ছোট জঙ্গল-শহর।[১০] (রীস ডেভিডস্, সি.এ.এফ., ১৯৬২ : ১৭৮-১৭৯)।

শহরের জনসংখ্যার তিনটি প্রধান শ্রেণি ছিল বণিক, কারিগর এবং সরকারি কর্মচারী। বৌদ্ধ সাহিত্যে উত্তর ভারতের শহরে ১৮টা সমিতির উল্লেখ আছে।[১১] সেগুলো হল ছুতোর, লৌহকার, চর্মকার এবং চিত্রশিল্পীদের। বাকি ১৪টার কথা কিছু বলা হয়নি। এই সমিতির সভাপতিকে বলা হত 'পমুখ' বা 'জেথক'। সমস্ত সমিতির মাথায় একটা দপ্তর থাকত। সেখানে থাকত একজন কোষাধ্যক্ষ 'ভাণ্ডাগারিক', যার কাজ ছিল সমিতির বা সংঘের মালপত্রের তদারকি করা।[১২] শহর-জীবনে বণিকদের স্থান ছিল খুবই উঁচু। তাদের বলা হত 'শেঠি'। এই শেঠিদের যে প্রধান তাকে বলা হত 'মহাশেঠি'। মহাশেঠিকে তার কাজকর্মে সাহায্য করত 'অনুশেঠি'রা।

সে সময় পেশাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক হত। যেমন কামারের ছেলে কামারই হত। এছাড়া এক সঙ্গে খেতে বসার ব্যাপারেও বিধিনিষেধ ছিল, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল একপাতে বসে খেতে পারত না। এ ঘটনাগুলো বাদ দিলেও পুরো বর্ণাশ্রম ব্যাপারটা শ্রেণি বিভাজন ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। রাজপুত্র, ব্রাহ্মণ এবং বণিকদের মধ্যে বন্ধুত্ব হত, তারা এক সঙ্গে সময় কাটাত, তাদের পুত্ররা একই গুরুর কাছে পাঠ নিত, খেত এক সঙ্গে, আনন্দ করতও একসঙ্গে। সামাজিক বিভাজন এবং অর্থনৈতিক পেশাগুলো মিলেমিশে যেত না। শ্রম এবং পুঁজি দুই-ই ছিল বেশ সচল (রীস, ডেভিডস্, ১৯৬২ : ১৮৩-১৮৭)।

জাতকের কাহিনিতে বাণিজ্যের কথা খুব আছে। এমনকী মরুভূমি বা সাগর পেরিয়েও বাণিজ্য করার কাহিনিও তাতে রয়েছে। যেসব জিনিস নিয়ে বাণিজ্য হত তার মধ্যে ছিল রেশম, মসলিন, রত্ন, জরি, কাচের বাসন, লোহার জিনিস, এমব্রয়ডারি,

কম্বল, সুগন্ধী, ওষুধ, হাতির দাঁতের কাজ, সোনার অলঙ্কার এবং সোনা। বহু বাণিজ্যপথের অন্যতম ছিল পাটলিপুত্র এবং তামলিপ্তি (তাম্রলিপ্ত) হয়ে শ্রীলঙ্কা।[১২] গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর বিশেষ অঞ্চল সেখানকার বাণিজ্য বস্তুর জন্য চিহ্নিত হয়ে যেত। যেমন কোনও স্থান মাছের, কোনও স্থান আনাজপাতির। কষাইখানা থাকত শহর-সীমানার বাইরে। জাতকের কাহিনিতে তাঁত ফেব্রিক, মুদিখানা দ্রব্য, তেল, আনাজপাতি, শস্য, সুগন্ধী, ফুল, সোনা এবং রত্নালংকার বাজারে বিক্রির কথা বলা হয়েছে। এমনকী, মদ বিক্রির কথাও বাদ যায়নি। কিন্তু গ্রামে হাট বসার কথা নেই। হাট-বাজার সম্ভবত অনেক পরে গড়ে উঠেছিল। জিনিসপত্র নিয়ে দরকষাকষির ব্যাপারটা তখন ছিল। জিনিসপত্রের ঠিক দাম নেওয়া হচ্ছে কিনা দেখার জন্য 'অর্ঘ্যকর্তা' ছিল। তার আরও কাজ ছিল শহরে আসা জিনিসের ওপর ১০ শতাংশ লেভি চাপানো, সঙ্গে একটা নমুনা নেওয়া। এই নিয়মটা অবশ্য মনুই চালু করেছিলেন। লেনদেন মুদ্রার সাহায্যে হলেও বিনিময় প্রথাও পাশাপাশি চলত। তেজারতি কারবার অনুমোদিত ছিল, ছিল বন্ধকী ব্যবসাও। এমনকি স্ত্রী, পুত্রকেও বন্ধক রাখার কথা ষষ্ঠ ও সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় (রীস, ডেভিডস্, সি.এ.এফ., ১৯৬২ : ১৯৩-১৯৫)।

জাতকের গল্পে বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ শহরাঞ্চলেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল বেশি। ব্রাহ্মণদের প্রাণিহত্যা ও কঠোর অনুশাসনবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই উঠে এসেছিল এই ধর্ম। এতে ছিল সারল্য আর মিতব্যয়িতার কথা। বুদ্ধ রোজগারের এক-চতুর্থাংশ জমাতে, এক-চতুর্থাংশ জীবন ধারণ করতে এবং বাকি অর্ধাংশ ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য খরচ করা উচিত বলে মনে করতেন (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ১৯৩)। প্রকৃতপক্ষে ওই সময়ে সংঘ যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল, নানা জায়গায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার সিয়াদোনি নামে শহরে তেল প্রক্রিয়াকরণ, মৃৎপাত্র, নুন, মদ, পান পাতা, পাথর খোদাই এবং কামারের কাজে বিশেষজ্ঞ ছাড়াও, নানা ধরনের ব্যবসায়ীরা যে থাকত তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মীয় ব্যাপারস্যাপার ছাড়াও সংঘ নানা ধরনের কাজের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে ছিল। এটা বর্ণাশ্রম এবং আঞ্চলিক সীমারেখাও মানত না। এদের অন্যতম বড় কাজের মধ্যে ছিল মন্দির তৈরি আর তার রক্ষণাবেক্ষণ করা, এ কাজের জন্য সংঘ বণিকদের কাছ থেকে চাঁদাও নিত। সেই টাকা থেকেই আবার সুদের বিনিময়ে বণিকদের ধার দেওয়া হত (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৪২-১৪৫)।

নাগরিক অবক্ষয় ও তার ফলে গ্রামায়ণ

নথিপত্র থেকে জানা যায় প্রথম সহস্রাব্দের শেষ বছর থেকেই নাগরিক অবক্ষয় শুরু হয়। শহরের বাড়বাড়ন্ত ভাব কমতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দীতে আসা চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন নগর-অবক্ষয়ের কিছু স্পষ্ট বিবরণ দিয়ে গেছেন, যা আড়াই শতক পরে আসা উয়ান চোয়াংও সমর্থন করেছেন (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ২৬১)।[১৩]

ষষ্ঠ ও সপ্তম খ্রিস্টাব্দে নাগরিক বিকাশ প্রায় কিছুই হয়নি। এর একটা কারণ হতে পারে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন। এর ফলে ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।

যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও শেষ হয়ে যায় রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, আর হুন আক্রমণে (কোসাম্বি, ডি. ডি. ১৯৬৫ : ১৮৫; শর্মা, আর.এস., ১৯৮৭ : ১৩৫-১৩৬)। এ দেশের নানা অংশ থেকে পাওয়া প্রচুর রোমান মুদ্রাই প্রমাণ করে যে, এক সময় এ দেশের সঙ্গে রোম ও তার আশপাশের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। পাশাপাশিভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন এবং তারপর কয়েক শতক ধরে ইউরোপের বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ থেকে সেই মুদ্রাও উধাও হয়ে যায়। এটা ভারতীয় অর্থনীতির ভেঙে পড়াকেই সূচিত করে।[১৪] শুধু রোমান মুদ্রা নয়, সমস্ত ধরনের মুদ্রারই ওইসময় ঘাটতি দেখা দেয়।[১৫]

প্রায় তিন শতাব্দী কোনও স্বর্ণমুদ্রার দেখা পাওয়া যায়নি। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে যখন তা আবার ফিরে এল, তাতে সোনার পরিমাণ খুবই কম। তুর্কি-আফগান হামলার আগে দুটো বড় সাম্রাজ্যের অন্যতম গুপ্ত সাম্রাজ্যে শহরে কোনও টাকশাল ছিল না। শিলমোহর ব্যবহৃত হত ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক কাজে। বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি (ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৩১৭; শর্মা, আর.এস, ১৯৮৭ : ১২৪-২৫, ১৩২, ১৩৬)।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও তার পরবর্তী বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য ভারত থেকে রেশম দ্রব্য কিনত, এই কারণে এখানকার অর্থনীতি কিছুটা হালে পানি পেয়েছিল। কিন্তু পরে ওরা চীনাদের কাছে রেশম কীট চাষ শিখে নিলে ভারতের বাজার কমে যায় (শর্মা, আর.এস., ১৯৮৭; ঠাকুর, বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ৩১৮)। রোম সাম্রাজ্যের পতন, তারপর বাইজেনটাইনদের রেশম চাষ শিখে ফেলার সঙ্গে আর একটা বিপদ আসে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হুন আক্রমণ। সেটা পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের পর শুরু হয়। হুনেদের পরে পরেই আসে গুর্জর আর আহিররা। ফলে ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় (থাপর, রমিলা, ১৯৮৭ : ১০; ঠাকুর বিজয়কুমার, ১৯৮১ : ২৬৩, ৩০৮)।[১৬] বিস্তৃত অঞ্চল আরবদের দখলে চলে যাওয়ার জন্যই ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটে। সঙ্গে শহর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বৌদ্ধ ধর্মের পতনও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। তার সঙ্গে সাতবাহন, কুষান এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন তো ছিলই (শর্মা, আর. এস., ১৯৮৭ : ১৩২)।

নাগরিক অবক্ষয় এবং বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য পড়ে যাওয়ার ফলে সমাজ গ্রামমুখী হয়ে পড়ে। কারিগররা শহর ছেড়ে দলে দলে গ্রামে ফিরতে থাকে। সামন্ততন্ত্রের উত্থান, জমি অনুদান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে গ্রামের কথা আগে আলোচিত হয়েছে, তা উঠে আসে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে। নাগরিক সংঘগুলো জাতিভেদে আটকে পড়ে। দুর্গ সংরক্ষণ, প্রাসাদ, তীর্থস্থান এবং মন্দির তৈরি হয়ে ওঠে নব্য নাগরিক বৈশিষ্ট্য (শর্মা, আর. এস., ১৯৮৭ : ১৬৭-১৭৭; চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৩০-১৩১)।

বাংলায় নগরায়ণের ছক : তাম্রলিপির প্রমাণ

বাংলায় নগরায়ণ শুরু হয়েছে উত্তর ও মধ্যভারতের কয়েক শতক পরে। মৌর্য রাজত্বের সময় বাংলায় আমরা মাত্র কয়েকটা শহরের কথা শুনি। যেমন দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত এবং উত্তরবঙ্গে মহাস্থান। যদিও এই দুটো শহরের সঙ্গে বাকি দেশের যোগ ছিল খুবই কম। প্রাক্-লৌহ যুগে গভীর অরণ্য বিরাট বাঁধা স্বরূপ ছিল। তা সত্ত্বেও উপকূল দিয়ে বহু বাণিজ্যপণ্য যে বিদেশে গেছে, তা গ্রিকদের কাজ থেকেই জানা যায়। পুণ্ড্র থেকে উত্তরবঙ্গে আসা তাঁত বস্ত্র যে তার মধ্যে সেরা ছিল, সে কথা বলে গেছেন স্বয়ং কৌটিল্য।

গুপ্তরাজাদের আমলে বাংলা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বহু শতাব্দী পরেও বাংলায় নগরায়ণের গতি ছিল খুবই মন্থর। লিপি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, এর পরে পরেই কয়েকটা শহরের পত্তন হয়। কিন্তু ওই সময়টাতে সারা দেশেই নগরায়ণের পতন ঘটছিল। মূলত ষষ্ঠ শতাব্দীর পর, যখন বণিকরা নিদারুণ লোকসানের মধ্যে পড়ে, বাণিজ্য থমকে যায়, মুদ্রা বিনিময়ের হার একদম নিচে নেমে আসে। বাংলার অর্থনীতির পক্ষে এই সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলানোর মতো শক্তি ছিল না। বিশেষত ৭ম শতাব্দীতে বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য-দুটোরই ক্ষতি হয় বিপুল, ধাতব মুদ্রার প্রসার কমতে থাকে। এর ফলে, শাসকশ্রেণি এবং সাধারণ মানুষ জীবনধারণের জন্য জমিতেই আশ্রয় নেয় এবং নগরায়ণ কমে যায়। নাগরিক অবক্ষয়, বাণিজ্য ও বিনিময় পড়ে যাওয়ায় গ্রামকে লড়তে হয় স্বয়ম্ভরতার জন্য (শর্মা, আর. এস., ১৯৮৭ : ১৬৭, ১৭৭)।

বাংলায় নগরায়ণের ব্যাপারটা কেমনভাবে হয়েছে, তার চেহারা কী ছিল, এটা সবচেয়ে ভালো জানা যায় দান-করা জমির তাম্রপত্র থেকে। ৪৩৩ থেকে ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জমি হস্তান্তর ও দান করার প্রমাণ হিসাবে ৭১টা তাম্রলিপি পাওয়া যায়। তাম্রফলকে লেখার ব্যাপারে বাংলার রাজারা সর্বভারতীয় ঐতিহ্য মেনে চলতেন। বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস-এর শাস্ত্র এবং গুপ্ত ও পল্লবদের নমুনা অনুসরণ করত। সাধারণভাবে তাম্রলিপিগুলো ছিল চার রকমের—

(ক) হাতবদলের অনুমোদন দেওয়ার সময় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কথা ঘোষণা করা হত।

(খ) যে সম্পত্তিটা হাতবদল হচ্ছে তার সীমানা, কে পাচ্ছে এবং গ্রহীতা কোন কোন শর্তে তা ভোগ করতে পারে উল্লেখ করা হত।

(গ) হস্তান্তরের ব্যাপারটা যে কার্যনির্বাহী ব্যক্তি করত, তাকে আবার সরকারের কাছে এই হস্তান্তরকে স্বীকার করার জন্য আবেদন করতে হত।

(ঘ) তারিখ, যেখান থেকে অনুমোদন দেওয়া হল সেই জায়গার নাম, এবং অনুমোদনকারী সংস্থার কিছু প্রামাণ্য ছাড়পত্রও থাকত।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টিত এই তাম্রপত্রগুলো থেকে কোন অঞ্চলের গুরুত্ব কতখানি বোঝা যেত। সবচেয়ে ঘনবসতি ছিল যমুনার পূর্বতীরস্থ বারেন্দ্র অঞ্চলের, মহানন্দার পশ্চিমাংশের এবং গঙ্গার উত্তরাঞ্চলে। গঙ্গার উত্তরাঞ্চলকে বলা হত

পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। এর অন্তর্গত ছিল বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুরা এবং দিনাজপুর। দ্বিতীয় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল পশ্চিমের রাঢ় বা সুহ্ম আর ভাগীরথীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যথা ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরে, যা তখন কঙ্কগ্রামভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি বলে পরিচিত ছিল। তৃতীয় অঞ্চল ছিল পূর্ব উপকূলবর্তী 'সমতট'। এখনকার বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং বাখরগঞ্জ এবং ঐতিহাসিক অঞ্চল হরিকেলা (কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতী অঞ্চল) এবং পাট্টিকেরা যার মধ্যে পড়ত। আধুনিক ঢাকা এবং ফরিদপুর ছিল চতুর্থ অঞ্চল। তখন এর নাম ছিল 'বঙ্গ'। বাংলার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এই চার অঞ্চলে (মরিসন, বি.এস., ১৯৬৯ : ৩)।

বারেন্দ্র অঞ্চলে পাওয়া তাম্রপত্র থেকে জানা যায় বিহারের নিকটবর্তী এই এলাকা ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে যে সব তাম্রপত্র পাওয়া গেছে তাতে আর গুপ্তরাজাদের নাম ছিল না। সেগুলো দেওয়া হয়েছে বিক্রমপুর এবং বঙ্গ থেকে। রাঢ় ও ভাগীরথী অঞ্চলের ফলক পাওয়া যায় কর্ণসুবর্ণ, তাভিরা (মেদিনীপুর) এবং বর্ধমান থেকে। এবং ১০ম শতাব্দীতে বারেন্দ্র অঞ্চল থেকে পাওয়া ফলকে বিক্রমপুর, বঙ্গর উল্লেখ আছে। স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চল প্রথমে শাসন করেছে বঙ্গ, পরে সেন বংশ। তবে পাল বংশের উল্লেখও দুটো ফলকে পাওয়া গেছে (মরিসন, বি.এস., ১৯৬৯ : ৩-৪)। সমতটেও পরের দিকের ফলকে বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। এই বিক্রমপুর ছিল প্রধান নগর-কেন্দ্র। এই অঞ্চলটা যে অন্য অঞ্চলগুলোর চেয়ে স্বাধীন ছিল, তা বোঝা যায় এখান থেকে পাওয়া ফলকে এই অঞ্চলেরই নামের উল্লেখ দেখে। অন্যদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর প্রাধান্য বিস্তার করে বঙ্গ অঞ্চল। চন্দ্র রাজাদের সময় সমতট অনেকটা সময় ধরে স্বশাসন চালিয়ে এসেছে। কিন্তু পরে, ১০ম শতাব্দী থেকে এটা বিক্রমপুরের অধীনে চলে যায়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে চন্দ্র, পাল এবং সেন-এর তিনটিই ছিল প্রধান রাজবংশ (মরিসন, বি.এম., ১৯৬৯ : ৪-৮।

তাম্রফলক থেকে জানা যায়, জমি ব্রাহ্মণদের দান করা হত মূলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। একমাত্র সমতটেই বৌদ্ধ সংঘকে জমি দেওয়া হয়েছিল, ১৭টা ফলকের ৬টাতে এর উল্লেখ আছে। এই ধরনের জমি দেওয়ার ব্যাপারটা মূলত শহর ও আধা-শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে ভালো জমি-জায়গা দুষ্প্রাপ্য ছিল। গ্রামে, বিশেষত বনাঞ্চলে পড়ে-থাকা জমি ছিল পর্যাপ্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আস্ত গ্রামই কেনা হত, কিন্তু এই হস্তান্তর শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকারের জন্যই, সত্যিকারের গ্রামদখলের জন্য নয় (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ১৭৯-২০৪, ২৬৪)।

সব মিলিয়ে এই ফলকগুলো থেকে নগরায়ণের ধাঁচ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। পাল এবং সেনযুগে আমলাতন্ত্রের যে বাড়বাড়ন্ত ছিল, একথা আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে (ইটন, আর.এস, ১৯৯৩ : ১৫; রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ২৬৩, ২৭০)। জমি দানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কিসের ওপর নির্ভর করত, সেই প্রশাসনের কাঠামো, তার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে ফলকগুলো কিছু না কিছু জানিয়েছে (মরিসন, বি.এস.,

১৯৭০ : ১২৫)। যেমন পাহাড়পুর থেকে পাওয়া ফলকে থাকার জমি ও জলাজমি কেনাব কথা লেখা আছে। তাতে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির পুণ্ড্রবর্ধনের মেয়রের কাছে আবেদন রযেছে। আবেদন পাওয়ার পর অধিকরণ (কাউন্সিল) পুস্তপালের (রেকর্ড কিপাব) কাছে যাচাইয়ের জন্য পাঠাত। আবেদন গৃহীত হলে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জমি হস্তান্তর হত। অধিকরণ গ্রামের প্রধানকে আদেশ দিত তার জমি চিহ্নিত করে, সীমানা ঠিক করে দেওয়ার। কোটিবর্ষে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বকারী 'উপরিকর্মরাজ' থেকে 'উপরিক'-এর কথা বলা হয়েছে। এরা 'নগর শ্রেষ্ঠী' রিভূপাল, বণিক বসুমিত্র, প্রধান 'কুলিক' (কারিগর) 'বরদত্ত' এবং প্রধান পুরোহিত 'বিপ্রপাল'-এর সঙ্গে নগর-প্রশাসন দেখত। কোটিবর্ষ ফলকে পরিত্যক্ত জমির কথা বলা হয়েছে, এর জন্য কোনও রাজস্ব দিতে হত না, ২ দিনারের পরিবর্তে এই জমি হস্তান্তর করা হত।

জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার কথা বহু তাম্রলিপিতেই পাওয়া যায়। পরের দিকে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার কোনও উল্লেখ আর পাওয়া যায় না তাম্রলিপিতে। স্থানীয় প্রশাসনে স্বায়ত্তশাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের বিস্তার শুরু হয়। প্রশাসনের স্তরভেদের কথা বিস্তারিতভাবে লিখিত হয় ফলকে। চন্দ্র রাজা যেসব তাম্রফলক চালু করেছিলেন তাতে গোপচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার নিচে ছিল বর্ধমানভুক্তির আধিকারিকরা। তার অধস্তন ছিল কার্তকৃতিকা, কুমারামাত্য (প্রধানমন্ত্রী), চৌরদ্ধরণিকা (উচ্চপদস্থ পুলিশ), উপারিধ (আঞ্চলিক শাসক), ঔদ্রঙ্গিকা (স্থায়ী ভাড়াটেদের কাছ থেকে নেওয়া কর 'উদ্রঙ্গ' আদায়কারী), অগ্রহরিকা (অগ্রহর জমির তত্ত্বাবধায়ক), ঔরনস্থানিকা (পশম দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক), ভোগপ্তিকা, বিশ্বপতি, তাড্য যুক্তক (অথবা আয়ুক্তক), হিরণ্যসমুদায়িক (নগদকর আদায়কারী), পাট্টালক (ছোট অঞ্চলের অফিসার ইনচার্জ), অবস্থিকা (সরকারি ভবন পরিদর্শক), দেবদেবীর মূর্তি বিসর্জনের ব্যাপারটা দেখার জন্য একজন থাকত, তাকে বলত 'দেবদ্রোণী'। ভুক্তি পর্যায়ের অফিসাররা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মহারাজা বিজয়সেনও তাদের সম্মান করতেন, তবে লেনদেনের ব্যাপারে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। তাভিরা ফলকে বলা হয়েছে, তাভিরার প্রশাসনিক অফিসে বিখ্যাত ব্রাহ্মণরা ছিল। দণ্ডভুক্তিতে (যেমন দাঁতন) অফিস শুধুমাত্র টাকা গ্রহণ করত এবং লেনদেন সম্পূর্ণ করত। এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সবসময়ই এসব এড়িয়ে চলত (মরিসন; শর্মা, আর. এস., ১৯৮৭ : ১০৮-১০৯)।[১৭]

ওই সময়ে বেশ কিছু বড় শহর গড়ে ওঠে। উত্তরে পুণ্ড্র (কিছু সময়ের জন্য কর্ণ-সুবর্ণ ও পরে গৌড়)। পূর্বে বিক্রমপুর এবং দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত ছিল বড় শহর। কিন্তু বড় হলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মস্ত শহর পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, সাকেত অথবা বারাণসীর মতো বড় ছিল না। এ ছাড়াও তাম্রলিপি ও অন্যান্য নথিপত্রে আরও অনেক শহরের কথা আছে।[১৮] কিন্তু এত সত্ত্বেও এগুলো থেকে জানা যায় না যে, শহরগুলো কত বড় ছিল, কত লোক বাস করত অথবা তারা কীভাবে দিন কাটাত, এমনকী, কতদিন তাদের প্রাধান্য বজায় ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং পর্যটকদের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ

বাংলার প্রত্নতত্ত্বকে জানার জন্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। এক, সংস্কৃত এবং গ্রিসীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে নগর এবং বিভিন্ন স্থানের লিখিত উল্লেখ, দুই ফ্রানসিস বুচানন হ্যামিলটনের মতো পণ্ডিতেরা এ দেশে এসে ধ্বংসাবশেষ নির্ণয়ে যে উৎসাহব্যঞ্জক কাজ করেছেন তার উপর (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪ : ১)। মহাস্থানগড় এবং পুণ্ড্রবর্ধন কোথায় ছিল আলেকজান্দার কানিংহাম তা জেনেছিলেন য়ুয়াং চোয়াং (মতান্তরে হিউয়েন সাং) এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪ : ৫)। যদিও, নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহের কাজ এখনও পর্যন্ত যা হয়েছে তা বিভিন্ন পুকুর বা খানাখন্দ প্রভৃতি মাটির উপরিতল থেকে দুর্ঘটনাবশত পাওয়া। মাটির নীচের প্রাচীন যুগের নিদর্শন সংগ্রহের কাজ এখনও অনেকটাই বাকি (সেনগুপ্ত, গৌতম, ১৯৯৪ : ২৯৩-২৯৪)। আমরা এখন বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিভিন্ন সূত্র এবং নানা ভ্রমণ বিবরণী থেকে প্রাপ্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবো।

তাম্রলিপ্ত : গ্রিক এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি গঙ্গা, অথবা পার্থালিস্ গ্যাঞ্জেস তীরবর্তী তাম্রলিপ্তই বাংলার প্রাচীনতম শহর। সেই যুগে তাম্রলিপ্ত[১৯] সম্ভবত সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল।[২০] তাম্রলিপ্তের অতীতকথা আমরা জানতে পারি দুই মহান চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতক) এবং য়ুয়াং চোয়াং (সপ্তম শতকের মাঝামাঝি)-এর বিবরণী থেকে। বৌদ্ধপরিব্রাজক ফা-হিয়েনকে যা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল তা হল এখানের চব্বিশটি সংঘারামের উপস্থিতি যার প্রত্যেকটিতে আবাসিক পুরোহিতরা থাকতেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। ফা-হিয়েন এ দেশে দুবছর থেকে যে বিবরণী দিয়েছেন তাতে বৌদ্ধধর্মের সংবাদই বেশি পাই। জনজীবনের খবরাখবর খুবই কম!

অবশ্য প্রায় আড়াই-শতাব্দী পরে আসা য়ুয়াং চোয়াঙের বই তাম্রলিপ্তের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। তার বিবরণীতে পাই সমুদ্রের মুখের কাছে এই শহরের আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, প্রকৃতির বর্ণনা এবং এখানকার মানুষের স্বভাব এবং পরাক্রমের সংবাদ। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি তিনি এখানে পঞ্চাশটি হিন্দু দেবমন্দিরেরও উল্লেখ করেছেন। 'হিন্দু' শব্দটি তখন অজ্ঞাত ছিল। বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এখানে বসবাস করত এবং জনসাধারণের অবস্থা মোটের উপর সচ্ছলই ছিল। তিনি দশটি বৌদ্ধ সংঘারামও দেখেছিলেন, যেখানে এক হাজার শ্রমণ বসবাস করতেন। এদের বিবরণ থেকে তাম্রলিপ্তের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ কোনও সংবাদ আমরা পাই না,[২১] তবে তাম্রলিপ্ত যে দেশের একটি প্রধান বন্দর ছিল তা জানতে পারি। য়ুয়াং চোয়াং তাম্রলিপ্ত বলতে কেবল শহর বা বন্দর বোঝাননি। তার বিবরণীতে তাম্রলিপ্ত ছিল দেশ, যেখানে মাটি আর জল মিশে ছিল। এদেশের অধিবাসীরা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতেন (ওয়াল্টার, টমাস, ১৯৬১ : ১৮৯)। বর্তমানের তমলুকে সেই অবলুপ্ত বন্দরের সামান্য স্মৃতিচিহ্নই পাওয়া যায়। অনেকের মতে, এ শহর ছিল আট মাইল দীর্ঘ এবং দুইশত ফুট উঁচু অশোকস্তম্ভ এখানে অবস্থিত ছিল। তমলুক শহরের বিখ্যাত বর্গভীমা বা কালীমন্দির

যে উচ্চভূমির ওপর অবস্থিত তা সম্ভবত একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির পর এটুকু চিহ্নই শুধু অবশিষ্ট রয়েছে (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., ১৮৭৬, খণ্ডত : ৬৩)। তাম্রলিপ্তের খননকার্যে পাওয়া গেছে পোড়া জমি, টেরাকোটার মূর্তি এবং কিছু তাম্রমুদ্রা। পরবর্তীকালে শুঙ্গ এবং কুষাণদের কালের কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে। গুপ্ত যুগের শীলমোহরের চিহ্নও মিলেছে। বৌদ্ধ এবং প্রাচীন সাহিত্যে এই প্রাচীন বন্দর শহরের উল্লেখ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু বৌদ্ধ বিহার কিংবা সংঘারাম ছাড়া অন্য কিছুর বিস্তৃত বর্ণনা নেই (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪ : ৮; চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৭৭-১৭৮)।

তাম্রলিপ্ত কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল নাকি একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, তার কোনও পরিষ্কার চিত্র এই বিবরণীগুলিতে নেই। কোনও দুর্গ, প্রাচীর এবং নগর জীবনের পরিচয়ও এই বিবরণীতে নেই। ভৌগোলিকভাবে তাম্রলিপ্ত দণ্ডভুক্তির নিকটস্থ ছিল, যার বর্তমান নাম দাঁতন, যা মেদিনীপুরের অন্তর্গত। বাংলার একটি প্রদেশরূপেই পরিচিত ছিল এই মেদিনীপুর, সম্ভবত বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। সমুদ্রপারে অবস্থিতির জন্য সমতটের অন্তর্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। জৈন উপাঙ্গে তাম্রলিপ্ত এবং বাংলা-কে আর্যভূমি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, ৭৬)। পাণিনির আমলে তাম্রলিপ্ত ছিল সেই প্রধান শহরগুলির মধ্যে একটি যার মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত[২২] ভারতের প্রধান যাতায়াতের পথগুলি যুক্ত ছিল (আগরওয়ালা, ভি.এস., ১৯৫৩ · ২৪৫, ৪৫৬)। তাম্রলিপ্তেব অবলুপ্তি সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার একটি হল, যে নদী দিয়ে এই বন্দর শহরটির সঙ্গে উত্তরভারতের যোগাযোগ ছিল, তা ক্ষয়ে যায়[২৩]। অন্য ব্যাখ্যা হল এর সমৃদ্ধি অনেকটা নির্ভরশীল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের উপর। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং সমুদ্রপথে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ আরবদের অধীনে চলে যাওয়ায় তাম্রলিপ্তেরও পতন দেখা দেয় (মেজর, আর.এইচ)[২৪]।

পুন্ড্রবর্ধন : উত্তরবাংলায় অবস্থিত পুন্ড্রবর্ধন শহরের অবস্থান ছিল গঙ্গার উত্তর দিকে। এ শহর সম্ভবত তাম্রলিপ্তর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে কারাতোয়া নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল এ নগর।[২৫] ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুযায়ী, এখানকার জনবসতি ছিল ঘন এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের প্রসারও ঘটেছিল এখানে (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, ১৯৭০ : ৭৭)। দুশো বছর পর পরিব্রাজক য়ুয়াং চোয়াং এ শহরে জনবাহুল্যের পাশাপাশি অনেক পুকুর এবং বাগান দেখেছিলেন। এখানকার মাটি ছিল নরম, শস্য উৎপাদন হত প্রচুর, বৌদ্ধ সংঘারামের পাশাপাশি অনেক দেবমন্দিরও তৈরি হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়ার কাছেই ছিল পুন্ড্রবর্ধন। উত্তর বাংলার এই শ্রেষ্ঠ শহরটি করতোয়া নদীর পাড়ে অবস্থিত ছিল। শহরটি দীর্ঘ ছয় মাইল পরিধির প্রাচীর ঘেরা, চার কোণে ছিল উঁচু গম্বুজ।[২৬] শহরের বেশিরভাগ অংশই অবশ্য ছিল এই প্রাকারের বাইরে। বর্তমান রাজশাহি, পাবনা এবং বগুড়া নিয়ে ছিল এই পুন্ড্রবর্ধন। (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭)। একশো পঁচাশি হেক্টর অঞ্চল এবং পাঁচ হাজার ফুট লম্বা টিলা জুড়ে এই

শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন সামন্তপ্রভুরা ছিলেন এর শাসক (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭।[২৭] ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে কুমার গুপ্ত (প্রথম)-এর আমলের তাম্রফলকে পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মগধের গুপ্ত রাজবংশ এখানে শাসন করতেন।[২৮] ভূমি ও সম্পত্তি ক্রয় হতো মুদ্রার বিনিময়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিবরণে পাওয়া যায় যে পাল রাজবংশের সময়ই এই শহরের চরম উন্নতি হয়েছিল (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩; চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭; চট্টোপাধ্যায় ব্রজদুলাল, ১৯৯৪)।

আঠারোশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত এই উন্নত শহরের খবর অজানা ছিল। ওই সময় ই.ভি.ওয়েস্টম্যাকট রাজশাহিতে আবিষ্কার করেন লম্বা ইটের টালি, যা সম্ভবত বৌদ্ধস্তূপ ছিল। এই ধ্বংসস্তূপ পরবর্তীকালে সোমপুর। বলে প্রমাণিত হয়। সোমপুর। পাল যুগের চারটি প্রধান বৌদ্ধ সংঘারামের একটি ছিল। ১৮৭৮ সালে এইচ.বেভেরিজ বগুরাতে মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। আলেকজান্ডার কানিংহাম য়ুয়াং চোয়াং-এর বিবরণী পাঠ করে এই স্থানকে পুণ্ড্রবর্ধন বলে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে উনিশশো একত্রিশ সালে মহাস্থানগড়ে মৌর্য লিপির সন্ধান পাওয়া যায় (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪)। নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে মহাস্থানের অস্তিত্ব ছিল, গুপ্ত এবং পাল আমলে এই অঞ্চল উন্নতির চরমে পৌঁছায়। এখানে শস্যভাণ্ডার এবং বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখও পাওয়া যায় (আক্রম, আফরোজ, ১৯৯৪ : ৫৩৫-৫৪৪)।

কর্ণসুবর্ণ : মুর্শিদাবাদের উত্তরে কর্ণসুবর্ণ ছিল গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী। য়ুয়াং চোয়াং-এর বিবরণীতে পাওয়া যায় যে এখানে ঘনবসতি ছিল এবং অধিবাসীরা ছিলেন রীতিমতো ধনবান। তাঁর বিবরণে, এখানকার জমি ছিল উর্বর, চাষবাস ছিল নিয়মিত, ফল এবং শস্য হত প্রচুর, আবহাওয়া ছিল ভালো এবং সর্বোপরি এখানকার অধিবাসীরা ছিল ভদ্র এবং শিক্ষিত। দশটিরও বেশি বৌদ্ধমন্দির এবং পঞ্চাশটি দেবমন্দির ছিল কর্ণসুবর্ণতে। একজন বৌদ্ধশ্রমণকে রাজা বৌদ্ধমন্দির নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এই শ্রমণের নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলার সমতটের রাজপরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। শীলভদ্র শিক্ষালাভের জন্য নালন্দায় যান এবং সেখানে তাঁকে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এক দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি বিতর্কে পরাজিত করেন। রাজার দ্বারা পুরস্কৃত হয়ে শীলভদ্র বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি নগরও লাভ করেন। পর্যটকদের বিবরণী থেকেই এইসব তথ্য পাওয়া যায়। গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, পশ্চিমে বর্ধমান এবং পূর্বে পদ্মা নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। কর্ণসুবর্ণই সম্ভবত পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি বলে পরিচিত হয় (চ্যাটার্জি, অঞ্জলী, ১৯৬৭ : ১-২)।

কজংগল এবং কোটিবর্ষ : য়ুয়াং চোয়াং-এর বিবরণীতে পূর্ব বিহারের চম্পা থেকে তাঁর কজংগল নামক স্থানে আসার খবর পাওয়া যায়। সম্ভবত, এটাই রাজমহল। তাঁর বিবরণে পাই, এখানকার জমি ছিল নাবাল, আর্দ্র, শস্যপূর্ণ। অধিবাসীরা ছিল শিক্ষিত এবং খোলামেলা। এখানে ছয় থেকে সাতটি বৌদ্ধ মন্দির এবং আটশো ভিক্ষু ছিল,

দশটি দেবমন্দিরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্মীয় বিষয়গুলির উপর তাঁর নজর যতটা ছিল, অন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে তিনি ততটা আগ্রহী ছিলেন না। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে কজংগল ছিল দামোদর-অজয় নদ সন্নিহিত এলাকায়, জঙ্গলে ঘেরা। অন্যান্য বিবরণ থেকে জানা যায় কজংগলের অবস্থান ছিল উত্তরবাংলায় (চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, ১৯৮৭ : ৫২-৫৩)।

কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি প্রধান জনপদ বা 'বিষয়'। হেমচন্দ্রের "অভিধান চিন্তামণি"-তে এবং পুরুষোত্তম দাসের "বই"-এ একটি প্রধান নগর রূপে কোটিবর্ষর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে দিনাজপুরের বাঙ্গার বলে উল্লিখিত এই নগর সম্পর্কে কথিত আছে, বালীর পুত্র বাণাসুরের শহর ছিল এটি। এখানে এক বিরাট বুদ্ধস্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনদিকে এর প্রাচীর এবং একদিকে পুনর্ভবা নদী (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩)। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে অনুমান করা হয় যে, এই শহর খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতকের। (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭; সরকার, হিমাংশু : ৪৯) দেবকোট ছিল একটি প্রধান শহর।[২৯] সম্ভবত বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরেই এর অস্তিত্ব ছিল। ১৮৬১-তে আরকিয়োলজিকাল সার্ভের প্রতিষ্ঠার পর আলেকজান্ডার কানিংহাম এর সন্ধান পান। মুসলমান শাসকরা দেশের পূর্বভাগে যে সামরিক অঞ্চল গড়েছিলেন তার একটি ছিল এই দেবকোট (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪)।

খননকার্যের ফলে এখানে প্রাক্ শুঙ্গ যুগের কূপ, টেরাকোটার মন্দির, ছাপমারা রুপো এবং তামার মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। শুঙ্গ, গুপ্ত এবং পাল আমলেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শহর বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে। বাঙ্গার-এর বিবর্তনের পাঁচটি পর্যায় চিহ্নিত করা যায়। এই নগরের চারদিকের ইটের প্রাচীর মৌর্যযুগে নির্মিত হয়েছিল। শুঙ্গ-কুশান পর্বে এই নগরের প্রচুর উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (খ্রিস্টপূর্ব ২০০-৩০০ খ্রিস্টাব্দ)। গুপ্তপর্বে সেরকম না হলেও পাল পর্বে এই নগর চরম উন্নতি লাভ করে (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৭৫-১৭৬)।

গৌড় : গৌড় নামটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৌড়কে একটি দেশ, গৌড় বা গৌড়-বাংলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোনও কোনও সময়ে আবার উল্লেখ করা হয়েছে শহর হিসাবে। বিদেশি পর্যটকরা এই শহরটিকে দেশের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পাল রাজবংশ নিজেদের গৌড়েশ্বর বলে বর্ণনা করত। কিছু কিছু বিদেশি একে লখনৌটি বা গৌড়লখনৌটি রূপে বর্ণনা করেছেন। গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেন এই প্রধান শহরটির নাম দিয়েছিলেন লক্ষ্মণাবতী। দেশ হিসেবে ধরলে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান ও বীরভূমের কিছু অংশ ছিল এর অন্তর্গত (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ১২১-১২২)। ১২০৪ সালের আগে পর্যন্ত গৌড় ছিল বাংলার একটি প্রধান বন্দর। গঙ্গা যেখানে পদ্মা এবং ভাগীরথীতে বিভক্ত হয়েছে সেখানেই ছিল এই শহর। বাংলার বহু রাজধানী শহর এই ধরনের নদী বিভাজিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। যেমন গৌড়, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, রাজমহল, কর্ণসুবর্ণ। পাণিনির রচনায় গৌড়পুরের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু অবস্থান স্পষ্ট করা নেই (আগরওয়াল, ভি. এস. ১৯৫৩ : ৭১)।

গৌড় দৈর্ঘ্যে ছিল নদীতীর বরাবর সাড়ে বারো মাইল এবং প্রস্থে আড়াই মাইল।

চওড়া দীর্ঘ পথের দুধারে ছিল সারিবদ্ধ গাছ। নির্দিষ্ট করে অবশ্য এর আয়তন নিয়ে কিছু বলা কঠিন (খান, আবিদ আলি, ১৯৬৮) কারণ কখনও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য, কখনও বা মহামারী দেখা দেবার জন্য, এর অবস্থান পাল্টে যাওয়ায় আয়তন সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় নি।[৩০] জেমস ফার্গুসন প্রাক্ ১২০৪ গৌড়ের নির্মিত কাজ দেখে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। সে সময় কালো পাথর এবং ইটের ব্যবহার এত মসৃণ ছিল যা পরবর্তীকালে মুসলিম আমলের কাজকেও প্রভাবিত করেছিল (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪ : ৪)। কিছু অমুসলমানি নাম ছাড়া এই পর্বের গৌড়ের সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে, যেমন—সাগরদীঘি, রামভিটা, বল্লালবাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া গৌড়েশ্বরী দেবীর আরাধনা এখনও চালু রয়েছে (খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬)।

বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও লালমাই-ময়নামতি : বাংলার একটি প্রধান নগরকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুব। সেন রাজাদের শাসনকালেরও অনেক আগে থেকে তার পরিচিতি ছিল। সেন রাজবংশের শেষ নৃপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বক্তিয়ার খিলজি গৌড় থেকে বিতাড়িত করার পর লক্ষ্মণ সেন এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন (রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯৮: ২৬)। এই অঞ্চলে নির্মিত বহু প্রাচীন তামার দানপত্র বঙ্গ এবং রাঢ় বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। ষষ্ঠ শতাব্দী এবং তার পরবর্তীকালে বিক্রমপুরের তাম্রফলক সারা বাংলায় গুপ্ত শাসনের মগধের তাম্রলিপির চেয়েও (মরিসন, ১৯৬৯ : ৪) বেশি ব্যবহৃত হত। এই নগর ছিল বহু রাজার, বিশেষ করে বর্মন রাজাদের রাজধানী।[৩১] উত্তরে যেমন পুণ্ড্রবর্ধন, পূর্ব বাংলায় বিক্রমপুরেব ছিল সেই শ্রেষ্ঠত্ব (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩)। ঢাকার নিকটবর্তী এই স্থান, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই শহরেরই বরেণ্য সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ৯৮০ সালে এক রাজপরিবারে যার জন্ম, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়েও, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি তিব্বতে পৌঁছেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে।

পূর্ববঙ্গ এবং সমতটের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান ছিল, বরিশালের তটভূমিতে। এর শাসকরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র প্রমুখ (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩; হান্টার, ৫ম খণ্ড : ৭০)।

কুমিল্লার নিকট অবস্থিত লালমাই ছিল বাংলার পূর্বপ্রান্তের শহরগুলির অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হঠাৎই এই স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অঞ্চলটিতে বহু বুদ্ধস্তূপ এবং সংঘারামের সন্ধান মিলেছে (গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪)।

অন্যান্য ছোট শহর : ইতিমধ্যেই উল্লিখিত বিশিষ্ট স্থানগুলির বাইরে আরো কিছু ছোট ছোট শহরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ থেকে। কিছু শহর ছিল পরিকল্পিতভাবে নির্মিত, কিছু ছিল অবিন্যস্ত। দুর্গ ঘেরা শহরের সন্ধানও মেলে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকেতুগড় (ঘোষ, এ, ১৯৭৩)। কিন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ইতালির পাম্পেই শহরের সঙ্গে তুলনা করার মতো কিছুই মেলেনি।

বীরভূম জেলার বিষ্ণুপুরের দ্বারকেশ্বর নদীর কাছে কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটি ১৫-২০ একর এলাকা জুড়ে। শহরবাসী লোহার ব্যবহার করত। পাথবেব

পুঁতি, কুষান ও শুঙ্গ যুগের টেরাকোটার দ্রব্যসামগ্রী এবং রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা মিলেছে এখানে।অনুমান করা হয়, খ্রিস্টীয় ২য় খ্রিস্টাব্দে এই স্থান পরিত্যক্ত হয় (চক্রবর্তী, দিলীপ, ১৯৯৭; শর্মা, আর. এস., ১৯৮৭)।

বাঁকুড়া জেলার পোখরনা নামক স্থানটি এক বর্গমাইল জুড়ে। একদা এখানেও এক বৃহৎ জনবসতি ছিল (চক্রবর্তী, দিলীপ, ১৯৯৭)। শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত চন্দ্রবর্মনের শিলালিপিতে উল্লেখিত পুষ্করণার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে নরসিংদির কাছে সহস্রাধিক রৌপ্য মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এখানে ছিল সেকালের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র যার সংযোগ ছিল আসাম, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এমনকী, রোম পর্যন্ত (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭)।

চন্দ্রকেতুগড় : উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপাতে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রথম আবিষ্কার করেন এ.এইচ.লংহার্স্ট ১৯০৬-০৭ সালে। জঙ্গলময় এক ঢিবিতে তিনি প্রাচীন ইটের একটি প্রাচীরের এবং ভাঙা ফলকে গরুড়ের মূর্তি খুঁজে পান। পরে বিদ্যাধরী নদীর মজা খাত খুঁড়ে এক বর্গমাইল এলাকার একটি দুর্গশহর আবিষ্কৃত হয়। ধ্বংসাবশেষে মাটির বাড়ি, বাঁশ বা কাঠের তৈরি ঘর, পোড়ামাটির কুয়ো, পয়ঃপ্রণালীর সন্ধান মেলে (চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭; চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪)। রুপো বা তামার মুদ্রার সঙ্গে এখানে পাথরের পুঁতি, হাতির দাঁতের সামগ্রী মিলেছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন চন্দ্রকেতুগড়ই টলেমি কথিত গঙ্গা। যদিও এর সপক্ষে জোরালো প্রমাণ নেই। এই অঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজ এখনও যথাযথ ভাবে হয়নি। সত্য জানতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪)

অন্যান্য স্থান : বর্ধমানের মঙ্গলকোটে কুনুর নদীর তীরে বিক্রমাদিত্যের ঢিবি বলে পরিচিত অঞ্চলে গুপ্ত-পূর্ব যুগের নমুনা মিলেছে। গঙ্গা অববাহিকার সভ্যতার প্রাচীনতার এটি একটি অন্যতম প্রমাণ। এখানে প্রাপ্ত পোড়া চাল কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ইঙ্গিত দেয় (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪)। ময়ূরাক্ষী নদীতীরে কোটশুরে মাটির দুর্গপ্রাকারের সন্ধান মিলেছে। নানা শিলালিপিতে আরও শহর এবং বন্দরের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনও সন্ধান মেলেনি। চন্দ্র বংশের শিলালিপিতে বন্দর শহর বঙ্গসাগর-সম্ভনদারিয়াক-এর উল্লেখ রয়েছে। এটি সম্ভবত ঢাকার কাছে ছিল। দেবপর্বত পূর্ববঙ্গের আরেকটি নৌবন্দর। শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কালে দেবপর্বতকে জয়স্কন্ধাবার বলা হত (চক্রবর্তী, রণবীর, ১৯৯৪)।

নগর ভাস্কর্য

বাংলার নগর ভাস্কর্যের খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বাংলার শহরগুলির ভাস্কর্য খুব উচ্চমানের ছিল না। যে সব মালমশলা দিয়ে নির্মাণকার্য হয়েছিল তা স্থায়ী হওয়ার (বাঁশ, কাঠ, ইত্যাদি জিনিসপত্র) মতো ছিল না। পাথরের কাজ একটি দুটি ছাড়া বিশেষ হয়নি বলেই বলা চলে। চৈনিক পরিব্রাজকেরা তাঁদের বিবরণে যে অসংখ্য বিহার, স্তূপ এবং দেবমন্দিরের উল্লেখ করেছিলেন, পাহাড়পুর, রাজশাহি এবং বাঁকুড়ার গুটিকয়েক

জায়গায় ছাড়া তাদের কোনও চিহ্নই মেলে না। সোমপুরের বুদ্ধমন্দির, পাহাড়পুরের ইটের তৈরি স্তূপ, বাঁকুড়ার স্তূপ এবং পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাক্ - ১২০৪ সালের (সরস্বতী, এস.কে., ১৯৭১) যে নিদর্শনগুলি আছে; ওড়িশা, কাঞ্চি এবং খাজুরাহের ভাস্কর্যের সঙ্গে তার কোনও তুলনা হয় না (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩; ইটন, আর.এম., ১৯৯৩)। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণের ওই সংঘারাম এবং স্তূপগুলির এরকম পরিণতি হল কীভাবে? একটি কাব্যে পালবংশের আমলের এক সুউচ্চ মন্দিরের উল্লেখ আছে, যার চূড়ায় ছিল সোনার কলস (সরস্বতী, এস. কে., ১৯৭১)। সম্ভবত এটা ছিল কবি কল্পনা, লোকসাহিত্যে এর কোনো উল্লেখ নেই। বাঙ্গলাদেশে বৃষ্টিপাত কোনও কারণ নয়, কারণ, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতেও বরবদুরের মতো মজবুত ভাস্কর্য নষ্ট হয়নি। আঞ্চলিক আবহাওয়াও এতগুলি ভাস্কর্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে না। একটি কারণ অবশ্যই রয়েছে : তা হল, বারবার স্তূপ ভেঙে মন্দির এবং মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা, আর ওই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে মালমশলা তুলে এনে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ এবং গৌড়ে নতুন নতুন ভবন নির্মাণের চেষ্টা করা। কিন্তু আসল কারণ হল, পাথরের মতো টেকসই জিনিসের অভাব।

তৎকালীন বিভিন্ন বিবরণী থেকে এরকম ধারণা হয় যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে সেসময় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শহরগুলি সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল থেকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত। তারা একই আর্থিক পরিকাঠামোর মধ্যে ছিল। গ্রাম এবং শহরগুলির মধ্যে মালপত্র চালাচালিতে কোনও আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। গ্রাম এবং শহরের সীমানা চিহ্নিতকরণেরও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় জমিদানের দলিলে শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বিবরণে শহরের নাম উল্লেখ থাকলেও, তার গড়ে ওঠা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। পুর এবং নগরে চলত শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম। বাস্তু, ক্ষেত্র এবং গোচারণ ইত্যাদির কাজ চলত গ্রামে। নবম শতাব্দীর প্রথম থেকে উন্নত নাগরিক ব্যবস্থার কথা জানল মানুষ—মেলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতে গ্রাম এবং শহরের পার্থক্য বোঝা সম্ভব ছিল না মানুষের পক্ষে।

এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলার শহরে বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং বণিকরা একটি বিশেষ সম্মানিত শ্রেণি হিসেবে গণ্য হত। আবার এমন সময়ও এসেছে যখন দুইয়েরই অবক্ষয় ঘটেছে। যে নগরগুলির উন্নতি হয়েছিল, মূলত কৃষির উন্নতির ফলে, উদ্বৃত্তর কারণে সেই ধীরে ধীরে শহরের মূল চরিত্রই পাল্টে গেলো যখন ব্যবসায়ীর বদলে এল আমলাতন্ত্র। আধিকারিকরা উঠে এলেন বণিকদের জায়গায়। ষষ্ঠ শতকের পর সারা ভারতে নগরের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়ও নগরজীবনে অবক্ষয় দেখা দিল। জাতীয় স্তরের অবক্ষয়ের প্রভাব বাংলাতেও পড়ল। অর্থের আদান প্রদান কমে গেল, স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা উধাও হল। ব্যবসা-বাণিজ্য কমতে লাগল, বণিকরা তাদের ক্ষমতা হারাল, উঠে এল আমলাতন্ত্র। শহরের স্বাধীকার কমতে লাগল, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি দেখা দিল। বাংলায় ধাতুমুদ্রার বড়রকম অভাব দেখা দিল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য ছিল না বলা চলে। ছোটনাগপুরের সামান্য কিছু তামা পাওয়া যেত। গ্রামীণ ক্ষেত্রে

আদানপ্রদান চলত কড়ির বিনিময়ে। এর বড় অংশ আবার আসত বিদেশ থেকে (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৬১, ১৯৬-১৯৭)। বিখ্যাত মুর পর্যটক ইবন-বতুতার বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। বাঙালি ব্যবসায়ীরা সাধারণত চালের পরিবর্তে তাদের হিসেব মেটাত কড়ি দিয়ে (বতুতা, ইবন, ১৯২৯)।

অষ্টম শতকের পর থেকে বাণিজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মানমর্যাদা লোপ পেল। খ্রিস্টীয় ১ম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বণিকরা ছিলেন সংগঠিত। বিশেষ করে রাঙামাটির বুধগুপ্তের আমলের কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। নগর প্রশাসনে বণিকদের প্রভাব ছিল (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩)। বাংলার কোনও অংশের নগর প্রশাসনে বণিকদের এই ধরনের কর্তৃত্ব ছিল বা কতদিন তা বজায় ছিল সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য নেই। তবে নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ৫ম থেকে ৮ম শতকে বণিকদের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত ছিল। বল্লাল সেনের সময় বণিকদের সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেওয়া হয় (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩)। কৃষির উন্নতি এবং বাণিজ্যের অবনতি সত্ত্বেও ওই সময় হীরা, হাতির দাঁত, লোহা ইত্যাদি এবং উন্নত হস্তশিল্পের অস্তিত্ব ছিল। বাংলার তাঁত শিল্পের রীতিমতো আদর ছিল। কৃষি এবং শিল্পের শ্রমবিভাজন ছিল নির্দিষ্ট। গ্রামে কৃষির এবং শহরে ছিল শিল্পের প্রাধান্য। কোনও কোনও পণ্ডিত বাংলার ক্ষেত্রে 'নগর অবক্ষয়' ধারণার প্রয়োগের প্রশ্নে আপত্তি করেন। তাঁদের মতে গুপ্ত যুগের পর বাংলায় নাগরিক ব্যবস্থা গতি পেয়েছিল (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪)। বাস্তবে, বাংলায় আর্যকরণ এবং নগরায়ণ ব্যাপকভাবে শুরু হয় গুপ্ত শাসনেই। সে সময় ভারতের অন্যত্র নগরের অবক্ষয় চলছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের পর থেকে বাংলাতেও নাগরিক ব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়। বিশেষ করে, বাইজেনটাইনে রেশম গুটি আবিষ্কার ও উত্তরপশ্চিম থেকে ধারাবাহিক অভিযানের কারণে।

উপসংহার

নাগরিক ব্যবস্থা বাংলায় এসেছিল বিহার এবং উত্তর ও মধ্যভারতের কিছু অংশের কয়েকশো বছর পরে। মৌর্য শাসনকালে আমরা তাম্রলিপ্ত এবং পুণ্ড্রবর্ধনের বিবরণ পাই। প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার বছরগুলিতে গুপ্ত আমলে ও নাগরিক উন্নতি দেখা দেয়। উত্তরবাংলায় পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি প্রধান শহর এবং পশ্চিমে ছিল বর্ধমান। কিন্তু প্রধানতম নগরকেন্দ্র ছিল পূর্ব-মধ্য বাংলার বিক্রমপুর। যার পশ্চিমে ছিল বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ এবং পূর্বে ছিল রাঙামাটি—লালমাই। পরবর্তীকালে আরব এবং অন্যান্যদের বিবরণে চট্টগ্রামের উল্লেখও পাওয়া যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা শহরের বিকাশের উপর আলোকপাত করলাম। শহরে দেখা দিয়েছিল এক নতুন শ্রমিকশ্রেণি যাদের কাজের ধরন গ্রামের শ্রমিকশ্রেণির থেকে আলাদা। সেরকম নগর সমাজের চালিকা শক্তি ছিল ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী এবং হস্তশিল্পীরা। বাণিজ্য এবং শিল্পের যখন ভাগ হল এক নতুন কর্ম বিভাজ্য হল। ব্যবসায়ী এবং হস্তশিল্পীরা আর একই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত রইলেন না। একটি নতুন নাগরিক উচ্চবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হল। তখন শহরের শ্রেষ্ঠত্ব লোপ পেতে লাগল, রাজতন্ত্রের উন্নতি

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে হল। একটা সময় এল যখন আমলারাই সর্বক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। এই সময়, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়তে লাগল এবং ষষ্ঠ শতকের পর থেকে বাণিজ্য সংকুচিত হতে লাগল। আর্থিক আদান প্রদান কমে গেল। অনেকে বলেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের পতন, একটি কারণ। কেউ কেউ বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক, এবং ব্যবসায়ী ও হস্তশিল্পীদের ধর্ম। তার পতনও এই অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

মন্তব্য

১. "শহরের সংখ্যা বাড়িয়ে লেখা খুবই সহজ, এমনকী, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাছের ছোট গ্রামের লোকজনকে শহরের লোক বলে ধরা হয়।" (জোবার্গ, গিডিয়ন, ১৯৬০ : ৮১-৮২)
২. একটি সিটাডেল পাশ্চাত্য সভ্যতার, একটি প্রাচীর, যেখানে ২০ থেকে ৩০ ফুট চওড়া সোজা প্রধান রাস্তা, একটি বহুতলবিশিষ্ট পোড়া ইটের বাড়ি থাকে। এর মধ্যে রয়েছে স্নানের বাথ এবং জটিল জল নিকাশি ব্যবস্থা। [জোবার্গ, গিডিয়ন, ১৯৬০ : ৪২]
৩. মজার ব্যপার, গ্রিকদের সাতটি জীবিকার মধ্যে পুরোহিতদের পরেই, চাষীর ছিল দ্বিতীয় নাম (শ্রেণির দিক থেকে যে দ্বিতীয়, তার কোন প্রয়োজন নেই)।
৪. শহর ও গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমরা প্রথম থেকেই আজ পর্যন্ত দেখি। এর শুরু হয় যখন গ্রাম বার্বেরিজম থেকে সভ্যতায়, আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রে, এবং অঞ্চল থেকে দেশে রূপান্তরিত হয়। (মার্কস, কার্ল এবং এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, ১৯৭৯ : ৪১)।
৫. মার্কস এবং এঙ্গেলস মন্তব্য করেন, 'শহরে প্রচুর লোক বাস করে, এরফলে জনসংখার ঘনত্ব বাড়ে, যার সঙ্গে বাড়ে উৎপাদন যন্ত্রের ঘনত্ব, মূলধনের ঘনত্ব, উপভোগের ঘনত্ব। গ্রামে এর ঠিক উল্টো জিনিস হয় এবং সবকিছু ওখানে আলাদা থাকে।' (মার্কস, কার্ল এবং এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, ১৯৭৯ : ৪২)
৬. 'গ্রাম এবং শহরের পৃথকীকরণ মূলধন এবং জমির পৃথকীকরণ বলে ধরা যেতে পারে। এমনকি সামন্ততন্ত্রের দিনেও শহরে মূলধন দেখা যেত'। (মার্কস, কার্ল এবং এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, ১৯৭৯ : ৪২)।
৭. এই অবস্থায় গিল্ডগুলো বর্ধিত জনসংখ্যার এবং গ্রাম থেকে আসা জার্নিমেনদের ভিড়ে তলিয়ে গেল। সেই সময়ে গিল্ডের ভূমিকা ছিল তাদের সভ্যদের স্বার্থ রক্ষা করা। ওরা চাইল যে ক্রাফটসম্যানদের কিছু মূলধন ও জার্নিম্যানদের শ্রমকে মিলিয়ে কিছু একটা করতে। শহরে ক্রাফটসম্যান এবং জার্নিম্যান-এর সম্পর্ক গ্রামের জমিদার সার্ফ সম্পর্কের তুলনীয় হয়ে দাঁড়াল। (মার্কস, কার্ল, এবং এঙ্গেলস ফ্রেডারিক, ১৯৭৯ : ৪০)।
৮. মার্কস এবং এঙ্গেলস গিল্ড করার কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো দেন :
(ক) যে সব সার্কেরা গ্রাম থেকে পালিয়ে শহরে এল তাদের মধ্যের প্রতিযোগিতা ;
(খ) গ্রাম ও শহরের মধে সব সময়ে লেগে থাকা যুদ্ধ এবং একটি মিউনিসিপাল কোর্স তৈরি করার প্রয়োজন ;
(গ) এক ধরনের শ্রম সকলে মিলে চালাত ;
(ঘ) একটি জায়গায় তাদের জিনিস বিক্রি হবে এমন ব্যবস্থা, যখন কারিগররা নিজেরাই নিজেদের জিনিস বিক্রি করত ;
(ঙ) একটা শিল্পের মধ্যে নানারকম দ্বন্দ্ব ছিল,
(চ) তাদের দক্ষতা রক্ষা করার জন্য সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল, (মার্কস,

কার্ল, এবং এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, ১৯৭৯ : ৪২-৪৩)।

৯. সময় যত গেল ততই নতুন নতুন বৌদ্ধবাদী কেন্দ্র বাংলায় তৈরি হল। এরমধ্যে কতগুলো বেশ বড় ছিল এবং কিছু ছিল একটি বড় গ্রামের মতো। তাম্রলিপ্ত, মৃগস্থাপনা, দেবপর্বত, সোমপুর, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদ্দল, ময়নামতী, পণ্ডিত, বিক্রমপুর, ভরতপুর (পানাগড়ের কাছে) এবং ত্রিকূটক (রায়) ছিল উল্লেখযোগ্য। (মহাপাত্র, বিমলচন্দ্র, ১৯৯৫, ৬১-৬৭)।

১০. বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন রকমের জীবিকার উল্লেখ আছে, সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল : হাতির দাঁতের কাজ, বয়ণ প্রণালী, মিঠাই প্রস্তুত, অলংকার এবং মূল্যবান ধাতুর কাজ, ধনুক এবং তীর তৈরি, মৃৎশিল্প, পুষ্পমালা তৈরি, শিকার করা, মাছ ধরা, ফাঁদ পেতে পশুপাখি ধরা, কসাই, চামড়ার কাজ করা, সাপের গুনীন, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী এবং বাদ্যবাদক, নলখাগড়া বয়নকারী, রথ তৈরি করা, নাবিক, পুষ্পমালা তৈরি কারি, মরু ব্যবসায়ী এবং রক্ষী। সেখানে ৫০০ জন পরিবারে উল্লেখ আছে যারা ডাকাতিতে পারদর্শী, বেশিরভাগ জীবিকাই পাওয়া যেত শহরে, কিন্তু প্রায়ই তারা অংশগ্রহণ করত উদ্ধত শিশুদের সঙ্গে, [রেহাস্, ডেভিডস্, সি, এ, এফ, ১৯৬২:১৮৩-১৮৫]

১১. ফা সিন্ নামে একজন চীনের ভ্রমণকারী তাম্রলিপ্ত থেকে নৌকায় করে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছিয়ে ছিলেন। [মুখার্জি বি, এন, ২০০০ : ১৩]

১২. সেখানে দেখা যায় যে, অনেকগুলি শহর ক্ষয় হয়ে সংযোজিত হয়ে উত্থান হয় নতুন একটি য়ুয়াং চোয়াং এর হিসাবে। [চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৫০-১৫১]

১৩. এক নজরে দেখা যায় যে, প্রায় সব রোমান মুদ্রাগুলি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল খ্রীস্টাব্দের প্রথম শতকে অথবা তারও আগে, অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যবসার ক্ষয় রোমসাম্রাজ্যের পতনের আগেই হয়েছে। [চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪ : ১৪৬-১৪৭]

১৪. যদিও মেডিটেরানিয়ানে উদ্ভূত রুলো এবং অ্যাম্ফোরা পাওয়া যায়। এগুলো উত্তর-পশ্চিম অথবা দক্ষিণের রাজ্যগুলো থেকে পাওয়া যেতে পারে। (মুখার্জী, বি. এন., ১৯৯৪ : ১৬৪-১৬৭)।

১৫. খননকার্য থেকে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ শহর পরিত্যাগ করা হয়েছিল খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় শতকে, যখন কোন বহির আক্রমণ ঘটেনি [শর্মা, আর, এস, ১৯৮৭ : ১৩৩]

১৬. এমনকী, শহরের ধ্বংস এবং বণিক ও ব্যবসায়ীদের দুঃসময় এর সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বরাহ সমোহিতা। [শর্মা, আর, এস, ১৯৮৭ : ১০৯-১১১, ১৩৯]

১৭. এছাড়া অন্যান্য নামকরা শহরগুলির মধ্যে ছিল : সোমপুর (এখন পাহাড়পুর) ত্রিবেণী (ধর্মের কেন্দ্রস্থল), চন্দ্রবুরমানকোট (ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার কাছে একটি দুর্গ), পাটিকেরা (ত্রিপুরার ময়নামতি), সুবর্ণতিথি (ফরিদপুরে), মেহেরকুল (চট্টগ্রামে), পুষ্করণ, রাঙ্গামাটি (রক্ত-মৃত্তিকা) মুর্শিদাবাদে বিজয়পুর (যমুনা এবং ভাগীরথী নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে সেন রাজবংশের প্রধান রাজধানী ছিল, এখনকার দিনে রাজশাহী থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত)। নদীয়া কোথায় ছিল, সেটা পরিষ্কার নয়, কোথা থেকে লক্ষ্মণ সেন পশ্চাদপসরণ করেছিলেন, যখন বক্তিয়ার খিলজির সৈন্যরা পৌঁছেছিল। এটি আজকের নবদ্বীপ হতে পারে অথবা বিজয়পুর হতে পারে। পালদের একটি মাত্র রাজধানী ছিল না, তাদের বিভিন্ন বিজয় স্কন্ধবার ছিল। যেভাবেই হোক আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে শহরের নামগুলি জানতে পারি, কিন্তু আজকের নামের সঙ্গে তখনকার যে নাম আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখি তার মধ্যে কোন মিল নেই। অতএব এই দুটোকে মেলানো খুব শক্ত [রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ২৯৪-২৯৮, ৩০১-৩০৫, ৩৬১-৪১০] পাণিনির

লেখার মধ্যে নবনাগরার উল্লেখ পাওয়া যায়। [আগরওয়াল, ভি, এস, ১৯৫৩, ভি. এস : ৬৫, ৭৫] করতোয়ার সঙ্গে গঙ্গার প্রবাহ যেখানে মিলিত হয়েছে রামপাল সেইখানে তৈরি করেছিলেন রামাবতি, সেই সময়ে এটি একটি খুবই সুন্দর শহর ছিল। [শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, ১৯১০ · ৭১-৭২] ডি. সি. সিরকার এর বক্তব্য অনুযায়ী, এইটি আগেকার দিনের লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়-এর খুব কাছে ছিল। [রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯৪ : ২৪৫]

১৮. তাম্র (কপার) এর আসল নাম পাওয়া যায় মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা নদীর কাছে এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলের ডিস্ট্রিকট-এর কাছে। [রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ১৪৪ ; চক্রবর্তী, ১৯৯৪ : ১৫৭]

১৯. প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁজাখুজিতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, শহর হিসাবে এটি পরিচিত ছিল বহু শতাব্দী অগে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতকে। [চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, ১৯৯৭ : ২১৮]

২০. একনজরে, তাম্রলিপ্তের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো যোগাযোগ গঠিত হয় নি। [মুখার্জি, বি, এন, ২০০০ : ১২]

২১. যাই হোক, পাণিনি বাংলার তিন-চারটি বড় অঞ্চলগুলির মধ্যে পূর্বের (প্রাচ্যের) অধিকতব জনপদের একটিরও তালিকাভুক্ত করেনি, যেগুলি ছিল কোশালা, কাশী, মগধ, কলিঙ্গ, এবং সুরমাশা ; শেষেরটি অবস্থিত ছিল আসামের পার্বত্য জেলার সুরমা উপত্যকায় ; পরবর্তীকালে এইটি একটি আলাদা রাজ্য হয়। পতঞ্জলীর লেখা অনুযায়ী, প্রাচ্যের নিজস্ব প্রদেশ ভাবতের বাইরে অবস্থিত ছিল। [আগরওয়াল, ভি. এস. ১৯৫৩ : ৩৭-৩৮, ৬০]

২২. নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, সরস্বতী নদীর রাস্তা ছিল তাম্রলিপ্ত ভাগীরথীর সংযোগস্থলে। কিন্তু অষ্টম শতকের শেষে, ভাগীরথীর সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গমস্থল শুকিয়ে যায়, যার ফলে তাম্রলিপ্ত ধ্বংস হয়েছিল। [রায়, নীহাররঞ্জন : ৭৭-৭৮] কোনো সন্দেহ নেই যে, বছরের পর বছর ধরে সেই অঞ্চলের নদীব্যবস্থার অসংখ্য পরিবর্তন হয়েছিল। মৎস্য পুরাণে বলে গঙ্গা তাম্রলিপ্ত হয়ে প্রবাহিত হতো। [মুখার্জি, বি. এন. ২০০০ : ১০]

২৩. বাংলাতে, রোম থেকে সোনা আনার জন্য গঙ্গা বন্দর এবং তাম্রলিপ্ত ব্যবহৃত হতো। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের সময়, উত্তর এবং দক্ষিণ বাংলাতে জমি ক্রয় এবং বিক্রয় হতো স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা। ৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আনুমানিক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে উদিত হওয়া আরবের সঙ্গে ইউরোপের নিয়ন্ত্রিত সামুদ্রিক বাণিজ্য হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল। এক শতকের মধ্যেই, আরব, সিন্ধেতে (৭১০ খ্রিস্টাব্দে) পশ্চিম ভারতের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। [রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৭০৪]

২৪. করতোয়া, ভুটান পার্বত্যমালা থেকে উৎপত্তি হয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা অতিক্রম করার পর পদ্মা-ধলেশ্বরীতে এসে মিশেছে এবং এর উপরের অংশকে তিস্তা (ত্রি-স্রোতা বা তিনটি ধারা) নামে পরিচিত ছিল। [রহিম, আবদুল, ১৯৫৭, ভলউম-১ : ১১-১২]

২৫. পাণিনির মত অনুযায়ী, শহরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল, মঠ, কেল্লা এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সিংহদ্বারগুলি, তা ছাড়াও সেখানে অবশ্যই রয়েল স্টোর্ড হাউস, আলোচনা সভাগৃহ এবং অন্যান্য 'শালা' বা নাচ, গান, সঙ্গীত, খেলাধুলা ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল [আগরওয়াল, ভি. এস. ১৯৫৩ : ১৪১]

২৬. শেবা পর্বের (XIII ; ৫৮, ৪) মধ্যে, ভেনগাস এবং কিরতাস এর সঙ্গে পৌণ্ড্রকার উল্লিখিত আছে, এবং বান পর্বের (LI, ১৯৮৮) মধ্যে উৎকল, মেকলা, কলিঙ্গ এবং অন্ধ্র এর সঙ্গে, এবং ভীষ্ম পর্ব (IX, ৩৬৫), এবং দ্রোণ পর্বে (IV, ১২২)। কানিংহাম মহাস্থান বা বগুড়া মহাস্থানগড় এর সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধন হিসাবে গণ্য করেন ; কামরূপ থেকে করতোয়া পুণ্ড্রকে আলাদা করেছিল। [পাণ্ডে, রাজ বলি, ১৯৬২ : ৮২-৮৪] একটি প্রাক্-মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে) বগুড়া, মহাস্থানেতে ভগ্ন পাথরে খোদাই করা অলঙ্করণ খুঁজে পাওয়া যায়, যার উল্লেখ বঙ্গবাসীর কাছে পাওয়া যায়। [পাণ্ডে, রাজ বলি, ১৯৬২ : ২-৩]

২৭. সেখানে অন্যান্য বিভিন্ন তাম্রফলকগুলির যেগুলি দামোদরপুর, দিনাজপুর থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি বুদ্ধগুপ্তের সময়কালের : একটি আনুমানিক ৪৮২ খ্রিস্টাব্দের এবং অন্যটি ৪৭৬-৪৯৫ খ্রিস্টাব্দের। [পাণ্ডে, রাজ বলি, ১৯৬২ : ১০৪-১০৮]

২৮. বখ্তিয়ার খিল্জির আক্রমণের সময়কালে দেবকোট ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। মিনহাজু-এস্-সিরাজ-এর হিসাবে দেবকোটে বিভিন্ন রকমের তথ্য আছে যাতে বখ্তিয়ার তিব্বতে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর। [মিনহাজু-এস্-সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩১৩-৩১৪]

২৯. পিরেস্ এর মত অনুযায়ী, গৌড় ছিল ৪০,০০০ মানুষের একটি রাজত্ব। [পিরেস্, টৌম্, ১৯৪৪ : ৯০]

৩০. কলিঙ্গ দেশের সিঙ্গাপুর থেকে বঙ্গর বর্মণ রাজারা এসেছিলেন, যারা বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসেছিলেন। বিক্রমপুর ছিল তাঁদের রাজ্য। [রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৩৯৭]

৩১. বাংলার পরিবেশ, বারবার বন্যা হওয়া এবং হাওয়া চলাচলের অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার জন্য। আবুল ফজল মন্তব্য করেন যে, এমনকি সেই দিনেও পাঁচ হাজার টাকা লাগতো ওখানে বাঁশের বাড়ি করতে মির্জানাথন একটা তিনতলা বাড়ির কথা বলেন যা তিনি নিজে ভোগ করতেন। (রহিম, এম. এ. ১৯৮২, খণ্ড ১ : ২৪)

৩২. নবম শতকে পানাগড়ে বুদ্ধ স্তূপে যে দুর্দশা হয়েছিল লালমাই (দেবপর্বত) এর শালবন বিহার এবং ময়নামতীর কিছু ধাতুর কাজ অবশ্যই সেই রকম।

২.৪

সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র

ভূমিকা

আগের অধ্যায়গুলিতে বিগত দুহাজার বছর থেকে শুরু করে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত রাষ্ট্র, নগর এবং গ্রামের বিকাশ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হবে ওই সময়কালে সংস্কৃতির প্রভাব কী রকম ভাবে এই বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল বা সেই বিকাশের প্রভাব কীভাবে সমকালীন সমাজের উপর পড়েছিল তা জানা।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ নয়। সংস্কৃতি বলতে জীবন সম্বন্ধে প্রায় সব কিছুকেই বোঝায়। যেমন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, ভাবধারা থেকে শুরু করে জমি, শ্রম, অর্থ, কাল সব কিছু। আমরা এখানে সংস্কৃতির দুটি মূল উপাদান অর্থাৎ ভাষা এবং ধর্ম নিয়েই আলোচনা করব, যার সঙ্গে শাসন ব্যবস্থার এবং শাসক এবং শাসিতেব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা জানি, একটি রাষ্ট্রে তার শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও, শাসক-সংস্কৃতির পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও, নানা উপসংস্কৃতি নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে এবং জাতি এবং শ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি এবং উপসংস্কৃতির পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়া, দুই সংস্কৃতির বিকাশেই সাহায্য করে। শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি নিজেদের সামাজিক ভিত্তি বিস্তৃত করার স্বার্থে, অনেকক্ষেত্রেই স্থানীয় উপসংস্কৃতির বিশ্বাস, দেবমূর্তি, আচারব্যবহারকে গ্রহণ করে নেয। বৌদ্ধ কর্তৃত্বের সময় সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু কিছুকে বৌদ্ধরা গ্রহণ করেছিল। আবার ব্রাহ্মণরাও হীনযান বৌদ্ধ মতের বহু দেবমূর্তিকে আত্মসাৎ করেছিলেন (সরকার, ভি. সি., ১৯৮৬)। এইভাবেই একটি সুসংহত সংস্কৃতি জনগণের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। এভাবেই মুসলিম শাসকদের আমলে ফারসি প্রচলিত হয়, যা মুসলমান এবং অমুসলমান দুইয়েরই ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল তবুও স্থানীয় নিম্নবর্গের জনগণ যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, নিজেদের ভাব এবং বিশ্বাসকে নিজস্ব সংস্কৃতিতেই ব্যক্ত করত। তাই সংস্কৃত এবং ফারসি নয়, বাংলাই ছিল তাদের ভাব প্রকাশের ভাষা। বেদ-এর দর্শন এবং ইসলাম ধর্মের বিশ্ববীক্ষার চেয়ে, সামাজিক অবস্থানের প্রভাবেই তাদের ভাবনা এবং বিশ্বাস গড়ে উঠত।

দৈনন্দিন জীবনে উপসংস্কৃতিগুলির নিয়ন্ত্রণ থাকলেও এটা সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে স্থানীয় সংস্কৃতি নিম্নমানের আর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি উচ্চমানের। সংস্কৃতি, রাষ্ট্র শক্তির ক্ষমতা বিস্তারের শান্তিপূর্ণ মাধ্যম। অরণ্য সমাজে রাষ্ট্র ছিল না। কৃষি বিকাশ এবং উদ্বৃত্ত তৈরি হওয়ার ফলে, শাসকদের স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রের জন্ম হল। শহর তৈরি হল এই প্রক্রিয়ায়। কিন্তু স্থানীয় দেবতাকে বৈধতা পেতে গেলে কোনও না কোনওভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির কোনও দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হত। যেমন, মনসাকে দাবি

করতে হয়েছিল যে, সে শিবদুহিতা এবং এক মুনির পত্নী। শহরের ভিতর ধনী এবং শক্তিশালীরা বাস করত। উৎপাদনের চেয়ে ভোগ এবং বাণিজ্য গুরুত্ব পেল বেশি। শহর এখন সুস্পষ্টভাবেই গ্রামের থেকে পৃথক হয়ে গেল। দুর্গ এবং প্রাচীরেই শুধু নয়। কাজকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রেও দুইয়ের পার্থক্য লক্ষ করার মতো। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ ক্ষমতা বা 'দণ্ড' সংখ্যালঘু শাসকরা অনুভব করেছিল যে, বলপ্রয়োগ তো বটেই শোষণের ব্যবহার করা দরকার। প্রজারা সবকিছুকেই কোনও প্রশ্ন ছাড়া মেনে নিত এবং ভাবত সবকিছু মেনে চললে পরজন্মে উচ্চজাত হয়ে জন্মাবে। সংস্কৃত রাজভাষার স্বীকৃতি পেয়েছিল। শক শাসনকালেও তাই ছিল। এ ছাড়া উৎসবে-অনুষ্ঠানে, যোগাযোগে সংস্কৃত ভাষারই ব্যবহার হত (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৬৫ : ১৬৭-১৬৮)। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং বর্ণব্যবস্থাও এদেশে স্থান করে নিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে তুর্ক ও আফগান যুদ্ধের পর ফারসি ভাষার অনুপ্রবেশ হল। শাসকশ্রেণি এটা আমদানি করল ভারতের বাইরে থেকে। সংখ্যায় অল্প হবার জন্য তাঁরা অমুসলমানদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করবার কথা ভাবত না এবং স্থানীয় রাজাদের সঙ্গেও এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করল যাতে জনগণের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

এই পরিচ্ছেদে আমরা ১২০৪ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। ১২০৪ থেকে ১৭৫৭-র কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে (পরিচ্ছেদ ৩.৪)। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নৃতত্ত্ব গবেষণায় বাঙালি জাতির উদ্ভবের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মের উপর আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বর্ণব্যবস্থা-সহ ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সঙ্গে বিচার করে দেখব অন্যান্য আর্য ধারার প্রভাব। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে লোকসংস্কৃতি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাঙালির ও বাংলা ভাষার উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের প্রধান উপসংহারগুলি আলোচিত হবে।

বাঙালির উৎপত্তি

নৃতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করবার ক্ষেত্রে সাবধানতা দরকার। কারণ অতীতে বর্ণ ব্যবস্থাকে শাসকশ্রেণি শোষণের স্বার্থেই ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে, ভারত বা অন্যান্য দেশে জনজাতিগুলির সংস্কৃতির পার্থক্যকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির সপক্ষে কখনও কখনও বিভেদকামী শক্তি ব্যবহার করেছে। হিটলারের "শুদ্ধ আর্যজাতি" হিসেবে জার্মানিকে তুলে ধরবার চেষ্টায় লক্ষাধিক মানুষকে গ্যাস চেম্বারে জীবন হারাতে হয়েছে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের আমলে বা বর্তমান পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতেই জাতিব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনেও দেখা গেছে বর্ণবিদ্বেষের প্রাবল্য। উত্তরপূর্ব ভারতে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তার মূলেও ওই একই বোধ কাজ করছে। মঙ্গোলীয় প্রভাবে প্রভাবিত একদল মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছেন।

জাতি বিষয়ে আলোচনা সে কারণেই বিতর্কমূলক এবং বিস্ফোরকও। অনেক সময়

দেখা যায় শুধু মানুষ নয়, জাতি পার্থক্যের মূলে সে অঞ্চলের আবহাওয়া এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশও দায়ী। প্রথম হোমো স্যাপিয়েন জন্মেছিল আফ্রিকায়। কিন্তু দেশে দেশে মানুষ আকারে বা রঙে পৃথক হয়ে গেল আবহাওয়ার তারতম্যে। আবহাওয়ার মতোই, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বৈবাহিক এবং যৌন সম্পর্কের মধ্য দিয়েও জাতিবৈষম্য দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে ব্রিটিশরা পরাধীন জাতির সঙ্গে স্বাধীন জাতির মেলামেশার ঘোর বিরোধী ছিল। পোর্তুগিজরা কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছিল তুলনামূলকভাবে উদার। ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ভারতীয় নৃতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাতের সঙ্গে ব্রিটিশদের ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির নিরাপদ শাসনের একটি সম্পর্ক ছিল। ডালটন, রিজ্‌লে, থার্স্টন, এনথোভেন, ক্রুক, প্রমুখ প্রশাসকদের নৃতাত্ত্বিক চর্চার এটাই মূল কারণ বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক অবস্থানগুলিকে অনুধাবন করে, তাদের শাসনের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া। ভারতীয় সমাজকে বুঝতে গিয়ে হিন্দু সমাজ সম্পর্কে তাঁরা যে আদর্শ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত তা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যময় ছিল না। তাঁরা ভারতকে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিতে শুধু বিভক্ত করল না, জাতিভেদ প্রবণতাকেও ব্যবহারিক জীবনে উৎসাহিত করেছিল (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৭২)। তাঁরা নিজেদের সুবিধামতো, সমাজকে "সামরিক" "করণিক" "অপরাধী" এই সমস্ত ভাগে বিভক্ত করেছিল। যার ফলস্বরূপ একজন জাঠকে প্রশাসনিক কাজে, একজন বাঙালিকে সামরিক দায়িত্বে, বা লোধাকে কোন দায়িত্বশীল পদে বসানো যেত না। ডঃ ডি.এন. মজুমদারের মতও তাই। তাঁর মতে, প্রাচীন জাতি ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাজিল বা অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশে, ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় বহু জনজাতিকে বস্তুত হত্যা করে শেষ করেছিল। ভারতের জনসংখ্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি। বিকল্প হিসাবে, তাঁরা এ দেশের জাতিগত বৈচিত্র্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করার নামে, বিভিন্ন জাতিগত পার্থক্য ও পরস্পর বিরোধিতাকে উস্কে দিয়ে শাসিত জনগণকে শাসকদের উপস্থিতি ও প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য করল। তাঁরা পরাধীন দেশের জনগণের মধ্যে একধরনের হীনমন্যতা তৈরি করেছিল (মজুমদার, ডি.এস., ১৯৬১)।

ঔপনিবেশিকরাই জাতি এবং আদিবাসী ধারণার জন্মদাতা। প্রাচীন রচনায় 'জন' এবং 'জাতি'র মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পাণিনির ব্যখ্যায়, 'জনপদ' মানে আঞ্চলিক বসতি। 'জন' অর্থ, যে কোনও সম্প্রদায়। 'জাতি' শব্দটি বর্ণাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত (আগরওয়াল, ভি.এস. ১৯৫৩ : ৯১)।

বলা বাহুল্য, উন্নত জাতি, অথবা অনুন্নত জাতি নির্দিষ্টকরণের কোনও প্রকৃত ভিত্তি নেই। আজকের পৃথিবীতে খাঁটি জাত বলতে কিছু নেই। মানুষের পরিচয়ের পেছনে রয়েছে ইতিহাসের ধারা এবং নানা ধরনের দেশান্তরের ঘটনা। জাত হিসেবে নিজেদের খাঁটি প্রমাণিত করার যতই চেষ্টা হোক আসলে তা নানা জাতির মধ্যে বৈবাহিক বা বিবাহ-বহির্ভূত মিলনেরই ফল। বাংলায় যেটুকু নৃতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা প্রধানত অস্ট্রিক, ভূমধ্যসাগরীয় এবং মঙ্গোলীয়, এই ত্রিধারার মিশ্রণের ফল।

কেউ কেউ বলেন, আর্যদের আক্রমণে দ্রাবিড়রা দক্ষিণে চলে গিয়েছিল। একথা

ঠিক নয়। মানুষের ঠাঁই বদল হয়নি বরং ভাষা, সংস্কৃতি এবং আচার আচরণ স্থান পরিবর্তন করেছে। উত্তর ভারতের মানুষ আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল। সেরকমই বিন্ধ্য পর্বতের ওপারে দ্রাবিড় ভাষা এবং জীবনধারা গ্রহণ করেছিল দক্ষিণ ভারতের মানুষ (কোসাম্বি, ডি.ডি. ১৯৬৫)। অতি সম্প্রতি ভারতের অনেক মানুষ পশ্চিমি জীবনধারা ও সংস্কৃতি এবং ইংরেজিকে তাদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ কবেছেন। এর জন্য তাদের সবাইকে দেশান্তরী হতে হয়নি, বরং ইংরেজি ভাষা এবং সংস্কৃতিই তাদের কাছে পৌঁছেছে। ছবিটা আরও গোলমেলে ঠেকে যখন নৃতাত্ত্বিকরা বলেন আর্য বা দ্রাবিড়রা কোনও জাতিগোষ্ঠী নয়, এরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংমিলনে তৈরি ভাষা-সংস্কৃতিগত গোষ্ঠী (মজুমদার, ডি.এন., ১৯৬১ : ৪৮)। আর্য সম্ভবত জার্মানদের মতো লম্বা, খাড়া নাক, ফর্সা, সোনালী চুলের নানা পৃথক জনগোষ্ঠী[১] (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০)। আর্যরা, পারস্যের পথ ধরে, বাসভূমির আবহাওয়ার পরিবর্তনে, বসবাস অযোগ্য[২] বাসস্থান ছেড়ে বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছে। প্রথম দলে নারী ছিল যথেষ্ট, ফলে বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী অভিবাসনকারীদের সঙ্গে নারী ছিল কম, ফলে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটেছে বেশি।

দ্রাবিড়রাও বহু গোষ্ঠী। তারা এসেছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম আফ্রিকা বা পূর্ব ইউরোপ থেকে।[৩] ভাষা এবং সাংস্কৃতিক দিক ছাড়াও আকৃতির ধরন-ধারণেরও যেমন খুলির আকার, উচ্চতা, নাকের ধরনধারণ ও রক্তের ধরন[৪] ইত্যাদিরও জাতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে (গুহ, বি.এস., ১৯৪)। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীর নৃতত্ত্বের বহু সিদ্ধান্ত বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে পরে প্রমাণিত হয়েছে। রিস্‌লের[৫] বহু সিদ্ধান্ত, যেমন, মারাঠিদের উৎস বা বিহারের কুর্মি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্ব (রিজলে, এইচ.এইচ., ১৯৬৯) উত্তরকালের নৃতাত্ত্বিকরা বাতিল করে দিয়েছেন। শাসকেরা যে ভাবেই জাতি বিভাজন করুক না কেন আসলে আজকের জাতি এক ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতি এবং বিবাহবহির্ভূত যৌন সংস্রবের পরিণতি।

বাঙালিরা অন্যান্য মানবজাতির মতোই নানা জাতের মিশ্রণের ফল। যদিও অনেক বাঙালি নিজেদের আর্যধারার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন এবং তাদের ব্যবহৃত ভাষাকেও আর্য ভাষারই এক রূপ ভাবেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে আজকের বাঙালি নানা জাতের মিলনের ফল—এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙালির মধ্যে আর্যদের নর্ডিক প্রভাব অনুপস্থিত। বাংলার আদি জনগোষ্ঠী সর্বার্থেই হয় প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড, কোল বা মন-খেমের জাতির।[৬] পরবর্তীকালে দ্রাবিড় অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির জনগোষ্ঠীর অভিবাসন শুরু হল দক্ষিণ থেকে (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ৬৯)। পূর্ব অঞ্চলে এল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। তাঁরা এল তিব্বত, দক্ষিণ চীন, বর্মা, কম্বোজ এবং থাই দেশ থেকে (মজুমদার, ডি.এন. ও সি.আর.রাও : ৯৭; রায়, নীহাররঞ্জন: ৩৩)।[৭] বাঙালি জনগোষ্ঠীতে নেগ্রিটো ধারার মিশ্রণ নিয়ে দুই প্রত্নতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। বাঙালিদের মধ্যে যে জাতিগত মিশ্রণ ঘটেছে, তার মিশ্রণের প্রকাশ এক এক স্থানে এক এক রকম। প্রাক্‌ স্বাধীন বাংলার উত্তর এবং পূর্ব ভাগে মঙ্গোলীয় ধারা বেশি প্রকট। আবার ছোটনাগপুরের আশেপাশের এলাকায় অস্ট্রিক ধারার প্রাধান্য।[৮] বাঙালির আকৃতিগত পার্থক্য বাংলার বিভিন্ন স্থানের মানুষের মধ্যে যা পাওয়া যায়

তা সামান্যই। বহির্বঙ্গের বাঙালির তুলনায় বাংলার ভিতরের বিভিন্ন স্থানের মানুষের পার্থক্য নামমাত্র। ১৯৪০-সালে ডি. এন. মজুমদার এবং সি. আর রাও[৯] শরীর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বাঙালিদের মাথা, নাক, উচ্চতা এবং ওজন ইত্যাদি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বাঙালি জাতিগুলির মুখের পরিমণ্ডল তুলনামূলকভাবে ছোট। তাছাড়া নাকের গঠনে বাংলায় ব্রাহ্মণ এবং অন্য জাতের মধ্যে তফাত সামান্যই, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণ এবং অন্য জাতের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায়।[১০] ১৯৩৫ সালে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের গবেষণার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায়, বিভিন্ন জেলায় বা গোটা রাজ্যে জাতিগুলির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেশের অন্যান্য অংশেব তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। এই দুইজন গবেষকের গবেষণার থেকে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হল যে বাংলার জনগণের বেশিবভাগ অংশই মিশ্রধারার থেকে এলেও তাঁরা চেহারায় এবং প্রকৃতিতে একই রকমের ছিল।

আর্যকরণ প্রক্রিয়া : বৌদ্ধধর্মের উত্থান

বাংলায় আর্যকরণ প্রক্রিয়া প্রধানত সাংস্কৃতিক, জাতিগত নয়। বাংলার প্রতি আগ্রহী হতে আর্যদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। এই সুদূর পূর্বপ্রান্তে বসবাসে তাঁরা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করত না। আর্যকরণের প্রক্রিয়ার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর এবং শান্তিপূর্ণ। বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করার পর এই প্রক্রিয়া দুইটি ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল- ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মৌর্য আমলেই এর প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, যার নিদর্শন আমরা মহাস্থানের ব্রাহ্মি লিপিতে পাই, গ্রিক পণ্ডিতদের রচনায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখের মধ্যে পাই। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুন্ড্র, বঙ্গ এবং কর্ণসুবর্ণ[১১] ইত্যাদি অঞ্চলের শিল্প এবং হস্তশিল্পের উল্লেখেও তা জানা যায় (কাঙ্গলে, আর.পি. ১৯৬৩ : ১০৪-১০৪)। কিন্তু বাংলার সমাজজীবনে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব মগধে গুপ্ত রাজবংশের আমলের আগে লক্ষিত হয়নি। প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর তুলনায় বাংলায় পৌছতে আর্যভাষা এবং সংস্কৃতির সময় লেগেছিল অনেক বেশি।

একাধিক বিবরণ অনুযায়ী বাংলার বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ঘটে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকে। বাংলায় কোনও অশোকস্তম্ভ না পাওয়া গেলেও সাঁচীর দুটি উৎকীর্ণ ফলকে পুন্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে, যেখানে বৌদ্ধপ্রভাব পৌছেছিল (মহাপাত্র, বিমলচন্দ্র, ১৯৯৫)। কোনও সন্দেহ নেই, বাংলার ইতিহাসের কয়েকশো বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম একটি প্রধান শক্তি ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের অনেক বৌদ্ধ মন্দিরের বিবরণ থেকে তা প্রমাণিত হয়। ফা-হিয়েন এবং য়ুয়াং চোয়াং-এর বিবরণে দেখা যায় গুপ্ত আমলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। অনেক বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হয়েছিল। চীনা পর্যটক ই-সিং লক্ষ করেছিলেন, "চীনা মন্দির" নির্মিত হয়েছিল মালদহের কাছে মৃগস্থপনে, গুপ্ত রাজ শ্রীগুপ্তর সময়। শশাঙ্কর আমলে এই ধর্ম কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু তার মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের আমলে বৌদ্ধধর্ম পুনঃপ্রচারিত হয়। বহু বাধাবিপত্তির পর পাল রাজবংশের আমল থেকে শুরু করে সেন বংশের শাসন শুরুর সময়কাল পর্যন্ত এই প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। সেনবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষে। দ্বাদশ

শতক থেকে বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস পায় এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বাংলার চন্দ্র রাজারা, সম্ভবত ছিলেন আরাকান বংশোদ্ভূত। তাঁরা বৌদ্ধধর্মানুসারী ছিলেন। খড়্গ রাজারাও ছিলেন তাই (তরফদার, এম.আর, : ১৯৯৫)।

বাংলার এবং বিহারের পালরাজাদের সাহায্যে বাংলায় যেসব প্রধান বৌদ্ধমন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর এবং বিক্রমপুর ইত্যাদি (মিত্র, দেবলা, ১৯৭১)। এক সময় বিক্রমশীলার প্রধান ছিলেন শীলভদ্র (৭০৫-৭৬২ খ্রিঃ)। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ছিলেন অগ্রণী বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত যিনি তিব্বতে গিয়ে (১০৫৪ খ্রীঃ কাছাকাছি) আমৃত্যু বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চায় কালাতিপাত করেছিলেন। সেই যুগের দুই খ্যাতনামা পণ্ডিত দীপঙ্কর এবং শীলভদ্র দুই জনেই ছিলেন বিক্রমপুরের অধিবাসী। পাল রাজারা ধর্মীয় অনুদান ইত্যাদির জন্য 'ডুটাকা' নামে এক রাজকর্মীর পদ সৃষ্টি করেন (দাশগুপ্ত শশীভূষণ, ১৯৪৬)। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং তার গোঁড়া আচার-আচরণের বিরুদ্ধে জৈন ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেরও উত্থান হয়েছিল, প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। বৌদ্ধরা সরল জীবন যাপনে বিশ্বাস করত। বৌদ্ধদের বিশ্বাস ছিল কর্মের মাহাত্ম্য জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে একজনকে নির্বাণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। নির্বাণ অর্থ অনন্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া। যার জন্য ঘটা করে উৎসব বা আচার পালন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। মানুষের নির্বিচার হত্যালীলা, পশুপাখির বলি ইত্যাদির বিরুদ্ধে 'অহিংসা' মন্ত্রের প্রভাব অনেক মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে প্রয়াসী করেছিল।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে যেখানে আর্যপ্রভাব প্রসার লাভ করেনি কিংবা খুবই দুর্বল ছিল, সেখানেই বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের ব্যাপ্তি ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতপ্রথাকে বিশ্বাস করত না। বুদ্ধ মনে করতেন, যে কোনও জাতের মানুষই সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

পরবর্তীকালে ইউরোপের প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রকৃতিগত মিল ছিল। ঈশ্বরকে পাওয়ার পথে মধ্যস্থতাকারী পুরোহিতের ভূমিকা বা জাঁকজমকে এদের বিশ্বাস ছিল না। জাঁকজমকের বদলে সাধারণ জীবনযাত্রাকে উৎসাহিত করতেন এরা। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে এক নতুন নীতিবোধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এই ধর্ম। বৌদ্ধ জাতকের গল্পে বণিক চরিত্রের ছড়াছড়ি এই কারণে। বণিকদের বলা হত 'শ্রেষ্ঠী' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্মের চরম বিকাশ ঘটেছিল সে সময়, যখন ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য 'দেশে ও বিদেশে' ভালোভাবে বিকাশ পেয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতিগতভাবে নাগরিক ধর্ম ছিল। নগর যখন গ্রামের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখনই বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি ঘটে। নানা বৌদ্ধ মন্দিরে সমাবেশ, ব্যবসায়ীদের ক্রিয়াকর্মে শহরগুলি ছিল জীবন্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেকালে বহু গণরাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। এরকমই এক শহরে জন্ম হয়েছিল বুদ্ধর। এই গণরাষ্ট্রগুলি সভা দ্বারা পরিচালিত হত।

বাংলায় আর্য প্রভাব কয়েক শতক পিছিয়ে গিয়েছিল। বাংলার তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট এবং অন্যান্য স্থানে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের সংবাদ পাওয়া যায়, তখন বৌদ্ধধর্মের বয়স একহাজার বছর পেরিয়ে গেছে। দেশের অন্যত্র তার পতন শুরু হয়েছে। কিন্তু ততদিনে যুক্তিবাদী বুদ্ধ আর নেই। তিনি তখন কিংবদন্তি, ঈশ্বরের

অবতারে পরিণত হয়েছেন (মিত্র,দেবলা,১৯৭১)।

পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় বৌদ্ধধর্মকে কয়েক শতাব্দী টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তার ক্ষতি শুরু হয়ে গেছে। পালরাজারা ধর্মীয় ব্যাপারে উদার ছিলেন। পরবর্তীকালে কিন্তু পালরাজারা শৈববাদ এবং বৈষ্ণববাদকে বৌদ্ধধর্মের মতোই সাহায্য করতেন, এবং ব্রাহ্মণরাই বংশানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হতেন।[১২] পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতা পাল শাসনের মূল উপাদান ছিল (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮)।[১৩] পাল শাসনের শেষ দুই শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিজেদের সংহত করল এবং ধীরে ধীরে সারা বাংলায় ছড়িয়ে গেল (রায়, হিমাংশুপ্রভা, ১৯৯৪)।

চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে ই-সিং ৬৭৩ সালে তাম্রলিপ্ত পরিভ্রমণ করে বৌদ্ধধামগুলি সম্বন্ধে বিবরণী লিখেছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী কিছু শ্রমণ তাঁদের জমি ভাগচাষিদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের জমি চাষ করবার অধিকার ছিল না। জল খাবার আগে তাঁরা তাকে পরিস্রুত করে নিতেন, যাতে তার মধ্যে জীবিত বীজাণুরা না থাকে। সবকিছুই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁদের সংঘের বিধান অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে সমান ভাগ করে নিতেন। যারা করতেন না তাঁদের বিতাড়িত করা হত। ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম পালিত হত, যাতে তাঁরা কোনও অনৈতিক কাজে জড়িয়ে না পড়েন। কোনও পুবোহিতেরই একাকী কোনও ভিক্ষুণীর গৃহে যাবার অনুমতি ছিল না। জানা যায় যে ওই সময়ে, বৌদ্ধ সংঘের এক সাধারণ শিক্ষক, তাঁর প্রজার পত্নীকে খাদ্য পাঠাবার দায়ে সংঘ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন (সেন, মজুমদার, গায়ত্রী, ১৯৮৫)।

বৌদ্ধরা যেমন শহর এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিজেদেব প্রভাবে রেখেছিলেন, ব্রাহ্মণবা সেক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন কৃষি এবং গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে। বহু বৌদ্ধ সংঘারাম বাণিজ্যপথেই অবস্থিত ছিল। তাঁরা বণিকদের সুদের বদলে অর্থ দিত। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র যথা, ধর্মসূত্র বা মনুস্মৃতিতে বাণিজ্যকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যপক্ষ, বৌদ্ধরা বণিকদের খোলাখুলি সমর্থন করতেন (রায়, হিমাংশুপ্রভা, ১৯৯৪)। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তিব একটি কারণ ছিল যে, এই ধর্ম যখন বাংলায় পৌছল তখন এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব সঙ্গে কোনও বিশেষ তফাত ছিল না। যদিও বুদ্ধ নিজে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই কবেছিলেন, কিন্তু, তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে তাঁর প্রচলিত ধর্মে উচ্চজাতের প্রাধান্য দেখা গেল। এরকম তিনশো বৌদ্ধ শ্রমণ এবং ভিক্ষুণীর জীবনকাহিনি থেকে জানা যায় যে, এদের দুই-তৃতীয়াংশই এসেছিলেন বড় শহর থেকে, শতকরা চল্লিশভাগ ব্রাহ্মণ, বাইশভাগ ক্ষত্রিয়, উনত্রিশ ভাগ ছিল বৈশ্য এবং একভাগ শূদ্র বর্ণের (রায়, হিমাংশুপ্রভা, ১৯৯৪ : ৫৪৬-৫৪৭, ৫৫০)।

বৌদ্ধধর্ম কীভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে পরাজিত হয়ে বাংলা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তার নানা ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যা হল, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধধর্মে যা ঘটেছিল, তার মধ্যেই এর কারণ নিহিত । বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তির একটি বড় কারণ, সংঘারাম এবং তার কিছু রীতিনীতির উপর নির্ভরতা এই ধর্ম প্রথমে উদার মহাযান ধারায় এবং আর পরে বজ্রযান ধারায় রূপান্তরিত হয়েছিল। বজ্রযানীরা মুক্ত যৌন সংসর্গে বিশ্বাসী ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধরা হীনযান এবং মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

হীনযানীদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের যাবতীয় অস্তিত্বের থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিতে পৌঁছে যাওয়া। সেখানে মহাযানীদের কাছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিই কাম্য ছিল, জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে বোধিসত্ত্বত্ব প্রাপ্তিতে তা পূর্ণ হত। ততদিনে বুদ্ধ আর মানুষ ছিলেন না, দেবতায় পরিণত হয়েছেন, যা তাঁর শিক্ষার অনুসারী ছিল না (সরকার, ডি.সি., ১৯৮৫ : ২)। কিন্তু এও বলা হত যে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বুদ্ধ হয়ে ওঠার শক্তি ছিল (মিত্র, দেবলা ১৯৭১ : ১৩), নির্বাণ প্রাপ্তিও সম্ভব ছিল।

একথা বলা যায় যে বুদ্ধকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে তাঁর ভক্তরা তাঁর মতবাদকেই হত্যা করেছিল। বৌদ্ধধর্মের নামে যা অবশিষ্ট ছিল তার সঙ্গে প্রাথমিক পর্বের বিশ্বাসের কোনও মিল ছিল না (মিত্র, দেবলা, ১৯৭১ : ১৭)। নানা ধরনের গোঁড়ামি এল, উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধনের নানা নিয়ম প্রবর্তিত হল এবং সময়কালে প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ধর্মের আচার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচিত হল। যে আচারসর্বস্বতার প্রতিবাদে এই ধর্মের উত্থান, সেই আচারসর্বস্বতা তাকে গ্রাস করল (সরকার, ডি.সি., ১৯৮৫ : ১১; দাশগুপ্ত শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ৮৬)। ধর্ম তার "সংযমী-মাহাত্ম্য" হারাল। যে বৌদ্ধধর্মে কয়েকজন বোধিসত্ত্ব ছাড়া অন্য দেবতা ছিল না, সেখানে দেবদেবীর ভিড়ে বৌদ্ধধর্ম তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যও হারাল। যে ধর্ম তার প্রাথমিক পর্বে জীবহত্যার বিরুদ্ধে ছিল (কোসাম্বী, ডি.ডি. ১৯৬৫) তা পরবর্তীকালে দেবী হরিতিকে মাছ-মাংস এবং তাদের রক্তের অঞ্জলি দানকে স্বীকৃতি দিল (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬)। বৌদ্ধধর্মের যা অবশিষ্ট রইল, তা, তন্ত্রসাধনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের রূপ নিল চৈতন্যপরবর্তীযুগে (তরফদার, এম.আর., ১৯৬৫:১৭৯)।

একই সঙ্গে, যে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে এক নতুন কৌশল নিল। বুদ্ধকে তাঁরা হিন্দু দেবদেবীদের একজন করে নিল, যদিও তাঁর দর্শনকে তাঁরা গ্রহণ করল না। বৃহৎধর্মপুরাণে উল্লেখ রয়েছে যে, শিব এবং বিষ্ণু বুদ্ধধর্মের কুফল থেকে বিশ্বকে উদ্ধারের নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্যদিকে মৎস্যপুরাণে বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেন (কান্টাওয়ালা, এস.জি., ১৯৬৪ : ১৬৫, ১৭১)। এই পুরাণে বুদ্ধ ক্রোধ এবং হিংসাশূন্য, প্রাণী হত্যার বিরোধী (চক্রবর্তী, কুণাল, ২০০০ : ১৬৪)। সেন রাজসভাতেও বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দর্শন গৃহীত হয়নি। বলা হত, বিষ্ণু বুদ্ধরূপে পাপীদের প্রলুব্ধ করতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাতে কল্কি রূপে তাদের ধ্বংস করার ক্ষেত্র তৈরি হয় (সরকার, ডি.সি., ১৯৮৫; চক্রবর্তী, কুনাল, ২০০০; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪)।

এরূপ কথিত আছে যে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় এবং অবলুপ্তির মূলে একটি প্রধান কারণ ছিল তার তন্ত্রনির্ভরতা। নিজের ঘনিষ্ঠ পরিজনদের কথায় মহিলাদের সংঘে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও বুদ্ধের এব্যাপারে মানসিক সম্মতি ছিল না।[১৪] যদিও বৌদ্ধ শ্রমণরা তাঁদের আদর্শ জীবনযাপন এবং সংযমের জন্য উচ্চ প্রশংসিত ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তান্ত্রিক প্রভাবের ফলে পরিবর্তন দেখা দিল। বিশ্ব রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে তাঁরা নিজের শরীরকে ব্যবহার শুরু করল। তাঁরা ভাবল, শরীরের সংযোগ সাধনের মধ্যে দিয়ে শিরা উপশিরায় রক্ত সঞ্চালনের এবং শক্তির প্রয়োগ সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষের নির্বাণ প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করা যায় (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৭৭৯-৭৮০)।

মহাযান মত মূলধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তীকালে পারমিতা-নয়া এবং মন্ত্র-নয়া এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছিল। মোটামুটি বলতে গেলে তন্ত্রবাদ এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কখনও কোনও চারিত্রিক মিল ছিল না। বাংলার বাইরেই এদের বৃদ্ধি ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েরই এই ঐতিহ্য ছিল। তন্ত্র সাধনার স্বাধীন ইতিহাস ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো তন্ত্র কিন্তু শূদ্র এবং মহিলাদের মধ্যে কোনও বৈষম্যে বিশ্বাসী ছিল না (হাজরা, আর.সি., ১৯৭৫)। বৌদ্ধ ধর্মের একটি পরিপূরক অঙ্গ হিসেবে তন্ত্রের পক্ষে বলার মতো কিছু যুক্তিও ছিল। শরীব এবং তার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে তন্ত্রের জ্ঞান অনেক গভীর ছিল। এর থেকেই বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদির প্রবর্তন হল। পারমিতা-নয়াব উপদেশগুলো সংস্কৃতে লিখিত ছিল। মন্ত্র-নয়ার নির্দেশ লিখিত ছিল প্রাকৃত ভাষায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধরা "প্রজ্ঞা" এবং "উপায়"-এর মধ্যে এক অদ্ভুত ভেদরেখা টেনেছিল। প্রজ্ঞা ছিল জ্ঞান এবং বিদ্যা, উপায় ছিল সেখানে পৌঁছবার পথ। প্রজ্ঞাকে নারী এবং উপায়কে পুরুষরূপে কল্পনা করা হত। একজন স্থিতিশীল, অন্যজন গতিময়-বাস্তবের দ্বৈতরূপ। প্রজ্ঞা হল শূন্যতার সমার্থক, উপায় করুণার।[১৫] তন্ত্রের আচারের সঙ্গে বুদ্ধের মূল মেলাবার এ এক চেষ্টা। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ধারণার প্রবেশ, মৌলিক চরিত্র বদলে নারী ও পুরুষের যোগ মিলনে উদ্ভূত মহা আশীর্বাদের ধারণায় রূপান্তরিত হল।[১৬]

তন্ত্র নির্ভরতা বৌদ্ধধর্মের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল কিন্তু তাই একমাত্র কারণ ছিল না। গুপ্ত যুগের আমল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি, সঙ্গে বণিকদের পতন এবং নগরজীবনের ক্ষয় এর একটি প্রধান কারণ। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল নগরজীবনকে কেন্দ্র করেই। যদিও তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে শৈব এবং বৈষ্ণবদের মিল পাওয়া যায়, ইতিহাসের এই বিশেষ সময়ে বৌদ্ধধর্মের সাথেই তার মিল ছিল বেশি।[১৭] কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে "পরিবার" সৃষ্টির তাগিদে তান্ত্রিক ধারার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের প্রতিষ্ঠানিক রূপ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কৃষিকাজ মূলত সম্পন্ন হত একজন গৃহপতির অধীনে পারিবারিক শ্রমের সমন্বয়ে (কোসাম্বি, ডি.ডি. ১৯৬৫ : ১৬৮)। তন্ত্র বিশ্বাসে অমিতাচার স্বীকৃত ছিল এবং পরিবার ধারণার মূলে তা আঘাত হেনেছিল। স্থায়ী কৃষিতে শ্রমের স্বার্থেই পরিবারের গুরুত্ব ছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মণরা গার্হস্থ্যধর্মকে মর্যাদা দিত, যা পারিবারিক ধারায় মূল্যবোধ এবং ব্যবহার বিধি নিয়ে এল। এও শোনা গেল, যে একজন মানুষের; তার পরিবারকে ফেলে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার মধ্যে কোনও ধর্ম নেই। অন্যদিকে, স্বামীকে সেবা এবং সুখী রাখবার জন্য যদি বেশ্যার ঘরে গমনের দায়িত্বও নিতে হয়, একজন স্ত্রীর পক্ষে তা-ই হয়ে ওঠে মহান ধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমস্ত বইতেই সব মানুষকেই স্বধর্মে যুক্ত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হল। স্বধর্ম বিচ্যুত হয়ে পরধর্ম আশ্রয় করার জন্য রাক্ষস সুকেশীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বর্ণ মিশ্রণকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে ভেনাকে ধ্বংস করা হয়েছিল (হাজরা, আর.সি., ১৯৭)।

ব্রাহ্মণ্যবাদ

জাতিপ্রথা; শ্রেণিশাসনের যৌক্তিকতা

আর্যপ্রভাবে যে জাতিপ্রথার আমদানি হয়েছিল, দ্বাদশ শতকে সেনরাজত্ব কায়েম হবার আগে পর্যন্ত বাংলার মাটিতে তা দানা বাঁধতে পারেনি প্রধানত দুটি কারণে। এক, আর্য অনুপ্রবেশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাতিপ্রথার পাশাপাশি জাতিপ্রথার বিরোধী বৌদ্ধধর্মকেও এখানে এনেছিল । দ্বিতীয়ত, বাংলার শাসকেরা, যারা প্রধানত নিম্নজাতের ছিলেন, বৌদ্ধধর্মকেই তাদের ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

মূলত দুটি কারণে ব্রাহ্মণরা সমাজে তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি করলেও, জাতপ্রথা সেভাবে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারেনি। প্রথম, ব্রাহ্মণসমাজ পরিচালিত ধর্মীয় রীতিনীতি, দ্বিতীয়, জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে ব্রাহ্মণদের স্বীকৃতি। ব্রাহ্মণরা পশ্চিম থেকে নিয়ে এসেছিল একটি নির্দিষ্ট দর্শন যা বেদ, পুরাণ এবং উপনিষদনির্ভর, একটি উন্নত ভাষা সংস্কৃত, একটি আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা যা মনু, কৌটিল্য এবং অন্যান্যরা নির্ণয় করেছিলেন, পাণিনি, পতঞ্জলি এবং কাত্যায়নের নানা তত্ত্ব, দুইটি মহাকাব্য মহাভাবত এবং রামায়ণ। পালরাজাদের অনেক প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন ব্রাহ্মণ , রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। অনেকদিন ধরে, ব্রাহ্মণরা জঙ্গল নিকাশ করে বসতি গড়েছেন, নিজেদের প্রতিষ্ঠানসমূহ তৈরি করেছিলেন এবং আদি পুরোহিতশ্রেণিকে বিতাড়ন করেছেন। এমনকী, পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেরও সংস্কৃতে অনুবাদ হল। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষা এবং কাব্যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের বন্দনা করা হয়েছে (মহাপাত্র, বিমলচন্দ্র, ১৯৯৫ : ২৩) ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত-র সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিও (জাতপ্রথা যার একটি বিশেষ অঙ্গ) বাংলার সমাজে স্থান করে নিতে শুরু করল।[১৮]

পাল আমলেও সমাজ বিভক্ত ছিল, পুরোহিত শ্রেণি, যোদ্ধা, কৃষিবিদ, বণিক এবং অন্যান্য শ্রেণিতে। এই বিভাজন তখন অন্যান্য সমাজেও চালু ছিল, এমনকী, রোমে পর্যন্ত। পুরোহিতরা থাকতেন পুজোআর্চা নিয়ে এবং শাসককে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে তারাই তুলে ধরতেন।[১৯] যোদ্ধাদের কাজ ছিল দেশকে রক্ষা করা এবং অন্যদেশ জয় করা। কৃষকরা শহরের অকৃষিজীবী সম্প্রদায়ের জন্য শস্য ফলাত। কৃষি ছাড়া নগরজীবনের চলবার উপায় ছিল না। গ্রাম থেকে কৃষি উদ্বৃত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করাও হত। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যের সময়কালে বণিকশ্রেণি প্রচুর উন্নতি করেছিল। তাদের মর্যাদা এবং প্রভাব বেড়েছিল নানা কারণে, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সে মর্যাদা হারিয়েছিল।

বাংলার রাজনীতিতে সেনবংশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার এবং বৌদ্ধ ধর্মের পতন দেখা দিল। সেনরা এসেছিলেন বাইরে থেকে। কর্ণাটকের ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁরা। সেনরা কেমন করে বাংলায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন তা বিশদভাবে জানা না গেলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্যের কোনও অভাব ছিল না। বৌদ্ধদের চিহ্ন মুছে ফেলতে তাঁরা বলপ্রয়োগের পথও ধরেছিলেন। এর ফলে বৌদ্ধরা 'নাথ' সম্প্রদায়ের ভেক ধরে আত্মগোপন করে। রাষ্ট্র প্রবর্তিত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে সেন রাজারা বর্ণব্যবস্থা চালু করেন। তাঁরা যে বর্ণব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন

তা পূর্ববর্তী আমলের নাগরিক শ্রেণিবিভাগের থেকে আলাদা ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল কঠোর, বংশানুক্রমিক এবং জন্মান্তরবাদের সঙ্গে জড়িত। ভাবা হত যে পূর্বজন্মের কর্মফলেই উঁচু এবং নিচু জাতের সৃষ্টি । সুকর্মের ফলে একজন নিচু জাতের মানুষ পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্ম নিতে পারে। সুকর্ম অর্থে বর্তমান জন্মে জাতিব্যবস্থা মুখ বুজে মেনে চলা বোঝাত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী সুকর্মের ফলে বর্ণনির্বিশেষে একজন মানুষ স্বর্গে পৌঁছে যেত (কাঙ্গলে, আর.পি., ১৯৬৩ : ৯)। বর্ণ ব্যবস্থা এবং জন্মান্তরতত্ত্ব শাসকদের হাতে বিনা বলপ্রয়োগে শাসন চালাবার মস্ত বড় অস্ত্র ছিল। সম্ভবত, জাতপ্রথার সবচেয়ে সংহত রূপ পাওয়া যায় মনুস্মৃতিতে। এই দলিলে বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র অধিকার ছিল বেদচর্চার (ঝা, গঙ্গানাথ, ১৯২৬)।

সাধারণ মানুষের উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার ছিল না, একমাত্র উচ্চশ্রেণীই এই অধিকার ভোগ করত। যে কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং যে কোনও ধর্মানুষ্ঠানই হোক না কেন, ব্রাহ্মণদের উপহার কিংবা প্রণামী দেওয়া ছিল অবশ্য কর্তব্য। এই প্রথা পালন করলে পুণ্যলাভ হত, না করলে পাপের ভাগী হতে হত (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : ৬৭৩)।

বৈদিক জাতপ্রথাকে সংস্কৃতে বলা হত বর্ণাশ্রম। বর্ণ অর্থে একজনের গায়ের রঙের কথা বোঝায়। আর্যরা ছিল সবচেয়ে ফরসা আর শূদ্ররা ছিল কালো। বলা হত, ব্রাহ্মণরা উদ্ভূত হয়েছিল স্রষ্টার মুখ থেকে আর পদতল থেকে এসেছিল শূদ্ররা, যা তাদের সামাজিক নিম্ন অবস্থানকে সূচিত করত। মৃতপাস (শবদাহক) এবং চণ্ডালরা ছিল সবচেয়ে নিম্ন জাতের। শূদ্ররা ছিল অস্পৃশ্য। সেই সমাজে দাসরাও ছিলেন। দাসরা এই জাতিব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আদি সমাজের বর্ণব্যবস্থাই সম্ভবত শ্রেণিব্যবস্থার পূর্ব লক্ষণ (কোসাম্বি, ডি. ডি., ১৯৬৫ : ৫০) পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। 'জন' যখন 'জাতি'-তে পরিণত হল, বর্ণ পর্যায়ে তাদের স্থান নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়ল। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মানদণ্ডেই তা নির্ধারিত হল (আগরওয়ালা, ডি.এস., ১৯৫৩)।[২০]

জাতপ্রথার প্রধান সমালোচক ছিলেন এক অসাধারণ মুনি, বাস্তববাদী, প্রাচীন পণ্ডিত চার্বাক।[২১] তিনি মনে করতেন এই সব আচার আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য নানা অজুহাতে ব্রাহ্মণদের স্বার্থকে রক্ষা করা। তাঁর মতে, কোথাও স্বর্গ নেই, মুক্তি নেই, আত্মা নেই, মৃত্যুর পর আর কোনও অস্তিত্ব নেই। জাত ব্যবস্থা নির্দিষ্ট জীবনের বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন কর্মের কোনও কর্মফল নেই। অগ্নিতে আত্মাহুতি, তিন বেদ, শরীরে ছাই মাখা এসবই নেহাত বোকামি এবং কাপুরুষের জীবনযাপনের লক্ষণ। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, বলিদত্ত পশু যদি সোজা স্বর্গে যায়, তাহলে, যাজ্ঞিক তার পিতাকে বলি দিচ্ছেন না কেন? তাঁর মতে বহু ব্রাহ্মণ্য আচরণ অর্থহীন। 'ব্রাহ্মণরা নিজেদের আখের গোছাতে এই সব নিয়ম তৈরি করেছে। বেদগুলি লিখেছেন কিছু ভণ্ড, ধূর্ত এবং দানব প্রবৃত্তির লোক' (চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ১৯৮৭; দাশগুপ্ত, শশীভূষণ)।

চার্বাক, অজিথা এবং অন্যান্য বস্তুবাদী দার্শনিকরা বিশ্বাস করতেন যে একজন দান ধ্যান বা যে কোনও ভালো কাজই করুক না কেন, মৃত্যুর পর আর কিছু নেই (কোসাম্বি,

ডি.ডি., ১৯৬৫)। বর্তমানই মুখ্য, মৃত্যু পরবর্তী জীবন বলে কিছু নেই। চর্যাপদের একপ্রধান কবি লুইপা চাবার্কের মতোই বলেছিলেন দুঃখকষ্টই যদি ভোগ করতে হয়, তাহলে আর পূজা আর্চা, নিয়মকানুন মেনে লাভ কী (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ৬৫)?

বৈদিক জাত বাংলার জাতপ্রথা : সেন রাজারা চার্বাক সম্বন্ধে কতটা অবহিত ছিলেন জানা নেই। তবুও তাঁরা বাংলায় জাতপ্রথা নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উদ্যোগে প্রধান বাধা ছিল, এই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের তিনটি উচ্চ জাতির এই দেশে উপস্থিতি ছিল না। তাঁদের প্রথম কাজ হল যথেষ্ট পরিমাণে বৈদিক ব্রাহ্মণ খুঁজে বার করা, যারা, এই বর্ণব্যবস্থার কেন্দ্রে আসীন থাকবেন। যথেষ্ট পরিমাণ ব্রাহ্মণের অভাবে অনেক ব্রাহ্মণকে বাইরে থেকে এমনকি কনৌজ থেকেও আমদানি করতে হল। প্রকৃত ব্রাহ্মণদের আসার আগে যাঁরা পৌরোহিত্য করতেন তাঁদের ততটা যোগ্য মনে করা হত না।

বলা হয়, পুরাণের রাজা আদিশূরের অনুরোধে কনৌজরাজ নানা ওজর-আপত্তির পর বাধ্য হয়ে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে ঘোড়ার পিঠে, ধনুক-বানে সাজিয়ে বাংলায় পাঠান। বৈদিক ব্রাহ্মণরা নিজেদের কুলিন বলে চিহ্নিত করলেন। যে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার বাবা-মা একজন কুলিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে পারলে জীবন সার্থক মনে করত, এই কাজকে স্বর্গে যাওয়ার উপায় বলে ধরা হত। এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক বিবাহ পর্যন্ত করতেন, তাঁদের খাতায় পরিবারের নাম ঠিকানা লিখে রাখতেন। এইভাবে তাঁরা নিজেদের বিকৃত কামনা এবং বাসনা চরিতার্থ করতেন। তাঁদের এই কাজে রাজন্যবর্গের সায় ছিল। কারণ, রাজাদের স্বর্গীয় মহিমার[২২] গুণগান গেয়ে তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে রাজাদের প্রতি ভক্তি এবং কর আদায় করতেন। পশ্চিম থেকে আসা ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় ছিলেন কম। এদের সংখ্যা বৃদ্ধির বহু উপায় নেওয়া হল।[২৩] ফলে কৈবর্ত এবং অন্যান্য আদিবাসীর কিছু মানুষও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হলেন।

বহিরাগত ব্রাহ্মণদের জাতপ্রথার সর্বোচ্চ পদে স্থান দেওয়ায় অর্ধেক কাজ সমাধা হল। বাকি অর্ধেক কাজটা ছিল কঠিন, বাংলায় বৈদিক বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে জাতিবিন্যাস সূচিত করা। এই কাজটি সহজ ছিল না। কারণ, সে সময় বাংলায় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যরা ছিল না। ব্রাহ্মণদের মতো তাদের বাইরে থেকে আমদানি করাও সম্ভব ছিল না। যোদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁরা ক্ষত্রিয়দের মতো দক্ষ বিবেচিত হত না। কারণ তাদের কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। রাজস্থানে এবং পশ্চিম ভারতের কোনও কোনও অংশে, বহু রাজপুত, তাঁদের মধ্যে আদিবাসীরাও ছিলেন, রাজত্ব দখলের পর নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে জাহির করতেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা এই দাবিকে জাল বংশলতিকা বানিয়ে স্বীকৃতি দিতেন (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ৫৯),সেন বংশীয়রা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

এইভাবে এবং কৃষিজীবীদের ভিতর থেকে বৈশ্যদের একটি পৃথক শ্রেণি সৃষ্টি করা হল। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এইভাবেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্ররা দেখা দিল (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ২০৩)। দশম শতাব্দীতে কায়স্থরা জাত হিসেবে

চিহ্নিত হল।[২৩] যেমন দ্বাদশ শতাব্দীতে হল বৈদ্যরা (কাঙ্গল, আর.পি., ২, ১৯৬৩ : ২৪৮; ওই, ৩, ১৪৬-৪৭)।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে জাতি প্রসঙ্গে সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা থেকে জাতিসমূহের উৎপত্তি এবং সমাজে তাদের পদ ও মর্যাদা বিষয়ে আমরা অবগত হই। নিচু জাতির কাজ ছিল উঁচু জাতির আদেশ পালন করা এবং আশা করা হত উচ্চ বর্ণরা পালন করবেন শূদ্রদের, পরবর্তীকালে যাদের "দাস" এবং "দাসী" বলা হত (হাজরা, আর.সি., ১৯৬৩)। এদেব বেদ বা পুরাণ পাঠের অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণদের উপদেশ অবশ্য তাঁরা গ্রহণ করতে পারত। ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে দিয়ে সেই জল পান করা শূদ্রদের জাতিগত দায়িত্ব ছিল (হাজরা, আর.সি., ১৯৬৩)। স্ত্রী-ধর্ম অনুসারে নারীদের কাজ ছিল পুরুষদের সেবা করা, তাদের বিশ্বাসভাজন হওয়া। এমনকি স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে তাঁরা নিজেদেরও সেই আগুনে আত্মাহুতি দিত। পুরুষদের বেলায় সেইরকম কোনও বাধ্যবাধকতা বা বিধান ছিল না। বহু নারী ভোগের তাঁরা অধিকারী ছিলেন, এবং বারো ধরনের সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন (হাজরা, আর.সি, ১৯৬৩)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও শুদ্রদের ক্ষেত্রে উচ্চ তিনটি জাতির সেবা করার বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করা আছে (কাঙ্গালে, আর.পি., ২, ১৯৬৩)।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী চণ্ডালদের ক্ষেত্রেও নানা বাধানিষেধ ছিল। চণ্ডাল কেবল চণ্ডালের কূপই ব্যবহার করতে পারবে (কাঙ্গলে, আর.পি, ১৯৬৩)। উচ্চজাতের নারী এবং ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করার অধিকার চণ্ডালদের ছিল না, তাদের অপবিত্র গণ্য করা হত। শ্মশানের নিকটবর্তী স্থানে চণ্ডালদের বাস করতে দেওয়া হত (কাঙ্গলে, আর.পি., ১৯৬৩)। এর থেকেই বোঝা যায়, চণ্ডালদের কীভাবে আর্য সমাজ ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছিল।

জাতির মুক্তকরণ : জাতির বহুমুখিনতা

ব্রাহ্মণ্যধর্ম জাতব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট এবং সুচিহ্নিত করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের এই চেষ্টা সর্বদা ফলপ্রসূ হয়নি। যতই কড়াকড়ি থাকুক, একজাতের পুরুষের অন্য জাতের মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। ফলে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুমতি ব্যতিরেকে এই মিলনের ফলে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে বিপদ দেখা দিল। আমরা আগে দেখেছি যে, ভেনা নামের পুরাণ উল্লিখিত এক রাজার কাহিনিতে এই সমস্যার কথা রয়েছে।[২৪] এই রাজা বেদের নির্দেশ অমান্য করে আন্ত-র্জাতি বিবাহে উৎসাহ দিতেন। এই পাপের জন্য সাধুরা তাঁকে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।[২৫] তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং পুত্র পৃথু সনাতন জাতি ব্যবস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠা করেন (হাজরা, আর.সি., ১৯৬৩ : ৪৩৬, ৪৪১)। এই কাজ করতে গিয়ে, সব সন্দেহের নিরসন করে, রাজাকে স্পষ্ট করে জানাতে হল যে আন্তর্সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন সন্তানরা শূদ্র।[২৬] ঘটনাচক্রে, পৃথু ছিলেন ভেনার দ্বিতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠ, নিষাদ ছিলেন কৃষ্ণকায়-আন্তর্সম্পর্কের সন্তান- সে কারণে সিংহাসনে তাঁর অধিকার ছিল না।[২৭]

ভেনার মৃত্যুতে এই আন্তর্সম্পর্কের অবসান ঘটেনি। এমনকি, জীমূতবাহনের মতো একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে এই উপদেশ দিতে হল যে, এই জারজ সন্তানদের জন্য

আলাদা স্থান এবং বাসভূমি নির্দিষ্ট করতে হবে। রাজা বল্লাল সেনের আমলে এই ব্যাপারে দ্বন্দ্বও দেখা দিল। বল্লালচরিতে পাওয়া যায়, যদিও একে ইতিহাস বলে মানা ঠিক নয়। বল্লাল সেনের সঙ্গে রাজ্যের সুবর্ণ বণিক এবং অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বারবার সংঘাত দেখা দেয়। কথিত আছে, বল্লাল সেন, তাঁর রাজ্যের এক ধনী বণিক বল্লভানন্দ শেঠের কাছে অধিক ঋণ দাবি করেন। বল্লভানন্দ অস্বীকৃত হন। ফলে বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হন। দ্বিতীয়, সুবর্ণবণিক সমাজ, উপযুক্ত আসন না পাওয়ায় রাজার ভোজসভা বর্জন করেন। তৃতীয়, ঋণের বন্ধক হিসাবে রাখা একটি সোনার পুতুল রাজাকে ফেরত দিতে একজন বণিক অস্বীকার করেন। রাজা বণিকদের বর্ণপর্যায়ে নীচে নামিয়ে দেন। বণিকরাও উচ্চবর্ণের লোকের বাড়িতে দাসের সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এই সমস্যা মেটাতে, বল্লাল সেন নিম্নবর্ণের মাহিষ্যদের 'সৎশূদ্র' জাতে উন্নীত করেন যাতে তাঁরা উচ্চজাতের গৃহকর্মে নিযুক্ত হতে পারে (মজুমদার,আর.সি, ১৯৭১; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩)।

নতুন ত্রিস্তর জাতিপ্রথা : সেন বংশীয়রা বহু চেষ্টা করেও বাংলায় বৈদিক ধারায় একটি সংহত জাতপ্রথার সৃষ্টি করতে পারলেন না। এই ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ ছিল, নীতিগতভাবে বাংলা প্রধানত একটি অনার্য দেশ। তা সত্ত্বেও তাঁরা একটি দ্বিতীয় শ্রেণির জাতিপ্রথার নির্মাণ করেছিলেন। সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে তিনটি উচ্চ বর্ণকে রাখা হল, যদিও তার মধ্যে দুটি বৈদিক শ্রেণিভুক্ত ছিল না। যারা প্রশাসনে করণিকের কাজ করতেন তাদের বলা হত কায়স্থ অথবা করণিক। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এই শ্রেণির অবস্থান অজানা ছিল না। সামন্ত শাসনে এদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[২৭] এই কায়স্থরা প্রাক্ ১২০৪ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক কাজে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতেন (মজুমদার, রমেশচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১; মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৭০; তরফদার এস.আর, ১৯৬৫; চ্যাটার্জি, সুনীতিকুমার ১৯৭০)। এইভাবে যারা চিকিৎসা কর্মে নিয়োজিত ছিল তাদের উচ্চমর্যাদা দেওয়া হত এবং বলা হত "বৈদ্য"। উভয় জাতিকেই মিশ্রজাতি রূপে গণ্য করা হত। বৈদ্যদের সৃষ্টি ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্যমাতার মিলনের ফলে। কায়স্থরা বেদ কিংবা মহাভারতে হল উল্লিখিত আন্তর্বিবাহের ফল। প্রাচীন সাহিত্যে পাঁচটি প্রধান জাতের নাম পাওয়া যায়; তা হল আর্য, দ্রাবিড়, মুন্ডা, অনাবাস এবং নিষাদ (পারগিটর, এফ.ই., ১৯২২ : ২৯০-৯৬)।

নতুন এই জাতিগত শ্রেণিবিভাগ ও পদমর্যাদা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল অনেক যত্ন নিয়ে। বর্ণনির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান মাপকাঠি ছিল অনুলোম এবং প্রতিলোম। অনুলোম বলতে বোঝাত পুরুষটি উচ্চজাতির এবং প্রতিলোমের ক্ষেত্রে মহিলা উচ্চজাতির। অনুলোমের ক্ষেত্রে মিশ্র বিবাহকে মেনে নিলেও প্রতিলোমের ক্ষেত্রে মিশ্র বিবাহ ছিল দূষণীয়।

অম্বোষ্ঠ বা বৈদ্যদের উচ্চপদমর্যাদা দেওয়া হত, কারণ তাদের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং বৈশ্য রমণীর মিলনের ফলে (হাজরা, আর.সি. ১৯৬৩; ঝা, গঙ্গানাথ, ১৯২৬)। কেবল এই কারণেই নয়, চিকিৎসাবিদ হিসেবেও তাদের উচ্চশ্রেণিভুক্ত করা হত। প্রশাসনিক কাজে জড়িত থাকার কারণে কায়স্থরাও রীতিমতো শক্তিশালী এবং ধনবান রূপে চিহ্নিত হতেন।[২৮]

ভারতের অন্য অঞ্চলের মতো, বাংলায় অস্পৃশ্যতা ততটা প্রকট ছিল না যেমন, দক্ষিণ ভারতে চণ্ডাল এবং ডোমদের সংস্রব দূষণের পর্যায়ে ধরা হত, উগ্রদের ঋগড়াটে বলে গণ্য করা হত (হাজরা, আর.সি.,১৯৬৩, কাঙ্গল, আর.পি., ১৯৬৩)। বল্লালসেন কৈবর্তদের সৎ-শূদ্র ঘোষণা করেছিলেন, বণিকদের প্রভাব খর্ব করতে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে[২৮] বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্য মাতার মিলনে মাহিষ্য জাতের উদ্ভব হয়। মাহিষ্যরা ছিল কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিজীবী অংশ।

জাতপ্রথার সংহতি সাধন করেছিলেন সেন বংশীয়রা। রাজা যত্নবান হলেও গ্রামে এবং শহরে তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বলা মুশকিল। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সূচিত হলেও সেনদের আমলে অন্যান্য জাতেব অবস্থান ততটা নির্দিষ্টভাবে সূচিত হয়নি। সেন রাজবংশ গৌড় থেকে বিতাড়িত হবার পর এবং তুর্কি আক্রমণকারীরা বাংলা দখল করবার পরই, সম্ভবত, পুরাণে জাতিপ্রথার কথা লেখা হয় (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৯১)।

লোক সংস্কৃতি : মৌখিকধারা

বাংলা সংস্কৃতি বলতে আমরা যা জানি তা হল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বযে চলা এক মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা। প্রাক্ ১২০৪-এর দিনগুলিতে এর উৎপত্তি, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়, উভয়ই একে সমৃদ্ধ করেছিলেন। নানা বৈচিত্র্য, যা প্রতিদিনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেমন, গৃহসজ্জা এবং তার পরিচ্ছন্নতা. শৈল্পিক রূপ, যেমন, বসার আসনের উপর শিল্পকলা, নববধূকে সাজানো, পূজামণ্ডপে আলপনা এবং স্থায়ী কাজকর্ম. যথা, কাপড়ের উপব কারুকার্য, গৃহস্থাপত্য, মন্দিরের দেওয়ালের উপব অঙ্কন শিল্প, টেরাকোটার মূর্তি এবং লোকগাথা। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের লিখিত পাণ্ডুলিপিও চিত্রিত করতেন গ্রামীণ শিল্পীরা (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৬৬৫-৬৬৭)।

সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েও লোকরঞ্জনের সংস্কৃতি তার প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিল বাংলা ভাষার আদিরূপে । যে ভাষা গড়ে উঠছিল মৌখিক ধারার মধ্যে দিয়ে। এর একটি জনপ্রিয় বা লোকপ্রিয় চেহারা ছিল পুতুল নাচ, যাকে পাঁচালী বলা হত—কয়েক রাত্রি ধরে তা পরিবেশিত হত। আর একটি রূপ ছিল যাত্রা, যার শিল্পীরা ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে নাটক অভিনয় করতেন। এ ছাড়াও ছিল কথকতা, অনেক শ্রোতার সামনে বসে পেশাদারের মতো গল্প বলা। এই দুটি সামাজিক ধারাই পাশাপাশি চলত। এমনকি বৈদিক দেবদেবী, যেমন, শিব কিংবা কৃষ্ণকে অন্যভাবে উপস্থাপন, যেমন, একজনের নেশাগ্রস্ততা এবং যৌনতাড়না, অপরজনের বৈবাহিক জীবন বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়েও লোকপ্রিয় প্রদর্শনী চলত। পুরাণে চণ্ডী অসুরনাশিনী, লোক কথায় বন্যপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্রী বনদেবী (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১)। রাষ্ট্রের দ্বারা প্রচারিত সংস্কৃতির মতো, লোকসংস্কৃতির বেলায় কিন্তু পুরাণ সাহিত্যের উল্লেখ থাকত না, কোনও প্রচারধর্মী মালমশলাও ছিল না। সাধারণত, মহিলারাই সোজা কথায়, পরিষ্কার এবং যথাযথ বর্ণনায় শিশুদের এইসব শোনাতেন (সেন, দীনেশচন্দ্র,

১৯৫৪)। এইসব গল্প মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ত। দেশের মধ্যে তো বটেই, এমনকী, বাণিজ্যের সুবাদে বিদেশে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গবেষণায় ভারতের লোককাহিনি এবং ইউরোপের লোকপ্রিয় গল্পগাথার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। ১২০৪ পরবর্তীকালে মুসলমান শাসনের সময় যখন হিন্দু নবজাগরণ হয়েছিল তখন বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের অসংখ্য উল্লেখ থাকত, যা তাদের প্রাচীন লোকগাথাগুলিতে ছিল না। ১২০৪-এর পরবর্তী কাল এবং মধ্যচতুর্দশ শতকের সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় কিছু লোকগাথায়, প্রথমে উল্লেখ না থাকলেও, পরবর্তীকালে পুরাণের নানা উল্লেখ যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়পর্বের লোকগাথাগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি কাহিনি বারবার উল্লিখিত হয়েছে (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ৫৪-৬০)। প্রাক্‌ ১২০৪ কাহিনিতে ঈশ্বর নায়ক নায়িকাব সংকটে প্রায়শই আবির্ভূত হতেন। চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের পরবর্তী সাহিত্য এ থেকে মুক্ত ছিল। উল্লেখ যদিও বা থাকত, সেই দেবতা পুরাণের প্রধান দেবতাদের দলে পড়তেন না। শুধু মানুষই নয় পশুপাখিও এই গল্প গাথার বিষয়বস্তু ছিল। শ্রোতারা বাড়িতে বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, গ্রামীণ সমাবেশে মুগ্ধ হয়ে এইসব কাহিনি শুনত। কারণ গল্প যাঁরা বলতেন তাঁরা ছিলেন এক একজন বিশেষজ্ঞ। এই ঐতিহ্যের ধারা প্রাচীন আমল থেকে চলে আসছিল। মুসলমান শাসকদের আমলে এবং স্বাধীন ত্রিপুরাতেও তা অব্যাহত ছিল। (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ ; দে, লালবিহারী, ১৯২০) এমনকী, ঠাকুরমা দিদিমার মতো বয়স্ক অপেশাদারী মহিলারাও গল্প বলার শিল্পকলাটি রপ্ত করেছিলেন যা তাঁরা নাতিনাতনীদের নিয়মিতভাবে শোনাতেন। গ্রামের বৃহৎ সমাবেশে থাকতেন পেশাদার কথকেরা। বিভিন্ন ধারায় এগুলো পরিবেশিত হত। কখনও কথকরা তা বিবৃত করতেন, গায়করা পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্য গেয়ে শোনাতেন রাতের পর রাত, কখনও পুতুলনাচ দেখানো হত, পুতুলগুলিকে দড়ির সাহায্যে নাচিয়ে। সাধারণ মানুষের কাছে এই মৌখিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি নিয়মিত আকর্ষণের বস্তু ছিল। এগুলো ছিল প্রধানত; (ক) কৃষি (খ) বাণিজ্য (গ) কৃষি বসতি গড়ে ওঠা (ঘ) প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত নিয়ে। এই লোককাহিনিগুলিতে সাধারণত দুজন রানি থাকতেন। একজন ভালো, অন্যজন খারাপ। এ ছাড়া থাকত বহুরকম ভূত। কাহিনিগুলির একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিও থাকত (দে, লালবিহারী, ১৯৬৯ : ১২৬)। স্থানীয় দেবদেবী, বিশেষ করে, কোনও দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হত এই কাহিনিগুলিতে, কোনও সরলীকৃত বর্ণনা নয়। এর থেকেই বোঝা যায়, কীভাবে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাত, সামাজিক প্রয়োজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হত। বিষয়গুলিকে এক এক করে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

কৃষি : প্রথম আলোচ্য কৃষি। বাঁচার জন্য খাদ্য উৎপাদনশীল সমাজে, কৃষকদের, শস্য উৎপাদনের জন্য, প্রকৃতির গতিপ্রকৃতি জানতে হত। দিন, মাস, বছর অনুযায়ী কৃষি বিষয়ক কাজকর্ম পালনের জন্য শস্য বিষয়ক তালিকা তৈরি হত। এটি আবার নির্ভর করত সম্পদ সংগ্রহ এবং আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির উপর। কারিগরি সংগ্রহ বলতে তখন ছিল লাঙল, ছোটখাট যন্ত্রপাতি এবং বলদ ইত্যাদি। কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় শস্য পর্যায়ের বিষয়ে বলা হত কাব্যের মাধ্যমে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ খনার বচন।[২৯] প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই তালিকা অনুসরণ করত। এই কবিতাগুলিতে গ্রামীণ পরিবেশ,

মাটির প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং ফল, তরকারি এবং শস্য উৎপাদনের উপর পরিবেশের প্রভাব উল্লিখিত হত। আরেক ধরনের কাব্যের নাম ছিল বারোমাস্যা, যাতে বারোমাসের আবহাওয়া সম্পর্কে ঋতুপর্যায়ভিত্তিক আলোচনা থাকত।[৩০] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা বাংলা বারোমাসের অর্থাৎ বৈশাখ থেকে চৈত্র, বিশদ বর্ণনা করেছিলেন। এই বিববরণীতে ফুল্লরা বৈশাখের খর রৌদ্র, জ্যৈষ্ঠের খরা, পরবর্তী তিনটি মাসের বর্ষা ও বন্যা, ষষ্ঠ মাসে দুর্গাপূজার উৎসব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। পরের মাস থেকে বাতাসে শীতের স্পর্শ, ফলে বাকি চারমাস গরম পোশাকের অভাবে কষ্টের উল্লেখ রয়েছে এই কাব্যে। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অনুভব করা যায় এই কাব্যে (সেন, সুকুমার, ৬১-৬২)। এতে দেখা যায় একজন মহিলা জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করতেন। এর থেকে কৃষিতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রমাণিত হয় (দে, সুশীলকুমার; সেন, সন্দীপ)। শিবের স্ত্রী দুর্গা বারবার শিবকে কৃষি বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হরমঙ্গলে দেখা যায় দুর্গা শিবকে পুকুরের ধারে জমি নিয়ে পঞ্চশস্য, অর্থাৎ ধান, সরষে, তুলো, যব আর তিল চাষ করতে বলছেন। এছাড়া নানারকম ডাল এবং সবজি চাষের কথাও উল্লেখ করছেন (দাশগুপ্ত, রতন, ২০০০; ১৫, ১৯)।

সেই সময়ের বেশিরভাগ উৎসব অনুষ্ঠানে কৃষির উল্লেখ থাকত। যেমন আমন ধান কাটার সময় বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবগুলি যথা, দুর্গাপূজা বা বিহু অনুষ্ঠিত হত, আর শীতের ধান কাটার সময় পালন করা হত পৌষ সংক্রান্তি বা নবান্ন উৎসব। সারা বছর বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলায় বারোমাসে তেরোপার্বণ অনুষ্ঠিত হত। বাংলার লোকসাহিত্যে অন্যান্য কৃষি সমাজের মতোই, "বৃষ্টি" একটি জনপ্রিয় বিষয়।

শিব : দরিদ্র কৃষক : লোককাহিনিতে, কৃষক শ্রেণিকে দরিদ্ররূপে দেখানো হয়েছে, এবং নরজন্মে এদের মধ্যে দরিদ্রতম ছিলেন দেবাদিদেব শিব।[৩১] তাঁর দারিদ্র্য, যত না খারাপ আবহাওয়ার জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি আলস্যজনিত। কৃষিকাজে তাঁর বিশেষ কোনও উৎসাহ ছিল না। ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যে যাও বা উৎসাহ ছিল তাও সম্ভব হত না প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে। তার অলস স্বভাবের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণও তাঁর কপালে জুটত না। স্ত্রীর চাপে কিছুটা নিরুপায় হয়েই তাঁকে কৃষিকাজে মন দিতে হল। শস্য রোপণ, উৎপাদন ইত্যাদি কাজে তিনি ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে উঠলেন, বর্ষার প্রসাদে শস্য ফলাতে সফল হলেন। কোচ নারীদের সঙ্গে তিনি এতটাই যুক্ত হয়ে পড়লেন যে, ভুলেই গেলেন তিনি একজন দেবতা, এবং তাঁর আবাস হিমালয়ে (ভট্টাচার্য, আশুতোষ : সেন, দীনেশচন্দ্র)। এই গল্পের থেকে ধারণা করা যায়, কৃষি কেমন করে উত্তরবাংলার কোচ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিবের এই পতন শিবকে জনপ্রিয়তম দেবতা করে তুলেছিল।[৩২] কোচ সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিবের এই সম্পর্কের কাহিনি খুবই আগ্রহোদ্দীপক। লোককথায়, কোচ নারীদের সঙ্গে তাঁর এই সংস্রব নিজে স্ত্রীর উমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলেছিল। উত্তরবাংলার উত্তরে অবস্থিত হিমালয়ের কন্যা ছিলেন এই উমা। বহু পুরাণে শিবের সঙ্গে পর্বতের সম্পর্ক নির্দেশ করা আছে-কৈলাশ, মেরু প্রভৃতি, উমার অন্য নাম হিমবতী ও পার্বতী। উমা নামটি কীভাবে এল তা নিশ্চিত জানা যায় না। ব্যাবিলনীয় বা দ্রাবিড় কোনও দেবীর সঙ্গে এই নাম সম্পর্কিত হতে পারে। শিবের সঙ্গে

কৈলাশ পর্বতের সম্পর্ক ছিল। শিবের গায়ের রং ফরসা। কৃষ্ণ কালো[৩৩] এবং রাম সম্ভবত বাদামি। শিব কিরাত[৩৪] রূপে অর্জুনকে পরাস্ত করেছিলেন (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭৪ : ৩০)। কেউ কেউ মনে করেন শিব আসলে কোচ সম্প্রদায়ের দেবতা। পরবর্তীকালে হিন্দু মূলধারায় স্থান পান (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০)। ঋক্‌বেদে শিব বা রুদ্রের স্থান তিন প্রধান দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের অনেক নীচে। শিবজায়া উমা গৌরী নামেও পরিচিত। অনুমান করা যায় তাঁর গাত্রবর্ণ হলদেটে সাদা (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৫৭)। ফলে তাঁর ক্ষেত্রেও কোচ উৎস উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শিবকে বৈদিক এবং লোকসাহিত্যে বহুরূপে দেখা যায়। শিব শুধু একজন কৃষিবিদ বা কিরাত নন, তাঁকে উর্বরতার দেবতাও বলা হয়, এবং তাঁরই প্রতীকস্বরূপ শিবলিঙ্গ শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশেই পূজিত হয় (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০ : ৬৬)। শিবকে একজন আদর্শ স্বামী রূপেও কল্পনা করা হয়, অসংখ্য অবিবাহিত মহিলা শিবের মতো স্বামী প্রার্থনা করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সেই অর্থে তিনি আদর্শ ছিলেন না, বহু নারীর সঙ্গে তাঁর সংস্রবের ফলে তাঁর একটি নাম ছিল স্ত্রীলম্পটদেবক (নারীসক্ত) আর একটি নাম ছিল প্রমোদপ্রিয় (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০; কান্টাওয়ালা, এস.জি., ১৯৬৪ : ৮০)। শিবকে কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে আদর্শ স্বামী বলে বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যে, শিবপত্নী সতী, পিতা দক্ষেব যজ্ঞে পিতার মুখে শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন, শিবকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করা হয়নি (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৫৭ : ৭১)। কে এই মাদকাসক্ত, জটাজূটধারী, গলায় সাপ জড়ানো, মুণ্ডমালা পরিহিত, ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে তাঁরা জামাইকে আমন্ত্রণ করতে চায়? যাঁরা শিবকে অনার্য অস্ট্রিক উৎসের দেবতা বলে ভাবেন, তাঁরা শিবের এই ভাবমূর্তিকেই গুরুত্ব দেন (ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ১৯৭০ : ১৪৫)। বৈদিক সাহিত্যে না পাওয়া গেলেও বহু পুরাণে শিবের এই ভাবমূর্তির উল্লেখ রয়েছে।[৩৫] শিবের এই ভাবমূর্তির সঙ্গে গ্রিক দেবতা ডায়োনিসাসের মিল মেলে (ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ১৯৭০ : ১৪০-১৪৮)। সতীর মৃত্যুতে শিব তাঁর অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন এবং সতীর দেহ নিয়ে চলে যান। সতীই শিবের প্রতি অনন্যপরায়ণতার কারণে উমা হিসাবে পুনর্জন্ম নেন।

শিবের আর একটি রূপ হল, "স্থাণু", যার সঙ্গে বুদ্ধের শান্ত স্থির মূর্তির মিল পাওয়া যায়। যেখানে শিব সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন মুদ্রিত নয়নে (ভট্টাচার্য, আশুতোষ)। শিব ছিলেন সেই বৈদিক দেবতা যিনি সৃষ্টি রক্ষার জন্য বিষ পান করেছিলেন।

বাণিজ্য : বাণিজ্য ছিল বহু লোককথার আরেকটি মূল বিষয়। সমাজজীবনে বণিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং সেন বংশ ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত তাদের এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। লোক-গাথাতে এরকমও জানতে পারি যে রাজপুত্রদের প্রধান তিন বন্ধুর মধ্যে একজন মন্ত্রীপুত্র, একজন কোটালপুত্র এবং তৃতীয়জন বণিকপুত্র (দে, লালবিহারী ১৯৬৯ : ১২৬)। নায়িকা কাঞ্চনমালার স্বামীও ছিলেন একজন বণিক। এরকম বহু লোকগাথাতেই বণিকদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণরা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করল, ঘোষিত হল যে, যারা এর অন্যথা করবে, তাদের জাতিভ্রষ্ট করে একঘরে করা হবে। গন্ধবণিক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সামাজিক অবস্থান জেলে বা কৈবর্তদেরও নীচে চলে গেল। বর্ণের মানুষরা তাদের হাতে জলপান

পর্যন্ত করতেন না (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ৬৩-৬৪)। সেই সময়ের অনেক লোকগাথায় সোনা, রুপা, হীরে, জহরৎ এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্নের উল্লেখ আমরা পাই। এর থেকে দীনেশচন্দ্র সেন সম্ভবত ভুল সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই উল্লেখ বণিকের গৃহে, বাণিজ্য সাফল্যের ফলে অর্জিত সাফল্যেব প্রমাণ। এতটা না হলেও, কিছু সময়ের জন্য বাংলায় বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতারা বণিকদেরই প্রধান চরিত্র করেছিলেন। মনসামঙ্গলের দেবী ছিলেন সর্পিণী—একজন অনার্য দেবী। তিনি একজন প্রভাবশালী বণিক, চাঁদ সওদাগরের পূজা চেয়েছিলেন যাতে সমাজের অন্য শ্রেণির সম্ভ্রম আদায় করতে পারেন। এককথায় সমাজের নানা অংশের উপর বণিকদের প্রভাব ছিল অবিসংবাদী। সে যুগের কবিরা বণিকদের নিয়ে নানা পাঁচালী গান গেয়ে দেশবাসীকে শোনাতেন। সমুদ্র নিয়ে কোনও আলোচনা এইসব কবিতায় থাকত না। সমুদ্রযাত্রার রোমাঞ্চ থেকে বাঙালি বঞ্চিত ছিল। অরণ্যের বর্ণনা থাকত প্রায়শই।

কৃষির নতুন জমির উপনিবেশিকরণ

এই সময়ের সাহিত্যে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্ন জাতের মানুষরা চাষবাসের জন্য তাদের জমির সীমা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের শিকারি নায়ক কালকেতু বন কেটে একটি নতুন শহর তৈরি করেছিল। এই কাব্যে কালকেতু কীভাবে এই শহর গড়ে তুললেন তার বর্ণনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য তিনি মুরারী শীল বলে একজন মহাজনের দ্বারস্থ হলেন। মুরারী তাঁকে ঋণ দিতে অস্বীকার করলে দেবী চণ্ডী তাঁর জামিনদার হলেন। মুরারী শীলের কাছ থেকে সাতকোটি টাকা পাওয়া গেল। এই শহর নির্মাণের পর যাতে খালি না পড়ে থাকে সেজন্য কালকেতু দুটি রাস্তা নিয়েছিলেন। একদিকে বৃষ্টিতে কলিঙ্গ শহর ভাসিয়ে ওই শহরের অধিবাসীদের বাধ্য করেছিলেন নতুন শহরে আসতে। অন্যদিকে উদারহাতে মানুষের মধ্যে, যে যতটা চাষ করতে পারে ততটা চাষের জমি বিতরণ করেছিলেন নামমাত্র করের বিনিময়ে। ব্রাহ্মণদের জন্য কোনও করই ছিল না, কৃষির জমির সঙ্গে তাদের বাসযোগ্য জমিও বিলি করা হত (সেন, সুকুমার ১৯৯৩)। মুসলমানসহ নানা জাতিসম্প্রদায়ের আগমনে এই শহর একদিন ভরে গেল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল লিখিত হয়েছিল ১৪৯৫-৯৬ সালে। সেখানেও দেখা যায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সাহায্যে সর্পদেবী সিজুয়ান পাহাড়ের উপর নতুন নগর স্থাপন করেছিলেন। পাশণ্ডি নগরকে জলমগ্ন করে তিনি নিজের তৈরি নগরে জনসমাগম ঘটিয়েছিলেন। দেখভালের জন্য দেবী নিজে সঙ্গী নেতাকে নিয়ে নগর পরিভ্রমণে বের হতেন। লোককাহিনিগুলিতে এরকম আরও নানা উপনিবেশ-স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে।

মনসা : দেবী মনসার লোকপ্রিয়তার একটি কারণ বোধহয়, যে সেকালে বাংলার জলাভূমিগুলি সাপে পূর্ণ থাকত। মনসামঙ্গলের নানা কাহিনিতে দেখা যায় চণ্ডী ছিলেন মনসার সৎমা। শিবের অনুগ্রহ পাবার জন্য দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ২ : ৪৫৩)।

আর একজন জনপ্রিয় দেবী ছিলেন মা ষষ্ঠী। শিশুর জন্মের দিকে যিনি দৃষ্টি

রাখতেন। সেকালের বাংলা ছিল অস্বাস্থ্যকর। জলবাহিত রোগে মড়ক ছিল নিয়মিত চিত্র। মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় জনসংখ্যার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল (ইটন, আর.এস., ১৯৯৩ : ১৪৪)। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় অধিবাসীরা অধিক শিশুর জন্ম, বিশেষ করে পুত্রসন্তানের জন্ম কামনা করত। জন্মহার বৃদ্ধির বাসনার প্রভাব পড়েছিল তাঁদের সংস্কৃতিতে (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ২, ২৬০-২৬১; দে, লালবিহারী, ১৯২০)। মনসা, ষষ্ঠী এবং সরস্বতী; কারও কারও মতে একই দেবীর নানা রূপ। যারা সাপ, শিক্ষা এবং শিশুজন্মের দেবী ছিলেন। এছাড়া ছিলেন মা শীতলা। বসন্ত রোগে লোক যাকে স্মরণ করত। ভালোবেসে নয়, ভয়ে। গুটি বসন্তকে বলা হত মায়ের দয়া (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১)। লোকগাথায় মনসা শিবকন্যা রূপে আখ্যাত হয়েছেন। ফলে মনসা আর্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়েছিলেন। পুরাণে শিবের সঙ্গে নাগের সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে।

চণ্ডী : মনসার পরে লোককথায় সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবীর নাম চণ্ডী। চণ্ডী ছিলেন অনার্য উপজাতি সম্প্রদায় উদ্ভূত। যাকে বন এবং বন্য পশুর দেবী বলে গণ্য করা হত।[৩৬] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ আছে, কালকেতু যখন বন্যপ্রাণী নিধনে ব্যস্ত, দেবী চণ্ডী তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন। কালকেতুকে উপদেশ দেন পশুহত্যা বন্ধ করতে এবং বনে কৃষিজীবীদের জন্য নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮; ১৯৯৩)। দেবী চণ্ডীর চরিত্র কল্পনার পেছনে হয়তো একটি কারণ ছিল যাতে যত্রতত্র শিকার এবং পশুহত্যা বন্ধ হয়, গাছগাছালি এবং শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শিকারী ও সংগ্রাহক সম্প্রদায়ের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্ক এ থেকে বোঝা যায়। চণ্ডীর প্রাচীন ভক্তরা হল শিকার-জীবন থেকে কৃষিকে বেছে নেওয়া মানব সম্প্রদায়, জাতি ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান নির্দিষ্ট করতে উদ্‌গ্রীব। কিছু লোককাহিনিতে চণ্ডীকে একজন হাড়ি সম্প্রদায়ের কন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চণ্ডীর পূজা সম্পন্ন হয় একজন হাড়ি-র ঢাক বাজানো এবং পশুবলিতে। পশুবলির কাঠকে বলে হাড়িকাঠ। এর থেকে এই দেবীর উৎস অনুধাবন করা যায় (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩)।[৩৭] চণ্ডীর অন্য পরিচয় বনদেবী হিসাবে, মুসলমান প্রভাবে যিনি বনবিবি। একই ভাবে চণ্ডীর একরূপ ওলাই-চণ্ডী, তিনিই আবার ওলাবিবি। মার্কণ্ড পুরাণে চণ্ডীকে মহিষাসুরমর্দিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হরিবংশে দুর্গাকে শবর, বর্বর এবং পুলিন্দাদের দেবী এবং মদ ও মাংসপ্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবে কোনও অনার্য দেবতাকে আর্য দেবমণ্ডলীতে স্থান পেতে হলে রক্তপিপাসু এবং হিংস্র বলে প্রমাণ করতে হত (ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ১৯৭০)। বাংলার বিভিন্ন উপজাতিরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। আর্যায়ণের সূত্রে তাঁরা দেবীদুর্গাকে আত্মস্থ করে আরাধনা করত, ইরানীয়-আর্য ঐতিহ্যের ধারায়।[৩৭] ভক্তেরা নানা স্থানে নানা নামে এই দেবীর পূজা করতেন যেমন, বাশুলী, গৌরী, উমা, তারা, চামুণ্ডা, মঙ্গলচণ্ডী, ইত্যাদি।[৩৮] কোনও কোনও পুরাণে দুর্গা এবং চণ্ডীর অষ্টোত্তর শতনাম বিধৃত আছে। দেবী দুর্গাকে নিয়ে একান্নপীঠের কাহিনি তো সবারই জানা।[৩৯] দেবী কালীর মূর্তি একজন নগ্নিকার, সম্ভবত অস্ট্রিক উৎসের। তাঁর জিভ দিয়ে রক্ত ঝরছে,[৪০] কণ্ঠে মুণ্ডমালা শোভা পাচ্ছে। তিনি অসুর দমনে ব্রতী, ভূতপ্রেত তাঁর অনুচর, কিন্তু এই মূর্তিকেই পরবর্তীকালে কয়েক শতাব্দী পর, আমরা করুণাময়ী মাতায়

পরিবর্তিত হতে দেখি সাধক কবি রামপ্রসাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনায় (ব্যানার্জি, এস.সি., ১৯৮৮; ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২)।

মাতৃদেবী ও উর্বরতা সাধনা : শক্তি রূপে মাতৃ আরাধনা বাংলায় এত বিকাশ পেল কেন—এটা একটা প্রশ্ন। নারীরূপে শক্তি ধারণার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার মিল ছিল। বকতিয়ার খিলজির বাংলা অধিকারের পর এই ধারার বিকাশ ঘটে। নিরাপত্তাহীনতাবোধের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত হতে পারে (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২)। অতীতের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবশেষ হিসাবেও এব বিকাশ হতে পাবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, বিশ্বের সব আদিম সমাজেই উর্বরতাসাধনার অঙ্গ হিসাবে মাতৃসাধনা চালু রয়েছে। ঋকবেদেও পৃথিবীকে 'মা' বলে কল্পনা করা হয়েছে—যিনি সকল সম্পদের উৎস। ফসল ও ভাগ্যদেবী লক্ষ্মী বলেও পৃথিবীকে কল্পনা করা হয়েছে।

দুর্গার পূজার সময় হেমন্তকাল—ফসল কাটার সময়। দুর্গা শাকম্ভরী, তিনিই অন্নপূর্ণা-খাদ্যের দেবী। উর্বরতার দেবী হিসাবে দুর্গার ভূমিকা এভাবেই স্বীকৃত। অম্বুবাচির সময়, বর্ষারম্ভে রন্ধন নিষেধ, কারণ পৃথিবী তখন ঋতুমতী।

অনার্য বাঙালি আর্য দেবতাকে গ্রহণ করলেও, লোকসাহিত্যে, তাদের সঙ্গে বৈদিক রূপের কোনও মিল নেই। বৈদিক আরাধনা হয় সংস্কৃতে। বাংলার নারীরা ব্রতকথায় নিজের ভাষায় আরাধনা করেন দেবতার। একই নাম, কিন্তু লোকজীবনে এই দেবতা ভিন্ন রূপে চিত্রিত।[৪১]

মঙ্গলকাব্য : মঙ্গলকাব্যব উল্লেখ না করলে বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দীর্ঘ কবিতার আকারে এবং বিধিবদ্ধ পদে লিখিত বিভিন্ন স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য-সূচক এই কাব্য রাতের পর রাতে বিভিন্ন সমাবেশে গাওযা হত এবং সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভই ছিল উদ্দেশ্য। এতে প্রায়শই দেখানো হত একজন আঞ্চলিক দেবীর সঙ্গে এক প্রভাবশালী মানুষেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দেবী তাঁর পূজা চাইতেন, ওই ব্যক্তি তা অগ্রাহ্য করায় দৈব শাস্তি নেমে আসত। অবশ্য শেষে কলহের অবসান হত এবং দেবীও পুজো পেতেন। এই কাহিনি আসলে আঞ্চলিক উপজাতি দেবদেবীকে উচ্চবর্ণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। আমরা আগেই দেখেছি দেবী মনসা এবং চণ্ডী, দুই প্রধান বণিকের কাছ থেকে পূজা কামনা করেছিলেন। তাঁরা শেষাবধি পুজোয় রাজি না হওয়া পর্যন্ত নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। এই কাব্যগুলি চরিত্রগত ভাবে অত্যন্ত বস্তুবাদী। নিত্যদিনের জীবন থেকেই এর উপাদান সংগৃহীত হত। কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটি অতি সাধারণ নারী চরিত্র নৌকা চালাত এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করত যাতে তার সন্তানেরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। মঙ্গলকাব্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে (ভট্টাচার্য, এ., ১৯৫০ : ১৮-১৯, ৪১, ৫৯)।

নাথবাদ : এই অংশে নাথবাদ সম্পর্কে আলোচনার কারণ, এই ধারাটির জনপ্রিয়তা এবং নিম্নজাতিগতভিত্তিতা। অনার্য সংস্কৃতির এই রূপটি কালক্রমে বাংলা সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এখানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। অনেকের মতে পাল

শাসনের শেষভাগে ব্রাহ্মণদের নিগ্রহ থেকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের রক্ষা করার কাজে নাথবাদ জনপ্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। শিবপূজার মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের বিশ্বাসকে আমদানি করেছিল। এই দর্শনে নারী-পুরুষের সমন্বয়, যথা, পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শক্তি, রাধা-কৃষ্ণ ধারণার স্থান ছিল। চীনা ধর্মপ্রচারক লাওৎসের বক্তব্যের সঙ্গে এক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়।[৪২]

আদিনাথ, যাকে নাথগোষ্ঠীর প্রথম হিসেবে ধরা হয়, তার সঙ্গে শিবের মিল খোঁজা হয়েছিল ভূতনাথ নামের মধ্যে। কখনও বা বলা হত "বজ্রসত্য", যে নাম বুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত, কথিত আছে যে, নাথদের প্রথম গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ মাছের রূপ নিয়ে সমুদ্রে থাকাকালে, স্ত্রীকে শিবের দেওয়া উপদেশের সাহায্যে যোগসাধনার মন্ত্রপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগের এই নাথ ধারণার সঙ্গে বৌদ্ধদের তান্ত্রিক ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর প্রথমে, বাংলায় মৎস্যেন্দ্রনাথ তন্ত্রবিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, শিবের সঙ্গে শক্তির মিলনের ফলে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করতেন শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানই মানুষের মুক্তির প্রধান উপায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, এস.সি. ১৯৮৮ : ৪৫৩-৪৫৭)। অষ্টাদশ শতকে এই সাধন মার্গ অনেক মুসলমানকেও আকর্ষণ করে এবং মীননাথ পরিবর্তিত হন মোচরাপীরে, যিনি মুসলমানদেরও পূজ্য ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ বলতে "মৎস্যদেবতা"কে বোঝাত। তাঁর প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ বলতে বোঝাত যিনি গরুদের রক্ষা করেন। এই দুই প্রধান চরিত্র মৎস্যজীবী এবং পশুপালকদেব কাছে সমান জনপ্রিয় ছিলেন। বাংলার তাঁতশিল্পীদের কাছেও নাথবাদ জনপ্রিয় ছিল। নাথবাদ সমাজের নিম্নবর্গীয় প্রজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ এই দুই প্রধান চরিত্রকে নিয়ে নানা কাহিনি আছে। যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় আখ্যানটির লেখক বিদ্যাপতি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা : পাল বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত সংস্কৃত সরকারি ভাষা রূপে গণ্য হত। এইসময়ে অধিকাংশ তাম্রফলক সংস্কৃতে লেখা হত, সারস্বত সমাজের ভাষাও ছিল এটি। বহু নাটক এবং কবিতা এই ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল (সেন, সুকুমার, খণ্ড ২, ১৯৭৮)। সেন বংশের আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চা রীতিমতো বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও, এই সংস্কৃত-সহ অন্যান্য ভাষায় লেখালেখি খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। কারণ মৌখিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অনেক বেশি। সংস্কৃত কয়েকশো বছর ধরে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১২০৪ এর পরবর্তীকালে ফরাসিরও এবং আর পরে ব্রিটিশ শাসনের সময় ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি শুরু হল। পঞ্চম শতক থেকেই বাংলার প্রচুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে সংস্কৃত ব্যবহারের প্রমাণ আছে। ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ এবং কবিতা ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য আছে। নবম শতকে, বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার বহু উল্লেখ বাদল স্তম্ভে উৎকীর্ণ ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে ভবদেব ভট্ট সিদ্ধান্ত, তন্ত্র এবং গণিত বিষয়ে

বহু আলোচনা করেছেন। জীমূতবাহনও একাদশ শতকে আইন এবং ধর্ম বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে এই ধরনের বহু নমুনা পাওয়া যায়। যদিও সংস্কৃত সংস্করণ হারিয়ে গেছে, তিব্বতি অনুবাদ অবশ্য কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে, যার রচয়িতা ছিলেন শীলভদ্র এবং শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর (দে, সুশীলকুমার, ১৯৭১)। "কাদম্বরী" "কথা-সার"-এর লেখক গৌড় অভিনন্দ, "রামচরিত"-এর লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী, এবং ইতিহাস খ্যাত "গীতগোবিন্দ"এর লেখক জয়দেব—এরা সবাই ছিলেন বাংলার। সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা প্রধান দুটি ভক্তকুলের মধ্যে বিভক্ত ছিল। কেউ শিবের কেউ বা বিষ্ণুর আরাধক (দে, সুশীলকুমার, ১৯৭১)। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই সময়কার লিখিত ইতিহাস নেই বললেই চলে। সেযুগের পণ্ডিতেরা একাজে বিশেষ দৃষ্টি দেননি বলেই মনে হয়। যে সময়ে আরবের আলবেরুণি, চীনের ফা-হিয়েন এবং য়ুয়াং চোয়াং-এর মতো পরিব্রাজকরা এই কাজে মন দিয়েছিলেন, সেই সময়ে বাংলার পণ্ডিতবর্গ কেন এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি তার উত্তর খুঁজে পাওয়া ভার। এমনকী, চতুর্দশ শতকের আগে দক্ষিণ ভারতে বেদও লেখা হয়নি। লিখিত বস্তুর এই অভাব থেকে মনে হয় এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের অপ্রতুলতার পাশাপাশি ভারতীয়দের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক বোধ ছিল না। যে মুষ্টিমেয় সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার বিবরণ পাওযা যায়, তার মধ্যে রয়েছে কালিদাসের রঘুবংশম্, বাণভট্টের হর্ষচরিত, কলহনের রাজতরঙ্গিণী এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত। শেষোক্ত গ্রন্থটি রাজা রামপালের বীরত্ব নিয়ে লেখা হয়েছিল। এটিই সম্ভবত বাংলায়, সংস্কৃতে লিখিত সে যুগের একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন। অন্যদিকে, বিখ্যাত লোককাহিনিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গ্রাম্য অনুষ্ঠানগুলিতে কথকদের দ্বারা বর্ণিত হত। এমনকি দ্বাদশ শতকে সেনবংশের রাজত্বের শেষদিকে জয়দেবের লেখা গীতগোবিন্দ গানের মাধ্যমে শোনানো হত। গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার একটি কারণ অসামান্য ভাষা এবং কাব্যগুণের পাশাপাশি তা অত্যন্ত সহজ, সরল সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। সম্ভবত, এটাই বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম চেষ্টা (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৬৫ : ২০৪)। জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি।

সংস্কৃত ছিল ধনী, ক্ষমতাশালী এবং শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ভাষা। বাংলার সাধারণ মানুষ যারা কেউই প্রায় আর্য নয়, নিজের ভাষা পরিত্যাগ করে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বাংলা ভাষাকেই নিজের করে নিয়েছিল। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ধীর, তা সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছিল কয়েক শতাব্দী। কালক্রমে, সৃষ্টি হল সংস্কৃতের এক অপভ্রংশ রূপ এবং ক্রমে তা পূর্বভারতের বিশেষ করে বাংলার মানুষের নিত্যদিনের ভাষা হয়ে উঠল। ইন্দো-এরিয়ান উৎসের ভোজপুরী, মগধী[৪৩] এবং মৈথিলী ভাষা সমূহ থেকে যে নতুন ধারা বেরিয়ে এল, তাই অবশেষে বাংলা, ওড়িয়া এবং অহমিয়াতে রূপান্তরিত হল (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০)। বাংলাভাষা কবে থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করল, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কোনও কোনও ভাষাবিদের মতে বাংলাভাষার জন্ম দশম শতাব্দীতে চর্যাপদ লেখার সময় (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ১, ১৪, ১০৫)। এ সম্পর্কে মতের মিল নেই। একদলের মতে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলার চেয়ে হিন্দি, অহমিয়া বা ওডিয়া ভাষার মিল বেশি। এটুকু বলা যায়,

পাল বংশের দীর্ঘ শাসন বাঙালিসত্তা ও বাংলাভাষার গঠন এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু আজকের বাংলার একটা বড় অংশ সে সময় তাদের অধিকারে ছিল না। গৌড়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল বেশি। 'বাংলা' শব্দটি তুর্ক-আফগান শাসনকালেই প্রথম নানাভাবে মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরাবাদে গোটা বাংলায় তাদেরই অধিকার প্রথম কায়েম হয়। বাংলাভাষা তার গঠনকালে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় সম্পর্কের ফলে অনেক শব্দকে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিল (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ২)।

চর্যাপদ : চর্যাপদ লেখা হয়েছিল ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে, এবং বাইশজন কবির সাতচল্লিশটি কাব্য এই চর্যাপদে আছে। নেপালে প্রাপ্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৈরি পাণ্ডুলিপিই চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা। সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধারণার এটি একটি লিখিত রূপ (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ ১৯৪৬ : ৭)।

চর্যাপদের অন্যতম প্রধান বিষয় এর নাস্তিক্যবাদী দর্শন। সত্যের কোনও অস্তিত্ব নেই, অনস্তিত্বও নেই। সত্য এই দুই-এর মিলনও নয়। এর অনুপস্থিতিও নয়। আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি ক্ষণস্থায়ী, অলীক। চর্যাপদের আর একটি বিষয়, চার শূন্য যেমন আলো, প্রজ্ঞা, অতিশূন্য এবং আলোক জ্ঞান। চর্যাপদের প্রধান কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন লুই-পা।[৪৪] যার কাব্যে চর্যাপদের শুরু এবং অন্যজন কানহ্া-পা যিনি লিখেছিলেন বারোটি কাব্য (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৫৬)। চর্যাপদের আর একটি বিষয় ছিল ব্রাহ্মণ এবং জাতিপ্রথার সমালোচনা। যার লেখক ছিলেন সারাহা-পদ এবং অশ্বঘোষ। সারাহা-পদ-র বক্তব্য ছিল, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দাবি করবার কোনও অধিকার নেই। শুধু জন্মের কারণেই কেউ উচ্চ বা নীচ জাতের হতে পারে না। অশ্বঘোষের বক্তব্য, নিচু জাতের মানুষকে বেদ পাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। চর্যাপদের দর্শন যাই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে এইরকম একটি সরল, সুন্দর সাহিত্য সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভাষায় বাংলায় এর আগে দেখা যায়নি (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১ : ১৯৭৮ : ৫৬-৭৫)।

নাথবাদে যেরকম হিন্দু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, চর্যাপদ ঘনিষ্ঠ ছিল বৌদ্ধ তন্ত্রবাদের সঙ্গে। অনেকের মত, হিন্দু "নাথবাদ" এবং বৌদ্ধ "তন্ত্রবাদের" মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথদের মতো নাথ প্রধানদের নাম বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের তালিকাতেও ছিল (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ২২৮-২৩১)।

লিঙ্গ সম্পর্ক : বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে লিঙ্গ সম্পর্ক নির্ণয়ের কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। যদিও সমাজ ছিল পুরুষশাসিত, আদিবাসী সমাজে কৃষি উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করতেন মহিলারাই। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, "খনা"-র নামে প্রবচনের মধ্যে দিয়ে কৃষিকাজ সম্পর্কে অনেক ছড়া প্রচলিত আছে। এ ছাড়া নানা বারোমাস্যায়, বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক বিবরণীতে, কৃষিজীবী মানুষের জীবনকথা বর্ণিত হত নারীদের দ্বারা। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা এরকম একটি দৃষ্টান্ত (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৫০ : ২৯-৩০)। শিকারী কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা একদিকে চাষবাস, অন্যদিকে শিকারী স্বামীর আনা মাংস বিক্রির কাজ করত। মাংস বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যেত, তাই দিয়ে তরকারি, নুন, মশলা ইত্যাদি কিনে আনত। মাংস বিক্রি করতে না পারলে সংসার কীভাবে চলবে তা জানা ছিল না। পুরুষ এবং নারীর সম্পর্ক নিয়ে জানা যায় উচ্চ

বর্ণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে অসাম্য ছিল। কুলিনপ্রথা ও সতীপ্রথা চালু ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সাম্য ছিল না। বিবাহের পূর্বে মেয়েকে থাকতে হত কুমারী। বিবাহের পর স্বামীর সম্পূর্ণ অনুগত থেকে সন্তান উৎপাদন করা ছিল তার প্রধান কাজ। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নিষেধ ছিল না। একজন পুরুষ ইচ্ছেমতো বিবাহ এবং নারী সংস্রব করতে পারত (আগরওয়াল, ভি. এস., ১৯৫৩ : ৮৫)। কুলীন প্রথা অনুযায়ী, মেয়েদের বিয়ে হত অত্যন্ত অল্প বয়সে এবং তার সঙ্গে স্বামীর ব্যবধান থাকত প্রায় কুড়ি বছরের। পরিণামে, দীর্ঘ বৈধব্যজীবন ছিল অবধারিত (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ২৯)। বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি ছিল না। সতীদাহপ্রথা আমদানি হয়েছিল রাজস্থান থেকে জহরব্রতের অনুকরণে। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের আগমনের আগে পর্যন্ত এই প্রথা বেড়েই চলেছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সতীদাহকে পুণ্যকাজ বলে উল্লেখ করা রয়েছে (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ডি.গাঙ্গুলি ও আর .সি.হাজরা, ১৯৬৩ : ৬০৯-৬১১)। সমাজে লিঙ্গসম্পর্কে সমতা না থাকলেও, মহিলাদের সম্মানের প্রতীক রূপে গণ্য হত। নারীর অপমানকে সমাজের অপমান বলে গণ্য করে গ্রামে গ্রামে বা সমাজে সমাজে সংঘর্ষ লেগে যেত। নারীকে সর্বদা স্ত্রী বা মা হিসাবে পবিত্র, অনুগত, দায়বদ্ধ থাকতে হবে, এটাই ছিল সমাজের বিধি; পুরুষদের বেলায় বৈবাহিক বিধি অনুসরণের দায় কোনওদিনই ছিল না। প্রাচীনকালে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ন্যূন ছিলেন না। মেয়েরা অনেক সময়েই ছেলেদের সঙ্গে অধ্যয়নও করত। সেন রাজাদের সময়ই স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্য সৃষ্টি হল। মুসলমান বিজয়ের পর ভীতির কারণে তা আরও দৃঢ় হল। এ সত্ত্বেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বহু উদাহরণ রয়েছে। তাঁরা কাব্যচর্চাও করতেন। চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, ও রামি ছিলেন চণ্ডিদাসের কাব্যানুরাগিণী। বাংলার শিল্পকলা নারীদের চর্চাতেই সমৃদ্ধ হয়েছিল (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২)। লাঙলনির্ভর এবং পুরুষ—চালিত কৃষি ব্যবস্থা নরনারীর সম্পর্কে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। কুল বা পরিবারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। (আগরওয়ালা, ভি.এস., ১৯৫৩)। আগে উপজাতি সমাজে বিয়ের সময় পুরুষরা রমণীদের পণ দিত, এখন কিন্তু বিয়ের সময় মহিলাদেরই পণ দেওয়ার প্রথা চালু হল। ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতিকূল এই পরিবর্তন দেখা দিল। লিঙ্গসম্পর্কের ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণির মধ্যে এই অসমতা ছিল আরো ব্যাপক, বহুগামিতা ছড়িয়ে পড়ল। কুলীনপ্রথা এবং সতীদাহপ্রথার মতো অমানবিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। উচ্চশ্রেণির পুরুষ অনায়াসে নিম্নজাতের নারীকে অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ করতে পারতেন, কিন্তু উচ্চজাতের মহিলা নিম্নজাতের পুরুষকে প্রতিলোম বিবাহ করলে জাতিচ্যুত হতেন।

উপসংহার

এই পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি সময়কালে কীভাবে জনগণের সার্বিক সংস্কৃতির রূপ নিয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে নানা উপসংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটেছিল, যাদের "নিম্ন" মানের সংস্কৃতি বলা হত (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮)। "উচ্চ", বা "উৎকৃষ্ট"

মানের সংস্কৃতির পাশাপাশি শাসকশ্রেণি তাদের সামাজিক ভিত্তিকে প্রসারিত করবার জন্য এই উপসংস্কৃতির ধারাগুলিকেও উৎসাহিত করত।

শাসকশ্রেণির সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্রে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা অর্থাৎ সেনা, অস্ত্র ইত্যাদির সরাসরি ব্যবহারের প্রয়োজন হ্রাস করা। যাতে অধীনস্থ প্রজাদের মনে শাসক শ্রেণির প্রতি সহজেই আনুগত্য গড়ে ওঠে, বলপ্রয়োগের দরকার পড়ে না।

বাংলায় আর্যায়নের প্রক্রিয়া পাটলিপুত্রে গুপ্তরাজবংশের ক্ষমতাসীন হবার আগে পর্যন্ত ঠিকমতো শুরু হয়নি। বাঙালি ছিল একটি মিশ্রজাতি, যা মূলত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং মোঙ্গলীয় ধারার সঙ্গে সামান্য আর্যধারার মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। বাংলায় আর্যদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এর অন্যথা করলে তাকে জাতিচ্যুত করা হত, শুদ্ধিকরণ ছাড়া জাতে ফেরা সম্ভব হত না। কয়েক শতাব্দীর আন্তঃমিশ্রণের ফলে বাঙালি একটি সংহত এবং সুনির্দিষ্ট জাতিতে পরিণত হল। বাংলায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির একটি সাধারণ মিল রয়েছে, অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মতো নন তাঁরা। গুপ্তবংশের রাজত্বকালে আর্যসংস্কৃতি এদেশে পৌঁছবার পর তা দুটি ভাগে বিভক্ত হল, বৌদ্ধবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ। প্রথমদিকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মই সেই স্থান অধিকার করল। বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ সেভাবে ব্যাখ্যা না হলেও দেখা যায় যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর এক হাজার বছর লেগেছিল বৌদ্ধধর্মের বাংলায় পৌছতে, তখন অবশিষ্ট ভারতে তার প্রভাব প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যবসা-বাণিজ্যেও দেখা দিয়েছে মন্দা। শহরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধপ্রভাব অবশিষ্ট ছিল তাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগল। বৌদ্ধধর্মও ধীরে ধীরে তার কঠোর মঠনির্ভর ধর্মীয় অনুশাসনের থেকে সরে শরীর এবং অন্যান্য বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বৌদ্ধধর্মের অনুসারী তন্ত্রবাদ এসে কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, যাদের কাছে পরিবার ব্যবস্থা জীবনের অঙ্গ ছিল। কৃষিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করা আদিবাসীরাও, তান্ত্রিক আচরণের ফলে পরিবার জীবনকে বিঘ্নিত করার কারণে বৌদ্ধদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। এর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারিত গার্হস্থ্যধর্ম, যা পরিবারের মূল্যবোধকে মর্যাদা দিত এবং তুলে ধরত, সমাজে স্বীকৃতি পেল। পালবংশের আমলেও বৌদ্ধধর্ম যথার্থ রাষ্ট্রীয় ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীর পদটি ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত ছিল। বিচারব্যবস্থাতেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস পেল। নিম্নজাতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় এই ধর্ম উচ্চ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব হারাল।

ব্রাহ্মণ্যবাদের বৌদ্ধধর্মের উপর এই জয়কে সাহায্য করেছিল জাতপ্রথা এবং জন্মান্তর বিষয়ক কিছু সুনির্দিষ্ট আদর্শ এবং বোধ। দুটি প্রধান মহাকাব্য যা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল, পাণিনি, পতঞ্জলি এবং কাত্যায়নদের মতো প্রখ্যাত বৈয়াকরণ এবং কৌটিল্যের এবং মনুর রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয় রচনা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে ব্রাহ্মণদের চাহিদা বেড়ে গেল, রাজা তাঁদের করমুক্ত জমি দান করতেন। তাঁদের জ্ঞানের যথার্থ ধারক হিসেবে ধরা হত। আর্য দেবতাদের সঙ্গে অনার্য রাজাদের বংশগত সম্পর্ক নির্ধারণের দ্বারা, বর্ণব্যবস্থায় তাঁদের উচ্চস্থান নির্ণয় করে ব্রাহ্মণরা রাজাদের বিশ্বস্ত হয়ে উঠলেন। অনার্য বাংলায় জাত নির্ধারণ সহজ ছিল

না, তবু তাঁরা তিনটি উচ্চবর্ণের শ্রেণি তৈরি করতে পেরেছিলেন, যথা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ধারাগুলিকে কাজে লাগিয়ে মিশ্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন। কর্ণাটকী সেন বংশীয়রা ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় বৌদ্ধধর্মকে খারিজ করে ব্রাহ্মণ ধর্মের বিকাশ সাধন করা হয়। সেন শাসকরা ব্রাহ্মণদের বাইরে থেকে নিয়ে এলেন, কুলীনপ্রথা চালু করলেন, বণিকদের সামাজিকভাবে অবনয়ন করা হল। জাতিপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের জাতি নির্দিষ্ট কাজটুকু নিয়েই আবদ্ধ থাকতেন, তার বেশি কিছু দাবি করবার অধিকার তাদের ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বক্তব্য, যে যার ভাগ্য নিয়েই জন্মায়, তাকে পরিবর্তনের কোনও সুযোগ মানুষের নেই। বলা হত, কেউ জাতি হিসেবে তার অবস্থান সঠিক মেনে চললে পরজন্মে তার উচ্চজাতে উন্নীত হওয়া সম্ভব। আর এর অন্যথা হলে পতন অনিবার্য। এই প্রথা সবাই মেনে নেওয়ার ফলে প্রশাসন কিংবা সামরিক বলপ্রয়োগের বিশেষ একটা প্রয়োজন হত না।

রাষ্ট্রের মূল সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উপসংস্কৃতিরও উন্নতি ঘটেছিল। এর প্রচার ছিল মুখে মুখে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে গান হিসাবে। অনেক সময়ই দিনের পর দিন গান গাওয়া হত। দর্শনগত মূল্যবোধের বদলে এসব গান রচিত হত সাধারণের জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে যেমন কৃষি, বাণিজ্য, পশু, পাখি, সাপ এবং অসুখবিসুখ নিয়ে। অবশ্য রাষ্ট্র প্রচারিত সংস্কৃতির তুলনায় এগুলিকে নিম্নস্তরের সংস্কৃতি রূপে গণ্য করা হত। মনসা এবং তার শাশুড়ি চণ্ডীকে সংস্কৃতির এই উচ্চধারায় উন্নীত হবার জন্য দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল। পুরাণের দেবী দুর্গা অভিষিক্ত হয়েছিলেন বিশ্বদেবত্বে। সংস্কৃতির এই মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে বাঙালির দীর্ঘ সময় লেগেছিল প্রাকৃত এবং মাগধি ভাষার থেকে আর্যভাষায় রূপ নিতে। যদিও চর্যাপদকে বাংলাভাষার আদিরূপের সম্মান দেওয়া হয়, যা সৃষ্টি হয়েছিল মাগধি এবং অপভ্রংশ থেকে, ভাষাবিদরা এই বক্তব্যকে পুরোপুবি মানেন না। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি, এমনকি নাটকও, রচিত হয়েছিল সংস্কৃতে। কিন্তু কিছু লোককথায় এবং নাটকে চরিত্রগুলি সংস্কৃতের পাশাপাশি ঃ • লিক ভাষাতেও কথা বলত। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তার প্রমাণ রয়েছে।

এই সময়ে বাঙালি তার নিজস্বতা কতখানি অর্জন করেছিল ঃ. পরিষ্কার নয়। সেই যুগে "বাংলা" বলতে কিছু ছিল না। জনগণ নিজেদের চিহ্নিত করত পুণ্ড্র অথবা গৌড়, সুমেহ অথবা রাঢ়, বাংলা অথবা সমতটের সঙ্গে। পালবংশই প্রথম বাংলার অবস্থানকে নির্দিষ্ট করেছিল চার শতাব্দী ধরে একটি বৃহৎ অঞ্চলের শাসনকালে। যদিও তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিত "গৌড়"-এর শাসক বলে (গৌড়েশ্বর)।

মন্তব্য

১. বৈদিক সাহিত্যে আর্য আক্রমণকারীদের চেহারার যে বিবরণ রয়েছে, অর্থাৎ উত্তরদেশে বাস, পাতলা চামড়া, সোনালি চুল—নর্ডিক জনজাতির সঙ্গে তা মিলে যায়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই এটা বাস্তব নয়। যেখানে পাঠান জাতির সঙ্গে নর্ডিক চেহারার মিল বেশি,

মহারাষ্ট্রের চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণরা কিন্তু প্রশস্ত-মুণ্ড বিশিষ্ট জাতির সংমিশ্রণ। তীব্র সূর্যালোক এবং ভারতের পরিবেশগত প্রভাবে চামড়া, চুল আর চোখের রং অবশ্যই পাল্টেছিল (গুহ, বি.এস., ১৯৪৪ : ২৩-২৪)।

২. ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এবং অশ্বিন প্রভৃতি হিন্দু দেবতার পূজা খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৫ শতকে উত্তর মেসোপটেমিয়ার মিত্তানিদের মধ্যেও চালু ছিল। এদের মধ্যে সুতর্ণ, সবন্ধু, দুশরত্ত, যশদত্ত প্রমুখ ভারতীয় শব্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নামও ছিল। সুরিয়া এবং মরুত্ত নামে দুই দেবতা ব্যাবিলন জয় করেছিলেন বলে কথিত আছে। এটা নিশ্চিত যে, আর্যরা ভারতে আসার আগে কিছুদিন ইরানে বাস করেছিল। আফগানিস্তানের পথ ধরে তারা ভারতে আসে। আজকের আফগানিস্তানের গান্ধার অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে আর্য ভারতের অঙ্গ ছিল (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ২৫)।

৩. গুহ তাঁর গবেষণায়, ভারতে দ্রাবিড় অনুপ্রবেশের তিনটি তরঙ্গ চিহ্নিত করেছেন। জাতিগত দিক থেকে সেগুলি ভিন্ন প্রকৃতির; ক) পেইল মেডিটেরিয়ান বা প্রাচীন মিশরীয় অনুপ্রবেশ। এরা ছিল মাঝারি মাপের, কৃষ্ণকায়, শীর্ণ, লম্বা এবং সরু মাথার, সরু মুখের, সরু কিন্তু খাড়া নাকের। খ) প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় প্রকৃতি-উত্তর ভারতের জনগোষ্ঠী প্রধান অংশ ছিল এরা। উচ্চ জাতির এই জনগোষ্ঠীর মানুষ সম্ভবত আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়। এরা ছিল মাঝারি বা লম্বা, পাতলা চামড়ার, লম্বা মাথার। গ) তৃতীয় যে ভূমধ্যসাগরীয় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, ফিশার তাদের প্রাচ্য জাতি বলে বর্ণনা করেছেন। এদের নাক ছিল লম্বা আর বাঁকানো, চামড়া ছিল পাতলা। এরা আরব এবং এশীয় মাইনর অঞ্চল থেকে এসেছিল (গুহ, বি.এস., ১৯৪৪ : ১৮-২০)।

৪. মজুমদার এবং রাও মনে করতেন, রক্তের নমুনা থেকে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এর থেকে একমাত্র বিভিন্ন নমুনার ভিন্নধর্মিতাই প্রমাণিত হবে (মজুমদার, ডি.এন. ও সি.আর.রাও : ১১০; মজুমদার, ডি.এন., ১৯৬১ : ৯৫-১০৪)। যদিও তাঁদের মন্তব্যের পর চল্লিশ বছর কেটে গেছে। সে যুগ থেকে বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অনেক ধাপ।

৫. রিস্‌লে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছিলেন।

ক. তুর্ক-ইরানীয় প্রকৃতি : (বন্ধ, ব্রুহি, আফগান)। বলিষ্ঠ কাঠামোর, কখনও খয়েরি হলেও চোখের রং কালো আর বড় বড় চোখ, সরু আর খাড়া নাক, প্রচুর চুল।

খ. ইন্দো-এরিয়ান প্রকৃতি : (পাঞ্জাব, রাজস্থান আর কাশ্মীরের রাজপুত, জাঠ আর খেত্রিরা)। লম্বা, ফরসা, চোখের রং কালো, প্রচুর চুল, লম্বা মাথা, সরু এবং খাড়া কিন্তু একটু ছোট নাক।

গ. স্কাইথ-দ্রাবিড়িয়ান : পশ্চিম ভারতের মারাঠি ব্রাহ্মণ, কুর্গ, কুনবিস প্রভৃতি। প্রশস্ত মাথা, ফর্সা, প্রচুর চুল, মাঝারি আকার, নাক সরু হলেও লম্বা নয়।

ঘ. আর্য-দ্রাবিড়িয়ান : উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা, শ্রীলঙ্কা-র হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ এবং চামার। লম্বা কিন্তু মাঝারি ধরনের মাথা, বাদামি অথবা কৃষ্ণকায়, মাঝারি অথবা চওড়া নাক, বেঁটে।

ঙ. মোঙ্গল-দ্রাবিড়িয়ান অথবা বাঙালি প্রকৃতি : নিম্নবঙ্গ ও ওড়িশা। প্রশস্ত মাথার, রং কালো, প্রচুর চুল, মাঝারি আকার, মাঝারি নাক হলেও চওড়া হওয়ার ঝোঁক রয়েছে। উচ্চ বর্ণের মধ্যে ইন্দো-এরিয়ান প্রভাবের চিহ্ন রয়েছে।

চ. মঙ্গোলয়েড : প্রশস্ত মাথা, পীত আভা সহ কালো রং, ছোটখাট আকার, সরু এবং বড় নাক, চ্যাপটা মুখ, ছোট চোখ।

ছ. দ্রাবিড় : প্রশস্ত মাথার মাপ ইন্দো-এরিয়ান এবং আর্য-দ্রাবিড়িয়ানদের থেকে এদের

পার্থক্য সূচিত করে। পূর্ববঙ্গে বাঙালি উচ্চবর্ণ থেকে রাজবংশী মগদের আলাদা করা যায় না (রিজ্‌লে, এইচ.এইচ., ১৯৬৯ : ৩৩-৩৫)।

৬. ১৯৫১ সালের আদমসুমারির ভিত্তিতে এস.এন. সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন মাতৃতান্ত্রিক ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর পরেই ছিল প্রোটো-অস্ট্রেলয়েডরা। উভয়েরই মাথা লম্বা। এর পরেই ছিল গোলমাথার আলপাইন ও আরমেনয়েডরা এবং সবার শেষে লম্বা মাথার আর্য। কে.পি. চট্টোপাধ্যায়, উচ্চবর্ণের উপব ভিত্তি করে, ধারণা করেছিলেন যে, প্রাচীনতম মানুষরা লম্বা মাথার মাতৃতান্ত্রিক ভূমধ্যসাগরীয় জাতিভুক্ত ছিল না। এরা ছিল গোল মাথার এক মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী যারা নিড়ানির সাহায্যে চাষ করত। চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত ছয়টি জোনেই ছোট গোল মাথাব জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই ছিল বেশি। সমতট এবং কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয় (মজুমদার, ডি.এন., ১৯৬১ : ৮২-৮৩)।

৭. জনগোষ্ঠীতে চওড়া মাথার সংখ্যাধিক্য, অনেক সময় আলপাইন অনুপ্রবেশের প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা হয়। কিন্তু মজুমদার এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন (মজুমদার, ডি.এন., ও সি. আর. রাও ১৯৬০ : ৯৭; মজুমদার, ডি.এন., ১৯৬১ : ৪৮)।

৮. কিছু প্রান্তিক অঞ্চল ছাড়া, মঙ্গোলীয় ধারাব গুরুত্ব প্রসঙ্গে মজুমদার দ্বিমত পোষণ করেছেন (মজুমদার, ডি.এন., ১৯৬১ : ৮৫)।

৯. লেখকরা ১৯৪৫ সালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের, ২০-২৫টি সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত প্রায় ৩০০০ মানুষের পরিমাপ করেছেন। উচ্চবর্ণ, আদিবাসী, আধা-আদিবাসী এবং কারিগব- এই কযটি ভাগে তাঁরা মনোযোগ দিয়েছেন। পরিমাপ করার সময় তাঁরা মাথার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য, মাথাব সর্বাধিক প্রস্থ, কপালের প্রস্থ, গোটা মুখের দৈর্ঘ্য, মুখের উপরিভাগের দৈর্ঘ্য, নাকের দৈর্ঘ্য, নাকের প্রস্থ, কাঠামো, উচ্চতা, ওজন, বসা অবস্থায় উচ্চতা। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত অনেকগুলি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বিশেষ গবেষণা হয়নি (মজুমদার, ডি.এন.ও সি. আর. রাও, ১৯৬০)।

১০. মাথার মাপের ভিত্তিতে বাংলা, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট। উত্তরপ্রদেশের জনগোষ্ঠীর মাথা লম্বা কিন্তু চওড়ায় ছোট। গুজরাটে আবার ঠিক এর উল্টো। বাংলা এর মাঝামাঝি। বিহারের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উত্তর প্রদেশ এবং বাংলার মাপের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। গুজরাট আর উত্তরপ্রদেশের ভীলদের মাথাব মাপ কিন্তু একই ধরনের (মজুমদার, ডি.এন. ও সি.আর.রাও, ১৯৬০, ৪৭)।

১১. কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্র অনুসারে, বাংলার 'দুকলা' হল সাদা আর নরম। পুন্ড্রের কালো এবং রত্নের মতো মসৃণ, সুবর্ণকুড্যের দুক্‌লা সূর্যের রঙের, সমানভাবে বোনা। এর মধ্যে এক সুতো, দেড় সুতো, দুই সুতো, তিন বা চার সুতোর কাপড় রয়েছে। কাশী এবং পুন্ড্রর ক্ষৌম্য কাপড়, মগধ, পুন্ড্র এবং সুবর্ণকুড্যের রেশম আর মধুরা, অপরান্ত. কলিঙ্গ, কাশী ও বাংলার সুতিবস্ত্র হল সেরা (কাঙ্গলে, আর.পি.১৯৬৩ : খণ্ড ২ : ১১৯-১২০)। দুকলা হল দুটি পাড়ের কাপড়, সুর্বণকুড্য হল কর্ণসুবর্ণ।

১২. কিছু বিপরীত দৃষ্টান্তও রয়েছে। একজন বৈষ্ণব রাজা, পূর্ববঙ্গের শ্রীধরণ রাতাব মন্ত্রী ছিলেন বৌদ্ধ (মহাপাত্র, বিমলচন্দ্র, ১৯৯৫ : ৪৫)।

১৩. পালযুগে এ রকম ব্যাপার অস্বাভাবিক ছিল না। ভারতের অন্যন্য অংশেও বৈদিকতাবাদ, পুরাণবাদ বা তন্ত্রবাদের মত, প্রচলিত ধর্মীয় মতের বিরোধী ধারণা একই সঙ্গে সম্মানিত ছিল (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ২০০-২০১)। এ ছাড়া, ভারতেব অন্যান্য অংশে যথা, দক্ষিণের সতবাহন শাসিত রাজ্যে, রাজারা বৌদ্ধ হলেও, বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসার হয়েছিল (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ২০৩)।

১৪. বুদ্ধ তাঁর মাসি প্রভাবতীর অনুরোধে মঠে নারীর প্রবেশ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অনুমোদন করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের আত্মসংযমের শিক্ষা সত্ত্বেও, কামচর্চা সীমা ছাড়িয়েছিল। কিন্তু আমরা আগেই জানি যে, এই অবক্ষয় কেবলমাত্র বৌদ্ধদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড১ : ৫০৪-৫০৯)।

১৫. এই মত প্রচলিত মায়াবাদ ও শূন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ১৯৮৭ : ৩৮)।

১৬. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, সহজিয়া বিশ্বাসে নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করত এবং অবৈধ প্রেমের জন্য কঠিনতম পথ গ্রহণে তাদের সাহস অবশ্যই উচ্চ প্রশংসাযোগ্য (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : খণ্ড২ : ৯৬৯)।

১৭. শিব-শক্তি ধারণার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। এই মতে, আলাদা ভাবে শিব অথবা শক্তি চূড়ান্ত সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। চূড়ান্ত সত্যের জন্য প্রয়োজন এক নিরপেক্ষ অবস্থা শিব ও শক্তির আদর্শ মিলন। এরই নাম সমরস্য (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৫৭ : ৮১)।

১৮. বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে রয়েছে, ব্রহ্মা গন্ধর্ব্য-কন্যা সোমলতাকে দেখে কামপরবশ হয়ে রেত ত্যাগ করেন। এই রেত থেকে জন্ম নেয় এক ভয়ানক বাঘ। প্রাচীন ভারতীয় লোককথায় ব্রহ্মার সঙ্গে তার কন্যার মিলনের উল্লেখ আছে। অন্য কাহিনিতে, ব্রহ্মার রেত দেবগরু কপিলাকে গর্ভিণী করে মনুরথের জন্ম দেয় বলে উল্লেখ রয়েছে (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১; ১৬৪)। এই কাহিনির উৎস ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩,৩৩), যেখানে ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে প্রলুব্ধ করতে হরিণের রূপ ধরেছিলেন। ঋক্‌বেদে রয়েছে (১০,১১১,৪-৭) গগন তাঁর কন্যার সঙ্গে সংগম করেছিলেন (ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ১৯৭০ : ১৬৪; কেইথ, এ.বি., ১৯১৭ : ৭৫-৭৬)। মনসার জন্ম শিব বীর্যে, কিন্তু এক অস্বাভাবিক উপায়ে। জলাতে ফুল তুলতে গিয়ে শিব একটি পদ্মপাতার উপর বীর্যপাত করেন। সে বীর্য জলে পড়ে পাতালে সাপেদের দেশে চলে যায়। সর্পরাজ বাসুকীর মাতা নিমনির মাথায় গিয়ে তা আটকে যায়। নিমনি সেই বীর্য থেকে মনসাকে সৃষ্টি করে তাকে বিষ ভাণ্ডার রক্ষার দায়িত্ব দেন। শিব এই বিষয়টি জানতেন না। মনসার সঙ্গে শিবের প্রথম সাক্ষাতে দেবাদিদেবের চোখে কামলালসা দেখে মনসা তাড়াতাড়ি তাঁর পরিচয় ব্যক্ত করেন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ১৬৩)।

১৯. ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা অসাম্প্রদায়িক কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও চালু ছিল। এই স্বীকৃতির নানারকম প্রক্রিয়া ছিল। কখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে-যার মধ্যে বলিদানের প্রথাও ছিল—কখনও বংশলতিকার সাহায্যে বা মন্দির তৈরি করে (চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ১৯৬)। পুরোহিতদের স্থান ছিল রাজার উপরে আবার একই সঙ্গে তাঁরা বস্তুগতভাবে ছিল প্রজা এবং রাজার উপর নির্ভরশীল (ড্যুমন্ট, এল, ১৯৭০ : ৬৫)। ব্রাহ্মণ্য শাসনকালের ধর্মীয় স্বীকৃতির এই ব্যবস্থা মুসলমান শাসনকালেও প্রচলিত ছিল (চট্টোপাধ্যায় ব্রজদুলাল, ১৯৯৭ : ১৯৭)।

২০. মহাভারতে চার্বাককে রাক্ষস বলে উল্লেখ করা হয়েছে (চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ১৯৮৭ : ২৩-২৪)।

২১. পাণিনির ভাষ্য অনুসারে, রাজাকে দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (আগরওয়ালা, ভি.এস., ১৯৫৩ : ৩৫৯)।

২২. দেবী চণ্ডীর আদেশে রাজা বল্লাল সেন একটি বিশেষ দিনে, দুই প্রহরকালে, যাকে দেখতেন

তাকেই ব্রাহ্মণ্যত্ব দান করতেন। এই ভাবে ৭০০ সপসতি ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হল-একটি কাহিনিতে এরকম উল্লেখ রয়েছে (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ৬২৬)। কোসাম্বির মতে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বা আজকের আফগানিস্তানের আর্যদের উদারতা ছিল এবং তারা বর্ণবিদ্বেষী ছিল না। সম্ভবত পূর্বদেশ থেকে শিক্ষালাভের জন্য যারা পশ্চিমে গিয়েছিলেন, তারাই ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নানা কায়দা কৌশল আয়ত্ত করে এবং দেশে ফিরে ব্রাহ্মণ হয়ে বসে (কোসাম্বি, ডি.ডি., ১৯৬৫)।

২৩. মুসলমান শাসকরা প্রায়শই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কায়স্থদের উস্কানি দিতে তাদের নানা উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করতেন। আবুল ফজলের বিবরণী থেকে জানা যায়, সে সময় বাংলার বহু জমিদার ছিলেন কায়স্থ (তরফদার, এম.আর., ১৯৬৫ : ১৯২)।

২৪. মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেছেন, পৃথিবীর রাজা হিসাবে ভগবান বিষ্ণু, বিরজার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বিরজা সেই দায়িত্ব স্বীকার করেনি। তার অনেক বংশধরও সে দায়িত্ব অস্বীকার করে। বিরজার এক বংশধরের সন্তান ভেনা রাজা হন। ভেনার ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে ঋষিরা ভেনাকে কুশাস্ত্রে খণ্ডবিখণ্ড করেন (গাঙ্গুলি, কিশোরী মোহন, মহাভারত, খণ্ড ৩, শান্তিপর্ব, খণ্ড ২ : ১২৬; ৫৯ অংশ)।

২৫. ভেনার মৃত্যুতে আন্ত-বর্ণ মিলন বা নিষিদ্ধ মিলন ঠেকানো যায়নি। জীমূতবাহন এই মিলনে উৎপন্ন জারজ সন্তানদের জন্য পৃথক স্থান নির্দেশ করতে বলেছিলেন (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৩৯)।

২৬. ঋষিরা ভেনার দক্ষিণ উরু বিদীর্ণ করতে এক খাটো পা মানুষ নিষ্ক্রান্ত হল। তার পোড়াটে বর্ণ, লাল চোখ আর কালো চুল। সেই হল প্রথম নিষাদ। এই 'বদমাস আদিবাসীরা পাহাড় আর অরণ্যে বাস করে জীবনধারণ করে'। ভেনার দক্ষিণ হস্ত বিদীর্ণ করতে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো দেখতে একজন নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাজ-দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ঋষিদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, ধরণীকে বর্ণ বিপর্যয় থেকে তিনি রক্ষা করবেন (গাঙ্গুলি, কিশোরীমোহন, মহাভারত, খণ্ড ৩, শান্তি পর্ব, খণ্ড ২ : ১২৬-১২৭, ৫৯ অংশ)।

২৭. এইভাবে ভেনার দ্বিতীয় সন্তানকে রাজা করে এক নতুন রাজতন্ত্র শুরু হল।

২৮. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ সম্ভবত প্রথম লেখা হয়েছিল অষ্টম শতকে। কিন্তু বাঙালি লেখকদের হাতে তার বিকাশ ঘটেছে ষোড়শ শতক পর্যন্ত। ফলে এই দুটি পুরাণে বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ রয়েছে তাতে বাঙালি প্রভাব রয়েছে (হাজরা, আর.সি., ১৯৭৫ : ১৬৬)।

২৯. লোকবিশ্বাস অনুসারে, খনা ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিষী এবং গণিতজ্ঞ বরাহমিহিরের পত্নী। তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরের তুলনা তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান এতটাই বেশি ছিল যে, তা তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরের লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। স্বামীকে লজ্জা থেকে রক্ষা করতে খনা নিজের জিভ কেটে ফেলেন। (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭১ : ৩৯১)।

৩০. ঋক্‌বেদে, শিবের উল্লেখ রয়েছে মাত্র আড়াইবার। পুরাণের যুগে সেই শিবই প্রধানতম দেবতাদের একজন হয়ে উঠলেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমারী ভট্টাচার্য, ১৯৭০, পরিচ্ছেদ ৬-৯ : ১০৯-২০৭।

৩১. একটি লোকগাথায়, অন্যতম প্রধান দেবতা ইন্দ্রকে ধান ঝাড়াই-এ ব্যস্ত দেখানো হয়েছে (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৩ : ২৫১)।

৩২. ঋকবেদে কৃষ্ণকে আনুসিকা (সম্ভবত মঙ্গোলীয় কিরাত)-কে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রের শত্রুতা করতে দেখা গেছে। গায়ের রঙের বর্ণনা থেকে আন্দাজ হয়, কৃষ্ণ সম্ভবত কোনও আদিবাসী দেবতা, পরবর্তীকালে হিন্দু মূলস্রোতের অন্তর্ভুক্ত হন (কোসাম্বি, ডি. ডি.,

১৯৬৫ : ৭৯, ১১৫-১১৭)।

৩৩. শিব কিরাত রূপ ধরেছিলেন। মনে হচ্ছিল, 'সুবর্ণ বৃক্ষের মতো উজ্জ্বল' ও 'অগ্নি যেন দেহ ধারণ করেছেন' (গাঙ্গুলি, কিশোরীমোহন, ১৯৯৩, বনপর্ব : ৮৬)।

৩৪. প্রকৃতির নানা বিষয়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল। মাস, বছর, ঋতু এবং নক্ষত্র-সকলকেই দেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে (আগরওয়ালা, ভি.এস., ১৯৫৩ : ৩৫৮)।

৩৫. বৈদিক সাহিত্যের দেবীদের মধ্যে রয়েছেন; ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী, বিশ্বপাপায়ী, পৃথিবী এবং উষা। বেদ-পরবর্তী যুগে, চারজন দেবীর উল্লেখ রয়েছে পাণিনির রচনায়; ভবানী, সর্বাণী, রুদ্রাণী, মৃদাণী। প্রথম তিনজন অগ্নি দেবতার নানা রূপের পত্নী। চার দেবীই একই অস্তিত্বের ভিন্ন রূপ (পাণিনি, ৫/১.৩৭;১.৪৯;২.৩১)। ঋকবেদে চণ্ডীর পতি শিব হলেন পশুদের রক্ষাকর্তা। তাঁর অন্য নাম 'পশুপতি' (ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ১৯৭০ : ১১২)।

৩৬. এশিয়া মাইনর অঞ্চলের একটি গোষ্ঠী দুর্গার উপাসক ছিল। তাঁরা 'ফ্রিজিও' বা বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে 'ভৃগু' নামে পরিচিত ছিল।

৩৭. ধনপতি-ফুল্লরার কাহিনিতে, মুকুন্দরাম, বণিকের পোষা পায়রা এবং ফুল্লরার ছাগল পালনের যে বিবরণ দিয়েছেন, সুকুমার সেনের মতে তৎকালীন বাংলায় তা অজানা ছিল। এই কাহিনির সূত্র সম্ভবত ফ্রিজিয়ান (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ৪২৫)।

৩৮. চণ্ডী বৈদিক দেবী নন, কিন্তু বহু পুরাণে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। এই দেবীর সম্ভবত অস্ট্রিক উৎস রয়েছে (ভট্টাচার্য, এ., ১৯৫০ : ২৯৯-৩০৩)।

৩৯. ঋকবেদে 'রাত্রি-সুক্ত' বলে এক দেবীর উল্লেখ আছে। কেউ কেউ তার মধ্যে কালির উৎস সন্ধান করেন। অনেকে এই দেবীকে নগ্নিকা বলে চিহ্নিত করেছেন যার হাতে রয়েছে একটি ফাঁস। শতপথ ব্রাহ্মণ (৭/২.৭), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪/১৭) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এই দেবীর উল্লেখ রয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে প্রথম 'কালি' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া (৭/২.৭), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪/১৭) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এই দেবীর উল্লেখ রয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে প্রথম 'কালি' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বলির আগুনের সাতটি শিখার একটি। মহাভারতে রক্তচক্ষু ফাঁস হাতে এই দেবীর উল্লেখ রয়েছে বহুবার। পুরাণে, যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে, তিনি চণ্ডী হিসাবে অসুর দমন করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রয়েছে, শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেবী কৌশিকী, পার্বতী রূপ গ্রহণ করেন। পার্বতী পরে কৃষ্ণ বর্ণ হন। চণ্ড এবং মুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেবী কৌশিকীর কপাল থেকে নিষ্ক্রান্ত হন কালি করালবদনী। অসুর নিধনের পর তাঁর নাম হয় চামুণ্ডা। রঘুবংশ এবং কুমারসম্ভব কাব্যে 'নরমুণ্ডমালিনী' বলে তাঁর উল্লেখ রয়েছে (ব্যানার্জি, এস.সি., ১৯৮৮ : ৪৭১-৪৭২, ৪৭৬)। কালির রূপ বর্ণনায় তাঁকে তান্ত্রিক দেবী বলেই মনে হয়। 'মুণ্ডগুলি থেকে শোণিত ধারা বইছে, দুই কানে দুল হিসাবে ঝুলছে দুটি শব, মৃতদেহের কাটা হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে কোমরবন্ধ, মুখের কোণ থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত, ত্রিনয়ন উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তাভ, মুক্ত কেশ দক্ষিণে দোদুল্যমান, উঁচু দাঁত, গুরুস্তনী নগ্নিকা-মৃতকল্প মহাদেবের উপর দাঁড়িয়ে, চারপাশে হিংস্র শৃগালদল' (ব্যানার্জি, এস.সি. :
৪৭৩)। যদিও এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বিতর্কিত তা সত্ত্বেও মনে হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা কিছুকাল কালি আরাধনা করেছিলেন (ব্যানার্জি, এস.সি., ৪৭৮)।

৪০. দীনেশচন্দ্র সেন একদা একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন, বাংলা সম্পর্কে একজন যতই জানবেন, এখানকার নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ততই বাড়বে। আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে এই জাতির স্বাতন্ত্র্য এঁরাই রক্ষা করেছেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : খণ্ড ২ : ৮৯৫)।

৪১. অনেকে দাবি করেন, চীন থেকে আসা খ্রিস্টপূর্বের তাওপন্থীরা এই ধারণা বাংলায় বয়ে এনেছিলেন। এরা ভোগ বলে পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চাওয়া অপরসায়নবিদরা এই শাস্ত্র চর্চা করতেন। পতঞ্জলিও শিকড়বাকড়, ওষুধ আর রসায়নের সুষ্ঠু ব্যবহারে সিদ্ধিলাভ সম্ভব-এ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। কোনও সন্দেহ নেই, এক ধরনের অপবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যার সাহায্য নিয়ে, সিদ্ধ মার্গ-এর বিকাশ ঘটিয়েছিল। নাথ সম্প্রদায় অনুসৃত আচরণ এবং যোগ প্রক্রিয়ার কোনও বৌদ্ধ বা হিন্দু উৎস ছিল না। পূর্ব ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের ঐতিহ্যই তার উৎস ছিল (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ২২১-২২২)।

৪২. পাহাড়পুর-মহাস্থানে পাওয়া পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষের শিলালেখতেই মাগধি ভাষার প্রাচীনতম নমুনা মেলে। মৌর্য ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ এই নমুনা (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭১ : ৩৭৫)।

৪৩. প্রশ্ন উঠতেই পারে, অবাঙালি নামের এই কবি কীভাবে বাংলাভাষার প্রাচীনতম কাব্য নিদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। আসলে 'লুই' হল 'রুই'—বাংলার জনপ্রিয়তম মাছ। 'পা' হল 'পদ' শব্দের সংক্ষিপ্তসার। এর অর্থ কবি ঈশ্বরের চরণাশ্রিত। নাথ সম্প্রদায়ের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতি লুই পা-র ভক্তিই এর ফলে প্রমাণিত হয় (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৫৬)।

৪৪. চর্যাপদের প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী টীকায় রয়েছে।

৩.১

রাজনৈতিক ইতিহাস (১২০৪—১৭৫৭)

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আমরা তুর্ক-আফগান ও মোগল শাসন পর্বের (১২০৪-১৭৫৭) ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বর্ণনা করেছি সতেরোজন অশ্বারোহী সমেত তুর্কি বণিক বখতিয়ার খিলজির আকস্মিক হানায় বঙ্গবিজয়—এই প্রচলিত কাহিনির যথার্থতা নিয়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে তুর্ক-আফগান শাসন এবং মোগল সাম্রাজ্য-পর্ব বিশ্লেষণ করা হবে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে ১৭০৭-এ মুর্শিদকুলি খাঁ-র ক্ষমতা অর্জন থেকে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের সমাপ্তি—এর অন্তর্বর্তী বছরগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরব।

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশ নিয়ে যেহেতু চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে, তাই এখানে সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হচ্ছে না।

বখতিয়ার খিলজির বিজয়

বখতিয়ার খিলজির ১৮ জন অশ্বারোহী : কল্পকাহিনি

পয়গম্বরের মৃত্যুর পর থেকে ইসলামের অনুগামীরা তাদের রাজ্য পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রসারিত করতে শুরু করল। মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে ইসলাম শাসন পশ্চিম এশিয়া থেকে সিন্ধু অঞ্চল এবং পশ্চিম ভারতের সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। আরও জোরালো হানাদারি এল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। প্রথম প্রথম গজনির সুলতান মাহমুদের লুঠেরা সেনাদলের ঝটিকা-হানা প্রায় প্রতি বছরওয়ারি হয়ে উঠলেও কোনও স্থায়ী উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য কায়েম করার কোনও মতলব তাদের ছিল না। লুটপাট, খুনজখম ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে তারা ফিরে যেত। এর পর অবশ্য ইসলামপন্থীরা ভারতের মাটিতে অধিকার বিস্তার শুরু করে এবং দুশো বছরের মধ্যে বিহার অঞ্চল পর্যন্ত গোটা উত্তর ভারত ওরা দখল করল।

একটি তথ্য আমাদের অজানা যে সুলতান মাহমুদ ভারতে বছর বছর যাযাবরী-অভিযান চালালেও তিনি এই হানাদারিগুলির সময় সঙ্গী-হিসেবে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ও নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসতেন। যে সব অঞ্চলের ওপর দিয়ে সুলতানের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী ছুটে যেত এবং অনন্য সামরিক দক্ষতার সঙ্গে সাময়িক দখলদারি

বিস্তৃত করত, ইতিহাসে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কিন্তু, এই পর্বে সুলতানের সঙ্গে যে-সব জ্ঞানী-গুণীরা নতুন দেশ, সেখানকার মানুষ, জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে আসতেন, সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়নি। এই বিদগ্ধজনদের মধ্যে একজন ছিলেন আলবেরুনি নামে এক প্রগাঢ় পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি ওই রক্তাক্ত, নিষ্ঠুর অভিযানের ফাঁকে ফাঁকে ভারতের নদনদী, অরণ্য, পাহাড়, দ্বীপমালা, উপত্যকা, অঞ্চলের বসবাসকারীদের জীবনযাপন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

তাঁর লেখায় বিশদভাবে এদেশের বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র চর্চার পাশাপাশি বেদ-পুরাণ-লোকশ্রুতি নিয়ে যে মেধাবী ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে, ভারতীয় ইতিহাসবিদরা সেই দক্ষতা দেখাতে পারেননি (সাচাও, এডওয়ার্ড সি, ১৯৬৪)। যদিও আলবেরুনি সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারীর অঢেল প্রশংসা করেছেন, তবু খোদ সুলতানের সেনাবাহিনীর খুনজখম, লুটপাট ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে তাঁর অপ্রসন্নতা চাপা দিয়ে রাখতে পারেননি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মাপের কোনও বড় গবেষক বিদেশ থেকে বাংলাদেশে না আসার দরুন এখানকার মানুষের সামাজিক জীবনের কোনও নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অরচিতই থেকে গেছে।

সুলতান মাহমুদের বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণের সময় বাংলার রাজা ছিলেন মহিপাল। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সব শাসক সুলতানের সৈন্যদের হানাদারির প্রতিবোধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি সম্ভবত তাঁদের সঙ্গে যোগ দেননি। এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, সুলতান মাহমুদ তাঁর আগ্রাসনকে দেশের পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত কবতে চাননি। দ্বিতীয়ত, চোল এবং কালাচুরি রাজাদের হাত থেকে পাল সাম্রাজ্যের অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে ফিরে পাওয়াব জন্য মহিপালকে বহুকাল কঠিন লড়াই চালিযে যেতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ইতিহাসে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পেশ করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে আফগান-তুর্ক ইসলামপন্থীরা তাঁর রাজ্যেব প্রায় সীমানায় এসে পড়েছিল। অন্যদিকে আরব ব্যবসায়ীদের একাংশ যে সব বন্দর এলাকা সেন-সাম্রাজ্যের বাইরে সে সব জায়গায় উপনিবেশ বিস্তার করতে শুরু করেছিল।[১] বহু মুসলমান ফকিররাও প্রবেশ করেছিলেন ওই সময়ে। এঁদের একজন, শাহ্ জালাউদ্দিন তাব্রেজ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ষোড়শ শতকে পাওয়া পুথি যার নাম 'শেখ শুভোদয়'—ওই পুথিতে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। (চ্যাটার্জি, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ৩৮০; সেন দীনেশচন্দ্র ১৯৯৩)। দ্বাদশ শতকের শেষ পর্বে, তুর্কি ব্যবসায়ী বখতিয়ার খিলজি[২] বিহার দখল করে নেন এবং অনেকগুলি বৌদ্ধ উপাসনালয় ধ্বংস করেন (মিনহাজু-এস সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩০৫-৩০৬)। মধ্য এশিয়ায় যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই ওই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে বখতিয়ার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলির থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করার কাজে। কিন্তু সেন সম্রাটদের আমলে বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় ওই হিন্দু শাসকের হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, তার বদলা নেওয়ার জন্য তাদের কেউ কেউ বখতিয়ার-এর সেনাবাহিনীর গুপ্তচরবৃত্তি করতেও পিছপা হয়নি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

ও ঐতিহাসিক তারানাথ-এর রচনায় এর সমর্থন আছে। বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি মুসলমান শাসকদের করতলগত হওয়ার পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। শোনা যায়, কয়েকজন জ্যোতিষী নাকি সেন সাম্রাজ্যের পতনের সম্ভাবনার কথা পূর্বাহ্নেই রাজা লক্ষ্মণ সেনকে জানিয়েছিলেন (স্টুয়ার্ট, চার্লস, ১৯৭১ : ৪৩; খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬ : ১-২; মিনহাজু-এস সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩০৮)।

তবু ইতিহাসবিদদের আজও বিস্ময়, কেন বখতিয়ার খিলজির সেনাবাহিনীকে ঠেকানোর কোনও প্রয়াস করেননি লক্ষ্মণ সেন (মিনহাজু-এস সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩০৮; স্টুয়ার্ট, চার্লস, ১৯৭১ : ৩৮-৫০)। তাছাড়া লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) অথবা বিক্রমপুর, যা ছিল তাঁর রাজধানীর অন্তর্গত, সে-সব স্থান ছেড়ে কেন নবদ্বীপ বা নদিয়াতে ঝটিকা আক্রমণ হেনে তাঁকে বন্দি করা হল, এটিও ইতিহাসে একটি প্রশ্নচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন যে লক্ষ্মণাবতী বা বিক্রমপুরের মতো নবদ্বীপও ছিল লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী এবং সেখানে একটি সৈন্য শিবিরও ছিল। তখন বাংলার রাজাদের রীতি ছিল একাধিক রাজধানী কায়েম রাখা। এগুলিকে স্কন্ধাবারও বলা হত।[৩] কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, লক্ষ্মণ সেন ভেবেছিলেন যে রাজমহলের দিক থেকে বখতিয়ার বাহিনীর আক্রমণ আসতে পারে এবং সেই কারণে ওই অঞ্চলের সীমান্তে বিপুল প্রতিরোধ বাহিনী মজুত হয়েছিল। অথচ বখতিয়ার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলের দুর্গম ও অব্যবহৃত পথ দিয়ে সেনাদের নিয়ে প্রবেশ করেন। তবে ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গবিজয়ের কাহিনিকে ঐতিহাসিকরা সবাই নিছক গল্প বলে নস্যাৎ করেছেন।

১২৪৩ সালে, অর্থাৎ ঘটনাটির চার যুগ পর ঐতিহাসিক মিনহাজু ওই ১৮ জন অভিযানকারী অশ্বারোহীর দুজনের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একদিকে বখতিয়ার তাঁর অষ্টাদশ সেনা নিয়ে রাজপ্রাসাদে যেমন তড়িৎগতিতে দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন তখন তাঁর মূল সেনাবাহিনী শহরের কেন্দ্রে পৌঁছে নাগরিকদের ভেতর ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া একটি ছোট অঞ্চলে রাজপ্রাসাদ খুঁজে বের করা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। অবশ্য তুর্কি সেনারা খুবই দক্ষ অশ্বারোহী ছিল এবং তাদের বাহনগুলি ছিল দুনিয়ার সেরা।[৪] বখতিয়ারের সেনাবাহিনী সংখ্যায় কয়েক হাজারের বেশি ছিল না।[৫] (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩)।

যা হোক ১২০৪ সালে নদিয়া এবং ১২০৫-এর গোড়ায় গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) বিজয়ের পর পরই গোটা বাংলাকে দখল করার পরিকল্পনা বখতিয়ার গ্রহণ করেননি। লক্ষ্মণ সেন তুর্কি আক্রমণের সময় নবদ্বীপ-প্রাসাদ থেকে পালিয়ে পূর্ব বাংলায় তাঁর রাজধানী বিক্রমপুরে চলে যান এবং তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা বেশ কিছুকাল পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করেন।[৬] এই বিশাল ও নতুন দেশে এসে পূর্ব বাংলাকে আয়ত্তে আনতে বেশ সময় লেগে যায়।

তুর্ক-আফগান শাসন দুর্যোগের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। গৌড় জয়ের পরপরই বখতিয়ার খিলজি তিব্বত ও তুর্কিস্থান দখলের পরিকল্পনা নেন। বহু অশ্বারোহী নিয়ে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদ পার হন বটে, কিন্তু মাত্র বাঁশের বল্লমধারী বিপক্ষ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা

তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। উপরন্তু, যখন তিনি জানতে পারেন বিপক্ষের ওই অগ্রবাহিনীর পিছনে আরও অসংখ্য সৈন্য তার সেনাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রতীক্ষা করছে তখন ভীত বখতিয়ার পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। ফেরার সময় তাঁর সেনাদলের অধিকাংশ ব্রহ্মপুত্রের জোয়ারে ভেসে যায় এবং বাকি সেনারা অসমের কামরূপ অঞ্চলের রাজার সৈন্যদের হাতে কচুকাটা হয়।[৭] ১০,০০০ অশ্বারোহীর মধ্যে মাত্র ১৫০ জনকে নিয়ে বখতিয়ার কোনওক্রমে পালিয়ে আসেন। নবদ্বীপ বিজয়ের মাত্র দু-বছর যেতে না যেতে দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়। এরকম মতও আছে যে তাঁর বিশ্বস্ত এক সঙ্গী তাঁকে ছুরিকাহত করেন (বিশ্বাস, দিলীপকুমার, অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩ : ৩০৫-৩০৯, ৬৮৮-৬৯০; মিনহাজু-এস সিরাজ ১৯৬৯)। তিনি রেখে যান খিলজি বা তুর্ক সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবদমান কিছু সামন্ত প্রভুকে যারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতাসীন ছিল (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ১৩-১৪)। গৌড়ের সহজ বিজয়ের একেবারে বিপরীত মেরুতে রাখা যায় তিব্বত ও কামরূপের শাসকদের হাতে বখতিয়ারের শোচনীয় পরাজয়কে।

তুর্ক-আফগান শাসন (১২০৪-১৫৭৫)

দিল্লি সুলতানশাহির সঙ্গে সংঘাত

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় ছিল মূলত নিজের উদ্যোগে। দিল্লির খুব একটা সাহায্য তিনি পাননি। বখতিয়ার নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং এই বাহিনী চলত তার লুটপাটে অর্জিত টাকাপয়সা দিয়ে। তবু, তিনি দিল্লির সুলতানের একান্ত অনুগত ছিলেন এবং দাবি করতেন, নিজস্ব ক্ষমতাতেই তিনি বাংলা বিজয় করেছিলেন। গৌড় বিজয় উপলক্ষে যে মুদ্রা ছাপা হয়েছিল তাতে দিল্লির সুলতান মহম্মদ ঘোরির মুখের ছাপ থাকলেও মুদ্রার লেখাগুলি ছিল সংস্কৃত ভাষায় (ইটন, আর.এস., ১৯৯৩ : ৩৩)। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বখতিয়ার বেশিদিন জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি এবং গৌড় বিজয়ের পর তিব্বত অভ্যুত্থানে পর্যুদস্ত হয়ে অল্পকাল পরেই প্রয়াত হন।

বখতিয়ারের মৃত্যু ও পরবর্তী দুজন শাসকের স্বল্পকালীন শাসনপর্বের পর গিয়াসউদ্দিন-উজ (১২১১-১২২৬) ১৫ বছরেরও ওপর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন, নিজের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং দিল্লির সুলতান আলতামাস-এর পুত্র নাসিরউদ্দিনকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। বখতিয়ার প্রবর্তিত মুদ্রার একপিঠে দিল্লির সুলতানের, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার খলিফা-র মুখ ছাপা হত। পরবর্তী খিলজি শাসকদের সময়েও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাধীনতার দ্যোতক হিসেবে বাংলার শাসকরা মুদ্রায় দিল্লির সুলতানের বদলে নিজের মুখের ছাপ ব্যবহার করতে শুরু করেন।

দিল্লির সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পর্বেও দেখা যায় বাংলার তুর্কি শাসকদের গড় আয়ু খুবই কম ছিল। ১২২৬ থেকে ১২৮২ সাল, অর্থাৎ ৫৬ বছরের মধ্যে ১৪ জন শাসক বদল হল অর্থাৎ গড়ে এদের শাসনের আয়ুষ্কাল ছিল ৪ বছর। মামলুক-এর শাসনকাল সম্পর্কেও এ-কথা বলা যায়। এই মামলুকরা ছিল পূর্বে কেন্দ্রীয় এশীয়

জাতিগোষ্ঠীর ক্রীতদাস সম্প্রদায়। তখনকার দিনে এটা একটা নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে একজন শাসককে হত্যা করে আর একজন শাসক হয়ে বসত (কানুনগো, কে.আর., ১৯৭৩ : ৪২)। স্বাভাবিক মৃত্যু বলতে গেলে কোনও শাসকেরই কপালে ছিল না।

ব্যতিক্রম হিসেবে নাম করতে হয় ইজ্জউদ্দিন তোগরাল তোগান খান উজবেগ (১২৩৩-৪৪), মুর্গিসউদ্দিন উজবেগ (১২৪৬-৫৭) এবং আমিন খানের (১২৬৬-১২৭৮) যাঁরা ৩৪ বছরব্যাপী শাসক ছিলেন। অন্যান্য ১১ জন শাসক গড়ে দুবছরের বেশি সময় পাননি। তোগরাল তোগান খান এবং পরবর্তীকালে মুর্গিসউদ্দিন দিল্লির অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। এরকম বেশ কয়েকটি পর্বে দিল্লির সুলতানদের সামরিক হস্তক্ষেপ করতে এবং নিজেদের মনোনীত শাসককে ক্ষমতায় বসাতে হয় (বিশ্বাস, দিলীপকুমার, অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩)। তবে, বাংলার যে শাসকই ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত বোধ করতেন তিনিই দিল্লির আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা করতেন (কানুনগো, কে.আর, ১৯৭৩ : ৪২-৫৭)।

যখন দিল্লি যথাক্রমে বলবন, খিলজি ও তুঘলকদের (১২৮২-১৩৩০) দ্বারা শাসিত হচ্ছিল তখন বাংলার শাসকেরা দীর্ঘতর সময়ে রাজত্ব করেন (১২৮২-১৩২৫)। ছ-জন শাসকের ৪৩ বৎসর ব্যাপী শাসনকালের মধ্যে শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০২-১৩২২) এবং নাসিরউদ্দিন (১২৮২-৯১) মোট ২৯ বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন, অন্য চারজন ১৯ বছর শাসন করেছিলেন, অর্থাৎ গড়পিছু ৫ বছর।

যুবরাজ নাসিরউদ্দিন তার পিতা সম্রাট বলবন-এর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দিল্লি ত্যাগ করেন এবং লক্ষ্মণাবতী বা লখ্‌নৌতিতে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে পিতার মৃত্যুর পর (১২৮৭) নাসিরউদ্দিন দিল্লির সুলতান হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নাসিরউদ্দিন বাংলাতেই থেকে যান এবং স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে থাকেন। তাঁর অপব্যয়ী ও অপদার্থ পুত্র দিল্লি মসনদে বসেন। নাসিরউদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু উভয়ের এক মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকারে পরস্পরের বিবাদ চুকে যায় (ইলিয়ট, এইচ.এম. ও জন ডসন, ১৯৬৯, সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। একজন তুর্কি শাসকের ভারত সম্রাট হওয়ার গৌরব অর্জনের বদলে বাংলার শাসক হওয়া কাম্য—এরকম ঘটনা সম্ভবত ইতিহাসে আর নেই।

বাংলার শাসকদের এই ঔদ্ধত্য বেশিদিন সহ্য করা হয়নি। ১৩২২-এ দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক আবার লখ্‌নৌতি অভিযান করলেন এবং তার পুত্র নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম শাহকে বাংলার শাসনভার দিলেন। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর বাংলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে রাখা হয়—লখ্‌নৌতি, সোনারগাঁও এবং সপ্তগ্রাম। প্রতিটি অঞ্চলে আলাদা আলাদা শাসক ছিলেন (ইলিয়ট, এইচ. এম. খণ্ড ৩)। এর পর যখন দিল্লি সাম্রাজ্যের পতন হয়, তখন সুলতানের মনোনীত শাসকদের হটিয়ে অন্যেরা বাংলার সিংহাসন দখল করেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফকর-উদ্দিন মুবারক শাহ, যিনি দিল্লি মনোনীত তাতার খান-কে হত্যা করে ১৬ বছর (১৩৩৬-১৩৫২) সোনারগাঁও শাসন করেন। এরপর তিনি লখ্‌নৌতিতে সুলতান-মনোনীত শাসক কাদির খানকে হটিয়ে সেই অঞ্চলও অধিকার করেন (সালিম, গুলাম হোসেন, ১৯৭৫; সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; রায় নীরদভূষণ, ১৯৭৩; বতুতা, ইবন, ১৯২৯)।

ইলিয়াস শাহি বংশজদের রাজত্বকাল

ফকর-উদ্দিন অবশ্য পরবর্তীকালে কাদির খানের সেনাপতি আলি মুবারকের হাতে নিহত হন এবং এই আলি মুবারকও প্রাণ হারান শামস-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্-র হাতে (সালিম, গুলাম হোসেন, ১৯৭৫)। সামস-উদ্দিন দিল্লি থেকে আলাদা হয়ে প্রথম বাংলাকে একজন শাসকের আওতায় আনেন (১৩৩৯-১৩৫৮) এবং তুর্ক-আফগান শাসনকালের দুটি প্রধান বংশধারার একটি প্রবর্তন করেন (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩; রায়, নীরদভূষণ, ১৯৭৩)। তিনি ১৩৫৩ সালে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ্-র আক্রমণের মোকাবিলা কবেন এবং সুলতানকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়। পরে দুই সুলতানের মধ্যে সখ্য এবং উপঢৌকনের আদান-প্রদানও হত।

শামস-উদ্দিনেব পুত্র সিকান্দর শাহ ৩১ বছর (১৩৫৮-৮৯) দেশ শাসন করেন। সেই সময় যেভাবে ঘনঘন শাসকের পবিবর্তন হত, তার তুলনায় এই সুদীর্ঘ শাসনকালকে অভাবনীয়ই বলা যায় (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। তাঁর রাজত্বের প্রথম পর্বে সুলতান ফিরোজ শাহ্-র আক্রমণেব মুখে দাঁড়িয়ে তিনি সোনারগাঁও-এ দিল্লির প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ১৫৩৭-এ হুমায়ুনের বাংলা অভিযানের পূর্বে দিল্লিব শাসকদের এই অঞ্চলে আর কোনও হস্তক্ষেপের কথা শোনা যায় না।[৮]

সিকান্দর শাহ্-র একটি প্রধান কৃতিত্ব পাণ্ডুয়ায় বিশাল আদিনা মসজিদ নির্মাণ। গোটা এশিয়ায় বহবে এবং স্থাপত্যে এটিব চাইতে কোনও সুদৃশ্য মসজিদ আর ছিল না (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫; বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩)। আদিনা মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৩৭৫-এ। এই স্থাপত্যে পাল-সেন যুগেব শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায়।

সিকান্দর শাহ্-র শাসনপর্ব শেষ হয় তার বিদ্রোহী পুত্র গিয়াস-উদ্দিনের হাতে, যিনি সিংহাসন আরোহণ করেই তার বৈমাত্রেয় ভাইদের অন্ধ করে দেন, যাতে ঘরের শত্রু সুযোগ না পায়। তাঁর শাসনকাল ১৩৮৯-১৩৯৬। পিতাকে হত্যা করা ও ভাইদের অন্ধ করে দেওয়া—এই দুটি অপরাধ সম্পন্ন করলেও পরবর্তীকালে তাঁকে ভালো শাসক হিসেবেই গণ্য করা হত।

একবার, তাঁর অজ্ঞাতসারে এক বিধবা রমণীর পুত্রকে আঘাত করার দরুন তিনি কাজির বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কাজির নির্দেশ অনুযায়ী রমণীকে ক্ষতিপূরণও দিয়েছিলেন। বিচারকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর পোশাকের আড়াল থেকে তলোয়ার বের করে দেখান ও বলেন, কাজি যদি নিরপেক্ষ বিচার না করতেন তা হলে তাঁকে তিনি হত্যা করতে পিছপা হতেন না। সুলতানের এই উক্তির উত্তরে কাজি তাঁর আসনের তলা থেকে একটি চাবুক বের করে বলেন, খোদার আইনকে যদি নবাব নস্যাৎ করতেন তা হলে ওই চাবুক তাঁর পিঠে পড়ত।

গিয়াস-উদ্দিন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কবি হাফিজকে তাঁর রাজসভায় আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। হাফিজ যদিও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবু সুলতান যখন একটি কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি লিখে সেটিকে উপযুক্ত পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে পূর্ণ করে দিতে অনুরোধ জানান, কবি সেই অনুরোধ সানন্দে পালন

করেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

রাজা গণেশ

মাঝখানে কিছু সময় ছাড়া ইলিয়াস শাহি রাজত্বকাল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দীর্ঘকাল ছিল। ওই দুইপর্বের মাঝে একজন অ-মুসলমান রাজা গণেশ বা কংস গৌড়ের অধিপতি হয়ে বসেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। তবে একথা বলা মুশকিল যে তিনি নিজেই সুলতান সেজে বসেছিলেন নাকি শাসকের মূল শক্তির কেন্দ্র ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তখন সুলতান হিসেবে বায়াজিদ খান (১৪০৯-১৪১৪)-এর নাম পাওয়া গেলেও শাসকরূপে গণেশের নামের প্রায় কোনও উল্লেখই দেখা যায় না। অনেকে সন্দেহ করেন, গণেশ নিজেই সুলতানের নাম গ্রহণ করেছিলেন। আর একটি তথ্যে জানা যায়, রাজা গণেশের হাতে রাজ্যের অর্থভাণ্ডার ন্যস্ত ছিল। সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি শাসনকার্য চালালেও তাঁর ১২ বছর বয়সের পুত্র যদু-কে 'জালালউদ্দিন' নামে ১৪১৫-এ সিংহাসনে বসান (ইটন, আর.এস., ১৯৯৩)। গণেশের চক্রান্তেই নিহত হন গিয়াসউদ্দিন, তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন এবং পালিত পৌত্র সাহাবুদ্দিন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

গণেশ গৌড়ের স্বীকৃত শাসক হোন বা নাই হোন, তিনিই ছিলেন রাজ্যের অভিভাবক এবং সব মুখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। সেই সময় তাঁর মতো মাত্র আর একজন গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু শাসক ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দনদেব, যাঁর রাজত্বের এলাকা পাণ্ডুয়া থেকে মালদা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁর নামাঙ্কিত দুটি মুদ্রার একটিতে তাঁর শাসনকালকে ১৪১৭ থেকে ১৪১৮ পর্যন্ত চিহ্নিত দেখা যায় (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩; ৪২৪-৪২৬)।

সে সময়ের পার্শি গাথাগুলিতে, বিশেষত রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ, গণেশকে একজন মুসলিম বিরোধী শাসক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে তিনি মুসলমানদের অনেক ক্ষতিসাধন করেছিলেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। বলা হয়, গণেশের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে ধ্বংস করা এবং তার জন্য তিনি বহু মুসলমান সাধক-মৌলবিকে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু শেখ বদবুল ইসলাম তাঁর সামনে মাথা নত করেননি, সেহেতু তিনি তাঁকে নিহত করেন। যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে, কীভাবে তিনি মুসলিম পরিবেশে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেন, রাজসভার ষড়যন্ত্র-অধ্যুষিত পরিবেশে ক্ষমতা রক্ষা করেছিলেন, এমনকী, নিজের পুত্রকে বাংলার সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। গণেশের অভ্যুত্থানের কারণ হিসেবে অবশ্য দুটি তথ্য উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, এই সময় দিল্লির সুলতানশাহির চূড়ান্ত দুর্দিন যাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, ১৪৩৮-এ অর্থাৎ একই পর্বে তৈমুর তার নৃশংস সেনাবাহিনী নিয়ে ধ্বংস ও লুণ্ঠনে গোটা দেশটাকে তছনছ করে দিয়েছিলেন (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩)।

রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ আখ্যাত রয়েছে যে, জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিমশাহ্ সার্কিকে কয়েকজন মৌলবি অনুরোধ করেন বাংলার শাসনাধিকার থেকে গণেশকে হটাতে। জৌনপুরের সেনাবাহিনী যখন বাংলার সীমান্তে প্রবেশ করে, তখন গণেশ

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ক্ষুব্ধ মৌলবিদের সঙ্গে আপস করতে চান। কিন্তু গণেশের স্ত্রী এ ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি জানানোর ফলে তিনি নিজের বদলে পুত্র যদুকেই ওই ধর্মে দীক্ষা দেন। এর ফলে জৌনপুর সেনাবাহিনী যখন ফিরে যায়, তখন গণেশ স্বমূর্তি ধারণ করে ফের শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং চেষ্টা করেন যাতে ধর্মান্তরিত পুত্রকে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা যায়। এর জন্য তিনি যাবতীয় শোধন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেও ব্রাহ্মণরা এই প্রয়াসে সমর্থন জানাননি। তাঁদের প্রত্যাখ্যানে কুপিত হয়ে গণেশ যদু-কে জালালুদ্দিন নামে সিংহাসনে বসান এবং জালালুদ্দিন কট্টর মুসলমান হয়ে যান। যে সব ব্রাহ্মণ তাঁর শোধন যজ্ঞে এসেও যদু-র হিন্দুধর্মে ফেরাকে সমর্থন জানাননি, সুলতান হয়ে তিনি তাঁদের গো-মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য করেছিলেন। ১৭ বছর (১৪১৪-১৪৩১) দেশ শাসন করার পর জালালুদ্দিন স্বাভাবিকভাবে প্রয়াত হলে তাঁর পুত্র সামসউদ্দিন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

জৌনপুর কাহিনির সম্ভাব্য অভিযান সম্পর্কে তারিক-ই-ফেরেস্তা বা মস্ত-খুব-উত-তাওয়ারিখ-এর মতো অন্যান্য পারসিক কাহিনিতে কোনও উল্লেখ নেই। স্টুয়ার্ট-এর মতো কয়েকজন ঐতিহাসিক এই অভিমত পোষণ করতেন যে যদু ছিলেন গণেশের মুসলিম রক্ষিতাদের একজনের গর্ভজাত সন্তান। কেউ কেউ এরকমও মন্তব্য করেছেন যে একজন মুসলিম মহিলাকে ভালোবেসে যদু ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩ : ৪২২-২৩)। ফেরেস্তা-তে গণেশের প্রসঙ্গ খুব কমই এসেছে। এখানে বলা হয়েছে, শামসউদ্দিনের মৃত্যুর পর গণেশ (কংস) নামে এক জমিদার, "বাংলার সিংহাসন অধিকারে সফল হন" এবং সাত বছর পর প্রয়াত হন (ব্রীগস্, জন, ১৮২৯)। সব ঐতিহাসিকই গণেশের স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন, তবে বিভিন্ন জনের লেখায় এ-সম্পর্কে সন-তারিখের অমিল দেখা যায়। গণেশের মৃত্যুর পর হিতমল (যদু) তাঁর সব কর্মচারীদের ডেকে পাঠান এবং বলেন, তাঁরা যদি যদু-কে পছন্দ না করেন, তাহলে তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে রাজি আছেন। তিনি যে মুসলিম হতে ইচ্ছুক, এ-কথাও তাঁদের জানান। উপস্থিত রাজকর্মচারীরা সবাই শর্তহীনভাবে যদুকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। তবে তাঁর ধর্মান্তর সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। যদু জালালুদ্দিন নামধারণ করে মুসলিম হন এবং একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ১৭ বৎসর রাজ্য শাসন করেন (ব্রীগস্, জন, ১৮২৯, খণ্ড ৪, ৩৩৭)।

সে সময়কার ঐতিহ্য ভেঙে একজন অ-মুসলমান রাজার ক্ষমতা দখল, তা যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন, বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির পালাবদল বুঝতে সহায়তা করবে। প্রাক্তন তুর্ক-আফগান শাসকেরা পশ্চিম এশিয়ার খিলাফত এবং দিল্লির সুলতানশাহিকে তাঁদের প্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য করতেন। এমনকী, বাংলার যেসব শাসক দিল্লির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন, তাঁরা দিল্লির বা প্রজাদের অভাব-অভিযোগের খুব একটা তোয়াক্কা না করলেও ইসলাম-দুনিয়ার বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছে রাজ্য শাসনের বৈধতার জন্য আবেদন জানাতেন (ইটন, আর. এম., ১৯৯৩ : ৩৯)। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের মুদ্রায় ক্ষমতার উৎস-হিসেবে খলিফত্‌কে চিহ্নিত করতেন। বলা যায় বাংলার শাসকদের রাজনৈতিক অবস্থান

ছিল স্বদেশে এবং মতাদর্শগত অবস্থান পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম শক্তি কেন্দ্রে (ইটন, আর.এম., ১৯৯৩ : ৫১)। কিন্তু দু নৌকোয় পা দিয়ে এভাবে চলা বেশিদিন সম্ভব নয়। যদুর পক্ষে এটা নিশ্চয় প্রশংসনীয় যে মুসলিম বনে যাওয়ার পরও তিনি বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুদ্রায় যেমন ইসলামি প্রতীক চিহ্ন ছিল, তেমনই দেবীদুর্গার বাহন হিসেবে কথিত সিংহের ছাপও ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্ত শ্রেণির প্রজার কাছ থেকেই শাসক হিসেবে সমর্থন কামনা করেছিলেন। এই সময় থেকেই নানা দেশজ চিহ্ন ও প্রতীক মুদ্রায় প্রতিফলিত হতে লাগল। পাণ্ডুয়ায় এক পাখি এবং অন্যান্য মসজিদে বৌদ্ধ মন্দিরের চৌকোনা ইটের গড়নেরও ছাপ পড়ল (ইটন, আর.এম., ১৯৯৩ : ৫৮-৬১)।

ইলিয়াস শাহি শাসনকালের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল, যদুর পুত্র, নৃশংস স্বৈরাচারী শামসউদ্দিন আহমদ শাহ্-র হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তাঁর দুই ভৃত্য যারা তাঁকে হত্যা করে, তারা আবার রাজসভার অমাত্যদের হাতে নিহত হয় (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। ওই অমাত্যবর্গ ইলিয়াস শাহ্-র এক উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ্-কে সিংহাসনে বসান। এই দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ১৪৪২ থেকে ১৪৮৬—মোট ৪৪ বছরে গড়ে ৯ বৎসর করে পাঁচজন শাসক রাজত্ব করেন।

হাব্‌সি খোজা দাসদের রাজত্ব

গণেশের ক্ষমতায় আরোহণ যেমন বিস্ময়কর ঘটনা, ইথিওপিয়া থেকে আগত হাবসি দাসদের বাংলায় সাত বছর ব্যাপী রাজত্বও (১৪৮৬-৯৩) তার চাইতে কম আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। আনুমানিক ৫ হাজার থেকে ৯ হাজার হাব্‌সি দাসদের কিনে আনা হত হারেমের মহিলাদের সুরক্ষার জন্য অথবা যে সব ব্যবসায়ীকে কাজে-কর্মে দীর্ঘকাল দেশ ছেড়ে এখানে অবস্থান করতে হত, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য। এই ক্রীতদাসদের অনেককে রাজপ্রাসাদের রক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হত। বিদেশি এবং খোজা এই দাসদের কাছ থেকে সুলতানরা কোনও বিপদের আশঙ্কা করতেন না। এদের অনেকে যোদ্ধা হিসেবেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। বরবক ও ইউসুফ এবং ইউসুফ-এর পুত্র ফতেও ওদের দাসব্যবসায় সাহায্য করেন। শোনা যায়, বরবক শাহ্ ইথিওপিয়া থেকে ৮০০০ হাব্‌সি দাস ক্রয় করেছিলেন (রহিম, এম.এ., ১৯৮২)। অপর একটি হিসেবে জানা যায়, বাংলার শেষ দাস শাসকের ৫ হাজার হাব্‌সি সৈন্য এবং প্রায় ৩০ হাজার আফগান-বাঙালি মিলিত সেনানী ছিল। ইলিয়াস শাহ্ ক্ষমতা দখলের জন্য এই খোজাদের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং জালালুদ্দিনের সন্তান নিহত হওয়ার পর একটি ক্যুদেতা সংগঠনেরও চেষ্টা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে এই দাসকুলের অনেকে নিছক রাজপ্রাসাদের রক্ষক না থেকে শাসকদের মুখ্য পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন (ব্রীগস্, জন, ১৮২৯)। ১৪৮৬-র মধ্যে "তাঁরা রাজসভার অধিকাংশ উঁচু পদ দখল করেন এবং রাজপ্রাসাদে ও রাজধানীতে বিপুল সংখ্যায় জড়ো হন"(সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ১৩৭)। ৫ হাজার পাইক সংগঠিতভাবে রাজাকে রাতে বিশ্রামকালে পাহারা দিত এবং দিনে যখন তিনি ঘুম থেকে উঠে সিংহাসনে বসতেন,

তখনও রাজসভা ও প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ করত। অনুমান করা যায় এই পাইকদের অধিকাংশই ছিল হাব্‌সি। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার শাসক হওয়ার পূর্বেই যে হাব্‌সিরা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কীভাবে এই দাসেরা ক্ষমতা দখল করল, তা আজও রহস্যময় রয়ে গেছে; তবে এতে বোঝা যায় বাংলার শাসকদের পায়ের তলার মাটি কতখানি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজাসাধারণের প্রতিদিনের জীবনযাপনের ওপর চাপ না পড়ত, ততদিন তাদের কাছে সিংহাসনে কে এল গেল এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু থাকত না। একজন রাজাকে খুন করে ওই হত্যাকারী সিংহাসন দখল করলে সে-ও একই ক্ষমতার অধিকারী হত। শুধু বিদেশি পর্যটকরাই নয়, দিল্লিবিজয়ী বাবরও এই বিষয়টি লক্ষ করেছিলেন। তবে তাঁর শাসনের অনেক আগেই বাংলা দিল্লি সাম্রাজ্যের আওতায় চলে এসেছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে হুসেন শাহ্-র মৃত্যুর পর নসরৎ-এর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতায় আসাটা বাংলার শাসক বদলের রীতির মধ্যে পড়ে না। স্বাভাবিকভাবেই হোক আর চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই হোক, যে-ই ক্ষমতায় আসুক, তাঁকেই রাজ্যের সব মানুষ একবাক্যে রাজা বলে মেনে নিত ও সম্মান করত (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩)।

প্রথম খোজা নৃপতি বরবাক মাত্র কয়েক মাস শাসন করার পর আর একজন খোজা মালিক আনদিল-এর হাতে খুন হন। এবং বিধবা রানির অনুমতি নিয়ে তিনি প্রায় তিন বছর রাজ্য শাসন করেন। আনদিল দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। অনেকে বলেন, তাঁর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু অন্য একটি মত—পাইকরা সংগঠিত ভাবে তাঁকে হত্যা করে (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; সালিম, গুলাম হোসেন, ১৯৭৫)। তাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ্ নামে একটি শিশুকে সিংহাসনে বসানো হয়। শিশুটি ছিল ফতে শাহ্-র পুত্র অথবা আনদিল-এর পালিত পুত্র। কিন্তু অল্পকাল পর সিদি বদর দিওয়ানা নামে এক খোজা হাব্‌সি দাস বালক-রাজাকে হত্যা করে পরবর্তী সাড়ে তিন বছর ধরে রাজত্ব চালান। সব অর্থেই দিওয়ানা ছিলেন খারাপ প্রশাসক এবং প্রজাদের অপ্রিয়। তিনি তার রাজত্বে ১২ হাজার মানুষকে খুন করেন। ফলে একসময় গোটা রাজসভার অমাত্যরা তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং গৌড়ের জনগণের অর্ধেক রাজত্ব ছেড়ে অন্যত্র পালায়। শেষে, তার নিজের মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন তাকে হত্যা করে নতুন সুলতান হয়ে বসেন (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫, ইটন, আর.এম., ১৯৯৩)।

মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন শাহ্—এই নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন।[৯] তাঁর জন্ম হয়েছিল আরবে। তিনি ২৬ বছর (১৪৯৩-১৫১৯) শাসন চালান। এই শাসনকাল সিকান্দর শাহ্।[১০] ছাড়া আর সব সুলতানের থেকে দীর্ঘ সময়ের। তিনি ছিলেন একজন দয়ালু অথচ দৃঢ়চিত্ত শাসক। সিংহাসন আরোহণ করেই হুসেন শাহ্ পাইক আর হাব্‌সি বাহিনী ভেঙে দেন। নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তার ক্ষমতা দখলের পর্বে যে-সব সেনারা রাজধানীতে অবাধে লুটপাট চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে ১২ হাজার জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ১৭৫; ব্রীগস্, জন, ১৮২৯ : খণ্ড ৪)।

হুসেন শাহ্ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অ-মুসলমানদেরও উচ্চ রাজপদে বসিয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য যাই হোক না কেন, বৈষ্ণব ধর্মের মহান প্রচারক চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর নাম চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাঁর দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী রূপ ও সনাতন পদত্যাগ করে চৈতন্যের অনুরাগী হয়েছিলেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী, দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান, মুদ্রাযন্ত্র দপ্তরের পরিচালক, ব্যক্তিগত সচিব, সভা-গায়ক, দ্বিতীয় ত্রিপুরা অভিযানের প্রধান সেনাপতি—সবাই ছিলেন অ-মুসলমান ধর্ম-ঐতিহ্যের ধারক (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩)। হুসেন শাহ্-র নাম বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, মালাধর বসুর রচনাবলি, যশোরাজ খানের পদাবলি, পরমেশ্বরের অনূদিত মহাভারত ইত্যাদিতে লেখালেখির প্রেরণা স্বরূপ বলে স্বীকৃতি জানানো হয় (সরকার, যদুনাথ; ১৯৭৩; বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩)। পরমেশ্বর হুসেন শাহ্-র পুত্র নসরৎ-এরও নামোল্লেখ করেছেন। এইসব তাঁর অন্য ধর্মীয় চিন্তার প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কথিত আছে যে ওই বংশের পরবর্তী সুলতানেরা অভিষেকের সময় গঙ্গাজলের ব্যবহারের মতো অ-মুসলিম ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত পালন করতেন (ইটন, আর. এম. ১৯৯৩ : ৬৯)।

১৯৯৪ সালে খোদ সুলতান বাংলা আক্রমণ করেন। যেহেতু হুসেন শাহ্ সুলতানের বৈরী জৌনপুরের রাজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাই এই আক্রমণ। কিন্তু বাংলার সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে সুলতান দিল্লিতে ফিরে যান, যেহেতু তিনি বাংলার শাসকের সঙ্গে এঁটে ওঠেন না (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩)। ১৪৯৮-এ হুসেন শাহ্-র সেনাবাহিনী কামতাপুর অভিযান করে এবং প্রাথমিক কিছু ক্ষয়ক্ষতির পর ওই অঞ্চলের রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর পুত্র ড্যানিয়েলকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু অসমের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ১৫২৭ সালে ড্যানিয়েল প্রাণ হারান (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধেও একই পরিণাম ঘটেছিল (রাজমালা : ৪৩-৫০)। ১৫০৯-এ ওড়িশা অভিযানেও হুসেন শাহ্ সফলতা লাভ করেননি।

তাঁর চারজন উত্তরপুরুষ আরও ১৯ বছর রাজত্ব করেন।

তুর্ক-আফগান শাসন—সামগ্রিক বিশ্লেষণ

একমাত্র ইলিয়াস শাহি ও হুসেন শাহি রাজত্বকাল ছাড়া বাকি শাসকদের প্রশাসন পর্ব ছিল খুবই সীমিত। ভগ্ন স্বাস্থ্য বা বয়সের দরুন মৃত্যু এঁদের প্রায় কারুরই কপালে ছিল না। পুত্র, স্ত্রী, মন্ত্রী এমনকী, একজন সাধারণ দাস—কাউকেই এঁরা বিশ্বাস করতে পারতেন না। যে রাজাকে হত্যা করতে সমর্থ সেই রাজা হয়ে বসবে—বিনা প্রশ্নে এই ঘটনাকে মেনে নেওয়াই ছিল একমাত্র সত্য। বখতিয়ার খিলজি থেকে দাউদ, অর্থাৎ ১২০৪ থেকে ১৫৭৬—এই ৩৭২ বছর যে ৪৩ জন বাংলার শাসক হয়েছিলেন তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই খুব অল্পকাল রাজত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২)।

সুলতানেরা সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহ ও লুটতরাজ নিয়ে থাকতেন, কামরূপ, ওড়িশার যাজপুর, বিহারের প্রতিবেশী অঞ্চল এবং আরাকান চট্টগ্রাম তাদের মনোমত অভিযান ক্ষেত্র ছিল। ভূমি সংস্কার, ভূমি রাজস্ব সম্পর্কেও গঠনমূলক কিছু করে যাননি। আইনের

শাসন বলে কিছু ছিল না, প্রশাসন ও বিচার চলত কর্তার ইচ্ছানুযায়ী। মোদ্দা কথা এই সুলতানেরা প্রায় কেউই ভালো শাসক ছিলেন না।

যেহেতু ব্যবসা বাণিজ্য বা কৃষি নিয়ে এঁদের মাথাব্যথা ছিল না, তাই রাজ্যের দুটি প্রধান অংশ এ সবের জন্য তাঁরা অ-মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী একটি অধ্যায় (৩.৪) আমরা দেখতে পাব, যতক্ষণ না নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে, এই শাসককুল অন্যদের জোর করে ইসলাম ধর্মের আওতায় আনতে চাননি এবং অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের নিজেদের মতো ধর্মাচরণ কবতে দিয়েছেন।[১১] শাস্তিদানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কখনও কখনও মন্দির ধ্বংস করা ও বিগ্রহ ভাঙা হত বটে, কিন্তু এগুলি ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভূস্বামীদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ এবং রাজকর্মচারীদের একটি বড় অংশ ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণিভুক্ত।

যদিও এই শাসককুল বিদেশ থেকে এসেছিলেন, তবু এঁদের প্রায় সকলেই নিজেদের জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা দিল্লির খবরদারি অগ্রাহ্য করেছেন এবং সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিল্লিতে নজরানা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন এবং নিজেদের টাকশাল খুলেছেন। এই সময় থেকেই বাংলা একটি ভাষা হিসেবে উন্নীত হতে থাকে এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মতো কবিদের রচনায় সমৃদ্ধ চেহারা ধারণ করে (পরিচ্ছেদ ৩.৪)।

মোগল শাসন (১৫৭৬—১৭০৭)

মোগলদের আগমন

১৫২৬-এ পানিপথের যুদ্ধে সম্রাট বাবরের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অ-মোগলমুসলমান শাসনের বস্তুত সমাপ্তি ঘটল। যদিও বাংলা আরও কয়েক বছর স্বাধীন রয়ে গেল, তবু দেয়ালের লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবরের বিজয়ের ফলে বহু অভিজাত আফগান পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও বিহারে পালিয়ে এলেন। ১৫২৯-এ বাবর বাংলা অভিযানও করেছিলেন কিন্তু ঘাঘরা নদীর তীরে তাঁর সৈন্যদল পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে তিনি নসরৎ শাহ-র সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে দিল্লি ফিরে আসেন। এই চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল, দিল্লি সিংহাসনের অধিকারের জন্য মহম্মদ লোদি সচেষ্ট হলে নসরৎ তাঁকে সহায়তা করবেন না (সালিম, গুলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ১৩৫)। এর কিছুদিন পরই, ১৫৩০-এ বাবর প্রয়াত হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই এক খোজা ক্রীতদাসের হাতে প্রাণ হারান নসরৎ। এই ঘটনার বছর না পেরোতেই নসরৎ-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী নিহত হন তার কাকার হাতে এবং এই ঘাতক সুলতান গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ নাম নিয়ে শাসক হয়ে বসেন। (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

মোগলদের আগে বিহারের একটি অংশের সামরিক প্রভু, আফগান শের খান বাংলার সুলতানকে পরাস্ত করেন। গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ শাহ বিহারে তাঁর শাসিত এলাকার এক প্রতিনিধিকে শাস্তি দেন। কিন্তু তিনি জানতেন না ওই শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত শের খানের মিত্র। শের খান ১৫৩৫-এ গৌড় আক্রমণ করেন এবং

সুলতানের কাছ থেকে জোর করে ৯ লক্ষ টাকা আদায় করতে চান। কিন্তু সুলতান এই জোরের কাছে নতিস্বীকার না করায় শের খান যখন ১৫৩৭-এ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন, তখন গিয়াসউদ্দিন বাবরের উত্তরাধিকারী সম্রাট হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করলে পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে শের খান পিছু হটেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণের পূর্বে গিয়াসউদ্দিনের তিনটি পুত্র শের খানের হাতে নিহত হয়। এই চরম দুঃসংবাদ জানতে পারার পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন পরের বছরই অর্থাৎ ১৫৩৮-এ প্রাণত্যাগ করেন (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

হুমায়ুন মাস তিনেক গৌড়ে অবস্থান করেন এবং এই অঞ্চলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গৌড়ের নতুন নামকরণ করেন-জন্নতাবাদ অর্থাৎ 'স্বর্গীয় শহর'। কিন্তু হঠাৎই তিনি ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যান। হয়তো এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণ সেখানে মহামারির বিস্তার এবং আগ্রায় বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান। হুমায়ুন ফিরে যেতেই শের খান বাংলায় অভিযান চালান এবং পরের বছর (১৫৩৯) চৌসা-র চাপাঘাটে সম্রাট হুমায়ুনকে চূড়ান্তভবে পরাজিত করেন। হুমায়ুন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন বটে, কিন্তু পেছনে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আসেন ৪০ হাজার মহিলা এবং ক্রীতদাসদের (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫; সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; ইটন, আর.এম., ১৯৯৩)।

শের খান এরপর সম্রাট শেরশাহ হয়ে বসেন এবং পরের বছর কনৌজের কাছে এক যুদ্ধে হুমায়ুনকে আবার পরাস্ত করায় হুমায়ুন পিছু হটে লাহোরে চলে আসেন। কিন্তু সম্রাট শের শাহ নিজেই সংকটাপন্ন হন যখন বাংলার শাসক হিসেবে তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি খিজির খান নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। ফলে শের খান তাঁকে অপসারিত করে পুত্র ইসলাম খান-কে খিজিরের স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু ১৫৫৩-য় হুমায়ুন আবার বাংলা দখল করেন। (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ৯৪৬; সরকার; যদুনাথ, ১৯৭৩ : ১৭৯; ইটন, আর.এম. ১৯৯৩; ১৪০)।

এই সময় মোগলদের পুরোপুরিভাবে বাংলা বিজয়ের মধ্যবর্তী পর্বে আট জন শাসক গড়ে তিন বছর করে চব্বিশ বছর দেশ শাসন করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধের শাসক সুলেমান কারানি, যিনি ১৫৬৪-তে গৌড় অধিকার করেন এবং আট বছর শাসনকার্য চালান। তিনি কূটনৈতিক কৌশলে বাইরে বাইরে হুমায়ুনের সঙ্গে সৌহার্দরক্ষা করে মোগলদের ঠেকিয়ে রাখেন এবং আকবরের সেনানায়ক মুনিম খানের সঙ্গে পাল্লা করে ওড়িশা জয় করেন। এই অজুহাতে পুরীর জগন্নাথ মন্দির তিনি ধ্বংস করেন যে ওড়িশার রাজা মুকুন্দদেব আকবরের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫; সরকার যদুনাথ, ১৯৭৩; ইটন, আর. এম. ১৯৯৩)।

কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী এবং সন্তান বায়াজিদ খান অচিরেই নিহত হন, যদিও ওই ঘাতকটি বায়াজিদ খানের ভ্রাতা দাউদের হাতে প্রাণ হারায় (সালিম, গুলাম হোসেন, ১৯৭৫)। বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক দাউদ খান (১৫৭২-৭৬) মেদিনীপুরের মোগলমারি অঞ্চলে, খানখানান মুনিম খান এবং টোডরমলের নেতৃত্বাধীন মোগল বাহিনীর হাতে পরাস্ত হন। এরপর মুনিম গৌড় জয় করেন এবং গৌড়ের প্রাচীন শহরটিকে ফের রাজধানী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পরে ঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। নদী

ইতিমধ্যে গতিপথ পরিবর্তন করেছিল এবং বদ্ধ জলাগুলি জলবাহিত অসুখবিসুখের কারণ হয়ে উঠেছিল। অনেকে মারা যেতে থাকে এবং মোগল সৈন্যরা দ্রুত গৌড় ছেড়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের অভিলাষ তো দূরের কথা, মারি ও মড়কে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয় তাদের মরিয়া করে তুলেছিল। এরকম ধারণা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল "বাংলা একটি বিপজ্জনক বিদেশি ভূখণ্ড, যেখানে সাময়িকভাবে কাজের উপলক্ষে আসা যায় কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করা যায় না।" ১৫৭৫-এর অক্টোবরে মুনিমের মৃত্যুর পর দাউদ ফের বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৫৭৬-এ রাজমহলের কাছে একটি যুদ্ধে রাজা টোডরমল এবং খানজাহান হোসেন কুলিখান তুর্কমানের কাছে নিহত হন। এই ঘটনার কিছু পরে আবুল ফজল এই বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান, "যে দেশের মাটি সবসময়ই অসৎ লোকেরা উত্তেজনাপ্রবণ করে রেখেছিল" সেই দেশ এতদিনে শান্তিময় হয়ে উঠল। পরবর্তী ঘটনাসমূহ কিন্তু প্রমাণ করে আবুল ফজলের এই উক্তি পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।[১২] (বেভারিজ, এইচ, ১৯৭৭, ৩, ২৫৬)।

এই আবুল ফজল-কেই পরে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়েছিল, "বাংলা এমন একটি জায়গা, যেখানে আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর এবং যে অঞ্চলে কলহ-বিবাদ লেগেই আছে। শয়তানরা এখানকার মানুষজন, ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে। এক কথায় বাংলাকে বলা যায় 'বুলগকখানা' বা নৈরাজ্যের কেন্দ্র।" (বেভারিজ, এইচ, ১৯৭৭, ৩, ৪২৭) কয়েক বছর পর, ১৫৭৯-এ বিদ্রোহের এক ভয়ংকর রূপ দেখা গেল।

সম্রাট আকবর ঠিক করেছিলেন যে একজন সুলতানকে সহায়তা করার জন্য একজন দেওয়ান, একজন আমিন ও বক্‌সি থাকবেন এবং বাংলার মনসবদারদের মাঝে মাঝে বদ্‌লি করা হবে। কিন্তু, ক্ষমতা পেয়ে কে কতটা লুটতরাজ চালাতে পারে, এ নিয়ে মোগল আর তুর্কমানদের মধ্যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল লেগে গেল। বাবা খান কাকশাল (জব্বরি) ও ওয়াজির জামিল এবং মাসুম খান কাবলি এই পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। দুবছর তাণ্ডবের পালা চলল। ১৫৮২ থেকে ১৫৮৩-তে ফের বিদ্রোহ দেখা দিল কত্‌লু খান ও তার পুত্র ওসমান-এর নেতৃত্বাধীন আফগানদের মধ্যে। এদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে বশে আনতে দিল্লির সম্রাটের সেনাবাহিনীর ১৬১২ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যায় (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩)।

মোগল অভ্যুত্থান ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে বাংলার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাল এবং গোটা দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংহতি সাধন করল। মোগলদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল বাংলাকে আঞ্চলিক শাসক ও যুদ্ধবাজদের হাত থেকে মুক্ত করে দেশটিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় আনা। দ্বিতীয়ত, বাংলায় সর্বভারতীয় পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় ও শাসননীতির প্রণয়ন করা। মনসবদার ও জায়গিরদারদের ক্ষমতাকে বিধিবদ্ধ করা হল এবং বাংলার আদায়িকৃত রাজস্ব কীভাবে ভাগ করা হবে, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল। আকবরের সেনাধ্যক্ষ ও অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমল ছিলেন এই নীতি-নিয়মাবলির প্রবক্তা।[১৩] প্রশাসক ও সুবেদারদেরও এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে বদলি করার প্রথা চালু করা হল।

প্রশাসককে সহায়তা করার জন্য সহকারী প্রশাসক, রাজস্ব মন্ত্রী (দেওয়ান), আরক্ষা বিভাগের প্রধান (বক্‌সি), সদর, কাজি ও কোতোয়াল নিয়োগ করা হল (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ২০৬)। এই বিভাগীকরণের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুবেদারদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা। দেওয়ানের কাজ ছিল রাজস্ব ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ের তদারকি এবং বক্‌সি সামরিকখাতে মঞ্জুর অর্থের ব্যবহারের দেখাশোনা করতেন। অন্য এক রাজকর্মচারী, ছিলেন 'ওয়াকৎ-নবিশ'। যে কোনও বিষয় সরাসরি সম্রাটকে জানানোর তিনি অধিকারী ছিলেন। এসব চালু করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩)।

বাংলাকে বাগে আনা দিল্লির পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না। একদিকে দুই অঞ্চলের মাঝখানে বিরাট দূরত্ব, অন্যদিকে বাংলায় মারি ও মড়কের প্রাবল্য। তারপর, বিশেষত বাংলার পূর্বাঞ্চলে অসংখ্য নদনদী ও বন্যার বাহুল্য। এসব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দিল্লির সামরিক বাহিনীর নিয়মিত অভিযান চালানো ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৬০২ সালে বাংলার রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাজমহল থেকে দক্ষিণে, গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত ঢাকায়। কিন্তু তাতেও হঠাৎ হঠাৎ বিদ্রোহ সামাল দেওয়া রীতিমতো মুশকিল হয়ে পড়ত। এই সংকটগুলি উপলব্ধি করে মোগল শাসনের প্রথম পর্বে, যিনিই বাংলার শাসক হয়ে বসুন না কেন, তিনি যদি দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেন, ব্যক্তিগতভাবে মোগল রাজসভায় হাজিরা দেন ও সম্রাটকে উপঢৌকন দিতে রাজি থাকেন, তাহলেই যথেষ্ট মনে করা হত। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা অনেকে এই ন্যূনতম শর্তও মানতে চাইতেন না এবং মোগলদের বশ্যতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কঠিন লড়াই চালিয়ে যেতেন। বারোজন সামন্ত-প্রধান, যাঁদের 'বারো ভুঁইঞা' বলে আখ্যা দেওয়া হত এবং যাঁদের মধ্যে বাঙালি ছাড়াও ছিল আফগান ও অন্যান্য জাতি, তাঁরা মোগল সেনাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। এঁদের মধ্যে বলা যায় সোনারগাঁও-র ইশা খান, যশোরের প্রত্যাপাদিত্য ও শ্রীপুরের কেদার রায় প্রমুখ শাসক দিল্লির সম্রাটের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন (বেভেরিজ, এইচ, ১৯৭৭, ৩; রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ১৮)।

এই সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৫৭৬ থেকে ১৬১২—দীর্ঘ ৩৬ বছর লেগে গিয়েছিল (নাথান, মির্জা, ১৯৩৬)।[১৪] এমনকী, মোগল সম্রাটের দুর্ধর্ষ রাজপুত সেনানায়ক মান সিংহ, যাঁকে ১৫৯৯-এ বাংলার বিদ্রোহী শাসকদের শায়েস্তা করতে পাঠানো হয়েছিল, তাঁর সেনাবাহিনীও রণক্ষেত্রে ও নৌযুদ্ধে পরাস্ত হন। ইশা খান-এর মৃত্যুর পরও আফগান দলপতিরা তাঁর পুত্র দাউদের পাশে এসে দাঁড়ান। পরবর্তীকালে ইশা খান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিছু পরিমাণে সফল হওয়ার পর যেই মানসিংহ আজমীড় ফিরে যান, সঙ্গে সঙ্গে সামন্তপ্রভুরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৬০১ সালে মানসিংহ বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন ও তাঁর সৈন্যদল বিদ্রোহীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। ১৬০২-এ তিনি ঢাকায় চলে আসেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায় তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও পরবর্তীকালে আরাকানীদের সহায়তায় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, পরাস্ত হন এবং মারা যান (যদুনাথ, সরকার, ১৯৭৩)। ১৬০৩ সালে কেদার রায় হেরে যান, মানসিংহের স্থলাভিষিক্ত হন ইসলাম

খান।[১৫] তিনি ১৬১২ সালে উথমান খান এর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে জয়ী হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহ লেগেই থাকে। উথমান খান-এর রাজ্য একসময় উত্তরে পূর্ববাংলার ভাটি থেকে রংপুরের ঘোড়াঘাট এবং দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩; সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।[১৬]

১৫৯৫-এ মানসিংহ তান্ডা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর করলেন। গৌড়ের চাইতে রাজমহল আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যকর এবং শত্রুর নদীপথে আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে অনেকখানি মুক্ত। এরপর রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং তার ফলে স্থলযুদ্ধে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করা সহজতর হল। মানসিংহ ও তাঁর সেনাবাহিনী বেশ কিছুকাল (১৬০২-১৬০৪) ঢাকায় অবস্থান করেন। তার ফলে ঢাকা রীতিমতো শহর হিসেবে গড়ে উঠল। সেখানে একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটিও তৈরি হল। তারপর ১৬০৮-১৬১৩-য় ইসলাম খানের রাজত্বের পর্বে সরকারিভাবে ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণাও করা হল (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫; রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ৩)।

প্রথম কয়েক বছর তুর্কিদের মতো বাংলায় মোগল শাসনের অবস্থাও বেশ নড়বড়ে ছিল। ১৫৭৫ থেকে ১৬০৮ এই ৩৩ বছরে দিল্লির ১১ জন প্রতিনিধি বাংলায় আসেন, যাঁদের গড় শাসনকাল দাঁড়ায় মাথাপিছু তিন বছর। এর মধ্যে বাংলায় মানসিংহ শাসিত ১২ বছর বাদ দিয়ে এই গড় নেমে দাঁড়ায় ২.১ বছরে। তবে, তুর্কি-আফগান আমলের মতো শাসকদের হত্যা করে নতুন শাসক হয়ে বসার নজির পাওয়া যায় না। এই সময়ের মধ্যে মাত্র দুই জন খুন হন, চার জন রোগভোগে মারা যান, এক জনকে হটানো হয় এবং চার জনকে বদলি করা হয় (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ২২৮-২৯)।

১৬০৮ থেকে ১৬৩৯— ৩১ বছরে দশজন প্রশাসককে নিয়োগ করা হয়, যাঁদের শাসনকাল ছিল গড়ে মাথাপিছু তিন বছর। এরপর অবস্থার উন্নতি হয়। ১৬৩৯ থেকে ১৭১৬—এই ৭৯ বছরে মাত্র আট জন শাসনকার্য চালিয়েছিলেন যা কিনা গড়ে প্রায় দশ বছর করে। এঁদের অনেকে ছিলেন রাজপুত্র এবং বিশিষ্ট রাজবংশীয় পুরুষ। তুর্ক-আফগান শাসনপর্বের নৈরাজ্যের বদলে মোগল শাসন, কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব এনেছিল। তবে তুর্কি ও আফগানরা বাংলার মাটিতে থেকে গেলেও মোগলরা বরাবর বহিরাগত শাসকের ভূমিকাই পালন করে গেছেন (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩, ৩৭, ৪৩)। দিল্লির প্রতি বাংলার সুবেদারের পূর্ণ আনুগত্য ছিল। ওই আনুগত্যের ভিত্তিতেই মোগল প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলত।

একজন সুবেদারের যোগ্যতা নির্ভর করত, বাৎসরিক নজরানা ছাড়াও নানা উৎসবে ও বড় মাপের যুদ্ধজয়ে তিনি সম্রাটকে কত বেশি পরিমাণে উপঢৌকন দিতে পারেন, এমনকী, লুটপাটের বখ্‌রাও। সম্রাট সুবেদারদের নিয়োগ করতেন এবং ইচ্ছেমতো বদলি বা বরখাস্ত করতেন। মোগল রাজপ্রতিনিধিরা প্রচুর বেতনভোগী ছিলেন তা সত্ত্বেও, তারা বাংলা ছেড়ে যাওয়ার আগে যতটা সম্ভব ধনসম্পদ আদায় করে নিতেন। এঁরা কখনওই তুর্ক-আফগান প্রশাসকদের মতো বাংলার মাটিকে নিজের মাটি বলে ভাবতেন না। টাকার দিকগুলো ঠিকঠাক থাকলে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহী হতেন না। এমনকী, বাংলার শাসকদের তাদের নিজেদের প্রজাদের ওপর বেআইনি অত্যাচারও

তাঁদের বিচলিত করত না (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ৬,৮)।

মানসিংহ এবং ইসলাম খানে-র শাসনপর্বের মাঝখানে আরও দুজন নাজিম বাংলা শাসন করেছেন। তাঁদের একজন, কুতুবউদ্দিন খান-কে পাঁচ হাজারি অর্থাৎ পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদার করা হয়েছিল। তাঁকে দু লক্ষ টাকা ভাতা এবং তিন লক্ষ টাকা রাহাখরচ দেওয়া হত সম্রাটের গোপন নির্দেশ পালন করার জন্য। নতুন সম্রাট, আকবরের পুত্র জাহাঙ্গির, তাঁকে দিয়ে খুন করাতে চেয়েছিলেন বাংলার এক মোগল রাজপ্রতিনিধিকে, শের আফগানকে, তার রূপসী স্ত্রী নূরজাহানকে হস্তগত করার জন্য। পরে ওই মহিলা, তার স্বামী নিহত হলে খোদ সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেন। এই অপরাধের সংগঠক কুতুবদ্দিনকেও পুরস্কৃত করা তো দূরের কথা, অল্পকালের মধ্যে তাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্থানে নিযুক্ত জাহাঙ্গির কোয়ালি খান অসুস্থ অবস্থায় মাত্র একমাসের মধ্যে মারা যান। মোগল সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ইসলাম খান তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ১৬৯-১৭২)।

ইসলাম খানকে অবশ্য নিহত হতে হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কোয়াসিম খান পাঁচ বছর রাজ্য শাসন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী, রাজার সহোদর ইব্রাহিম খানের আট বছরব্যাপী (১৬১৭-২৪) রাজত্বকালে বাংলার দ্বাদশ ভুঁইঞাদের প্রত্যেকে মোগল সাম্রাজ্যের অনুগত ছিলেন। কিন্তু নতুন শাসকরা জমিদারদের বশ্যতা আদায় করা ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের কতখানি শুভার্থী ছিলেন, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে (ইটন, আর. এম. ১৯৯৩)।

ইব্রাহিম খানের শাসনকালে মোগল সম্রাটের পুত্র শাহজাহান নিজেই সম্রাট হয়ে বসেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে সম্রাটের সেনাবাহিনীকে ১৬২৯-এ বাংলার দিকে ঠেলে দেন। ইব্রাহিম খান ঢাকা ছেড়ে পালালেও রাজমহলে নিহত হন। শাহাজাহান সেখানে বাংলার প্রশাসক হিসেবে দরাব খানকে নিয়োগ করেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।[১৭] দরাব খান বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল নিজের তাবে আনেন বটে কিন্তু ১৬২৪-সালে এক যুদ্ধে শাহজাহানের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে দক্ষিণে পালিয়ে যান (যদুনাথ, সরকার, ১৯৭৩, নাথান, মির্জা, ১৯৩৬, খণ্ড ৩)।

তবে দিল্লি থেকে বিশাল ফৌজ নিয়ে মোগল সম্রাটের মনোনীত মহাব্বত খান যখন বাংলায় এসে পৌছান, দরাব খান শাহজাহানকে ছেড়ে অতি দ্রুত সম্রাটের দিকে ঢলে পড়েন। প্রতিদান হিসেবে মহাব্বত দরাবের শিরশ্ছেদ করেন এবং তাঁর ছিন্নমুণ্ড দিল্লির সম্রাটের কাছে পাঠান (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ২০৩)।

মহাব্বত কিন্তু পরে স্বাধীন বাংলার শাসক হওয়ার চেষ্টা করেন। দিল্লিতে তিনি তাঁর রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ করেন। তখন, সম্রাট, তাঁর সম্পত্তি ক্রোক করার হুকুম দেন। ওই টালমাটাল সময়ে বাংলার মহাব্বত খান জাহাঙ্গিরের কাছে যান কিন্তু পুরো রাজস্ব মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সম্রাট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অসম্মত হন। ব্যর্থকাম মহাব্বত ফের দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

মহাব্বতের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন সুবেদারের পদ থেকে তাঁর পুত্রকে হটিয়ে মুকররম খানকে বাংলার প্রশাসক করা হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর জলযান

বন্যায় তলিয়ে গেলে ফিদাই খানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।[১৮] এই ঘটনার আগেই, ১৬২৭ সালে সম্রাট জাহাঙ্গিরের মৃত্যু হয় এবং তাঁর বিদ্রোহী পুত্র শাহজাহান মসনদ দখলের জন্য রাজধানী অভিমুখে রওনা হন। তিনি ফিদাই খানের স্থানে কাসিম খানকে চটজলদি বাংলার শাসকের পদে বসিয়ে দেন। কাসিম খান ১৬৩২-এ পোর্তুগিজদের হুগলি থেকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরই তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর অপদার্থ উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রশাসক হয়ে বসেন ইসলাম খান। তিনি অবশ্য বেশ শক্ত হাতেই লাগাম ধরেছিলেন এবং অসমিয়াদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু সম্রাটের উজির হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয় (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫)।

এর ফলে শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ সুজা বাংলার শাসকপদে নির্বাচিত হন। শাসনের মধ্যবর্তী পর্যায়ের দুটি বছর বাদ দিলে ১৬ বছর তাঁকে এই কাজ চালাতে হয়। ওই দুবছর শাসক ছিলেন ইতাকাদ খান।

শাহজাহান রাজমহলকে বাংলার নতুন রাজধানী বলে ১৬৫৮-য় ঘোষণা করেন এবং গোটা দেশে নতুন রাজস্বনীতি প্রণয়ন করেন। শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁর পুত্ররা যখন দিল্লির মসনদ দখল করার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হন, তখন সুজাকেও বাংলার শাসকের পদ ছেড়ে তড়িঘড়ি দিল্লি অভিমুখে ছুটে যান। কিন্তু লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে তিনি আরাকান রাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আরাকান রাজ প্রথমে তাঁকে সাদরে আশ্রয় দিলেও পরে তার মতিগতি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। সুজা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছেন এহেন অনুমান করে শেষমেশ তাঁকে হত্যা করেন।[১৯]

ঔরঙ্গজেবের সেনানায়ক মীরজুমলা, যিনি শাহ্ সুজাকে পরাস্ত করেছিলেন, তিনি মুয়াজুম খান খান-ই-খানান এই পদবি নিয়ে শাহ সুজার (১৬৫৮-১৬৬৩) স্থলাভিষিক্ত হন। মীরজুমলা আসাম ও কুচবিহারকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে আমরা দেখব যে বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়।

তাঁর উত্তরাধিকারী এবং সম্রাটের কাকা শায়েস্তা খান ২৫ বছর (১৬৬৩-১৬৮৮) বাংলা শাসন করেন। এই শাসনপর্বের মাঝখানে দু'বছর, ১৬৭৬ থেকে ১৬৭৯ আজিম খান এবং যুবরাজ মহম্মদ আজিম শাসকের কাজ করেছিলেন। শায়েস্তা খানের সামরিক সাফল্যের একবড় দৃষ্টান্ত ১৬৭০ এর দশকে—আরাকান রাজকে পরাস্ত করে চট্টগ্রামকে স্ব-নিয়ন্ত্রণে আনা। এর ফলে তিনি আরও সফলভাবে ওই উপকূল-সংলগ্ন অঞ্চলে মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের খুন-ডাকাতির মোকাবিলা করেন। তাছাড়া ১৬৮০র দশকে তিনি ইংরেজদের হুগলি, হিজলি ও অন্যান্য অঞ্চলে পরাজিত করেন। (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ২২৭-২২৮)।

শায়েস্তা খানের স্থলাভিষিক্ত নবাব ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-১৬৯৭) ইংরেজ কোম্পানিকে বাণিজ্য করার ও ফেরার অনুমতি দেন। দেশের অভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রদানে ছাড় দিয়ে বার্ষিক ৩০০০ টাকা করের বিনিময়ে বাণিজ্য চালাতে অনুমতি দেন। এই সময় আফগান নেতা রহিম শেখের সহায়তায় শোভা সিংহ[২০] বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ ইংরেজদের একটি অজুহাত দিল দুর্গ বানাবার। কিন্তু পরে

সেটাই বাংলার সুলতানের সঙ্গে তারও সম্পর্ক তিক্ত করে দিল। (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২)।

মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উত্তরসূরিদের শাসন-পর্ব

ইব্রাহিম খানের উত্তরাধিকার বর্তাল সম্রাটের পুত্র যুবরাজ আদিম ওসমান-এর (১৬৯৭-১৭০৭) ওপর। কিন্তু বাংলায় আসল ক্ষমতা রয়ে গেল দেওয়ান মুর্শিদকুলির হাতে। নবাব আক্রামের চক্রান্তে নিহত হওয়ার আশঙ্কায় মকসুদাবাদে প্রধান কার্যালয় সরিয়ে আনেন এবং পরে স্থানটি মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ একজন জবরদস্ত প্রশাসক ছিলেন। নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য একবার সমস্ত জায়গিরদারি ওড়িশায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। যদিও যুবরাজ আজিম শেষ পর্যন্ত ১৭৭০৭ সালে মুর্শিদাবাদে রাজধানী করেন। তা সত্ত্বেও আসল ক্ষমতা মুর্শিদকুলি খাঁর হাতেই থেকে যায়। তিনি তার আমিন ও শিকদারদের দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ রাখতেন যাতে বছর বছর দিল্লিতে পাঠানে তার রাজস্ব বেড়ে যায়। এইভাবে তিনি মোগল শাসকদের অনুগ্রহভাজন হন।

১৭২৫ সালে মুর্শিদকুলির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তার সন্তানরা খাজনা আদায়ের ব্যাপারে সচেতন হন। মুর্শিদকুলির সন্তান সুজাউদ্দিন খান চোদ্দো বছর নবাব ছিলেন। যুবরাজ আজিম ১৭০৭-এ রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর করেন (করিম, আবদুল, ১৯৬৪, ১৬-১৮)।

মুর্শিদকুলি খানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান—রাজস্বনীতির সার্বিক পরিবর্তন। কলমের এক খোঁচায় তিনি বাংলার সব জায়গিরগুলি বাংলা থেকে হটিয়ে ওড়িশায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। বছরের পর বছর রাজস্ব প্রদানের বাড়িয়ে তিনি দিল্লির সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়ে ওঠেন, এবং স্বামীর জমিদারদের বিরাগভাজন হন। ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যুবরাজ আজিম তাঁর পিতা শাহ্ আলমের পর নিজেই সম্রাট হন। ফলে, যদিও তথাকথিত অর্থে তিনি বাংলার শাসক বলে বহুবছর চিহ্নিত ছিলেন, তবু মুর্শিদাবাদকে রাজধানী করে নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করলেন মুর্শিদকুলি খান।

মুর্শিদকুলি খাঁ এক জবরদস্ত প্রশাসক ছিলেন। শোনা যায় যে তিনি ভিত্তিতে তাঁদের আয়কে সঙ্কুচিত করেছিলেন। তাঁর রাজস্ব আদায়কারী অমিনরা প্রতিটি গ্রামে শিকদার ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের পাঠাতেন চাষের ও ডাঙা জমির মাপজোক করতে, প্রজাদের তাকাভি বা কৃষি ঋণ দিয়ে ওই জমিতে চাষাবাদ, ফসল ফলানোর বিনিময়ে খাজনা আদায় করার জন্য। তবে, খাজনা আদায়ের ব্যাপারে মুর্শিদকুলি এতই কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন যার ফলে যারা খাজনা বকেয়া রাখত, তাদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হত।[২১] এর ফলে বহু হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ২৫৮)।

১৭২৫-এ মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর পর পুত্র সুজাউদ্দিন খান নবাব হিসেবে ১৭৩৯ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৪ বছর রাজত্ব করেন। সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খান এক বছর রাজত্ব করার পর তাঁর সেনানায়ক আলিবর্দি খানের হাতে নিহত হন এবং আলিবর্দি

দক্ষতার সঙ্গে পরবর্তী ১৬ বছর রাজত্ব চালান। কিন্তু তাঁর শাসনপর্বে মারাঠা বর্গিদস্যুরা বারবার বাংলায় হানা দেয় এবং দিল্লির সম্রাটের কাছে বাংলার শাসকের দেয় রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ 'চৌথ' হিসেবে দাবি করে বসে। এহেন হানাদারি চলে ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত। শেষে আলিবর্দি তাদের প্রতি বছর ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন এবং মারাঠাদের হাতে ওড়িশা ছেড়ে দেন। বর্গিদের সঙ্গে ঘন ঘন সংঘাত বাংলার বহু অঞ্চলে রীতিমতো দুর্যোগ নিয়ে আসে এবং প্রতিশ্রুত চৌথদানের জন্য আলিবর্দিকে আরও কঠোর ভাবে ব্যবসায়ী ও বণিকদের ওপর চাপের সৃষ্টি করতে হয়। ১৭৫৬-তে আলিবর্দি খানের মৃত্যু হলে তার নবীন ও অনভিজ্ঞ দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হন। ১৯৭৬-এ তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কলহের ফলে তাদের আস্তানা কলকাতা দখল করে নেন। পরের বছর একদিকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনী ও অন্যদিকে তাঁর নিজের বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের যোগসাজশে পলাশির যুদ্ধে পরাস্ত হন। এভাবেই বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনপর্বের সূত্রপাত হয়।

মন্তব্য

১. হারুন অল রুশিদের, ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের, একটি রুপোর টাকা পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষে মিলেছে।

২. বখতিয়ার খিলজি ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী। ভারতে আসার আগে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ মেলেনি। সাহাবুদ্দিন ঘোরির বাহিনীতে যোগ দিতে গেলে, খর্বাকৃতির জন্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ভারতে সমর জীবিকার সন্ধানে এসে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের কাছেও প্রত্যাখ্যাত হন। ১১৯৭ সালে তিনি অবধ-এর সুবেদারের বাহিনীতে স্থান পান—সুবেদার তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে পূর্ব সীমান্তে নিয়োগ করেন। সেখান থেকে বিহার পৌঁছে, নিজের সামরিক সাফল্যের বলে, বহু খিলজি সম্প্রদায়ের লোককে সংগঠিত করেন। ১১৯৯ সালে তিনি ওদন্তপুরি বিহার দখল করেন। বৌদ্ধ মঠকে দুর্গ ভেবে তিনি বিহার লুঠ করেন এবং এখানকার মুণ্ডিত শির শ্রমণদের হত্যা করেন। মঠের মধ্যে পুথির সম্ভার দেখে তিনি বিষয়টি জানতে চেয়ে কোনও ব্যক্তির খোঁজ করেন। কিন্তু সত্য জানাতে কেউ সেখানে বেঁচে ছিলেন না। পরের বছর তিনি লুঠ করেন বিক্রমশীলা বিহার (মিনহাজু-এস সিরাজ ১৯৬৯ : ৩৯৬ : সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ১-৪)।

৩. এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ৫)।

৪. "১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে তিনি সহসা নদিয়া নগরে হাজির হলেন, বাহিনী পড়ে রইল পিছনে। বখতিয়ার কাউকে মারধর করলেন না, বাড়াবাড়ি করলেন না, শান্তভাবে নগরে প্রবেশ করলেন, কেউ সন্দেহই করল না। পথচারীরা তাঁকে ঘোড়া বেচতে আসা বণিক ভাবল। এইভাবে, রাজা লক্ষ্মণের প্রাসাদের সিংহদরজায় পৌঁছে, তাঁরা তরবারি বার করে আক্রমণ করলেন। রাজা তখন খেতে বসেছেন। সোনা রুপার বাসনে থরেথরে সুখাদ্য সাজানো রয়েছে। হঠাৎ চিৎকার ভেসে এল। কিছু বুঝে উঠবার আগেই বখতিয়ার প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন—বেশ কিছু লোকের তরবারির আঘাতে প্রাণ গেল। রাজা খালি পায়ে, ধনসম্পদ ফেলে, রানিদের ফেলে প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে পালালেন। সব ধনসম্পদ, দাসদাসী, রানিরা বখতিয়ারের দখলে এল। বখতিয়ারের বাহিনী যখন

পৌঁছাল, গোটা নগর তখন তাদের দখলে। বখতিয়ার এই শহরেই ঘাঁটি তৈরি করলেন (মিনহাজু-এস সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩০৯)।

৫. কামরূপের রাজা তাঁকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার তাঁর উপদেশ মানেননি। তিনি কোচ এবং মেচ সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে শারীরিক প্রকৃতিতে তুর্কিদের মিল দেখেছিলেন। একজন মেচ-কে ধর্মান্তরণও করেন। একটি গুরুতর সংঘর্ষের পর তিনি আক্রমণের সিদ্ধান্ত পালটান। বখতিয়ার খবর পান করমবতান নামে একটি শহরে ৩৫০০০ তুর্কি সৈন্য তাঁর বাহিনীর প্রতিরোধ করতে তীর-ধনুক নিয়ে প্রতীক্ষায় আছে। পশ্চাদপসরণের সময় বখতিয়ার দেখলেন ব্রহ্মপুত্রের উপর সেতুটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হতে গিয়ে তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য প্রাণ হারাল অথবা কামরূপের সৈন্যদের হাতে নিহত হল। কামরূপের রাজা, বখতিয়ার বাহিনীর রসদে টান দিতে পোড়া মাটি নীতি নিয়েছিলেন। দেবকোটে ফেরার পর নিহত সৈনিকদের স্ত্রীরা তাঁকে অপমান করে (মিনহাজু-এস সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩১১-৩১৩)।

৬. "রায় লক্ষ্মণ সাকনাতের (সম্ভবত জগন্নাথ অর্থাৎ ওড়িশা-লেখক) দিকে গেলেন আর গেলেন বাংলায় (সম্ভব পূর্ব বাংলা-লেখক)। এখানে তিনি মারা যান। বাংলার এই অংশে তাঁর পুত্ররা রাজত্ব করেন" (মিনহাজু-এস. সিরাজ. ১৯৬৯ : ৩০৯)। ১২৬০ সাল পর্যন্ত সেন বংশ পূর্ব বাংলা শাসন করেছে (ব্লকমান, এইচ, ১৯৬৮ : ৪)।

৭. অন্য একটি বিবরণীতে দেখা যায়, ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধের পর ইলিয়াস শাহ নদী পথে সোনারগ্রামে এসে ফিরোজ শাহকে আচমকা আক্রমণ করে হত্যা করেন (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ১০৪)।

৮. ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর অ-মুসলমান গুরু ভবানীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গুরুর শেষকৃত্যে যোগ দেন। নিরাপদে দুর্গে ফেরার আগে তিনি দিল্লির সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি (সালিম, গোলাম, হোসেন, ১৯৭৫ : ১০২)।

৯. তাঁব জন্ম মক্কায়, এক ইমামের ঘরে। পিতা ছিলেন মক্কার শেরিফ, তরমুজের বাসিন্দা। ঘটনাচক্রে তিনি বাংলায় আসেন এবং চাঁদপুরে বাস করেন। এর বাইরে, তিনি কীভাবে খোজা সম্রাটের দরবারে নিযুক্ত হলেন বা কীভাবে গুরুত্ব অর্জন করলেন, সে সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় না (সালিম,গুলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ১৩)।

১০. হুসেন শাহের মতো ভালো শাসকও নবদ্বীপের অধিবাসীদের ভয় দেখালেন। তাঁর কাছে খবর ছিল নবদ্বীপবাসীরা ব্রাহ্মণ্যশাসন ফিরিয়ে আনতে চক্রান্ত করছে। যখন অনুভব করলেন যে ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন-ভয় দেখানো বন্ধ হল (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৬৬৪)।

১১. তার ভণ্ডামি দিল্লি সহ্য করেছিল, বোকা বনেনি। আবুল ফজলের মন্তব্য, 'ভণ্ড হলেও সে বাধ্য। দরবারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সে ঘনঘন আবেদন পাঠায়-উপহার দেয়' (বেভেরিজ, এইচ, ১৯৭৭, খণ্ড ৩ : ২৮)।

১২. তার ঘোড়া কাদায় আটকে যায়। তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ করা হয়। আবুল ফজলের বিবরণীতে রয়েছে, তার সৈন্যরা বীরদর্পে লড়াই করেছিল (বেভেরিজ, এইচ, ১৯৭৭, খণ্ড ৩ : ২৫৫)।

১৩. মোগল বাহিনীর সেনানায়করা ছিল চুগতাই। একজন কুইজিবাসের অধীনে যুদ্ধ করতে তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু অমুসলমান টোডরমলকে তারা মেনে নিয়েছিল (বেভেরিজ, এইচ, ১৯৭৭, খণ্ড ২ : ২৫০)।

১৪. বিদ্রোহী পাঠান বা মোগলদের মতো, বারো ভুঁইঞাদের সঙ্গে সংঘাতের বিষয়ে একজন মোগল সেনাপতির বিবরণী মেলে (নাথান মির্জা, ১৯৩৬)। বোঝা যায় যে, এদের প্রতি মোগলদের ব্যবহার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। মোগলদের বশ্যতা মেনে নিয়ে নজরানা দিলেই তাঁরা মিটমাটে রাজি ছিলেন। বারো ভুঁইঞার একজন, যশোরের প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগলদের ব্যবহারেই তার প্রমাণ মেলে। ইসলাম খানের কাছে তাঁকে নিয়ে এলে, 'সুবেদার তাঁকে সম্মান বস্ত্র, ঘোড়া এবং তরবারির কারুকার্য শোভিত খাপ দিয়ে অভ্যর্থনা জানান, প্রতাপাদিত্যকে একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি করে নেওয়া হয়।' এছাড়াও তাঁকে কিছু ইরাকি ও তুর্কি ঘোড়া, 'একটি মদ্দা ও একটি মাদি হাতি এবং রাজকীয় উপহার দেওয়া হয়।' বদলে প্রতাপাদিত্য, তাঁর পুত্র সংগ্রামাদিত্যের নেতৃত্বে ৪০০টি নৌকা-সহ একটি নৌবহর সম্রাটের বাহিনীতে পাঠাতে সম্মত হন (নাথান, মির্জা,১৯৩৬, খণ্ড ২,অংশ ১ : ২৭-৩৪)।

১৫. সম্রাটসুলভ আচার-আচরণ শুরু করার পর, সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে অপসারণ করেন (রায়চৌধুরী, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ৮)।

১৬. মির্জা নাথানের মতে, তাঁকে ভাতি (পূর্ব বাংলা)-র সুবেদার করা হয় এবং পাঁচ হাজার ঘোড়া-সহ ছয়হাজারি মনসবদারিতে উত্তীর্ণ করা হয় (নাথান, মির্জা, ১৯৩৬, খণ্ড ২, অংশ ৪ : ৭০৯)।

১৭. সম্রাট, তাঁর প্রধান দায়িত্ব নির্দেশ করেছিলেন যে, প্রতি বছর সম্রাটকে ৫ লক্ষ টাকা এবং সম্রাজ্ঞীকে সম পরিমাণ টাকা দিতে হবে (রায়চৌধুরী, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ৫)।

১৮. অন্য একটি বিবরণী অনুসারে ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০—এই ২১ বছর।

১৯. পরাজয়ের পর সুজা আরাকানে আশ্রয় নেন, আরাকান রাজ তাঁকে স্বাগত জানান। কিন্তু পরে, অজানা কারণে, আরাকান রাজের মত পাল্টায়-তিনি সুজাকে আরাকান ছাড়তে বলেন। বর্ষার জন্য সুজা আরও কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন। আরাকান রাজ তখন সুজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান—সুজা রাজি হননি। এর ফলে রাজা ক্রুদ্ধ হন। তাঁর সন্দেহ হয় যে সুজা আরাকান দখল করতে চাইছেন। এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে তিনি শাহ সুজা ও তাঁর বাহিনীকে হত্যা করে সুজার কন্যা পরিবানুকে জোর করে বিয়ে করতে যান, পরিবানু আত্মহত্যা করেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৮৩১-৮৩২)।

২০. বর্ধমানের জমিদার কিষেণরামকে হত্যার পর, তাঁর এক কন্যাকে ধর্ষণে উদ্যত শোভা সিংহ-কে সেই কন্যা সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে হত্যা করে (সালিম, গোলাম হোসেন, ১৯৭৫ : ২৩৩)।

২১. "মাস শেষ হয়ে এলেই তিনি খালসা আর জায়গির সংক্রান্ত সব চুক্তিপত্র বাজেয়াপ্ত করতেন। সম্রাটের খাজাঞ্চিখানায় বকেয়া অর্থ জমা না পড়া পর্যন্ত তিনি চিহেল সাতুন প্রাসাদের দিওয়ানখানায় সমস্ত মুতাসাদিস্, আমিল, জমিদার আব কানুনগোদের ত্রস্ত করে রাখতেন। দেনাদারদের খাওয়াদাওয়া, প্রাকৃতিক প্রয়োজন, জলপানেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হত। বকেয়া আদায়কারী কর্মচারীদের পেছনেও গোয়েন্দা লাগানো হত, যাতে তারা ঘুষ খেতে না পারে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের অভুক্ত রাখা হত, চাবুক মারা হত" (সালিম, গুলাম হুসেইন, ১৯৭৫ : ২৫৮)।

৩.২

তুর্ক-আফগান আমলে রাষ্ট্রক্ষমতা ও ভূমিব্যবস্থা

মুখবন্ধ : তুর্ক-আফগান শাসনে ভূমিব্যবস্থা

১২০৪ সালে তুর্ক-আফগানদের বাংলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিব্যবস্থা পাল্টায়নি। নতুন শাসকেরা প্রধানত যোদ্ধা হিসেবেই এসেছিলেন। কৃষিকাজ বা বাণিজ্যের দিকে তাঁদের খুব একটা নজর ছিল না। এরা মুখ্যত নগরাঞ্চলে থাকতেন। গ্রামে বিক্ষোভ দেখা দিলে সেখানে ধাওয়া করতেন, তা ছাড়া নয়। গ্রামের প্রশাসন চালাতেন স্থানীয় রাজারা সাবেক প্রথায়। গ্রামের সাধারণ মানুষজনের কাছে একমাত্র তাদের চাষাবাদ করা জমি ও উৎপাদিত পণ্য থেকে রাজস্ব আদায়কারী অবাঞ্ছিত শক্তি ছাড়া শাসকদের অন্য কোনও অস্তিত্ব ছিল না।[১]

শাসকদের মধ্যে যিনি নির্মমতম, তিনিও এটা বুঝতেন যে একটা অঞ্চল জয় করা সহজ কিন্তু বিজিত প্রজাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য রক্ষা করা খুব কঠিন। তুর্ক-আফগান শাসনপর্বের প্রথম পর্যায়ে শহরে ঘাঁটি গেড়ে বসা আক্রমণকারী হানাদার শক্তি ও গ্রামাঞ্চলের ভূস্বামীদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সরু সুতোর ওপর ঝুলছিল বলা যায়।

তুর্ক-আফগান শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫১৯)। তাঁর সভায় মুসলমান ধর্মগুরুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধান রাজকর্মচারী হিসেবে হিন্দুদেরই নিয়োগ করা হত।

এই অধ্যায়টিকে দশটি অংশে ও তিনটি পরিশিষ্টে বিন্যস্ত করা হয়েছে — (১) তুর্ক-আফগান শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য; (২) মোগল আমলের জমি ও কৃষি-ব্যবস্থা; (৩) বাংলার ক্রীতদাস- প্রথা পর্যালোচনা; (৪) বাংলার সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তুলনা; (৫) বাংলায় কৃষক-সমাজের শ্রেণিবিন্যাস; (৬) প্রাক্-পলাশি বাংলায় এই বিন্যাসের চরিত্র; (৭) ইউরোপীয় বণিককুল এদেশে আসার পর এবং নদীর গতিপ্রবাহ পরিবর্তনের, ফলে বাংলার কৃষিকাজের নতুন ধরনের বিন্যাস; (৮ ও ৯) আমাদের প্রশ্ন — প্রাক্-পলাশি বাংলায় জোতদার, ভাগচাষি এবং ভূমিহীন খেতমজুরদের অস্তিত্ব ছিল কি না; (১০) গোটা পর্যালোচনা সারাংশ। তা ছাড়া এই অধ্যায়ের তিনটি পরিশিষ্ট অংশে ছোটখাট গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র, উৎপাদনের এশীয় পদ্ধতি এবং জোতদার হিসেবে একটি শ্রেণির উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মোগল আমলে ভূমিব্যবস্থা

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি কীভাবে বাংলার বারো ভুঁইঞাদের পরাস্ত করে সম্রাট আকবর গোটা প্রদেশ অধিকার করেন। একবার মোগল প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলে তাঁদের অন্যান্য সামন্ত্রতান্ত্রিক অধিকার মেনে নিতে মোগলদের দ্বিধা ছিল না। জাহাঙ্গিরের আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু রাখা হয়েছিল। তবে ঔরঙ্গজেবের আমলে

এঁদের ক্ষমতাকে নতুন আইনে সংকুচিত করা হয় (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩: ২০-২৩)। প্রসঙ্গত আকবরের রাজস্বনীতি বিশেষত টোডরমলের প্রবর্তিত বাংলায় ১৫৮৩-র সুখ্যাত বন্দোবস্ত-র কথা উল্লেখ করতে হয়। দিল্লির সঙ্গে বাংলার ভূস্বামীদের জমি ও রাজস্ব সম্পর্ক বিলি-বাঁটোয়ারার নতুন ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের রচনাতেও (সিংহ, এন. কে. ১৯৬৮)।

১৫৮৬-তে সম্রাট একটি ডিক্রি জারি করে সবকটি প্রদেশে শাসনের সমতা আনার জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিলেন একজন সিপাহ্‌সালার (প্রশাসনিক), একজন বক্সি (সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক), একজন সদর কাজি এবং কোতোয়ালের হাতে (সরকার, জগদীশ নারায়ণ, ১৯৭২)।

বাংলার সুবেদার বা নাজিমের পদ ছিল খুবই লোভনীয় এবং রাজপরিবারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের জন্য পদটি রক্ষিত হত। কিন্তু তাঁরও যোগ্যতার পরিমাপ করা হত, সীমার ওপরেও অতিরিক্ত কতখানি রাজস্ব আদায় করে তিনি রাজধানীতে পাঠাতে পারেন। এই সুবেদাররা যখন অন্য প্রদেশে বদলি হতেন, তার আগে যতটা পারবেন নিজেব আখেরও গুছিয়ে নিতেন। আমরা আগের অধ্যায়েই দেখেছি, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করলে এবং স্বশাসন কায়েম করার জন্য উদগ্রীব হলে সুবেদার বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কীভাবে দ্রুত বদলি বা পর্যুদস্ত করা হত। তাঁর বা তাঁদের ক্ষমতার ডানা ছাঁটাই করে দিল্লির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার অধিকার অন্য কোনও প্রবীণ রাজকর্মচারীদের হাতে তুলে দেওয়া হত। তাছাড়া মৃত শাসকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও ছিল সম্রাটের হাতে (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩: ৯-১০)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেনানায়কদের নিচের পদেই থাকতেন ফৌজদাররা। ফৌজদাররা সরকারি আইনকানুন চালু রাখার ব্যাপারেও নজর রাখতেন এবং খাজনা প্রদানে অসমর্থ ছোট ছোট ভূস্বামীদের ওপর জুলুম খাটাতেন (ফারমিঙ্গার, ওয়াল্টার কেলি, ১৯১৭)। রাজ্যের অঞ্চলগুলিকে সরকার ও পরগনা হিসেবে চিহ্নিত করা হত। ফৌজদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকত সরকার এবং শিকদারদের নিয়ন্ত্রণে পরগনাগুলি। থানাদারদের হাতে ছিল থানাগুলি। আইনের রক্ষক কাজি জিনিসপত্রের দরদামও নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এক একজন কোতোয়ালের আওতায়। ক্রোড়ীরা রাজস্ব আদায় করতেন। তবে নিচুতলার কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যহার না করা পর্যন্ত— তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে ওপরওয়ালারা খুব একটা মাথা ঘামাতেন না (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ১০-১৭; ফারমিঙ্গার, ওয়ালটার কেলি ১৯১৭)।

জমির একটি অংশকে বলা হত খালিফা। এগুলি প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগের দ্বারা সরাসরি পরিচালিত হত। কখনও কখনও এই অঞ্চলগুলিকে মুস্তাফির বা রাজস্ব আদায়কারী কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হত এবং তারা আদায়ীকৃত অর্থ সরাসরি রাজদরবারে জমা দিত। ফৌজদার, ক্রৌড়ী ও গ্রাম-প্রধান চৌধুরিরাও প্রয়োজনে এই কাজে তাদের সহায়তা করতেন (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ২৫, ২৮)।

রাজকর্মচারীদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গির হিসেবে কয়েকটি অঞ্চল নির্দিষ্ট হত। মনসবদারদের হাতে এই এলাকাগুলো তুলে দেওয়া হত এবং মাস মাইনের

বদলে ওইখান থেকে আদায়ীকৃত অর্থেই তাঁরা জীবনযাপন করতেন। এ ছাড়া দেশের বাকি জমিগুলো জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকত। হিন্দু ও আফগান জমিদাররাই ছিলেন সবকিছু দেখভালের মালিক। তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব ও খাজনা আদায়ের জন্য যে যার ইচ্ছেমতো নিজ নিজ এলাকা শাসন করতেন। তবে প্রজাদের হিতের জন্য তাঁদের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। জানা যায়, একজন অত্যাচারী জমিদার ৭৫০টি কৃষক পরিবারকে ভূমিদাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। অনেক জমিদার আবার অন্যের জমি আত্মসাৎ করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। ফলে জমিদারে-জমিদারে কাজিয়া লেগেই থাকত। জমির খাজনা ছাড়াও প্রজাদের ওপর নানা রকমের কর ধার্য করতেন এঁরা, যে কোনও ছুতোয় তাদের কাছ থেকে ভেট আদায় করতেন। এ-সবের ওপর ছিল সেলামি, বিভিন্ন পালা-পার্বণে পার্বণী ও নিয়মিত তোলা আদায় (ওই, ১৯৫৩ : ২১-২৩, ৩১-৩৪)।

বড় জমিদাররা দেশের প্রশাসকের হাতে সরাসরি খাজনা জমা দিলেও ছোট ভূস্বামী বা চৌধুরিরা কয়েকজন মিলে সেই অর্থ তুলে দিতেন আমিল-এর হাতে। আরও নিচুতলায় রাজস্ব-প্রশাসন চালাতেন কানুনগো এবং পাটোয়ারিরা। এঁরা প্রজাদের কাছ থেকে সুদসহ ঋণ আদায় করা ছাড়াও গ্রাম-জীবনের চাষাবাদ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জীবনযাপনেরও খবরদার ছিলেন (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ২১)। এইভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসন দেশময় দুটি সমান্তরাল প্রবাহের মতো বহমান ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় ঠিক থাকছে, স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের প্রজাকুলের ওপর যাবতীয় অত্যাচারের দিকে চোখ বুজে থাকত কেন্দ্রীয় প্রশাসন (ফারমিঙ্গার, ওয়াল্টার কেলি, ১৯১৭)।

ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ও জমির সঠিক মাপজোক খুব কমই হত, সুফসলা জমির দিকেই থাকত শাসকদের চোখ। কৃষক ছাড়া অন্যান্য জীবিকার মানুষজনের কাছ থেকে ও নানা পদ্ধতিতে মাসুল নির্ণয় করা হত (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ২৫, ৩৫)।

জমিদারকুল এবং জমির মালিকানা-সংক্রান্ত বিষয়

কে জমির মালিক? রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে জমির মালিক হচ্ছে গ্রামের জনসাধারণ এবং সেই জমি গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিধান ছাড়া হস্তান্তর করা যেত না (মুখার্জি, রামকৃষ্ণ, ১৯৫৭; রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩)। কেউ কেউ মনে করেন, খোদ সম্রাটই ছিলেন জমির মালিক। দেশ ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে আসার প্রাক্-পর্বে রাজা রাজবল্লভের মতো বিশিষ্ট অভিজাতবর্গ এহেন অভিমত পোষণ করতেন (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ১৩; হাবিব, ইরফান, ১৯৬৫)।

কীভাবে সময়ের ও জীবিকার পরিবর্তন ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জমির ব্যবহারের চরিত্র পালটে যায়, ইতিপূর্বে তা আলোচনা করা হয়েছে। মনে করুন সে সব দিনের কথা যখন রাজা, রাজ্য, কৃষিকাজ, চাষের যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না। আদিকালের মানুষজন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জঙ্গল নিকেশ করে বসতি গড়ত, ও ফলমূল খেয়ে থাকত। ব্যক্তি-মালিকানা বলতে কিছু ছিল না। ছিল না রাষ্ট্র, নির্দিষ্টভাবে বসবাসের অঞ্চল এবং সম্প্রদায় বলে আখ্যাত কিছুর অস্তিত্ব। বাঁচার তাগিদে মানুষেরা কয়েকজন একজোটে

এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াত, পরিবার, বিবাহ ইত্যাদি কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা কিছুই তখন চালু হয়নি।

পরবর্তীকালে চাষের উদ্ভব ও ধাতুর ব্যবহার এবং চাল বা গমের আবিষ্কারের পর, মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে যখন উদ্বৃত্ত হতে লাগল, তখন বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব ঘটল। ক্ষমতাবানরা রাজ্য গড়ে তুলল এবং বাইরের শত্রুদের মোকাবিলায় নেমে পড়ল। জমির মালিকানা ব্যক্তি নয়, পরিবারের হাতে ন্যস্ত হতে লাগল এবং গোষ্ঠী নয়, পরিবারের কর্তাদের প্রভুত্বই হয়ে উঠল মুখ্য। কিন্তু গ্রামকে স্বনির্ভর করতে গোষ্ঠীপতিদের বাদ দেওয়া গেল না। এই গোষ্ঠীপতিরাই ঠিক করতেন যে কীভাবে গ্রামের দাস বা কারিগরদের নগদে অথবা অন্যভাবে কাজের দাম চুকিয়ে দেওয়া হবে। ব্যক্তি-মালিকানা নির্দিষ্ট হলেও গ্রামের সার্বিক জীবনধারার ওপর গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বাড়তে লাগল এবং নানা জিনিসের উদ্ভাবন ও উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধারাবাহিক পরিবর্তন সামাজিক চরিত্রেও অবশ্যম্ভাবী পালাবদল ঘটতে লাগল।

একটা পর্যায়ে জমির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গোষ্ঠীর হাতে থাকলেও পরিবারের সদস্য-সংখ্যা অনুযায়ী চাষাবাদের ও বসবাসের জন্য জমি দেওয়া হত। প্রথমে এই ব্যবস্থা অস্থায়ীভাবে চালু হলেও পরে তা সুনির্দিষ্ট হতে থাকে। এর পর আসে জমির মাপজোক এবং জমির সীমানা নিয়ে এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের বিসম্বাদ মেটানোর প্রশ্নগুলি। জঙ্গল সাফ করে ক্রমবর্ধমান মানুষের বসতি গড়ে তোলার প্রশ্নে জমির সীমানা এবং জমির ব্যবহার নির্ণয়ের প্রসঙ্গ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। (সিংহ, এস. ডি., ১৯৬৬ : ৩১)।

এই ক্ষমতাসীন শক্তি দুটি ভূমিকা পালন করতে লাগল। রাজস্ব হিসেবে উৎপন্ন শস্যের ভাগ আদায় করা হত একদিকে ব্যক্তি-কৃষক ও কারিগরদের উৎপাদনের খাইখরচা মেটানো এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংঘর্ষ নিরসন করার জন্য। তবু জমির মালিকানা নিয়ে তখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু এই ক্ষমতা যত সংহত হতে থাকল, উদ্ভব হল প্রশাসক ও রাজশক্তির প্রচার করা হল, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। দেশের সবকিছুতেই তাঁর পূর্ণ অধিকার এবং সব বিষয়েই তাঁর সিদ্ধান্ত হল তর্কাতীতভাবে চূড়ান্ত। তিনি যে কোনও কৃষক বা ভূস্বামীকে ক্ষমতাছাড়া করতে পারেন, যার হাতে খুশি জমি অর্পণ করতে পারেন, বেচতে বা দান করতে পারেন, নিজের প্রজাদের দিয়ে জোর করে নিজেই জমি চাষ করাতে পারেন। এককথায় বলা যায়, একজন সাধারণ মালিকের হাতে যা যা ক্ষমতা থাকে, তার সব কিছুই পুরোপুরি রাজা-নামধেয় শাসকটির হাতে অধিকার হিসেবে তুলে দেওয়া হল।

অবশ্য, এই পর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তার চরিত্র ছিল মোটামুটি তাত্ত্বিক। সাধারণ একজন কৃষককে উচ্ছেদ করা হত না এবং রাজ্য-শাসকরা মূলত রাজস্বটুকু ঠিকঠাক পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন। জমি কেনাবেচা, দান করা, রাজস্ব আদায়—এসব ব্যাপারে কৃষক পরিবারগুলিই ছিল সর্বময় (ফারমিঙ্গার ওয়ালটার কেলি, ১৯১৭)। বস্তুত জমির মালিকানার চাইতেও বড় প্রশ্ন ছিল শ্রমের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা। জমির মালিকের পূর্ব অনুমতি ছাড়া মজুররা গ্রাম ছেড়ে যাওয়া বা অন্যত্র চাষাবাদ করার অধিকারী ছিল না।

সর্বোচ্চ ভূস্বামী হিসেবে রাজার প্রভুত্ব প্রধানত নির্ভর করত রাজস্বের এবং প্রজাদের শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের ওপর তাঁর অধিকারের ওপর। তবে নিখুঁতভাবে জমি-রাজস্ব নির্ণয় ও কার্যকর করার ব্যবস্থা এবং এই কাজে বিরাট রাজকর্মচারী বাহিনীর নিয়োগ, যেমনটি ছিল মল্লভূম বা কুচবিহার রাজ্যে, তা যতটা তাত্ত্বিক ততটা বাস্তব ছিল না। রাজাকে কত টাকা দেওয়া হবে তা শুল্ক আদায়কারী ঠিক করত। বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সম্প্রদায়ে এদের চরিত্র ছিল স্বতন্ত্র। খরা ও বন্যার সময় স্বাভাবিকভাবেই আদায় কমে যেত ও ব্যাপক ফসল হলে ভালো আদায় হবে এরকমই প্রত্যাশা করা হত।

রাজস্ব পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে-প্রয়াস চালানো হয়েছে তা কোথাও কার্যকর হয়েছে, কোথাও হয়নি। তুর্ক-আফগান শাসকরা তো প্রধানত গোটা বিষয়টি আঞ্চলিক রাজাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি না হলে তাঁদের বাহিনী হয় লুঠতরাজ শুরু করত না হয় যেভাবে খুশি টাকা আদায় করত। জমিদাররাও জমির ওপর নির্দিষ্ট কর বা রাজস্বের ওপর নানা ছুতোয় প্রজাদের কাছ থেকে অনেক বেশি অর্থ আদায় করতেন। মোগল-শাসনে রাজস্ব বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হলেও দক্ষিণ বাংলার কিছু উন্নত জনবহুল অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তা খুব একটা ফলদায়ক হয়নি (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ১৮)।[২]

আসল কথাটা হল—জোর যার, মুলুক তার। জমিদার, রাজস্ব-আদায়কারী, প্রশাসক—সবক্ষেত্রেই প্রাক্-পলাশি যুদ্ধে এই কথাটাই ছিল চরম সত্য। জমিদাররাই ছিল অভ্যন্তরীণ আইন-কানুনের ও অন্যান্য সামাজিক-ব্যবস্থার রক্ষক। জমিতে জুলুম করে যে সব মজুরদের খাটানো হত তাদের ওপর ভূস্বামীরা 'ফুলবন্দি' নামে অতিরিক্ত কর বসিয়েছিলেন (সিনহা, এন. কে., খণ্ড ২ : ১১৩)। বিপদের সময় কৃষকদের তাকাবী-ঋণ দেওয়া হত ১.৫ শতাংশ মাসিক সুদে (সিনহা, এন. কে, খণ্ড ২)। রাজস্ব আদায় ছাড়াও জমিদারদের নানা খাতে কর আদায়ের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখাতেন। কোনও কিছুতেই প্রজাকে শায়েস্তা করা না গেলে লেঠেল-বাহিনী লেলিয়ে জমিদার তাকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমি বিক্রি, বিলি-বাঁটোয়ারা বা বিক্রির টাকা সনদ হিসেবে সম্রাটকে পাঠানো—ইত্যাদি ব্যবস্থা নিতেন (সিনহা, এন. কে, খণ্ড ২ : ১৪-১৫)।

এই জমিদাররা আসতেন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। এদের কেউ ছিলেন বাংলার সুলতানকে করদাতা নিছক এক গোষ্ঠীপতি, কেউ বা ধারাবাহিক সামন্ত-শাসনের উত্তরাধিকারী। কেউ ছিলেন প্রায়-স্বাধীন নরপতি কেউ বা নবাবের অনুমতি আদায়কারী বণিক (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ১৭-১৯; রায়চৌধুরি, তপনকুমার : ১৭-১৮)।

ওপরের বিবরণী থেকে বোঝা যায় প্রাক্-পলাশি-যুদ্ধ এদেশের ভূমিব্যবস্থা ছিল জটিল ও অস্থির। বড়, মাঝারি ও ছোট মাপের জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল। ছিল সম্পন্ন ও দরিদ্র কৃষক। জমির ওপর জমিদার, নবাব অথবা তাঁর রাজস্ব প্রশাসনের কর্তারা যেখানে যেমন, সেখানে তেমনভাবে কাজকর্ম চালাতেন। তবে জমিদাররাই ছিলেন নিজস্ব ভূখণ্ডের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক এবং তাঁদের শাসন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। দেশের উত্তর, দূর-দক্ষিণ, দূর-পূর্ব এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে, অরণ্যসংকুল এলাকা ও চাষযোগ্য উপত্যকায়,

আদিবাসী ও অজ-আদিবাসীদের উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপুল পার্থক্য পরিলক্ষিত হত। গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিমালিকানার অধিকার অঞ্চলে-অঞ্চলে স্বতন্ত্র চেহারায় বিরাজ করত এবং দেশের শাসকদের বিভিন্ন স্তরের আন্তঃসম্পর্কও সেই অনুযায়ী নির্ণীত হত।

ক্রীতদাস ও দাসপ্রথা

কার্ল মার্কস দাস প্রথাকে সামন্ততন্ত্রের পূর্ববর্তী মানবসভ্যতার বিবর্তনের একটি প্রধান সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে বাংলা সম্পর্কে এই বক্তব্য কতখানি প্রযোজ্য, তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। যদিও ভারত বা বাংলায় দাসপ্রথা অপ্রচলিত ছিল না, সেই প্রথাকে আর একটি সমাজ ব্যবস্থা বলে গণ্য করা যেত না। আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকায় যেভাবে বিস্তীর্ণ দাসপ্রথা প্রচলন করেছিল, বাংলায় তেমনটি হয়নি। বাংলার লোককাহিনি 'দাস' বা 'দাসী' বলতে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ছিল পারিবারিক কাজকর্মে নিযুক্ত। উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে এই পরিচারক-পরিচারিকাদের গণ্য করা হত না (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ২৭০; উইটফোগাল, কার্ল এ, ১৯৫৭ : ২৮৩)।

মার্কস-এর মতে, 'প্রাচীন সমাজব্যবস্থা'-য়, যেমন গ্রিসে ও রোমে, দাসরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ তাদের কোনও স্বাধীনতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বতন্ত্র অধিকার ছিল না। ইতালি এমনকী, লিবিয়াতেও তাদের বিপুলভাবে নিয়োগ করা হত জঙ্গল নিকেশ করে গাছ লাগানো ও চাষাবাদের কাজে। এই ক্রমবর্ধমান দাসশ্রেণির মধ্যে শ্রমের মূল্য নিয়ে অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে চলতে লাগল। দাসদের অনেককেই পরে সামন্তপ্রভুরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক করল। কাউকে এক টুকরো জমি দেওয়া হল। এরই পাশাপাশি কারিগরদের উদ্ভব হল যারা নাগরিক সংঘ নির্মাণ করল এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করল।

পরবর্তীকালে মার্কসবাদীরা বিভিন্ন দেশ ও সমাজের দাস-পরিকাঠামো নিয়ে পড়াশোনা করে দেখেছেন যে, যদিও ইতিহাসে কোনও না কোনও সময়ে দাস নিয়োগ সব দেশেই চালু ছিল, তবু দাসদের কাজে লাগানো এবং মালিক-দাস সম্পর্ক যে সার্বিকভাবে দাসপ্রথা কায়েম করেছিল, সে-কথা বলা যায় না (আমিন, সমির ও রবিন কোহেন, ১৯৭৭ : ২৯)।

পশ্চিম আফ্রিকায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের ভ্রূণাকার রাষ্ট্রগুলিতে দাসেরা ছিল রাজা ও সভার অমাত্যদের গৃহভৃত্য। তারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত না। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি উৎপাদনের কাজ সংগঠিত করত। যদিও পরবর্তীকালে বিভিন্ন 'অধিকৃত গ্রাম'-এর মানুষজনকে প্রভুরা জোর করে খাটাতে শুরু করে তবুও তাকে দাসপ্রথা বলা যায় না (আমিন, সমির ও রবিন কোহেন, ১৯৭৭ : ৩৬)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্যদের মতো দাসেরাও উৎপাদনের ভাগ পেত, পেত একটুকরো জমি যেখানে সে নিজের ও তার প্রভুর হয়ে চাষবাস করত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যে দাসব্যবস্থা চালু করেছিল, বিশেষত বন্দর এলাকাগুলিকে আগত বণিক ও স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের যোগসাজশে যে ব্যবসা রমরমিয়ে চলছিল, তার সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়ের মিল নেই (আমিন, সমির ও রবিন কোহেন, ১৯৭৭ : ৩৭)।

দাস সংগ্রহের জন্য পোর্তুগিজরা বাংলার বন্দরে বন্দরে হানা দিলেও এখানে যে আগে দাসপ্রথা অজ্ঞাত ছিল তা নয়। এ নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকী, বহুপূর্বে পরিব্রাজক ইবনবতুতা যখন এখানে এসেছিলেন তিনি বাংলা বাজারে খুবই সস্তায় দাসদের বিক্রিবাটা নিজের চোখে দেখেন ও লেখেন, "একটি সুন্দরী দাসীকে একটি সোনার দিনার দিলেই কিনতে পাওয়া যেত, মরক্কো-র টাকায় যার পরিমাণ আড়াই দিনার (বতুতা, ইবন, ১৯২৯ : ২৬৭)।

যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল আরব ব্যবসায়ীদের হাতে, এদের কেউ কেউ দাস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বারবোসা লিখে গেছেন, এই শহরের মুর-ব্যবসায়ীরা দেশে দেশে বাপমায়ের বা অন্য লোকজনের কাছ থেকে কিশোরদের ক্রয় করে তাদের খোজা বানিয়ে দেয়, যাতে তারা সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার পর নিজেদের মহিলাকুলের ও জমির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই খোজাদের নিয়োগ করা হয়। এই নপুংসকরা তাদের মালিকদের খুবই বিশ্বস্ত হয়ে উঠত, মুর রাজারা এদের কখনও কখনও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবেও নিয়োগ করতেন। ফলে এরাও একসময় বিপুল বিত্তের ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠত। পর্যটক মার্কো পোলো ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব বিহার ছাড়াও বিচিত্র ভাষায় কথোপকথনকারী এমন একদল নপুংসককে দেখেছিলেন যারা নিজেরাই দাসব্যবসায় লিপ্ত ছিল (পোলো, মার্কো, ১৯৯৩, খণ্ড ২)।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একথা বলা চলে দাসেদের প্রতি মোটামুটি ভালো আচরণ করা হত, যার দৃষ্টান্ত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছিল না (মুখার্জি, অমিতাভ ১৯৬৮ : ২২৫)। তাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হত। এদের মধ্যে যারা উচ্চবর্ণের তাদের নিজস্ব বর্ণ-অনুযায়ী সামাজিক প্রথা পালন করতে দেওয়া হত। তবে এর সবকিছুই নির্ভর করত মালিকদের ওপর, যাদের একাংশ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর চরিত্রের। তারা দাসকুলকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করত। বিশেষত দাসীদের পারিশ্রমিকহীন পতিতাদের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল (চট্টোপাধ্যায়, অমল, ১৯৭৭। তপন রায়চৌধুরির আলোচনায় জানা যায় সম্রাট জাহাঙ্গীর ও আকবরের আমলে জমিদারদের অত্যাচারে দাসেদের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায়, একজন জমিদারের তাঁবে রয়েছে ৭৫০টি দাস পরিবার। পোর্তুগিজরা এদের অনেককে খোলা বাজারে বিক্রি করত এবং ওই বিক্রির দলিলে কাজিদের শিলমোহরের ছাপ থাকত। এদের অনেককে খোজা বানানো হত, যাদের অনেকে পরে ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছিল। সংখ্যায় কম হলেও এদের কেউ কেউ উৎপাদন-ভিত্তিক কাজকর্ম যেমন দর্জির কাজ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হত। হুগলির এক নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ীরা এ জাতীয় ভৃত্যদের নিজের মতো আয় করার অধিকার এবং নিজ আয়ের লভ্যাংশ পর্যন্ত দিতেন (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ৬৮, ১৯৬-১৯৭)।

হিন্দু আইনে ১৫টি ধরনের দাসবৃত্তির অনুমোদন পাওয়া যায়। অনেক পরিবার দুর্ভিক্ষের সময় বাচ্চাদের বেচে দিত এবং ডাকাত, ঠগি ও অন্যান্য লুঠেরা-দুর্বৃত্তরা এদের নিয়ে রীতিমতো ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় আরব থেকে আনা ৫টি আর্মেনীয় কিশোর ও ১৫০ নপুংসককে বাঙালি নারী ও শিশুদের সঙ্গে বিনিময়

করা হচ্ছে। ১৭৫৭-র পর এবং ১৭৮৯-এর আগে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হল বহু ইংরেজ কেনিয়া ও আফ্রিকা থেকে দাস সংগ্রহ করতে লাগল, যাদের চাহিদা ছিল খুবই ভালো (গোপাল, এস, ১৯৪৯)।

এ পর্যন্ত যা কিছু তথ্য জানা গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলা বাদে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের চাইতে পূর্বাঞ্চলে দাসপ্রথা ব্যাপকতরভাবে চালু ছিল এবং এর পেছনেও ছিল ১৭৭০-এর মন্বন্তর, যখন গরিবেরা দুমুঠো অন্নের জন্য সপরিবারে নিজেদের বিক্রি করতে থাকে। এদের সিংহভাগই ছিল গৃহভৃত্য এবং নির্দিষ্টভাবে একজন মালিকেরই আওতাধীন (চট্টোপাধ্যায়, অমলকুমার, ১৯৭৭)।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, ভাড়ার বিনিময়ে শ্রম ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন-সেখানে দাসপ্রথার সঙ্গে সামন্তপ্রথার পার্থক্য, কিছু জমি মালিক চাষিকে দিত। যে জমি মালিক চাষিকে দিত তাকে বলা হত আবশ্যিক জমি, এবং সেই জমির উৎপাদন থেকে সমস্ত কিছু প্রয়োজন চাষি ও তার পরিবার মেটাত। কিন্তু চাষি তারই সঙ্গে সঙ্গে মালিকের জমিতে কাজ করে মালিকের উদ্বৃত্তের প্রয়োজন মেটাত। অর্থাৎ চাষির নিজস্ব কিছু জমি ছিল যা দিয়ে তার প্রয়োজন মেটাত, এবং মালিকের জমিতে সে কাজ করত উদ্বৃত্ত তৈরি করবার জন্য। তার নিজের জমির শ্রমকে যদি আবশ্যিক শ্রম বলি তাহলে মালিকের জমিতে চাষি যে শ্রম দিত তাকে উদ্বৃত্ত শ্রম বলব। অর্থাৎ চাষির শ্রমের দুটো ভাগ ছিল : একটা ছিল আবশ্যিক শ্রম, যা দিয়ে সে খেয়ে পড়ে থাকত, এবং অন্যটা ছিল উদ্বৃত্ত শ্রম, জমিদারের জমিতে, যার ভাগ সে পেত না। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, চাষির সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক ছিল পুরোপুরি ব্যক্তিগত, যার ভিত্তি ছিল মালিকের ওপর চাষির নির্ভরতা এবং মালিকের চাষির ওপর জোর খাটানো। জোরখাটানোর প্রয়োজন ছিল, না হলে চাষি ভূস্বামীর জমিতে কাজ করত না। তখন জমির অভাব ছিল না, কিন্তু শ্রমের অভাব ছিল। তাই শ্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই শ্রমিক সেই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে তাকে আগেভাগে মালিকের অনুমতি নিতে হত। চাষিকে জমির সঙ্গে বেঁধে রাখা তাই এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অন্য দুটি বৈশিষ্ট্য হল প্রথমত, এলাকাভিত্তিক আইন-কানুন চালু রাখা এবং ওপরতলার মালিকদের উপঢৌকন ও আনুগত্য দিয়ে খুশি করে ভূস্বামীদের ইচ্ছেমাফিক কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, সামন্ততন্ত্রের সর্বময়তা বোঝানোর জন্য ধর্মকে কাজে লাগানো।

এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমটির কোনও অস্তিত্ব বাংলা তথা ভারতে ছিল না। এখানে শ্রমের বিনিময়ে নগদে অথবা উপাদানে মজুরি দেওয়ার প্রথা ছিল। অর্থাৎ ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের মতো আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যে বাংলায় পার্থক্য করা হত না। আবশ্যিক শ্রমের বদলে নগদ পয়সা চাষিকে দেওয়া হত। অবশ্য এ থেকে অনেকে এমন সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতে সামন্ততন্ত্র সেভাবে কোনদিনও

ছিল না। কিন্তু আমরা যেভাবে এখানকার সামন্ততন্ত্র ব্যাখ্যা করেছি তাতে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে মেলে।

কিন্তু ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বাকি তিনটি বৈশিষ্ট্য বাংলাতেও বিরাজমান ছিল। কৃষক ও ভূস্বামীর সম্পর্কের একটি প্রধান ভিত্তি ছিল পারস্পরিক নির্ভরতা। এই পরস্পর নির্ভরতার দুটো দিকই ছিল। একজন জমিদার তাঁর প্রজাদের বাইরেকার হামলা থেকে রক্ষা করতেন, জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতেন। এই সেচ থেকেই বোঝা যেত কে ভালো জমিদার আর কে খারাপ। মার্কস উল্লেখ করেছেন : সর্বস্তরের প্রশাসনেরই তিনটি প্রধান দায়িত্ব থাকে — বহিরাগতের লুণ্ঠন থেকে প্রজাদের নিরাপত্তাদান, সেচের ব্যবস্থা করা এবং এই কাজ দুটি অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব আদায় করা (মার্কস, কার্ল, ১৮৫৩ : ৭১)।

বলা বাহুল্য, আইন আর প্রশাসন সবসময় একপথে চলে না। টোডরমল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কারণের যে চেষ্টা করেছিলেন তার আয়তন ছিল সীমাবদ্ধ। দিল্লি থেকে বহুদূরে বাংলায় মোগল সম্রাটের লক্ষ্য ছিল প্রধানত শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে প্রশাসন অর্পণ করে তাঁদের আনুগত্য ও রাজস্ব সুনিশ্চিত করা। মোগলদের আগে তুর্ক-আফগান শাসকরা এই একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মতোই শহরাঞ্চলে বসবাস করতেন। ইউরোপের মতো বাংলাতেও ধর্ম সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মমতকে আঘাত না করার ব্যাপারে সব ক্ষমতাসীন শক্তিই ছিল সতর্ক।

ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো সুদের কারবার বা ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য থেকে মুনাফা অর্জনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। যুদ্ধের সময় বল্লাল সেন-কে সহায়তা না করায় তিনি বণিকদের নিচু জাত বলে. চিহ্নিত করেছিলেন। বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসকে হাতির পিঠে উল্টোমুখে পিঠমোড়া করে বেঁধে চাবুক মারার হুকুম দিয়েছিলেন জালালউদ্দিন এই সন্দেহে যে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কবির আবেগময় সম্পর্ক আছে (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৬৬৩, ৬৭১-৭২।) তবে পাঠকদের মনে রাখতে হবে এই দুটি কিংবদন্তিই ঐতিহাসিকদের দ্বারা অনুমোদিত নয়। বাংলার সামন্ততন্ত্র প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময় থেকে নগরাঞ্চলে কোনও বণিক-সংঘ ও কারিগর-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি। বণিক ও শাসকদের মধ্যেকার সম্পর্কও ছিল অনির্দিষ্ট।

কৃষক-শ্রেণি বিন্যাসের পরিধি

দক্ষিণ বাংলায় পলাশির যুদ্ধের সময় পর্যন্ত যে নানামাত্রিক ভূমি ব্যবস্থা চালু ছিল, সেগুলি ছিল জমিদারদের কঠোর আওতায়। পরিশিষ্ট 'ক' অংশটিতে যে আদর্শ গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এর কোনও তুলনা চলে না। লোকগাথা থেকে জানি, বাংলায় কৃষকদের ওই ধরনের প্রজাতন্ত্র কখনও ছিল না। অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য ছিল। কিছু কৃষক অন্যদের জমিতে চাষবাস করত। উপরন্তু ছিল ভীতিপ্রদ গ্রাম্য সুদখোর ও স্থানীয় রাজস্ব আদায়কারী ডিহিদারের জুলুম (দাশগুপ্ত, বিপ্লব,

১৯৮৪)। জমির কর ও বকেয়া ঋণ শোধ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের জলের দামে ধান ও গোরু বিক্রি করে দিতে হত। মহাজনদের পীড়নের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালানোর কোনও রাস্তা খোলা ছিল না (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ৩-৪)। একটি লোক কবিতায় কবি প্রশ্ন করছেন বানভাসি জমির শস্য নষ্ট হয়ে গেলে তিনি কীভাবে বকেয়া কর মেটাবেন? অন্য এক কবি বর্ণনা করেছেন, ঋণ শোধে অসমর্থ মানুষজনকে ঢাকায় নবাব শায়েস্তা খান কীভাবে সাজা দিতেন। কাউকে চাবুক মারা হত, কাউকে শিঙ্গি মাছে ভরা কুয়োয় নামিয়ে দেওয়া হত, কারও নাকে-কানে শুকনো লঙ্কা গুঁজে দেওয়া হত বা সাঁড়াশি দিয়ে নাক কান ছিঁড়ে নেওয়া হত। এভাবে, জমিদারেরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে রাজস্ব আদায় করতেন। নগর এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সংলগ্ন উন্নত গ্রামাঞ্চলগুলিতেই ধনী ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিশেষ করে পার্থক্য চোখে পড়ত (দাশগুপ্ত, জে. এন., ৬৭)।

গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মুখ্য বৃত্তিই ছিল চাষাবাদ, আর যাই করুক না কেন। (রায়, নীহাররঞ্জন,১৯৯৩ : ২৭৭)। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলগুলিতে, জঙ্গলমহলগুলিতে ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গোষ্ঠীগতভাবে কৃষিকাজ করা হত। কিন্তু গ্রামগুলিতে জমির অধিকার থাকত নির্দিষ্ট মালিকের হাতে। (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩: ২৮৫)।

জমি বিলির নানা ব্যবস্থা

কিছু কিছু কৃষক অন্যদের চাইতে বেশি নিরাপত্তা ভোগ করত এবং পাকাপোক্তভাবে জমির চুক্তিও পেত। এই চুক্তি তারা ভোগ করত, যতদিন তারা সবার মনোমতো ফসল উৎপন্ন করত। জমি অধিকারের নানা ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল—যেমন ইস্তিমরারি (নির্দিষ্ট ভাড়ার ভিত্তিতে), মৌরসি (উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ভূখণ্ডে চাষের অধিকার), লাখেরাজ (আসরাফ-মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া নিষ্কর জমি), চাকরানি (গ্রামের জমিদারের ভৃত্যদের চাষের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় জমি বিলি), এবং জোতমণ্ডল (জঙ্গল নিকাশের জন্য গোষ্ঠীপতিদের দেওয়া জমি) (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., ১৮৭৬)।[৩]

গ্রামের প্রধান এবং অন্যান্য প্রশাসন কর্মী

গ্রামের প্রধান হিসাবে সংজ্ঞা-অনুযায়ী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে নিযুক্ত করা হত বটে কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ভর করত প্রতিটি এলাকায় রীতিনীতি ও চালু নিয়মকানুনের ওপর। তাছাড়া ওই ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলের বাইরেও কতখানি প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখেন, সেটাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য ছিল। সাধারণত জমিদাররা গ্রামের সব চাইতে সম্পন্ন পরিবার থেকেই প্রধান নির্বাচন করতেন; কিন্তু গ্রামের জনসাধারণের মতামতের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হত। তবে উত্তরাধিকারী সূত্রে বা অন্যভাবে অর্জিত এই পদ থেকে একজনকে হটিয়ে অন্য আর একজনকে নিয়োগ করার ক্ষমতা জমিদারদের হাতেই থাকত (ওই, ১৮৭৬, খণ্ড ৩ ও ৪)।

গ্রামের প্রশাসন চালাতে প্রধানকে সহায়তা করতেন পাটোয়ারি (গ্রামের হিসেব-

রক্ষক), তহশিলদার (রাজস্ব-আদায়কারী), ঘাটোয়ালিবৃন্দ (গিরিখাতগুলির পাহারাদার), সীমানাদার (গ্রামের সামন্ত-রক্ষক), হালসনাস (শস্যের পাহারাদার) এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দ। তবে এদের সঙ্গে গ্রামের প্রধানের প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল, তা এককথায় বলা মুশকিল। এলাকা অনুযায়ী গ্রামীণ প্রশাসন চালানোর রীতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ওই সহায়তাকারীরা নিষ্কর জমি পেত এবং অন্যান্য সুবিধেও ভোগ করত। এমনও দেখা গেছে, অর্থের বিনিময়ে গ্রামের প্রধান অন্য একজনের কাছ থেকে তার যাবতীয় অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। (ওই, ১৮৭৬, খণ্ড ৪ : ৬৫-৬৬, ২৪১, ৩৪৩; খণ্ড ৩ : ৩৪৭)।

বাণিজ্য এবং টাকা কর্জ দেওয়ার কারবার

যে সমস্ত অঞ্চলে তন্তুশিল্প গড়ে উঠেছিল, সে সব ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, খণ্ড ২ : ৩০৫-৬)। জীবিকা-হিসেবে সুদের কারবার ছিল বহু গ্রামেরই সবচেয়ে পুরনো জীবিকা। এই কারবারীরা কৃষিকাজ করত না বলে হেয় জ্ঞান করা হত। সুদ ব্যবসায়ীদের ছোট ছোট অঞ্চলের মধ্যেই কাজকর্ম চালাত। এরা বিভিন্ন গ্রামের জমিদাররা বৃহত্তর সামন্তপ্রভুর সম্ভাব্য হামলার ভয়ে টাকা-পয়সা জমানো বা উৎপাদনমুখী কাজকর্মে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তবুও ব্রিটিশ আমলের বহু পূর্ব থেকেই, যতটা ভাবা যায়, তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে অঞ্চলে অঞ্চলে সুদের কারবার চালু ছিল (চৌধুরি, বিনয়ভূষণ ১৯৭৫ : ১০৫-১৬৫)।

জঙ্গল সাফ করা

জঙ্গল সাফ করা ছিল এক বড় কাজ। বহুক্ষেত্রে, ওই সম্পন্ন কৃষকেরা জঙ্গল নিকাশকারী মজুরদের চাষাবাদের জন্য কিছু জমির স্থায়ী স্বত্ব দান করত। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে একেবারে আদিকাল থেকে রাষ্ট্রের অনুমোদিত এই ধরনের কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে দেখতে পাব সুন্দরবনে বাঘ ও সাপের আক্রমণের পরোয়া না করে এই জঙ্গল হাসিলের দুঃসাহসিক কাজকর্ম কীভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন রূপকথায় ও লোককাহিনিতে উল্লেখ আছে।

কঠোর শ্রম এবং বুদ্ধি

তা ছাড়া কিছু মানুষ, যারা অন্যদের চাইতে পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান, তারা তখনকার চাষের উপাদানগুলিকেই কাজে লাগিয়ে অন্যদের চাইতে বেশি উৎপাদন ও রোজগার করত। এইভাবে তারা নিজেরা জমিদারদের কাছে অপরিহার্য ও বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল। জমিদাররাও তাদের বেশি পরিমাণে জমি দিতেন, যে জমি অধিক উর্বর এবং জনবহুল স্থানের কাছে। এইভাবে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণির তারতম্য ঘটে যায়।

জাতিগত অধিকার

হিন্দু ও মুসলমান—উভয় শ্রেণির মধ্যেই জাতপাতের প্রশ্ন ছিল। বর্ণাশ্রমের কর্তাব্যক্তিরা বংশানুক্রমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিভাজন চালু রাখতেন।' এর আগেই তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে উঁচু বর্ণের মানুষজন জন্ম থেকেই সমাজে

যে সব সুবিধা ভোগ করত, যত মেধাবী বা পরিশ্রমীই হোক না কেন নিম্নবর্গের মানুষেরা সেই অধিকার বা প্রশয় থেকে বঞ্চিত ছিল।

জমির মালিক ও জমির চাষিদের মধ্যে উৎপন্ন শস্যের বণ্টন পদ্ধতির বৈষম্য নিয়ে সাহিত্যেও বেশ কিছু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে (গোপাল, এল., ১৯৮০ : ১৭৫), কিন্তু কোথাও খেতমজুদের একটি শ্রেণিরূপে উল্লেখ করা হয়নি। ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের মতো তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ সন্তরাও তাঁদের নিজস্ব জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করতেন শস্যের ভাগ নির্ণয়ের ভিত্তিতে। এমনকী তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুরা তাদের জমি বড়লোকদের মধ্যে বণ্টন করতেন। পরবর্তী পর্বে আমরা দেখব মোট কৃষক জনসংখ্যায় একেবারে 'ভূমিহীন' বলতে যা বোঝায় তাদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

তারতম্যের মাত্রা

দক্ষিণ বাংলার জমিজমা যেহেতু ঘনসংলগ্ন ছিল, সেই কারণে সেখানে বৈষম্যের মাত্রাও ছিল কম (দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ১৯৮৪)। শহর অঞ্চল ও শহর-সংলগ্ন প্রধান এলাকাগুলি ছাড়া জমির বাজার বলতে সেখানে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, কোথাও বা তা নয়। ভাড়াটে হিসেবে জমিদারের কাছ থেকে জমি পাওয়া যেত। সেখানেও ফসল ফলাতে হত। কোনও চাষি জঙ্গল নিকাশ করে চাষের জমি তৈরি করতে পারলে জমিদার প্রীত হতেন। কিন্তু পঞ্চায়েত বা প্রধান ছাড়া কৃষিকাজের জন্য নির্দিষ্ট জমি কেনাবেচা করার কোনও অধিকার এই উৎপাদনকারীদের ছিল না। জমি থেকে উচ্ছেদ করার ঘটনা খুব একটা দেখা যেত না। ভাগচাষি ঠিকঠাক খাজনা দিলে এবং কর্তব্যপালন করলে উচ্ছেদের প্রশ্নই উঠত না (সিংহ, এন. কে. ১৯৬৮, খণ্ড ২ : ১৮)।

যদিও মোগলরা চেষ্টা করেছিল গোটা বাংলায় একটি সুনিয়ন্ত্রিত ভূমিব্যবস্থা গড়ে তুলতে, তবুও তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি থেকে কম খরচে যতটা পারা যায় আর্থিক ফায়দা তুলতে। যিনিই মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়মিত রাজস্ব পাঠাতেন, তাকেই মোগল-প্রশাসক রাজা বা জমিদার বলে মেনে নিতেন। এর ফলে, একটা সময়ে যখন রাজনীতি অনিশ্চিত ছিল তখন অনেক নতুন জমিদারির উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে, মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকে, বড় জমিদারদের সরকারি আনুকূল্য দেওয়া হতে থাকে। নবাবের অনুমোদন পাওয়া নিয়ে রাজায় রাজায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বর্ধমান, দিনাজপুর, রাজশাহি, নদিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের জমিদারদের এভাবেই, সে সময় প্রাধান্য পাওয়া শুরু হয়।

শ্রম-বাজারের অনুপস্থিতি

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়, গ্রামগুলিতে শ্রম নিয়ে বাজারের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগতদের সেখানে প্রবেশের সুযোগ ছিল খুব কম। কে কোন জাতের ঘরে জন্মেছে, তা দিয়েই তার বৃত্তি নিরূপিত হয়ে যেত। চর্মকারের ছেলে চাইলেও দুধের ব্যবসায়ী হতে পারত না, এমনকী, গ্রামে সেই বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় লোকের অভাব হলেও।

জাতপাতের ভিত্তি যেমন অনড় ছিল, তেমনই ঠিকঠাক খাজনা বা রাজস্ব দিলেও একজন কৃষিজীবী প্রদত্ত জমির এক্তিয়ারের বাইরে যেতে পারত না।

নদীর গতিপথের পরিবর্তন, জঙ্গল নিকাশ ও পূর্ব বাংলায় জনবসতির বিস্তার এই অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছিল। অন্য একটি অধ্যায়ে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। একটা প্রশ্ন থেকেই যায় জঙ্গল সাফের টাকা কারা জোগাত? এর উত্তর হয়তো নিহিত আছে সেই সময়ে বাংলার তন্তু শিল্পের রপ্তানির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের মধ্যে।

সুবিবেচনার সঙ্গে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করা হত বলে উৎপাদনে রত অঞ্চলগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি খুব বড় একটা হত না। এই বিপুল উপার্জনের বড় অংশ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল তিনটি রাজধানী—ঢাকা (১৬০৮), কলকাতা (১৬৯০) এবং মুর্শিদাবাদ (১৭০৪)। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা হিসেবে উপার্জিত অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ধাতুর গহনা কেনার যথেষ্ট চল ছিল। তা ছাড়া দিল্লিতে পাঠানোর জন্য শাসককুল জোর করে টাকা-পয়সা আদায়ও করতেন। তবু তন্তু শিল্প থেকে এতই বিপুল উপার্জন হত, যার ফলে কৃষকদের চাষের জন্য হাল-বলদ বা বীজ জোগানের কাজ কখনও ক্ষুণ্ণ হত না।

আগেই বলা হয়েছে যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হত। কৃষি-বহির্ভূত কাজ-কর্ম চালাত তিন ধরনের কৃষিজীবী— রাজকর্মচারীদের মধ্যে ছিল গ্রামের হিসেবরক্ষক, রাজস্ব আদায়কারী, শস্যক্ষেত্র ও সীমান্ত পাহারাদার, গ্রামের প্রধান, পুরোহিত ইত্যাদি। কারিগররা ছিল তন্তুবায়, কামার-কুমোর বা অন্যান্য ধরনের বৃত্তিজীবী, যারা নির্ভর করত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৃত্তির ওপর। কত বৃত্তির মানুষের যে তালিকা পাওয়া যায় তা বলে শেষ করা যায় না। এদের মধ্যে ছিল ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, দর্জি, জেলে থেকে শুরু করে কারা নয়। ছোট গ্রামগুলিতে এদের সবার অস্তিত্ব না থাকলেও বড় গ্রামে এরা ছিল অপরিহার্য। ছোট গ্রামগুলো তাদের প্রয়োজনমতো এদের ডাকত। এই মানুষদের পারিশ্রমিক গ্রামবাসীরা যৌথভাবে দিত, কিন্তু, ব্রিটিশ শাসনের কিছু আগে থেকে লেনদেন ব্যক্তিভিত্তিক হয়ে যায়। সাধারণত ফসল ওঠার পর পারিশ্রমিক চুকিয়ে দেওয়া হত (বাডেন, পাওয়েল, ১৯১৩)।[৪] কাজের শ্রেণি বিন্যাস ছিল জাতিভিত্তিক। তবে, যুদ্ধ, খরা, বন্যা, তীর্থ যাত্রা—এই সব ঘটনায় কারিগরদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ত। সাধারণত জাত-ব্যবসা ছেড়ে কেউ অন্য কাজে হাত লাগাত না, কুমোরের ছেলেকে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যেতে হলেও তাকে কুমোরের-ই কাজ করতে হত। গ্রামের বাইরে তার পরিচয় হত দুভাবে—প্রথমত কোন গ্রাম থেকে এসেছে এবং দ্বিতীয়ত তার কি জাত। যাই হোক, জাতিভিত্তিক কাজকর্মের ওপরেই তাদের পরিচয় নির্ণীত হত। তবে, যুদ্ধবিগ্রহের সময় এরা অনেকে সৈন্যদলে যোগ দিত বা ঢাকার মতো বড় শহরে পালিয়ে যেত। ভূ-স্বামী ও গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াকে বেইমানি বলেই মনে করতেন এবং জোর করতেন তাকে যেভাবে হোক গ্রামে ফিরিয়ে আনতে।

উৎপাদিত সামগ্রীর সীমাবদ্ধ বাজার

উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর গ্রামগুলিতে কারিগররা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি বাজার বসাত। এই লেনদেন হত দ্রব্যের বিনিময়ে বা বদলে। গ্রামবাসীরা ওই বাজারগুলি থেকে প্রধানত ক্রয় করত যা গ্রামে পাওয়া যায় না। যেমন—নুন, ধাতব জিনিসপত্র এবং সৌখিন উপাদান। শহর অঞ্চলের বাজারে মজুত থাকত মাছ, তরিতরকারি, মোম, মধু এবং গোরুর খাদ্য (দাশগুপ্ত, রতন, ২০০১ : ২৬৫)।

'কৃষি ও শিল্পের সংহতি'— ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ম্ভর চরিত্রের মূল কথা। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজন। যা লাগে তার বাইরে ভূ-স্বামীর খাজনা ও মহাজনের ঋণের সুদ মেটানোর জন্য কিছু অতিরিক্ত উৎপাদন করত। গ্রামীণ শিল্পও স্থানীয় চাহিদা-মতো উৎপন্ন হত। গ্রামের জিনিসপত্র বাইরে প্রায় যেতই না, এবং গ্রামের উৎপাদন ছিল স্বাবলম্বী। বছরের এক বড় ভাগ গ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ ছিল না, কেন না রাস্তাঘাট খারাপ ছিল। সেই সময়ে স্বাবলম্বী না হয়ে উপায় ছিল না।

ঋণের বাজারের সীমাবদ্ধতা

ঋণের বাজার ছিল খুবই সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা বিপদের সময় কৃষকদের ঋণ দিতেন এবং ফসল উৎপন্ন হওয়ার আগের মাসগুলিতে বীজধান ও চাষের হালবলদ সরবরাহ করতেন। এই ধার খুব কম সুদেই দেওয়া হত। সুদের হার ছিল মাত্র এক কি দুই শতাংশ। জমিদাররা নিজেদের সুদখোর মহাজনের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে ঘৃণাবোধ করতেন। এর ফলে একদিকে যেমন গ্রামের চাষবাস অক্ষুণ্ণ থাকত, তেমনই কৃষি মজুরদের ওপর ভূ-স্বামীদের অধিকারও থাকত নিয়ন্ত্রণে।

একেবারে প্রাচীন সময় থেকে সুদখোর মহাজনেরা ছিল গ্রামীণ সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার ষোড়শ শতকের লোকসাহিত্যেই দেখা যায় এরা কীভাবে গরিব কৃষকদের ঠকাত এবং সন্ত্রস্ত করে রাখত। আসল নয়, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আদায়ই ছিল এদের কারবার। তাদের বণিকের ভূমিকাতেও দেখা যেত। এদের হাত ঘুরেই গ্রামের রাজস্ব শহরে শাসকদের হাতে পৌঁছাত। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৈশ্য সম্প্রদায়ের চাইতে জাতি হিসেবে এদের মর্যাদা ছিল খুবই কম। বঞ্চনার মাধ্যমে সঞ্চিত বিপুল অর্থ ভূ-স্বামীদের থেকে লুকিয়ে রাখত এই মহাজনকুল (মিশ্র, ২৩-২৫, ৪৪)।

জমি যতই ব্যক্তিগত ভিত্তিতে চাষ করা হতে লাগল, ততই গ্রামের প্রাক্তন কৃষিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস কমে আসতে লাগল এবং কৃষিঋণ ও উৎপাদিত বিষয়গুলির বাজারের চরিত্রও পাল্টাতে লাগল।

মধ্য-ষোড়শ শতক থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম

সন্দেহ নেই যে প্রাচীন উৎপাদনের উদ্বৃত্ত থেকে জমিদারকে খাজনা দেওয়া কৃষি-বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল। এই শস্যের উদ্বৃত্ত এইভাবে ছোট জমির মালিক থেকে উচ্চতর শাসক হয়ে শেষপর্যন্ত বাংলার নবাব ও ভারত সম্রাটের হাতে পৌঁছাত। এভাবে এই উদ্বৃত্ত গ্রাম ছাড়িয়ে শহর, নগর ও গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। খরার

সময় এই উদ্বৃত্ত কমে যেত। উৎসব ও সংস্কৃতি চর্চা এবং নানা সৌধ ও মন্দির নির্মাণের কাজে ভাঁটা পড়ত।

তন্তু-শিল্প এবং জমি বণ্টন পদ্ধতির নানা রূপান্তর

ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা আমাদের দেশের তন্তুবায় ও ছোট ব্যবসায়ীদেরও আয় বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদিও গ্রামের অভাব সম্পূর্ণ দূর করা যায়নি এবং তাঁতিরা তাদের প্রাপ্য যথাযথ পেত না, কিন্তু ওই সময়ে যে আয় সকলেরই বেড়েছিল সেই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, এমনকী, যাদের জাত ব্যবসা তাঁত ছিল না, তারাও এই ব্যবসায়ে অংশ নিয়ে এই ব্যবসা উৎপাদনমুখী ও লাভজনক করে তুলেছিল।

এই পর্বে মোগল আমলাতন্ত্রের ক্রমশ পতন এবং বড় বড় জমিদারদের অভ্যুত্থান হতে থাকে। মুর্শিদকুলি খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন ঘটিয়েছিলেন। প্রথমত জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাদের ওড়িশায় চালান করা হয়েছিল বা তাদের এমন নিষ্ফলা, দূরাঞ্চলগুলিতে পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা বাংলার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে না পারে। গোটা বাংলার জমিকে 'খলিশা' জমি হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ভার ভারত সম্রাটের অধীনস্থ দেওয়ান বা নবাব এবং রাজস্ব প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫] দ্বিতীয়ত, ইজারাদারির পত্তন। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কর আদায় করার অধিকার ন্যস্ত হয়। এই ইজারাদাররাই কালক্রমে জমিদার নামে পরিচিত হন।

মুর্শিদকুলি খানের সময়ে জমিদারদের দু'টিভাগে ভাগ করা হত। প্রথমটিতে পড়ত বর্ধমান, দিনাজপুর, রাজশাহি, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি বিশাল জমিদারি, যেখান থেকে সরাসরি রাজস্ব পাঠানো হত নবাবকে। আদায়ীকৃত অর্থের অর্ধেক তুলে দেওয়া হত নবাবের হাতে এবং নয়জন বড় মাপের ভূস্বামী ৬১৫টি পরগনা থেকে, প্রজাদের কাছ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় করতেন। দেশের বাকি অঞ্চলগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৩টি চাকলা নির্দিষ্ট হয়েছিল (সিংহ, এন. কে., খণ্ড ২, ১৯৬৮)। যদিও সব অর্থেই মুর্শিদ ছিলেন একজন স্বাধীন শাসক তবু দিল্লির সম্রাটকে তিনি সবসময়ই খুশি রাখতেন এবং নিয়মিত প্রাপ্য অর্থ জোগাতেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের ফরমানের তোয়াক্কা করতেন না। ওই বণিকরা নবাবকে এড়িয়ে সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করত। কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে নানাধরনের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বাংলায় বাণিজ্য শুল্ক দিতে নারাজ বলে এই কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং পূর্ব বাংলায় উপনিবেশ বিস্তার

সেই সময়ে ভাগীরথী নদীর খাত দিয়ে গঙ্গার জল কমে যেতে লাগল এবং পদ্মা নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। নদীর এই জল কমা এবং বাড়া এক বড় ঘটনা।

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ১৫ শতক থেকে এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভূতত্ত্ববিদ

এবং ভৌগোলিকরা নদীর ভাঙা-গড়ার ঘটনাগুলিকে নানা দৃষ্টিতে বিচার ও ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত মানচিত্রে, যেমন, দ্য বারোস-এর আঁকা (১৬১৫) ভ্যান ডেন ব্রুকের আঁকা (১৬৬০) এবং বেনেল এর আঁকা (১৭৭৯) মানচিত্রে ওইসব কালপর্বে পদ্মার প্রবাহ ও তীরবর্তী অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধির চেহারা ধরা পড়ে।

প্রবল জলপ্রবাহ ও বন্যার তোড়ে পূর্ব বাংলার বহু দুর্ভেদ্য অরণ্য অঞ্চল ভেসে যায় ও নতুন চর জেগে ওঠে, এবং ওই বিশাল পলিসমৃদ্ধ জমিতে চাষবাস শুরু হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ববঙ্গে যেখানে জল বাড়ে, সেখানে জনবসতি বাড়তে থাকে ও উৎপন্ন বস্তু থেকে যথেষ্ট অর্থাগমও হতে থাকে। নদীর গতিপথের বদল শুধু পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তনই ঘটায়নি, বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতিকেও রীতিমতো চাঙ্গা করে তুলেছিল (ইটন, রিচার্ড এম., ১৯৯৩ : ১৯৬-১৯৭)।

ওয়ান-তা-ইয়ান নামে এক চৈনিক বণিক ১৬৪৯-৫০-এ বাংলার উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেন কৃষিকাজের প্রতি নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করার মধ্যেই বাঙালি জাতির শান্ত স্বভাব ও শ্রীবৃদ্ধি অর্জনের বীজ নিহিত আছে। অন্যপক্ষে, নিষ্ফলা অরণ্য বা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের চারিত্রিক অসহিষ্ণুতার উৎস জমির অনুর্বরতা থেকেই।

জোতদার ও ভাগচাষিদের অস্তিত্ব ছিল কি?

আমরা কিন্তু পূর্বেই লক্ষ করেছি ইউরোপ থেকে বণিকরা এদেশে যে বিপুল বস্ত্রশিল্পের বাজার তৈরির কাজে নেমে পড়ল, তার ফলে এদেশের কৃষি-উৎপাদনও বাড়ল। এদেশ থেকে সুতো কিনে সেই সুতো থেকেই ইউরোপের কলকারখানায় নির্মিত বস্ত্রের বাজার গড়ে তুলতে গিয়ে তন্তুবায় ও বিদেশি বণিক কোম্পানিগুলির বেচা-কেনার মাঝখানে বিভিন্ন স্তরে দালাল ফড়িয়াদের উদ্ভব হতে লাগল। এই মধ্যবর্তী শ্রেণির রমরমা কৃষকদের একাংশকে আংশিক সময়ে তুলো চাষের কাজে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই।

এই কারবারে লগ্নি থেকে যারা বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিল, তারাই কি জোতদার বলে একটি নতুন শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ওদের অনেকে জমিদারের চাইতেও প্রতাপান্বিত হয়ে যায় (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ২১)? এই ঘটনা পলাশির যুদ্ধের আগে কি পরে অথবা ১৭৭০-এর মন্বন্তরের পর ঘটেছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য রয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক যে ওই যুদ্ধের আগে সম্পন্ন কৃষকদের ভেতর থেকে জোতদাররা একটি শ্রেণি হিসেবে সামাজিক ভাবে চিহ্নিত হয়নি। ওই পর্বের দুই প্রধান গবেষক কোলব্রুক এবং বুচানন-হ্যামিলটনের রচনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম চারটি দশকের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এঁরাও কিন্তু জোতদার ও জমিদারদের এদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণি বলে উল্লেখ করেননি।

আসল প্রশ্ন হল — যখন জমি ও শ্রমের বাজার দৃঢ়ভাবে গঠিত নয়, তখন কৃষকদের একটি অংশ তুলনামূলকভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠলেও অর্জিত অর্থ চাষবাসে খাটিয়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিতে গড়ে ওঠার ক্ষমতা অর্জন করেছিল কি না। তা ছাড়া টাকার জোরে

চাষিদের খেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষক বানিয়ে তাদের জমি নিজেদের তাবে আনার মতো পরিস্থিতি কি সত্যিই সৃষ্ট হয়েছিল?

বুচানন-হ্যামিলটন তার বিশালায়তন আলোচনার মাত্র একটি জায়গায় বড় মাপের কৃষকদের প্রসঙ্গ তুলেছেন যারা ১৮০৮ সালে দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যার ষোলোভাগের একভাগ। তারা ৩০ থেকে ১০০ একর জমি চাষ করত। তিনি বলছেন, "এরা নিজের হাতে জমি চাষ করত না তবে আশ্রিত আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আরও দু-তিন জন মুনিষকে ভাড়া করে তাদের দিয়ে চাষ করাত। আবাদের কাজে লোকের অনটন হলে বাকি জমির জন্য তারা ভাগচাষিদের কাজে লাগাত। অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি ছোট কৃষক ও ভাগচাষিদের টাকা ও বীজ সরবরাহ করত। পারিবারিক বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবের পেছনে যেভাবে টাকা ঢালতেন জমিদাররা, এ ছিল তারই রকমফের।

বুচানন-হ্যামিলটনের মতে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—সম্পন্ন কৃষকদের আশ্রিত আত্মীয়েরা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে সেখানকার চাষবাস ছেড়ে অন্য কোথাও সপরিবারে চলে যেত, তখন অনেকদিন সেই জমি লোকাভাবে অনাবাদী থেকে যেত। ফলে নরমে-গরমে ওই বিক্ষুব্ধদের চাষে রাজি করাতে না পারলে আবার অন্য জায়গা থেকে পালিয়ে আসা কোনও পরিবারকে ওই জমি চাষে লাগানোর চেষ্টা হত।

ওপরের অধ্যায়টিতে দেখা যাচ্ছে জমি-মজুর অনুপাত এই সম্পন্ন কৃষকদের পক্ষেই যেত, কারণ তাদের হাতে ছিল পুঁজি, হালবলদ এবং মুখাপেক্ষী আত্মীয়-স্বজনের বিশাল বাহিনী। জমিদারদের চাইতে এরা ছিল মাটির অনেক কাছাকাছি। কিন্তু 'ভূস্বামী' হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের সঙ্গে কোনও-তিক্ত সংঘাতে না গিয়ে প্রয়োজন হলে তারা তাদের পুঁজি ও মজুরদের নিয়ে অন্যত্র চলে যেত। উত্তর বাংলায় চাষযোগ্য অনেক জমি ছিল। সেখানে তারা নতুন উদ্যোগে চাষ শুরু করত। দক্ষিণ বাংলায় ঘনবসতি অঞ্চলগুলির সম্পন্ন কৃষকদের সঙ্গে এদের কোনও মিল ছিল না, বরং দুর্গম অঞ্চলে যারা জঙ্গল নিকাশ করত সেই হাওলাদারদের সঙ্গে এদের তুলনা করা যেত।

একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি-হিসেবে জোতদারদের অভ্যুত্থানের কোনও সময় নির্ণয় করা যেমন কঠিন, ততটাই বিতর্কিত 'ক্ষমতা' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ। স্থানীয় সামন্তপ্রভু যিনি সরাসরি তাঁর প্রজাদের ভাগ্য নির্ণয় করতেন তিনি, না পরোক্ষভাবে এদের শাসক দিল্লির সম্রাট—কার হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা? যেমন, প্রশ্ন উঠতে পারে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে ভীতিজনক হয়ে ওঠা কার পক্ষে বেশি সম্ভব—এলাকার থানার দারোগা না জেলা দপ্তরের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের? বহুজাতিক সংস্থার সভাপতি বা সংস্থার আঞ্চলিক প্রধান, যিনি তার নিচুতলার কর্মীদের নিয়োগ বদলি বা ছাঁটাইয়ের সরাসরি মালিক—কে আসলে প্রকৃত ক্ষমতাবান?

এর উত্তর একটাই—স্থানীয় কর্তা। তবে তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট অঞ্চলটুকুতে তাঁর ওপরওলার বেঁধে দেওয়া ছকের মধ্যে কাজ করতে হয়। এই পরিকাঠামোর কথা চিন্তা করলেই জোতদার ও জমিদারের ক্ষমতার মূল্যায়ন করা যায়। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে যে ব্যক্তি প্রশাসনের উন্নততর অবস্থানে থাকেন তিনিই তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষমতা ভোগ করেন, সন্দেহ নেই।

ভাগচাষিদের সম্পর্কে আলোচনা এলে প্রথমেই এদের দুভাগে ভাগ করতে হয় —

একদল ভাগচাষে অভ্যস্ত এবং অন্যেরা শ্রেণিগত ভাবেই ভাগচাষি। অর্থাৎ শ্রেণিতে ভাগচাষি না হয়েও ভাগচাষ করা যায়। আমরা আগে দেখেছি তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধ-পীঠগুলি প্রতিষ্ঠার আমল থেকে বাংলায় ভাগচাষের প্রচলন ছিল। অনেকে সংসার ছেড়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের জমি-র চাষের উৎপাদিত অংশ পাবেন, এই শর্তে ভাগচাষি হাতে জমি তুলে দিতেন। এই শর্ত স্থানীয় কৃষকদের পক্ষে লাভজনকই হয়ে উঠত (সেন মজুমদার, গায়ত্রী, ১৯৮৫ : ৯৩-৯৬)।

উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে, বুচানন-হ্যামিলটনের সময়েও ভাগচাষিরা দুই থেকে তিন বিঘা জমির মালিক ছিল। এরা অবসর সময়ে তাদের প্রতিবেশীদের জমি চাষ করত। তা ছাড়া ২ বা ৩টি হাতের অধিকারী চাষি নিজের জমি চাষ করার পর অন্যদের জমিতে লাঙ্গলের ব্যবহার করার সময় পেত। একবার ফসল উৎপন্ন করার পরও তারা অন্যের জমিতে জন খাটত এবং চিনি ও নীলের ব্যবসায়ীদের মুটে-মজুরদের কাজ করত (বুচানন-হ্যামিলটন, ১৮৩৩ : ২৩৫)।

কৃষির বিকেন্দ্রীকরণের কোনও নজির ১৭৮৬ সালের আগে চোখে পড়েনি। বুচানন-হ্যামিলটনের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৮০৮ সালেও দিনাজপুরে ১৫০,০০০ জন ভাগচাষি ছিল। অন্যান্য জেলাগুলিতে এদের সংখ্যার কোনও হিসেব নেই। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি সহজ নয়। কারণ বুচানন হ্যামিলটনের হিসেবের সঙ্গে বন্যা-কমিশনের হিসেবে বেশ গরমিল লক্ষ করা যায়। প্রথমজন যেখানে দিনাজপুরের ৩৪ শতাংশ কৃষককে ভাগচাষি বলে আখ্যা দিয়েছেন সেখানে ১৯৩৮-এ বন্যা কমিশনের মতে ওই সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম, মাত্র ১৩.৮ শতাংশ। রংপুরে ভাগচাষিদের সংখ্যা ছিল বুচানন-হ্যামিলটনের মতে ৩৯.৪ শতাংশ এবং কমিশনের হিসেবে ১৯.১ শতাংশ।

নিযুক্ত খেতমজুরদের বিত্তশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব একটা ছিল না। তবে এদের সিংহভাগ মানুষেরই দুই বা তিনটি হাল ছিল এবং চাষের কাজে পারিবারিক সদস্য কম হলে এক কৃষক এক লাঙ্গল ভিত্তিতে অন্যদের জন খাটাত। এই ভূমিদাসদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না (বুচানন-হ্যামিলটন, ফ্র্যান্সিস, ১৮৩৩ : ২৪৪)।

মজুর : এরা কি সত্যিই ভূমিহীন ছিল?

ধর্মাকুমার উনিশ শতকের মাদ্রাজে ভূমিদাস প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ওই প্রদেশে এই ধরনের কাজে নিযুক্ত চাষিদেরও নানা ভাগে ভাগ করা যেত। তিনি আদমশুমারি দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যে দপ্তর ১৮৭০-এর আগে কাজ শুরু করেনি। সুতরাং উনিশ শতকের শেষে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না যে ভূমিদাস ও খেতমজুরদের যে সংখ্যা ওই দপ্তর থেকে পাওয়া গেছে তা কোম্পানির আমল বা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী পর্বের কি না।

ধর্মাকুমার অবশ্য আদম-শুমারি দপ্তরের হিসেবের অনুসরণে ইংরেজ শাসনের গোড়ার পর্বে শ্রমজীবী সম্প্রদায় যেমন মালা চর্মকার শ্রেণি বা পারিয়া তন্তুবায় শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। সংখ্যায় কম হলেও বাংলাতেও এ ধরনের সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু শুধু অস্পৃশ্যতা নয়, তাকানো পর্যন্ত বারণ—এরকম অন্ধ জাতপাতের বিচার

যেভাবে মাদ্রাজে ব্যাপক ছিল, বাংলায় এমনটি কখনও ঘটেনি।

আমাদের আলোচ্য বিষয়—খেতমজুরদের সংখ্যা কত ছিল এবং তারা প্রধানত ভূমিহীন ছিল কি না। আমরা আগেই লক্ষ করেছি, বাংলায় দাসবৃত্তি অজ্ঞাত না থাকলেও এদের কৃষিকাজ বা অন্য কোনও উৎপাদনমুখী কাজকর্মে লাগানো হত না। অষ্টম শতকে কোথাও কোথাও ভূমিহীন কৃষকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের নাগরিক অধিকার ছিল না। এরা ছিল প্রধানত ভৃত্যশ্রেণির। অন্ধ্র, পুলিন্দ, শবর, ডোম, চণ্ডাল বলে নির্ণীত এই দাসসম্প্রদায়গুলির কোনও উল্লেখ অবশ্য পাল-রাজবংশের উদ্ভবের পর থেকে আর পাওয়া যায় না (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ২৭৩)। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমানারক্ষক ও অরণ্যবাসী হিসেবে চণ্ডাল, শবর, পুলিন্দ শ্রেণির নামোচ্চারণ করেছেন (কাঙ্গলে, ১৯৬১)। পাণিনি অদক্ষ শ্রমজীবীদের 'কর্মকার' আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন শ্রমের মজুরিই ছিল তাদের বৃত্তি। ভাড়াটে শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি বিশেষ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন তিনি—'কর্মকারণ উপনয়াস্তে'। দক্ষ মজুরদের তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'শিল্পীন'। কখনও নগদে কখনও বা ফসলে দেয় কাজের মজুরির ভিত্তিতে এই খেতমজুরদের নির্ণয় করা যেত (আগরওয়ালা, ১৯৫৩ : ২৩৬-৩৭)।

যদিও ১৭৫৭-র আগে গ্রামগুলিতে শ্রম-বিক্রয় একেবারে অজানা ছিল না, তবু বিশাল কৃষকশ্রেণির তুলনায় এদের শ্রেণি-হিসেবেও গণ্য করা সম্ভব নয়। ১৭৫৭-র পূর্বকার গ্রামগুলিতে এরা প্রধানত কাজের খোঁজে বাইরে থেকে আসত এবং এদের অধিকাংশই ছিল আদিবাসী যাদের জাতপাতের বিচারে সমাজে সব চাইতে নিচু স্থান দেওয়া হত। তবে গ্রামে এত উদ্বৃত্ত জমি ছিল যে এরাও আর ভূমিহীন থাকত না। এমনকী, ইংরেজ শাসনে বিভিন্ন বাণিজ্যিক শস্যের ফলন শুরু হলেও, এবং ১৭৭০-এর মন্বন্তরে গ্রামীণ জীবনে ধ্বস নামলেও, খেতমজুররা নিজেদের খরচে জমির আংশিক সময়ের চাষবাসের কাজ থেকে ইস্তফা দেয়নি।

১৮০৪ সালে কোলব্রুক খেতমজুরদের পরিস্থিতি বিচার করতে গিয়ে দেখেছেন ভূমিদাসদেরও কিছু নিজস্ব জমি থাকত এবং প্রথাগতভাবে তারা দিনের অর্ধেক মালিকের কাজ করার পর নিজের জমি চাষ করত। এই জমি সম্ভবত মালিকের কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে নেওয়া।

প্রধানত ১৮৭২-এর আদমশুমারি ভিত্তিক তথ্য থেকে গৃহীত ১৮৭০-এর পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে হান্টার দেখেছেন যে স্বল্পপরিমাণ জমির অধিকারী খেতমজুরদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি ভূমিহীন মজুর ছিল নামমাত্র। দার্জিলিং জেলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন যে ওই ভূমিহীনরা ছিল বহিরাগত যারা পরে চা বাগানে কুলিগিরি করতে আসে। তিনি লক্ষ করেছেন জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি মানুষের নিজের বলতে এক খণ্ড জমি ছিল ফলে দিনমজুর হিসেবে কোনও শ্রেণির অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। এই প্রতিবেদনে বিশেষভাবে ধাঙড়দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, যারা বছরের এক সময় পালকিবাহক বা রাস্তা সারাই-এর কাজ করত। এদের নিজের বা ভাড়া নেওয়া জমি বলতে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., খণ্ড ১০ : ২৭৮)।

হান্টারের প্রতিবেদনে কুচবিহার জেলায় ভূমিহীনদের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু সেখানে বিহার ও ছোটনাগপুর থেকে আগত রাস্তা সারাই ও নির্মাণের কাজে নিযুক্ত

শ্রমজীবীদের কথা বলা হয়েছে। দিনাজপুরে চালু ছিল শস্য-ব্যবসায়ীদের রাজমহল থেকে সংগৃহীত শ্রমিক এনে ধান ঝাড়াই করা। তা ছাড়া রাস্তার কাজকর্মের জন্য যে মজুররা বাইরে থেকে আসত, তারা এপ্রিল-মে মাসে নিজেদের দেশে ফিরে যেত। মুর্শিদাবাদ-সংক্রান্ত তথ্যে জেলার উত্তরপূর্ব সীমান্ত থেকে আগত আদিবাসী ও সাঁওতাল মজুরদের উল্লেখ থাকলেও ভূমিহীনদের প্রসঙ্গ নেই। একমাত্র হুগলি জেলায় (সে সময় হাওড়া জেলার সংলগ্ন ছিল) বা নিকটবর্তী নদিয়ায় যে বিশাল কারখানা-মজদুর শ্রেণি গড়ে ওঠে, সে সব অঞ্চলেই ভূমিহীন মজুরদের শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। হুগলি জেলা প্রসঙ্গে হান্টার বলেছেন — "রায়ত বলে চিহ্নিত অনেকের হাতে এক একরেরও কম কিছু কিছু জমি ছিল এবং পারিবারিক ভরণপোষণের বিকল্প উপায় হিসেবে সে-জমিতে তারা চাষবাস করত। নদিয়া জেলার প্রসঙ্গে বলা হয় ভূমিহীন মজুর শ্রেণির কথা, যাদের 'কৃষাণ' বলে উল্লেখ করা হত। ১৮৬৬ সালে মহামারি ও মন্বন্তর এবং ১৮৭১-এর বন্যা এর কারণ কি না বলা কঠিন। হান্টারের সমগ্র প্রতিবেদন থেকে মোটামুটি আমরা জানতে পারি নিম্নবর্গের সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে চিহ্নিত বহিরাগত মজুরদের বৃত্তান্ত।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে ১৮৮০-র সময়েও নিচু বর্গের সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে মজুর ও অ-মজুর—সবারই আয়ত্তে কিছু কিছু কৃষিজমি থাকত। তবে উর্বর ও অনুর্বর জেলাগুলির ক্ষেত্রে স্বভাবতই এ-ব্যাপারে তারতম্য দেখা যেত। হান্টারের প্রতিবেদনে বাংলার যে জাতপাতের তথ্য দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে শ্রমে নিযুক্ত সম্প্রদায়গুলির মানুষজনের সংখ্যা সামগ্রিক জনসংখ্যার এক-শতাংশও ছিল না। এমনকী, গ্রামের ভৃত্য বা ব্যক্তির নিজস্ব কাজে নিয়োজিত মজুর—যেমন নাপিত, ধোপা, ঝাড়ুদার এবং অন্যান্য বৃত্তির মানুষের সংখ্যাও বাংলার দুই জেলায় জনসংখ্যার পাঁচ-শতাংশও ছিল না। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন এদের যৌথভাবে মজুরি বা উৎপাদনের ভাগ দিত, যেমন জমিদাররা দিতেন 'চাকরান' নামে নিষ্কর জমি। কিন্তু ইংরেজ আমল আসার পর এই মজুরি দান ব্যক্তিভিত্তিক হয়ে উঠল এবং ভূমিদাসদের ভূস্বামীরা সম্ভবত সরাসরি মজুরি দিতে শুরু করলেন।

উপসংহার

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব-প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের দ্রুত কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। নতুন শাসককুল যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন স্থানীয় রাজাদের হাতে ওই বিষয়গুলির জিম্মা রেখে। মোগল শাসনের শেষপর্বে পট পরিবর্তন হতে লাগল, যখন উত্তর ভারতের ঘাঁটি ছেড়ে মোগল সেনাবাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত আফগান ভূস্বামীরা বাংলায় মাথা গুঁজতে আসা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি মোগল শাসকবৃন্দ কীভাবে তাদের ভূমিরাজস্ব এবং প্রশাসনকে সারা সাম্রাজ্য এমনকী, বাংলাতেও চালু করেছিল। এখানে সে কাজ নিষ্পন্ন করার ভার পরেছিল পরিবর্তনশীল আমলাতন্ত্রের ওপর। মোগলরা জমির বড় একটি অংশকে 'খালিশা' বলে চিহ্নিত করলেও জমিদাররা বেশ দাপটের সঙ্গে নিজের এলাকায় শাসন চালিয়ে যেতেন। জমির বিষয়টি ছিল একটি প্রহেলিকার

মতো যা জমিদাররা একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং ইচ্ছেমাফিক তার অধিকারও ছেড়ে দিতে পারতেন।

তৃতীয় অংশে আমরা দেখেছি প্রাচীন গ্রিস ও রোমের মতো বাংলায় কিন্তু দাসপ্রথা উৎপাদনের অঙ্গীভূত কোনও বিষয় ছিল না এবং এখানে তাদের গৃহভৃত্য হিসেবেই ব্যবহার করা হত। আমরা চতুর্থ অংশে বাংলায় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখাতে চেয়েছি যে ইউরোপে যেভাবে শ্রমিকদের খাটানো হত, বাংলায় কিন্তু তার চরিত্র ছিল অন্য। তবে একটা বিষয় দু দেশেই ছিল অভিন্ন— তা হল জমির মালিকানার চাইতে শ্রম-ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা। অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাপসৃষ্টি ও ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতা ছাড়া সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা হয় না। দুই দেশেই ভূস্বামীদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে শাসকের পক্ষে আবশ্যিক বলে স্বীকার করা হত। তবে তথাকথিত 'প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতান্ত্রিকতা' (ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজম্) বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না বাংলায়। গ্রামীণ প্রশাসনের হাল ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মোগল শাসকরা যতই তাকে একটি সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করুন না কেন। কৃষকদের চরিত্র এবং ছোট ছোট গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র গঠনে তাদের ভূমিকা নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও প্রশাসকরা যে বক্তব্য রেখেছেন এই গ্রন্থের পঞ্চম অংশে তার যাথার্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ক ও খ সংযোজনায় প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে ভাগচাষের অধিকারের বিভিন্ন নিয়ম, বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব, নতুন জমিতে উপনিবেশিক উদ্যোগ, গ্রামীণ প্রধানদের কাজকর্ম, শহরের বাণিজ্যের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর। ষষ্ঠ অংশে আমরা জমি, শ্রম, ঋণ এবং উৎপন্ন বস্তুর বাজারের অভাবে কী ধরনের পরিবেশ ছিল তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

সপ্তম অংশে পাশ্চাত্য বাণিজ্য সংস্থাগুলির আগমনের ফলে পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৫৩০ নাগাদ ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে প্রবেশ করে গ্রাম-জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনে, বিশেষত তাঁত শিল্প কেন্দ্রিক এলাকাগুলিতে। এরা জমিদারদের ক্ষমতার তোয়াক্কা না করে বস্ত্র উৎপাদনে পুঁজি যোগাতে থাকে। এই সময় নদীর পরিবর্তন ও নদীপ্রবাহ নিম্নগামী হওয়ার ফলে পরিবেশ ও অর্থনীতির ভারসাম্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। অরণ্য বিধৌত করে পদ্মা বিপুল চর জমি পূর্ব বাংলার মানুষের হাতে তুলে দেয়। সেখানে চাষবাস ছাড়াও নানা ধরনের কাজকর্মের উদ্যোগ দেখা যেতে থাকে। বলা কঠিন এই কাজে বিদেশিরা কী পরিমাণ অর্থ লগ্নি করেছিল এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তার কতটা ফায়দা তুলতে পেরেছিল। তবে যেহেতু শ্রমের চরিত্র ছিল উৎপাদনমুখী, তাই কোনও মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে দেখা যায়নি। শহরগুলির উদ্ভব ও বিকাশ এবং পূর্ব বাংলায় লগ্নিকারীদের উপনিবেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অষ্টম এবং নবম অংশে আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি যে বাংলায় প্রাক্-পলাশি পর্বের চাষাবাদের ক্ষেত্রে জোতদার, ভাগচাষি ও ভূমিহীন মজুরদের কতটা অস্তিত্ব ছিল। অথবা এই কৃষককুলের মধ্যে এমন ধরনের বিভাজন ছিল কি না যাতে স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে তাদের গণ্য করা যায়। আমাদের বিবেচনায় পলাশির যুদ্ধের পূর্বে বাংলায় কৃষকদের মধ্যে এ ধরনের শ্রেণি বিভাজনের অস্তিত্ব ছিল না। আমরা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি একটি বিষয়, সেটি হল সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলায়

'ভাগচাষ'-কে একটি পদ্ধতি রূপে ব্যবহার এবং গ্রামীণ জীবনে শ্রেণি হিসেবে ভাগচাষিদের অস্তিত্বের অভাব। একইভাবে, আলোচনা করা হয়েছে অতিরিক্ত আয়ের জন্য 'দিনমজুর' এবং 'ভূমিহীন মজুর'-দের প্রশ্নে। দেশের প্রথাগত চাষাবাদের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মিশে যাওয়ার আগে বহিরাগত বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ ও এখানে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত বাংলায় প্রচুর জমি থাকায় 'ভূমিহীন' বলতে কারও অস্তিত্ব ছিল না। অরণ্য জীবন সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে। জোতদারদের উদ্ভব নিয়ে সংযোজনী - 'গ'-তে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। আমাদের মতে ১৭৭০-এর মন্বন্তরের পর এইসব শ্রেণির মানুষই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট—ক

ছোট ছোট গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র

গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র : ইংরেজ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে

কোনও কোনও ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের ভারতীয় এবং বাংলার গ্রামগুলি সম্পর্কে নিজেদের দেখার ভিত্তিতে কিছু বাধাঁধরা ধারণা জাহির করার প্রবণতা ছিল। হেনরি মেইন, চার্লস মেটকাফ এবং জি ক্যাম্পবেল এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বহু ঘোষিত পঞ্চম প্রতিবেদনটিও এই একই ধরনের। আমরা পরে দেখতে পাবো, প্রাক্-রাষ্ট্র আদিবাসীদের সামাজিক সংস্থা এবং পরবর্তীকালে জাতির ভিত্তিতে গ্রামের শ্রম-বিন্যাস—তাঁরা গুলিয়ে ফেলেছিলেন। অথচ দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের এই বক্তব্যকেই সারা দুনিয়ায় একবাক্যে সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। একই ভাষায়, লেখকের পর লেখকরাও পরবর্তীকালে একই জাতীয় মন্তব্য করে গেছেন, যেন ভারতবর্ষের গ্রাম ওই রকমই। এই প্রচার সে সময়কার ব্রিটিশ শাসকদের রোমান্টিক ও অভিভাবক-সুলভ মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। (ড্যুমন্ট, লুই, ১৯৭০ : ১১৩, ১১৮)। এই ধারণায় এমন বলা হল যেন ভারতের গ্রামগুলো ছিল অপরিবর্তনীয় এবং উন্নয়নের পরিপন্থী, ব্রিটিশরা এই বাধাঁধরা জীবনকে পাল্টে গতিশীল করেছে।

১৮১২ সালে হাউস অফ কমনস্-এর পঞ্চম প্রতিবেদনে ভারতের গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, "একেবারে আদিকাল থেকেই গ্রামের মানুষজন পুর-সরকারের আওতায় বসবাস করত। গ্রামের সীমানাগুলি ছিল অপরিবর্তনীয়। ওপরতলায় কে শাসক বা কে রাজা তা নিয়ে সাধারণের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। গ্রামীণ অর্থনীতির চরিত্রও ছিল পুরোপুরি অনড়। গ্রাম-প্রধান ছিল একাধারে শাসক ও বিচারপতি। কর আদায় ও জমি বিলির কর্তাও ছিল প্রধান।

১৮৩০-এ চার্লস মেটকাফ মন্তব্য করেন, "গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলি ছিল ছোট ছোট আকারের প্রজাতন্ত্র, নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর উপাদানে স্বয়ম্ভর এবং বহিঃশক্তির

সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যখন সবকিছুই পালটে যায়, এই প্রজাতন্ত্রগুলির চরিত্র অবিচল থেকেই যায়। রাজত্বের পর রাজত্বের বিলয় ঘটে। বিপ্লবের পর বিপ্লব... (তবু) গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলির গড়ে তোলা এই ছোট আকারের প্রজাতন্ত্রগুলির চিরায়ত অস্তিত্বর দরুনই ভারতের মানুষ অনেক বিপ্লব আর পরিবর্তনের মধ্যে বহু আঘাত সয়ে বেঁচে আছে। ওই ছোট অথচ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যেই তারা সুখ ও মুক্তি পেয়েছে বরাবর (কে. জন উইলিয়াম, ২ : ১৯১-১৯২)।

উইল্‌কস এর সঙ্গে যুক্ত করলেন, "গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও যৌথভাবে চাষাবাদ এবং মজুরদের সঙ্গে উৎপন্ন শস্য ভাগ করে নেওয়ার নজির থাকলেও সাধারণভাবে প্রতিটি অধিবাসী নিজের হাতে নিজের জমি চাষ করত।"

হেনরি মেইন-এর মতে ভারতের গ্রামগুলির চরিত্র ছিল টিউটনিক অথবা স্ক্যানডিনেভিয় গ্রামাঞ্চলের মতো, অধিকাংশ খাসজমিতে গ্রামের সব মানুষেরই সমান অধিকার ছিল। এরা ছিল অভিভাবক সুলভ এক স্বৈর-শাসকের অধীনে। গ্রামের অন্তর্কলহেব মীমাংসা করত সরকারের উপদেষ্টা পর্ষদ পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তিরা। তাঁদের অনুজ্ঞা-অনুযায়ীই চাষবাস ও অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালিত হত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল. কিন্তু তা এতদূর যেত না যাতে যৌথভাবে জমি চাষের পদ্ধতি বন্ধ হয। আদিকাল থেকে একই পদ্ধতিতে চাষের জমিতে জল দেওয়া হত এবং গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী জমিব পুনর্বণ্টন করা হত। প্রবীণদের পর্ষদ ছিল স্ক্যানডিনেভিয় গ্রামগুলির যৌথ সভাবই মতো। সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য যদিও মাঝে মাঝে নতুন আইন প্রণয়ন করা হত, কিন্তু বস্তুত সেগুলি ছিল পুরনো বোতলে নতুন মদ ঢালারই শামিল। টিউটনিক গ্রামগুলির থেকেও ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে জমির ওপর যৌথ-মালিকানা শক্তিশালী ছিল এবং তথাকথিত 'জলা' জমিগুলিকে ভবিষ্যতের ব্যবহারের কাজে রেখে দেওয়া হত (মেইন, হেনরি, ১৮৯০ : ১২১)।

গ্রামবাসীদের অধিকারের প্রকৃতি ও সীমা এক স্থান থেকে অন্য এক স্থানের আঞ্চলিক পার্থক্য অনুযায়ী নির্ণীত হত। বহু স্বার্থের ও শ্রেণির মানুষ যখন একযোগে কাজ করত, তখনই গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রের সর্বোত্তম চেহারা দেখা যেত। পঞ্চায়েত ছিল প্রধানত বর্ষীয়ানদের নিয়ে গড়া এবং এব সদস্য সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান ছিল। যুবকদের তত গুরুত্ব দেওয়া হত না। কারণ মেইন-এর মতে ভারতীয়রা যোদ্ধা নয় এবং 'সসৈন্য-সম্রাটরা গ্রাম ঘিরে আক্রমণ চালালে গ্রামবাসীরা বিনা প্রতিরোধে তাদের অত্যাচার সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল।" যেখানে পঞ্চায়েত সুদক্ষভাবে কাজ করত না, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রামের একটি পরিবার থেকে প্রধান হিসেবে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হত। গ্রামের অন্যান্য বৃত্তিজীবী—যেমন পুলিশ, সাবেক বণিক, মুচি, কামার-কুমোর, পুরোহিত, নর্তকী, গ্রামের হিসেব-রক্ষক—এঁদের গ্রামের সবাই মিলে কাজের বদলে নিষ্কর জমি বরাদ্দ করত (মেইন, হেনরি, ১৮৯০)।

মেইন কিন্তু বস্তুত এই গ্রামীণ সমাজগুলির অনির্দিষ্ট চরিত্রের প্রশংসা করে উঠতে পারেননি। তাঁর এবং অন্যদের মতে এই সমাজগুলির রূপ ছিল আদিম এবং উৎপাদন-পদ্ধতিও ছিল খুবই নিম্নমানের। তা ছাড়া যেখানে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকত, জমিদাররা লুঠ করে নিতেন। মেইনের বক্তব্য, "যেখানে সম্পদ বলতে প্রায় সম্পূর্ণ কৃষি-উৎপাদন বোঝাত,

সেখানে জমিদারেরা তার ওপর এত বড় থাবা বসাতেন যে কায়ক্লেশে বাঁচা ছাড়া গ্রামবাসীদের আর কোনও উপায়ই থাকত না। সাম্রাজ্য অথবা রাজ্যের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি এক লহমায় কোনও অস্থায়ী কেন্দ্রে চালান হয়ে যেত এই সেই স্থানটি দক্ষ ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পীদের ঘাঁটি হয়ে উঠত। প্রাচ্যের শহরগুলির রাজসভার বিলাসের উপাদান সংগৃহীত হত গ্রামের উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু শোষণ করে (মেইন, হেনরি, ১৮৯০)।

তবে শহরাঞ্চল গ্রামের তুলনায় খুব কমই ছিল এবং অধিকাংশ শহরই ছিল সামরিক-ঘাঁটি সমন্বিত একটি বড় মাপের গ্রাম। গ্রামীণ সমাজ বংশধারা অনুযায়ী সংগঠিত ছিল। যারা প্রথম বন কেটে বসত গড়েছিল, তাদেরই গ্রামপত্তনকারীর প্রধান সম্মান দেওয়া হত। মেইন্ বিভিন্ন স্তরের মানুষের উল্লেখ করেছেন যারা তাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করত এবং এই বলে উপসংহার টেনেছেন—"এরা ছিল বহিরাগত, যাদের নিজস্ব জমি উপনিবেশবাদী বা হানাদাররা দখল করে নিয়েছিল।" বাজারগুলির চেহারা ছিল অগঠিত, খুব কম সময়ই জমি বেচা-কেনা বা ভাড়া দেওয়া বা টাকার জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখা হত।

মেইন অবশ্য বলেছেন বাংলার চাইতে উত্তর ভারতেই এসব প্রথা বেশি চালু ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে পূর্বের অবস্থার যথেষ্ট বদল হলেও কমবেশি অতীতের বাংলাতেও জীবনযাপনের মডেল ছিল একইরকম। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এদেশে মোগল শাসকদের অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির পরিচালনাধীন সমাজব্যবস্থাব অদলবদল ঘটতে থাকে এবং সব জমির মালিক হয়ে ওঠেন সর্বশক্তিমান সম্রাট, এমনকী ব্যক্তিগত জমিরও। পুরোনো গ্রামচিত্রের কিছু আভাস অবশ্য জমিদারি আমলেও পাওয়া যায় যখন তাঁরা রাজস্ব আদায় করতেন এবং গ্রামের ভেতরকার প্রশাসন চালাত গ্রামবাসীরাই (মেইন, হেনরি, ১৮৯০)।

ক্যাম্পবেল : ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি সরকারি কমিটির প্রতিবেদন

জি. ক্যাম্পবেল ও মেইনের ভারত-সম্পর্কিত প্রতিবেদন ইংলন্ডের হাউজ অব কমন্স-এ পেশ করা হয়েছিল এবং কার্ল মার্কস তা থেকে উদ্বৃতিও ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সম্ভবত পশ্চিম ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই মন্তব্য করেছেন যে গ্রামের প্রশাসন এবং শহরে পুরসভার কাজ পরস্পরের পরিপূরক ছিল। গ্রামের প্রধান অঞ্চলের কাজের তদারকি করতেন, বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতেন, পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার এবং রাজস্ব আদায়ের পরিকাঠামো চালনা করতেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য থাকতেন একজন হিসেবরক্ষক, দুষ্কর্ম নিবারণের জন্য এক 'তালিয়ার' এবং ধানের পুঞ্জিগুলির এক রক্ষক। সীমান্তরক্ষী গ্রাম সীমানার পাহারাদার ছিল এবং সীমানা নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হলে তার মীমাংসা করত। দিঘি-পুকুর ও সেচের জলের বণ্টন তদারক করত এক পরিদর্শক। তাছাড়া অন্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জ্যোতিষীদের অস্তিত্ব ছিল। তিনি এই বলে উপসংহার টেনেছেন, এই ধরনের সরল পুর-প্রশাসনের আওতায় একেবারে আদিকাল থেকে দেশের মানুষ জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। "একই নামে, একই সীমার ভেতরে, অভিন্ন স্বার্থে যুগের পর যুগ গ্রামগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।" বাইরে রাজা বদলের কোনও প্রতিক্রিয়া

সেখানে হয়নি।

কিন্তু আমাদের মতো, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির জীবনচর্চাকে এখানে যেমন সরল ও আদিম চেহারায় দেখানো হয়েছে, বাস্তবে তা নয়।

পরিশিষ্ট—খ

উৎপাদনের এশীয়-পদ্ধতি

জেমস মিল-ই প্রথম 'সরকারের এশীয়-মডেল'-এর উল্লেখ করে বলেন ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে এর কোনও তুলনা হয় না (উইটকোগাল, কার্ল এ., ১৯৫৭)। কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে সরাসরি কোনও জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পাননি। তথ্যের সন্ধানে তাঁকে ব্রিটিশ পাঠাগারে পড়াশোনা ও গবেষণা করতে হয়েছিল এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হয়েছিল, ইংরেজ প্রশাসক ও গবেষক মেইন বা ক্যাম্পবেল-এর রচনা পাঠ করে (হবস্‌বাস, এরিক, ১৯৭৮)। আদি সাম্যবাদ থেকে ক্রমান্বয়ে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যে ঐতিহাসিক বিবর্তন রেখাটি টেনেছিলেন তিনি তার সঙ্গে এশীয়-পদ্ধতির ফারাক তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। শুধু শিকার-ফলমূল সংগ্রহ বা যা পাওয়া যায় ভাগ করে খাওয়ার আদিম অর্থনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্ন নয়। কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকলেও 'আদি সমাজতন্ত্রের' সঙ্গে মার্কস এশীয় গ্রামীণ জীবনের তুলনা করেননি, কারণ সেখানে উত্তরাধিকার-অনুযায়ী শাসক এবং সামন্ততান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল।

মার্কস ভারত নিয়ে যেটুকু পড়াশোনা করেছিলেন, তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ও শ্রেণিগুলির বিবর্তনের সঙ্গে ইউরোপীয় ইতিহাসের মিল নেই। তাঁর 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এর বিশ্লেষণের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গঠনের সহায়তায় লেগেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ইউরোপের পূর্ণ বিকশিত সামন্ততন্ত্র বা রোম ও গ্রিসের দাসদের নগর সভ্যতার তুলনা টানলে ভুল হবে।

তাঁর কাছে প্রকৃত প্রশ্ন ছিল যে, কোথায় তিনি এই সমাজব্যবস্থাকে রাখবেন? মার্কস একেই 'এশীয়-পদ্ধতি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকা থেকে কোনও তথ্য তাঁর হাতে আসেনি, ফলে ইংরেজদের লেখালেখি নিয়েই তাঁকে কাজ চালাতে হয়েছিল। পরে অবশ্য এঙ্গেলস-এর সঙ্গে তিনি জার্মানির 'মার্ক' এবং রুশদেশের 'মীর' এবং ইউরোপের অন্যান্য সমাজগুলির সম্পর্কে নিবিড় পাঠ নিতে গিয়ে উপলব্ধি করেন এশিয়া-সম্পর্কে তাঁর আগেকার ইতিহাস চর্চায় কিছু কিছু ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। পরিবারের উদ্ভব, রাজ্য ও ব্যক্তি-সম্পত্তির ওপর এঙ্গেলস-এর বিখ্যাত গবেষণা কর্মে কিন্তু এই সমাজব্যবস্থার কোনও আলোচনা নেই। এঙ্গেলস-এর অভিমত কাজ করতে গিয়ে মার্কস দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো বা ভারতের গ্রামীণ জীবনধারার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পান। সেদিকে চোখ ফেরানোর আগে এশীয়-পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্পর্কে মার্কস-

এর চিন্তাধারার মূল পর্যালোচনা করতে হবে (এঙ্গেলস্, ফ্রেডরিক : ২৭৪-২৯৩)।

মার্কস-এর মতে এশিয়ার সমাজগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ উৎপাদন পদ্ধতি। বছরের পর বছর একই উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটত এবং শত শত বছরেও এর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। চাষের কৃৎকৌশল ছিল অপরিবর্তনীয় ও সাবেক-চরিত্রের এবং গ্রামের কাজকর্মের ক্ষেত্রে বৃত্তি-বিন্যাসেরও তাই। খরা, বন্যা, ভূমিকম্পের সময়েও উৎপাদন ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন করা হত না। যন্ত্র বা পুঁজি নিয়োগ কিছুই না থাকায় প্রগতির কোনও লক্ষণ দেখা যেত না। গ্রামের মানুষজন চাষে বা জীবনযাপনে একটানা পুরোনো ধারার অনুসরণ করে চলত। অনুন্নত চেহারার এক ধরনের সাম্য তাদের জীবনকে চালনা করত। তাদের চাহিদা ছিল এত কম যে গ্রামের ভেতরেই তার সংকুলান হয়ে যেত।

তবে এই বছরের পর বছর একই ধারায় ফসল উৎপাদনকারীদের সম্পর্কে মার্কস কোনও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। ইংরেজদের শোষণ, বর্বরতা, উপনিবেশগুলিতে গ্রামীণ হস্তশিল্পিগুলির ধ্বংসসাধন সম্পর্কে প্রবল ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি। বদ্ধ জলায় ঢিল ছুড়ে নতুন তরঙ্গ তোলার মতো ইংরেজ-শাসন বস্তুত 'ইতিহাসের এক অচেতন ভূমিকা' হিসেবে কাজ করেছে বলে তাঁর ধারণা (মার্কস, কার্ল, ১৮৫৩ : ৭৫-৭৬)।

এশীয়-পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার শেষে এহেন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি শ্রেণি ছিল জমিদার ও কৃষক। জমিদার অর্থাৎ ভূস্বামীরা প্রধানত ছিল রাজস্ব আদায়কারী। জমিদাররা যখন তাদের জমি বিক্রয় বা দান করতেন, বস্তুত তাঁরা তাঁদের রাজস্ব আদায়ের অধিকারই অন্যপক্ষের হাতে তুলে দিতেন। গ্রামাঞ্চলে ক্রয় ক্ষমতা ছিল না, তাই গ্রামে শহরের মতো বড় বড় জিনিস হতে পারত না।

কৃষককুল মোটামুটি নিজেদের ধারায় জীবন চালিয়ে যেত। গ্রামের জমিতে সম্প্রদায়গতভাবে একই পদ্ধতিতে উত্তরাধিকারসূত্রে চাষবাস চলত, কৃষকদের মধ্যে তেমন কোনও শ্রেণি বৈষম্য ছিল না এবং গ্রাম-পর্ষদের পরিচালনায় শ্রম বিভাজন ও কাজকর্ম নির্দিষ্ট করা ছিল। সবার স্বার্থ রক্ষা করা ছিল এই পর্ষদের দায়িত্ব।

কমবেশি গ্রামীণ মানুষজনের এই সমতা এবং কৃষিকাজের হাল-বলদ দিয়ে আবাদের সরল ব্যবস্থা চালু ছিল। কেবল বর্ষায় এক ফসলি উৎপাদন হত। ব্যক্তি সম্পত্তির উদাহরণ ছিলই না বলা চলে। যেটুকু উদ্বৃত্ত হত তা দিয়ে জীবনযাপনের জন্য অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করা এবং বাইরের রাজস্ব মেটানো হত। 'কৃষি ও শিল্পের ঐক্য' যা কৃষক ও কারিগরদের যৌথ ক্ষমতার ফল, গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করেছিল, তবে বিলাসসামগ্রী, বা নুনের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার প্রশ্ন ছিল স্বতন্ত্র। গ্রামে পাওয়া যায় এমন কিছু জিনিসপত্র বাইরে থেকে ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালারা নদীপথে বহন করে নিয়ে আসত।

অধিকাংশ কারিগরই ছিল আংশিক সময়ের, তারা প্রচলিত রীতিতেই চাষবাস করত ও তাদের কারিগরি উৎপাদনের দাম দেওয়া হত চাল দিয়ে। ছুতোর-কামার-তন্তুবায়-স্যাকরা-কুমোর বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত গ্রাম-পর্ষদ। তা ছাড়া গ্রামের ভৃত্যশ্রেণি, নাপিত, ধোপা, পুরোহিত—এদেরও গ্রাসাচ্ছাদানের ব্যবস্থা করা হত বিভিন্ন সামগ্রী ও অন্যান্য ধরনের মজুরি দিয়ে। তবে অঞ্চল ভিত্তিতে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটত।

আরও দুটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অনেক সাম্রাজ্য ভাঙা ও গড়ার

ভেতরেও গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনচর্চা বস্তুত অব্যাহতই থেকে যেত। বাইরের শাসকরা রাজস্বের আদায় পেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন, গ্রামের ভেতরকার ব্যাপারে মাথা গলাতেন না। গ্রামবাসীর প্রতিদিনের জীবনে সে অর্থে 'রাষ্ট্র' কথাটির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় গ্রামের শ্রমশক্তিকে কখনও সখনও খানিক পরিমাণে ব্যবহার করা হত বটে তবে শাসকদের নিজেদের সংগঠিত সেনাবাহিনীই ছিল যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সাধারণত ছিল উৎপাদনের পক্ষে প্রতিকূল। কিন্তু সাধারণভাবে গোটা দেশের সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে স্বয়ম্ভর বাংলার গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতিতে এসবের চাপ খুব একটা পড়ত না। শ্রমিকদের স্থানান্তর প্রায় হতই না, কারণ জাতপাতের বিচার ও অন্যত্র কাজে জোগাড়ের অসুবিধে—দুটোই প্রবল ছিল। এই গ্রামীণ-পরিস্থিতিতে ভূস্বামী ভাগচাষি বা নজরদার কৃষক মজুর—এ জাতীয় কোনও আলাদা সম্পর্কের বিন্যাস সম্ভব ছিল না।

আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি যে রাষ্ট্রের উদ্ভব, ব্যক্তি-অধিকারের অভ্যুত্থান এবং বিস্তারিত শ্রম-বিভাজন প্রভৃতির কোনও অস্তিত্ব বাংলায় ছিল না।

পরিশিষ্ট—গ

জমিদার ও জোতদার

রত্নলেখা রায়ের মতে, পলাশির যুদ্ধের সময়কালে কৃষিজীবীদের পৃথগীকরণ এমন এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল যখন তাদের মধ্যে ধনী এবং জোতদারদের একটি পৃথক শ্রেণির উদ্ভব হ'ল। শুধু তাই নয়, জমিদারদের ক্ষমতা যেখানে রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে ভূমি সমস্যা নির্ণয়ের ভার ছিল জোতদারদের উপর। পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার সঙ্গে প্রথমটির মিল নেই। তাঁর মতে জমিদারির ক্ষেত্র অর্থনীতির অপেক্ষা রাজনীতির স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল বেশি (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯: ২১)। রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যে তাহলে কে কাকে পরিচালনা করত? জোতদাররা যদি ভূস্বামীর কাজই দেখত এবং সেই অর্থে জমিদারদের চেয়েও ছিল বেশি ক্ষমতাবান, তাহলে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের জমিদারদের অনুমতি নিতে হত কেন? প্রভূত বিভ্রান্তির সৃষ্টি এখানেই। জমিদার, যিনি রাজস্ব সংগ্রহ করতেন তিনি কি আর্থিক নীতিকে পরিচালনা করতেন না? আর জোতদারেরা যাঁরা ভূমি শাসনের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদেরই বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল কতটুকু। শ্রীমতী রায়ের বর্ণনার বিপরীত ছিল না কি তাদের ভূমিকা? শ্রীমতী রায়ের অভিমত অনুযায়ী জোতদারেরা প্রায়শই জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিত। জমিদাররা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এমনকী, অতিরিক্ত করের বোঝা জোতদারদের দিয়ে পাস করিয়ে নিতেন। এর কুফল ভোগ করত গরিব কৃষক শ্রেণি যাদের ক্ষমতা ছিল খুব অল্পই। অন্য অর্থে জোতদারদের দ্বারা পরিচালিত এই ব্যবস্থা নিম্নবর্গের রায়তদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করত। রায়তদের জমিদারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলে

তা ঘটত না (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ৫২-৭২)।

তাহলে, প্রাক্ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে জোতদারেরা কি জমিদারদের থেকে বেশি ক্ষমতাশালী ছিল। শ্রীমতী রায়ের বইটি ভালো করে পড়লে দেখা যায় যে এর যথার্থ উত্তর নেই। শ্রীমতী রায়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণটি গড়ে উঠেছে কোলব্রুক এবং বুচানন হ্যামিলটনের রচনাবলি এবং জেলা কালেক্টরদের ১৭৮০-পরবর্তী বিবরণের থেকে। ১৭৫৭ সালের পূর্ববর্তী কোনও বিবরণের তিনি উল্লেখ করেননি। তা হলে তিনি প্রাক্ ব্রিটিশ সমাজের জোতদারদের ভূমিকা নিয়ে এরকম দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন কীভাবে?

এ সবের উত্তর শ্রীমতী রায় প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্বে নেই। আছে তার যুক্তি বিন্যাসে। তার লেখার মূল প্রতিপাদ্য হ'ল যে, ১৮৮০ সালের পরবর্তী রেকর্ড সমূহ প্রমাণ করে উন্নতমানের ভাড়াটিয়া প্রথার উত্থান। যদিও তৎকালীন সাহিত্য এবং রাজস্বের সূত্রে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে ১৭৬০ অথবা ১৭৭২-এর মধ্যে কোনও ধনী কৃষিজীবী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ৫৭)। বরং মনে হতে পারে যে ধনী কৃষকের ক্ষমতা নিহিত ছিল গ্রামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর গভীরে (প্রাক্ ব্রিটিশ সমাজে - লেখক)।

ওই একই কথার উল্লেখ পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন, "কোনও প্রমাণ নেই যে ১৭৬০ থেকে ১৭৯০-এর মধ্যে জোতদার শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল" (রায়, রত্নলেখা, ১৯৭৯ : ৫৮)। তিনি আর বলেন যে, "তাদের ঠিক কবে উদ্ভব হয়েছিল তা জানতে হলে গ্রাম বাঙলার মধ্যযুগীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা দরকার, তবু এটুকু বলা যেতেই পারে যে বাংলার কৃষি সমাজে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ৫৫)"। এই যুক্তির থেকে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন, "যদি তিরিশ বছরের অল্প ব্যবধানের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে উঠত, তা সম্ভব হত একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। যার গভীরতা নিশ্চই তৎকালীন পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ৫৯)।

আমাদের যুক্তি, ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ, যাতে প্রতি ষোলোজনে ছয়জনের জীবনহানি হয়েছিল এবং কৃষিজীবীদের অর্ধেকের এই পরিণতি হয়েছিল, এই ক্ষতি সামলাতে দুটি প্রজন্ম লেগেছিল। এই ঘটনার গুরুত্ব অনায়াসেই তৎকালীন পর্যবেক্ষকদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং এই পটভূমিকাকেই জোতদার শ্রেণির উত্থানের কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

তাঁর আর একটি যুক্তি এই যে কোলব্রুক এবং বুচানন হ্যামিলটন এই দুই সমকালীন পণ্ডিতদের রচনা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। এই দুই গ্রন্থকারের রচনাবলির নিবিড় পর্যালোচনা করলে গ্রাম্য সমাজের ধনী কৃষিজীবীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ শাসনের পত্তনের কয়েক দশক পরে এই দুই প্রধান রচনা প্রকাশিত হয়। যেমন কোলব্রুকের লেখা প্রকাশিত হয় চার দশক পরে (১৭৯৪) (কোলব্রুক, এইচ. টি. ১৮০৪ : ৯১-৯২) এবং বুচানন হ্যামিলটনের বই প্রকাশ হতে লেগে যায় পাঁচ দশক (বুচানন-হ্যমিলটন, ফ্রান্সিস : ৭৩-৭৫)। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব এতে যুক্ত হয়েছিল। কোলব্রুক এবং বুচানন হ্যামিলটন ব্রিটিশ শাসনের আগের ভূমি এবং শ্রম সম্পর্ক নিয়ে কোনও আলোকপাত করেননি।

মন্তব্য

১. এমনকি, মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমলেও কর আদায়ের দায়িত্ব হিন্দু সামন্ত রাজাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। কারণ মুসলমান যোদ্ধাদের তুলনায় করের খুঁটিনাটি তাঁরাই ভালো বুঝতেন। সম্রাট বা সুবেদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও তাঁদের আগ্রহ কম ছিল (ফারমিঙ্গার, ওয়াল্টার কেলি, ১৯১৭, ৩৫)।

২. সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে এসেও বাংলার মাত্র ১.৫ % গ্রামে জরিপ হয়েছিল। গোটা সাম্রাজ্যের এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৯% (রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯ : ১৮)।

৩. জমি বিক্রির দলিল ঘাঁটলে অনেক রকম জমির অধিকার লক্ষ করা যায় : লাখরাজ (আশরক মুসলমানদের নিষ্কর জমি), খানবাটি (খাদ্যের জন্য তরিতরকারির আবাদ), ফকিরান, চেরাগি, খয়রাত (দানসূচক), কোরশিলা, বাঁজা জমিন, ব্রহ্মোত্তর, বসতবাটি প্রভৃতি (দাসগুপ্ত, রতন, ২০০০, ১৩২)।

৪. উত্তর ভারতে, প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে গোপালন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানুষজন ছিলেন। পাণিনির ভাষ্য অনুসারে, গোখাদ্যের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ১২ বছরের ক্রমপর্যায় অনুসরণ করা হত। গোচারণ হত সমবেতভাবে। কিন্তু, চারণভূমি ব্যক্তিগত ছিল। গোপালকদের বসতি পরিচিত ছিল ঘোষ বা গোপাল নামে (আগরওয়ালা, ১৯৫৩ : ১৪২)

৫. তাঁর শাসনকালে, শায়েস্তা খাঁ দিল্লির বাদশাকে প্রচুর অর্থ জুগিয়েছেন। ১৬৮০ সালে সম্রাট, তাঁর কাছ থেকে সাত লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে নেন - যে অর্থ কোনওদিনই শোধ হয়নি। ১৬৭৮ সালে, প্রথম দফার নবাবির পর শায়েস্তা খাঁ বাদশাকে ৩০ লক্ষ টাকা নগদে এবং ৪ লক্ষ টাকার মণিরত্ন উপহার দেন। ১৬৮২ সাল থেকে, প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা নজরানা পৌঁছে যেত দিল্লিতে। প্রজা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-সহ বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এই অর্থ জোগাড় হত। ব্যক্তিগতভাবেও শায়েস্তা খাঁ যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। একটি হিসাব অনুসারে তার সঞ্চয় ১৭ কোটি টাকা। অন্য মতে ৩৮ কোটি টাকা। তিনি এবং অন্যান্য শাসকরা যা করতেন, তা হল, কোন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য বস্তুর সরবরাহের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করা এবং বিক্রির সময় দাম বাড়িয়ে দেওয়া। এ ছাড়া পরবর্তীকালে এই শাসকরা সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তু কম দামে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করতেন (সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ৩৭৩-৩৭৫)। এছাড়া শোনা যায় যে, মীর জুমলা কুচবিহার আর অসমে প্রচারের সময় ঢাকার শস্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২৫০০০ টাকা এবং মহাজনদের কাছ থেকে ৩ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন (সরকার, জগদীশ নারায়ণ, ১৯৭৩ : ৩৪৪)।

৩.৩

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শহরগুলি

ভূমিকা

পূর্বে ব্যবসায় অধোগতি দেখা দিলেও পরবর্তীকালে তুর্কি-আফগানদের বাংলা বিজয়ের পর থেকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বাংলায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দু'রকম ভাবে লক্ষ করা যায়। আগের যুগে অধোগতির বিশেষ কারণ ছিল স্থল এবং জলপথে ব্যবসা চালু রাখার বাধা, যা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আরবদের কর্তৃত্বের জন্য সম্ভব ছিল না। নতুন শাসকেরা একই ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের পক্ষে আরবের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংযোগ রাখা সহজ হল। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর একশো বছর পর্যন্ত জলপথে সেই প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। এই সম্পর্কের জেরে পূর্বে ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকার বন্দরগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলা এবং দিল্লির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় সারা ভারতের সঙ্গেই বাংলার ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হল। ব্যবসার কারণে গঙ্গা নদীতে নৌকায় মালপত্র দেওয়া-নেওয়ার সুবিধা হ'ল। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতেও, তটরেখা দিয়ে এবং পর্বত পথে ব্যবসাকে ইউরোপ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল।

ব্যবসার প্রসারের কারণে নতুন নতুন বন্দর শহরের সৃষ্টি হল। গৌড় যাকে লখনৌটিও বলা হয়, তার অবস্থান গঙ্গা যেখানে পদ্মা এবং ভাগীরথীতে বিভক্ত হয়েছে সেখানে হওয়ায়, সেটি একটি উল্লেখযোগ্য বন্দরের রূপ নিল ভারত অভ্যন্তরে সর্বত্র মালপত্র আদান-প্রদানের জন্য। অন্যদিকে চট্টগ্রাম একটি প্রধান বন্দর হিসেবে গড়ে উঠল, যা আরবের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ খুলে দিল। এই দুটি প্রধান বন্দর ছাড়াও পূর্বে সপ্তগ্রাম আর পশ্চিমে সোনারগাঁও বন্দর গড়ে উঠল। সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম এবং নদীপথে গৌড়ের সঙ্গে এই বন্দরগুলির নিয়মিত সম্পর্ক স্থাপিত হল।

গৌড়, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও এবং সপ্তগ্রাম, এই চারটি বন্দর মিলে ব্যবসা এবং রাজনীতিতে এক অদ্ভুত চতুর্বর্গীয় ব্যবস্থা কায়েম করল। এই পর্বের শেষ দিকে ঢাকা তার নিকটবর্তী সোনারগাঁওয়ের বিকল্প হিসাবে দেখা দিল। সপ্তগ্রাম গৌড়ের জোগানদারী বন্দর রূপে গড়ে উঠল, এবং পরে পোর্তুগিজ আগমনের পর যা চট্টগ্রাম অবধি প্রসারিত হল।

ষষ্ঠ শতকের পূর্বে এবং ইউরোপের মধ্যযুগে যেমন ছিল সেরকম কোনও শিল্প ব্যবসায়ী সমিতি তখনও গড়ে ওঠেনি। দক্ষ কারিগরি কিংবা শিল্পকর্ম ছিল জাতিভিত্তিক, হিন্দু বা মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই। এই কর্মসূচি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই কারিগরি শিক্ষানবিশি গুরু-শিষ্য সম্পর্কের দ্বারা স্থাপিত হত। এই ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত যতক্ষণ না পর্যন্ত শিষ্য গুরুকন্যাকে বিবাহ করে স্বাধীন শিল্পকর্ম শিখে একজন দক্ষ কারিগরে পরিণত হচ্ছে, এবং তার অধীনে শিক্ষানবিশি শুরু হচ্ছে। এই ব্যবস্থা পারিবারিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল যা গ্রামীণ অর্থনীতির চেয়ে ছিল আলাদা। এটা একটা নতুন ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হল।

শহর এবং গ্রামের মধ্যে পার্থক্য, সামরিক এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম, শিল্পোদ্যোগের আরম্ভ

ছিল ওই সময়ে শহরে বাংলার প্রধান ঘটনাবলি। 'দাস' এবং 'নপুংসক'দের বারংবার উল্লেখও ওই সময় পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে না হলেও, দাস প্রথা আগেও প্রচলিত ছিল। এই সময় দাসবৃত্তির জন্য ইথিওপিয়া থেকেও অনেককে আনা হয়, তারা বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা বিদেশে গেলে, তাদের পরিবারের রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকত। এই সব দাসেরা আজীবন ব্যক্তিগত পরিচারকের কাজ করলেও, নিজেদের জীবনেও কিছু অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করত।

শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রের একটি প্রধান কাজ ছিল মুদ্রা তৈরি করা। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির বাংলা অধিকারের সময় থেকে ১৫৭৫ সালের মোগলদের আগমনের সময় পর্যন্ত তেইশটি মুদ্রানগরীর খবর পাওয়া যায়।[১] সেগুলি হল লাখনৌটি, ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, মৌজামাবাদ, সারেনাও, গিয়াসপুর, ফতেবাদ, হুসেনাবাদ, খালিফতাবাদ, মুজাম্মারাবাদ, মুজঃফরাবাদ, চট্টগ্রাম, মাহমুদাবাদ, মহম্মদাবাদ, আরকান, টান্ডা, রোহতাশপুর, জন্নতাবাদ, নাসরাতাবাদ, বারবাকাবাদ, আউলিস্থান, চন্দ্রাবাদ এবং বঙ্গ, এগুলির অবশ্য খুব নির্দিষ্ট পরিচিতি নেই এবং কিছু শহর তালিকায় ভিন্ন নামেও উল্লেখিত আছে। যেমন সারেনাও অর্থাৎ নতুন শহর যার উল্লেখ পুরানো গৌড়ের কাছে পাণ্ডুয়া নামেও উল্লেখিত আছে (খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬ : ৩; দত্ত, চিন্ময়, ১৯৮৬)। অনেক ক্ষেত্রেই মুদ্রাগুলি বিতরণ করা হত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে, যেমন কোনও স্মরণীয় যুদ্ধের জয়ের জন্যও। আর্থিক লেনদেনের জন্য যার ব্যবহার ছিল খুবই কম'।

বাণিজ্য চতুর্ভুজ

সেই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত চারটি প্রধান শহরে। রাজধানী হবার জন্য গৌড়ই ছিল এদের প্রধান। গৌড় এবং তার পার্শ্বস্থ শহরগুলির বিবরণ দিয়েই শুরু করছি। পরে বাকি তিনটি উল্লেখযোগ্য নাগরিক বন্দরের বিবরণ দেওয়া হবে।

গৌড়

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ১২০৪-এর পূর্ববর্তী বাংলায় গৌড় বলতে বিভিন্ন পরিদর্শকের বিবরণ অনুযায়ী দেশ এবং রাজধানী উভয়কেই বোঝাত। তাই একে গৌড়বাংলা বা শুধু বাংলা বলা হত। এবং বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকরা একে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করত যেমন বাংঘেলী (বারবোসা ডুয়ার্টে, ১৫১৮) বাংলা, বেঙ্গুলা এবং আয়ো অন্যান্য শব্দে।[২] তাই, সময়ে সময়ে গৌড় শহরকে ওই সব নামেও ডাকা হত। ফলে, স্থান নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ১৩৭৫ সালে কাটালান মানচিত্রে গৌড়কে বাঙ্গালা শহর হিসেবে দেখানো হয়। এবং সেই কারণে বিদেশি পর্যটকদের কাছে গৌড় এই নামেই পরিচিত ছিল। গৌড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় সমূহকে পাণ্ডুয়া এবং টান্ডা নামক পার্শ্ববর্তী শহরের অংশ হিসেবেও দেখানো হত। কারণ গৌড়ের সঙ্গে এক সময় এদেরও রাজধানী অংশ হিসেবে গণ্য করা হত।

পোর্তুগিজ ঐতিহাসিক সউফা লিখেছিলেন "প্রধান শহর গৌড় গঙ্গার তীরে অবস্থিত এর লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ দু হাজার পরিবার, শহরটি ছিল সুরক্ষিত, রাস্তাগুলি ছিল চওড়া এবং সোজা, তার দুইধারে ছিল গাছপালা (সৌফা, ম্যনুয়েল ডি ফারিয়া, ১৬৯৪ :

৪১৬-৪১৭)।" যদিও তিনি শহরের নামকরণ সম্বন্ধে ভুল করেননি কিন্তু লোকসংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে তার নির্ণয় ভুল ছিল। কারণ ১.২ মিলিয়ন পরিবার হলে এবং প্রতি পরিবারে গড়ে পাঁচজন সদস্য থাকলে, লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ছয় মিলিয়ন বা ষাট লক্ষ যা আসলে দেশের লোকসংখ্যার থেকেও বেশি হয়ে যায়। সুতরাং এই সংখ্যাটিকে গুরুত্ব না দিয়েও একথা বলা যায় যে গৌড় যে একটি বৃহৎ শহর ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সৌফা অন্যান্য প্রধান শহরগুলির কথাও জানতেন। তার বর্ণনায় আছে, গঙ্গার মোহনায় পূর্বদিকে ছিল 'চাটিগ্রামের' অবস্থান, যেমন পশ্চিমে ছিল 'সতিগ্রাম'। গঙ্গা বাংলাকে দুভাগে ভাগ করেছে। নদীর পশ্চিমে ছিল কসপেতির (এটা কোথায়? - লেখক)। তার বর্ণনায় পাওয়া যায়, বাংলার সমতলভূমি গঙ্গা নদীর দ্বারা প্লাবিত হত, যেমন নীলনদ প্লাবিত করত মিশরকে।

বারবোসা, শহরটির উল্লেখ করেছেন "বাংগালা" নামে।[৩] "উত্তরে, মুরদের একটি প্রধান শহর ছিল যাকে বাঙ্গলা বলা হত।" তিনি বলেছেন, "এখানে সমুদ্র এবং আকাশ মিলেছে এবং এদের স্বাধীন মুর রাজা আছে। অধিবাসীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ফর্সা, এবং নানা পর্যটকদের ভিড় এই শহরে যেমন আরবি, পারসি, আবিসিনিয়ান এবং ভারতীয়। ফলে এ জায়গা ছিল বৃহৎ, সুস্বাস্থ্য এবং সম্পদে প্রাচুর্যপূর্ণ। এরা সবাই ছিল খুবই ধনী ব্যবসায়ী এবং এদের ছিল মক্কার মতো জাহাজ রাখার বিলাসিতা (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৪ : ১৩৫-১৪২)।" এই বিবরণে কিন্তু ভ্রান্তি ছিল অনেক। গৌড়, যার অবস্থান ছিল সমতলের অনেক ভিতরে, তা সমুদ্র আকাশের মিলনকেন্দ্র হয় কেমন করে? তিনি কি তাহলে সপ্তগ্রাম' বা সোনারগাঁওয়ের মতো শহরের উল্লেখ করতে চেয়েছেন? কিংবা চট্টগ্রাম? তাহলে 'উত্তরে অবস্থিত' এই কথার সঙ্গে এর মিল কোথায়? তাহলে কি তিনি অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছেন? এই ফর্সা মানুষই বা কারা? এরা কি আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী নাকি সদ্য আগত ইরানি বা আফগান অধিবাসী? এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। দাস সম্প্রদায়কে নিয়ে বারবোসার অভিমত আমরা পরিচ্ছেদ ৩.১-এ আগেই উল্লেখ করেছি।

এছাড়া তিনি লক্ষ করেছিলেন যে নগরের জনগণের মধ্যে অনেক বৈষম্য ছিল। শাসক সম্প্রদায়ের সাজসজ্জা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা ছিল। "সম্ভ্রান্ত মুরেরা চলাফেরা করত সুতির সূক্ষ্ম কুর্তা পরে ভিতরে পরত সিল্কের দামি পোশাক। তাদের কোমরে গোঁজা থাকত স্বর্ণ এবং রৌপ্যখচিত ছুরি। আঙুলে থাকত মণিমাণিক্যখচিত আংটি আর মাথায় উত্তরীয়। তারা সর্বঅর্থে বিলাসী ছিলেন, আহারে-বিহারে তারা দুহাতে খরচা করতেন। অন্যপক্ষে শহরের নিচুতলার মানুষরা পড়ত হাঁটু পর্যন্ত খাটো সাদা পোশাক (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮ : ১৪৮)।

শহরের মানুষরা নিয়মিত স্নান করত দেখে তার ভালো লেগেছিল। কিন্তু এক একজনের তিন-চার বা ততোধিক বিবাহরীতি তার পছন্দ হয়নি। উৎসবাদি এবং পানীয় ইত্যাদিতে তাদের সময় কাটত। উৎসব অনুষ্ঠানে সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮ : ১৪৮)।

আবুল ফজলের "আইনী আকবরি"তে সাম্রাজ্যের স্বর্ণমুদ্রা তৈরির নগর হিসাবে চারটি শহরের মধ্যে গৌড়বাংলার নাম পাওয়া যায়। ১৫৩৭ সালে গৌড়ের জনসংখ্যা হিসাবে এক দশমিক দুই মিলিয়ন পরিবারের উল্লেখ আছে যা বারবোসার পরিসংখ্যানের সঙ্গে কমবেশি

মিলে যায়। তার মতে গৌড়ের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ছিল না। ফলে বাংলার রাজধানী টান্ডার নিকট স্থানান্তরিত করা হয়। তান্ডা ছিল নদীপথে কয়েক মাইল উত্তরে (ভার্তেমা, লুডোভিকো ডি, ১৮৬৩ : ২১১)।

ভার্তেমার পরিদর্শনের সময় এই শহরের কোনও অংশই নদীর নিকটস্থ ছিল না। তবু এই শহর দেখে তিনি সন্তুষ্ট হন, "বসবাসের পক্ষে এই শহর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শহরে, মহিলারা নন, পুরুষরা তাঁত বোনার কাজ করতেন।"[৪] ভার্তেমা তাঁর পুস্তকে এও বলেছেন, "আমার দেখা শহরগুলির মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। এখানে মুর শাসকের অধীন দুই লক্ষাধিক পদাতিক এবং অশ্বারোহী রয়েছে (ভার্তেমা, লুডোভিকো, ডি, ১৮৬৩ : ২১১, ২১৪)।

পোর্তুগিজ পরিব্রাজক ডুয়ার্টে বারবোসা গৌড়কে দুই লক্ষাধিক জনাকীর্ণ শহর বলে উল্লেখ করেছেন। শহরের রাস্তাগুলি খুব চওড়া এবং সোজা এবং রাস্তার দুধারে সারিসারি দোকান ছিল। ফরাসি পরিদর্শক লে ব্ল্যাঙ্ককের বইটি প্রকাশিত হয় সপ্তদশ শতকেব মধ্যভাগে, যা ১৫৬৭ সালের সময়বর্তী যুগকে ধরে লেখা হয়েছে। অনেক বিদেশি ব্যবসায়ী তখন ছিলেন, যেমন গ্রিক, আবিসিনিয়ান, রাশিয়ান, তুর্কি, মুর, ইহুদি, চৈনিক এবং জর্জিযান। লে ব্ল্যাঙ্ক একে মুরদের শহর বলেই উল্লেখ করেছেন। শহরে ৪০,০০০ বাসস্থানের তিনি সন্ধান পান এবং বলেন, রাজা সুন্দর ইটের তৈরি বাগানওয়ালা প্রাসাদে বাস করতেন। তাঁর লেখা থেকে জানি যে কোনও নাগরিক স্বল্প মূল্যে তরুণ ক্রীতদাস রাখতে পারতেন। অন্যদের তুলনায় তিনি বাংলার আবহাওয়ার প্রশংসা করেছেন বেশি (রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯২ : ৬৩; রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৮৬; খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬ : ২৯)।

প্লেগের কারণে লোকেরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল—বুচানন হ্যামিলটন অবশ্য একথা স্বীকার করেননি। বরং তার মতে ষোলোশো উনচল্লিশ সালে যুবরাজ সুজা শাহর শাসন কালে অনেক গৃহ এখানে তৈরি হয়েছিল। যদিও রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল রাজমহলে। জানা যায় যে শহরের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী শহরগুলোর গৃহনির্মাণ কাজে। এমনকি মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্সি নির্মাণের কাজেও। বুচানন হ্যামিলটন ওই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পরিখা দিয়ে ঘেরা চারশো গজের একটি স্থানও লক্ষ করেন। শহরটি ছিল ছয়শো গজ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের এক চতুর্থাংশের মতো। শহরের দুর্গটি তার গৌরবময় পর্বে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল। লম্বায় উত্তর-দক্ষিণে ছিল এক মাইল এবং চওড়ায় ছিল ৬০০-৮০০ গজের মতো। শহরটির আয়তন ছিল ১৩ বর্গ মাইল এবং ঘনবসতিপূর্ণ। এখানেই বাংলার গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু স্থাপত্য সাগরদিঘি ছিল (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., খণ্ড ৭ : ৫৪-৫৫; খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬ : ৩১)। পিরেস্-এর রচনাতেও বাংলার রাজধানীর উল্লেখ আছে। চল্লিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে বেশিরভাগই থাকত কুঁড়েঘরে আর রাজা অবস্থান করতেন সুরম্য প্রাসাদে।

পান্ডুয়া

টান্ডার মতোই পরবর্তীকালে গৌড় নামটি পান্ডুয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। লখনৌটি-গৌড়ের থেকে বেশি দূরে নয়। ১৩৫২-র পর পান্ডুয়া বেশ কিছু সময় বাংলার রাজধানী ছিল, তখন

ইলিয়াস শাহ — দিল্লির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং রাজধানী তান্ডায় স্থানান্তরিত করেন। (ইটন, রিচার্ড, এম. ১৯৯৩ : ৪০)। "নতুন শহর" পান্ডুয়ায় সেই সময় ইলিয়াস শাহ এবং সেকেন্দর শাহর নামে তিনটি মুদ্রা পাওয়া যায়। (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩ : ৩৮৪)। পাণ্ডুয়ার অবস্থান গৌড় থেকে কুড়ি মাইল দূরে, মালদহ থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে। এক সময় এই শহর ভাগীরথী নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। যেখানে ভাগীরথী মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে এবং যার তিন মাইল দূরে ছিল আদিনা মসজিদ। নদীপথে পূর্ব বাংলার সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে ছিল এর যোগাযোগ (খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬)। ফিরোজাবাদ নামেও এর পরিচিতি ছিল। পাঁচজন শাসক এই শহর থেকে রাজ্য চালিয়েছেন। ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল এই অঞ্চল, ফলে মোগলদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চল। এখানেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব দাউদখান মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হন এবং ১৬৭৫ সালে বিজয়ী মোগল সেনাপতি মুনিম খান ক্ষমতা দখল করেন এবং তান্ডা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন গৌড়-লাখনৌটিতে। সংক্রামক রোগে বহু সৈন্যর মৃত্যু ঘটলে রাজধানী আবার টান্ডায় স্থানান্তরিত হয়। পান্ডুয়ায় ছিল ৫০০ বছরের পুরনো ভাস্কর্য শিল্পের বৃহত্তম নিদর্শন আদিনা মসজিদ। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৫৬৫ এবং ৩১৭ ফুট বিস্তৃত এই মসজিদ ভারতীয় উপমহাদেশের এক বৃহত্তম সৃষ্টি। চৈনিক পরিব্রাজক মা-হুয়ান চট্টগ্রাম এবং সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। তিনি পাং-কো-লা বা বাংলায়ও এসেছিলেন। তার লেখায় প্রাচীর ঘেরা এক নগরীর উল্লেখ আছে। আর এক চৈনিক পরিব্রাজক ফেঙ-ফে-সিন ১৪১২-১৪১৮ মধ্যবর্তী সময় পান্ডুয়ায় ঘুরে যান। হোসেন শাহর রাজত্বকালে এখানে শিল্প সাহিত্যের চর্চার বিকাশ ঘটে। পান্ডুয়া নামে দুইটি স্থান রয়েছে। হুগলির পান্ডুয়া এবং গৌড়ের পান্ডুয়া। রাজধানী পান্ডুয়ার রাস্তা ঘাট এবং বাজার ইত্যাদি ভর্তি ছিল বহু রকমের দোকান, স্নানাগার, মদের দোকান, মিষ্টি খাবারের দোকান ইত্যাদি বহু সামগ্রীর দোকানে। প্রশাসন চালাতেন দক্ষ রাজকর্মচারীরা এবং শহরে ডাক্তার বদ্যি, বিভিন্ন শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং জ্যোতিষীদের উপস্থিতি ছিল (মা, হুয়ান, ইং-ইয়াই শেং-লান, ১৯৭০ : ১; ঐ, ১৯৭০ : ৬০)।

টান্ডা

গৌড়ের আবহাওয়ার অবনতি হওয়ার জন্য টান্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ১৫৬৪ সালে (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু, খন্ড ৭ : ৬৪)। ব্রিটিশ পরিব্রাজক ফিচের মতে নদীর গতিপথের পরিবর্তনই রাজধানী স্থানান্তরিত হবার কারণ (ফস্টার, উইলিয়ম, ১৯২১ : ২৪)। নদীর ঘন ঘন খাত পরিবর্তনের জন্য, মজাখাতের জমা জলে মশা জন্মাত। নর্দমার জল শহরে ঢুকে পড়া আটকাতে পর পর দুটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল (সরকার যদুনাথ, ১৯৭৩ : ১৪৪)। মুনিম খান ১৫৭৫ সালে টান্ডা থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করলেও গৌড়ে ব্যাধি সংক্রমণের জন্য আবার টান্ডায় ফিরে যান। ১৫৯৫-এ রাজধানী স্থানান্তরিত হয় নদীর অন্য পাড়ে রাজমহলে। ১৬১২ সালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। ১৮২৬-এর বন্যা এত হয় যে এই শহরের অবলুপ্তি ঘটে। পরিব্রাজক ফিচ্ টান্ডা শহর দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। "আগ্রা থেকে যমুনা নদী এবং পরে গঙ্গায় এসে বাংলায় পৌঁছাতে আমার পাঁচ মাস সময় লেগেছিল। এখানে ব্যবসাপত্র বিশেষ করে বস্ত্র ব্যবসা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সবই উন্নত ধরনের। এখানে বাঘ এবং অন্য বন্য প্রাণীও রয়েছে" (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ২৪)।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বহু পূর্ব থেকেই বাংলার প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল। শুধু বাঙালি শাসকরাই নয়, আরাকানিরাও দীর্ঘদিন এই বন্দর দখলে রেখেছিল। ষোলোশো সত্তরের দশকে মোগল নবাব শায়েস্তা খান আরাকান রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল দখলদারি কায়েম করেন। পোর্তুগিজরা একে বড় বন্দর বলে জানত। এখান থেকেই তারা নদী পথে শহরাঞ্চলে প্রায়শই হানা দিত দাস সংগ্রহের জন্য। এই বন্দরের প্রাথমিক বিবরণ পাওয়া যায় ইবন বতুতার প্রতিবেদনে। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন সুদক্যন। তার বিবরণ পাঠ করলে দেখা যায় যে তিনি বন্দর শহরের উল্লেখই করেছেন। এর কাছেই ছিল গঙ্গা নদী যেখানে হিন্দুরা ধর্মাচরণে যেত। গঙ্গা নদী বলতে এখানে বোঝাচ্ছে পদ্মা নদীকে যা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলায় প্রবাহিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় এই শহর গৌড়-লাখনৌটির অংশ ছিল না। পূর্ববঙ্গের প্রথম স্বাধীন নবাব সুলতান ফকরুদ্দিনের উল্লেখে নিশ্চিত হয় যে সুদক্যন সপ্তগ্রাম বন্দরও নয় (বতুতা, ইবন, ১৯২৯ : ২৬৭-২৬৮)।[৫] "বন্দরের নাম সাট-এল গঙ্গা থেকেই বোধ হয় হয়েছিল। সাট-এল বলতে বদ্বীপ বোঝায় যা আরবি থেকে এসেছে" (রহিম, এম. এ., ১৯৮২, খন্ড ১, ৯-১০)। এমনকি প্রাচীন আরবিক সাহিত্যে চট্টগ্রামেব উল্লেখ আছে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ব্যাপী আরব সাহিত্যে চট্টগ্রামের উল্লেখ আছে। অনেকেই চট্টগ্রাম বন্দরকে "সমানদার" নামে উল্লেখ করেছেন আর শহরকে উল্লেখ করেছেন রুহমি বলে।[৬] এবং তাম্রলিপ্তর অবসান এবং পালবংশের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে এই বন্দর শহরটির খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক মা-হুয়ান চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং চট্টগ্রামকে বাংলার প্রধান বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতকের শুরুতে এই বন্দর পোর্তুগিজ অধীনে আসে।

সপ্তগ্রাম

তাম্রলিপ্তেব পতনের পর সপ্তগ্রাম হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বন্দর। সপ্তগ্রাম ছিল সাতটি গ্রামের সমষ্টি। পুরাণ মতে কনৌজের রাজার সাত ছেলে সপ্তগ্রামের সাতটি গ্রামে বসতি করেছিলেন (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., খন্ড ৩ : ৩০৯)। গৌড় যখন আর বাংলার রাজধানী রইল না তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় অংশ চলে গেল সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রাম ছিল সরস্বতী নদীর তীরে যার জল আসত হুগলি নদী থেকে। আবুল ফজল লিখেছিলেন, "গঙ্গা নদী সহস্রধারায় বিভক্ত হয়ে সাতগাঁওয়ের সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।" সেই সময় সমুদ্র ছিল আরও কাছে। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে এখানে রাজকীয় টাঁকশাল ছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বাধীন রাজাদের মুদ্রাও এখানে পাওয়া যায়। ১৪১৮-র পর শের শাহ এর পুনর্নির্মাণ করেন। আকবরের বিজয়ের পর অবশ্য এই কাজ বন্ধ হয়ে যায় (ব্যরবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮ : ১৪০)। ওলন্দাজ অ্যাডমিরাল ওয়ারউইকের মতে ১৬৬৭ সাল নাগাদ পোর্তুগিজদের ব্যবসা-বাণিজ্য এই শহরেই সংগঠিত হত (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৩ : ৩১০)।

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে এই নদী শুকিয়ে যায়। এর জল চলে যায় হুগলি নদীর খাতে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় হুগলি, এবং এটা চলে কলকাতা উদ্ভব হবার আগে পর্যন্ত। অবশেষে, ১৮৭০ সালে কয়েকটি কুটির আর একটি

ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ ছাড়া এই বন্দরের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., খণ্ড ৩ : ৩০৮)।

সিজার ফ্রেডরিকের সপ্তগ্রাম পরিদর্শনের সময় এর অবলুপ্তি শুরু হয়ে গেছে। সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার পর হুগলি পোর্তুগিজদের একটি প্রধান বন্দর হয়ে দাঁড়ায়। ডি বারবোমা-র অভিমত অনুযায়ী সপ্তগ্রাম ছিল একটি উল্লেখযোগ্য শহর, যদিও চট্টগ্রামের তুলনায় বন্দরের কাজকর্মে সুবিধে ছিল কম। শাহজাহাননামার ব্যাখ্যা অনুযায়ী পোর্তুগিজরা হুগলিতে বসতি স্থাপন করেন এবং সপ্তগ্রাম থেকে ব্যবসার কেন্দ্র সরে আসে হুগলিতেই। মোগলরা হুগলির খাল আর গভীরভাবে খনন করে, ফলে সাতগাঁওয়ের জল কমে যায় (হন্টার, ডাব্লু. ডাব্লু. খন্ড ৩)। অবশেষে ১৫৬৫-তে ফ্রেডরিক সিজারের ভ্রমণের সময় এর অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয় (ক্যামপোস, জে. জে. এ., ১৯১৯ : ৫০)।

সোনারগাঁও

আধুনিক ঢাকার কাছে, তৎকালীন সোনারগাঁও ছিল বস্ত্রশিল্পের মূল কেন্দ্র। এই শহরের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে ১২৩০ সালে, যখন দনুজ রায় নামে সোনারগাঁও-এর রাজা, তোগরাল খাঁ-র বিদ্রোহ দমন করতে আসা সুলতান বলবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও অমিতাভ ভট্টাচার্য, ১৯৯৩ : ২৯৩; ইলিয়ট, খণ্ড ৩ : ১১৬)। ১৩৩৮ সালে, পূর্ববঙ্গের প্রথম স্বাধীন শাসক ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ্-র রাজধানী ছিল এই শহর (আহমদ, কামারুদ্দিন, ১৯৬৭)।

ফিচ দেখেছিলেন যে, বহু ধনী মানুষের বসবাস সত্ত্বেও, এই শহরের বাড়িঘর, ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের মতই সাধারণ। অধিকাংশ বাড়িতে খড়ের ছাউনি, বাঘ বা শেয়ালের উৎপাত আটকাতে দরজায় শক্তপোক্ত বাঁধনের ব্যবস্থা। ফিচের পরিভ্রমণের সময় সোনারগাঁও-এর শাসক ছিলেন বারো ভুঁইঞার একজন নবাব ইশা খাঁ। ওই অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বহু নদীনালা, দ্বীপ ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইশা খাঁকে সম্রাট আকবরের অশ্বারোহী বাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে সাহায্য করত। এই সময়েই সপ্তগ্রামের মতোই, সোনারগাঁও-এর বদলে শ্রীপুরের রমরমা বাড়ছিল। ফিচ শ্রীপুর বন্দরেও গিয়েছিলেন (ফস্টার, উইলিয়াম ১৯২১ : ২৮)। ফিচ লক্ষ করেছিলেন যে, গ্রামগুলি জনশূন্য-লম্বা ঘাস আর বন্য জন্তুতে ভরা (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ২৬)।

ম্যানরিকের পরিভ্রমণের সময়, সোনারগাঁও শহর ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের এক খালের প্রায় দুই মাইল ভিতরে। শহরে দুটি মাত্র সরু রাস্তা, দুপাশে খড়ের বাড়ি, কিছু ইটের বাড়িও ছিল। যোগাযোগের মূল মাধ্যম ওই খালটির নাব্যতা হ্রাস পেয়েছিল। ম্যনরিক সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষ দিকে এই শহরে এসেছিলেন। এই সময়েই সপ্তগ্রাম বন্দরও শুকিয়ে যায়। মেঘনা কূলবর্তী, সোনারগাঁও শহর থেকে ছয় ক্রোশ দূরের, শ্রীপুর হয়ে ওঠে বস্ত্র বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। শ্রীপুর শহরও, কীর্তিনাশা নদীর প্লাবনে অবশেষে নদীগর্ভে চলে যায়। সোনারগাঁও শহরের স্থাপত্য শৈলী বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., খণ্ড ৫ : ৭১-৭২; তরফদার, এম. আর., ১৯৬৫ : ১৪৫)

শ্রীপুর শহরে, ফিচ লক্ষ করেছিলেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ সুতিবস্ত্র পাওয়া যায়। এই শহর

থেকে সুতিবস্ত্র আর চাল গোটাভারত, সিংহল, পেগু, মালাককা এবং সুমাত্রা-সহ আরও নানা স্থানে চালান যায় (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ২৮)।

মোগলদের গড়া শহর

১৫৭৫ সালে বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, তারা দুটি শহর গড়ে তোলে। ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ—দুটিই পর্যায়ক্রমে বাংলার রাজধানী হয়েছিল। বিদ্রোহীদের কাছাকাছি হয়ে, বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। অন্য আরেকটি কারণ, বাংলার বস্ত্রশিল্পের রাজধানী সোনারগাঁও ঢাকার কাছেই। মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার দেওয়ানের কেন্দ্র। ঢাকার নবাবের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ থেকে নিস্তার পেতে দেওয়ানের কাছারি মুর্শিদাবাদে সরিয়ে আনা হয়। পরে অবশ্য বাংলার নবাব এবং দেওয়ান একই ব্যক্তি হওয়ার পর, মুর্শিদকুলি খাঁ-র সময় থেকে, মুর্শিদাবাদই বাংলার রাজধানী শহর হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ এবং ডাচ বণিকরা বাংলায় আসার পর, এদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে, তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

ঢাকা

১৬০৮-১৬১২ সালে, বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে পূর্ব বাংলার ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে এই শহরের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ইসলাম খানের মতে, এই স্থানান্তরণের কারণ ছিল বিদ্রোহ দমন। ওই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, নদীবহুল অঞ্চল, অশ্বারোহী বহিরাগত সৈন্যচালনার উপযুক্ত ছিল না। প্রধান কারণটি, যদিও তা কখনই প্রকাশ্যে উল্লেখিত হয়নি, বাংলার বস্ত্রশিল্পের রাজধানী সোনার গাঁও-এর নৈকট্য।

ওখানে একটি কেল্লা তৈরি করা হয়েছিল এবং জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল দুই লক্ষতে। পুরানো শহর বিক্রমপুর থেকে এই শহর বেশি দূরে ছিল না। কাছেই ছিল নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ নামে দুটি ব্যবসাকেন্দ্র (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৫ : ৬৭)। ইংরাজ এবং ওলন্দাজরা এখানে তাদের কারখানা গড়ে তুলেছিল (বাউরি, টমাস, ১৮০৫ : ১৫০)। শহরে বিদেশ থেকে আসা লোকজনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে বসবাসকারী সমগ্র পোর্তুগিজ সম্প্রদায় ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন আরাকানের রাজার সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ চলছিল। ঢাকায় যে অঞ্চলে তারা বসবাস করত তাকে বলা হত ফিরিঙ্গিপাড়া (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৫ : ৪৫)। এখানকার কাপড়ের কারখানাগুলিতে, উচ্চবিত্তদের জন্যে খুবই ভালো মানের কাপড় উৎপন্ন হত।

বাউরী সাহেব ঢাকা শহর এবং এখানকার স্থাপত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন সুন্দর অট্টালিকাময় নগরী, অথচ ১৬৮৪ সনে জন বাপ্তিস্তা এ শহরে এসে খুব একটা খুশি হননি। তাঁর মতে, নদীতট বরাবর ঢাকার বৃদ্ধি ছিল একমাত্রিক এবং একরৈখিক। কারণ প্রত্যেকেই নদীর ধারে বাড়ি করার চেষ্টা করত। এ সময়ে এই শহরে ছোট নৌকা তৈরি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং অনেক কারখানাও তৈরি হয় কিন্তু যে সমস্ত বাড়িতে মিস্ত্রিরা বাস করত সেগুলি ছিল খুবই সাধারণ, বাঁশ ও মাটির তৈরি কুঁড়ে। ঢাকার শহরাঞ্চলও যে সাংঘাতিক ভালো ছিল এমন নয়। স্বয়ং শাসকদের বাসস্থানটি ছিল উঁচু দেওয়াল ঘেরা একটি বিস্তৃত

অঞ্চলের মাঝে কাঠের তৈরি খুবই সামান্য এক বাড়ি। শাসক নিজে এই ঘেরাটোপেরই মধ্যে একটি তাঁবুতে বাস করতেন। অথচ ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা যখন দেখলেন তাঁদের জিনিসপত্র এইরকম সাধারণ বাড়িতে রাখা খুব একটা নিরাপদ হচ্ছে না তখন তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনমতো বাড়ি তৈরি করে নিলেন। ইংরাজরাও তুলনামূলকভাবে ইটের তৈরি অনেক ভালো বাড়ি তৈরি করা শুরু করেন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আর এক বিদেশি পর্যটক মানুচি যখন ঢাকায় আসেন তিনিও খেয়াল করেন অনেক ঢাকাবাসী খড়ের তৈরি বাড়িতে থাকেন (করিম, আবদুল, ১৯৬৪ : ৩৬)।

ঢাকার সীমান্ত অঞ্চল ফিরিঙ্গিবাজারে যিনি পোর্তুগিজদের নিয়ে আসেন এবং চট্টগ্রাম দখল করেন সেই নবাব শায়েস্তা খাঁর উদ্যোগে ঢাকা শহরে নানান কর্মকাণ্ড শুরু হয়। শায়েস্তা খাঁর উত্তরসূরি আজম শাহ্ লালবাগ দুর্গ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজকর্ম চালু করেন। প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে এই শহরের গুরুত্ব ১৭০৪ সালে হ্রাস পায় যখন মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর কাছারি মুর্শিদাবাদ শহরে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু বয়নশিল্প উৎপাদন ও সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা শহরের গুরুত্ব, সোনারগাঁও-এর উত্তরসূরি হিসাবে, এতটুকু কমেনি।

মুর্শিদাবাদ

১৭০৪ সালে ভাগীরথী নদীর তীরে মুর্শিদাবাদ শহরে মুর্শিদকুলি খাঁ শুল্ক আদায়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৯ : ২৬)। তখন কিন্তু এ অঞ্চল ছিল মকসুদাবাদ নামের এক ছোট গ্রামমাত্র (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৯ : ৬৫)। এরপর যখন মুর্শিদকুলি খাঁ তাবৎ অঞ্চলের নবাব মনোনীত হন মুর্শিদাবাদ শুধু তাঁর কাছারিই নয় বাংলার রাজধানী হয়ে ওঠে। এখানেই টাকশাল নির্মিত হয়। গড়ে ওঠে কিছু বাণিজ্যিক কুঠি যেমন ধনকুবের জগৎ শেঠের কুঠি। এ শহর প্রসঙ্গে নানান রাজনৈতিক উত্থান পতন কিংবা পলাশির যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ না উল্লেখ করেও বলা যায় ১৬৪০ থেকে বেশ কয়েকবার মারাঠা আক্রমণ এ শহরের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এ শহর তার রাজনৈতিক গুরুত্বও হারায়। কিন্তু এর পরেও আরও কয়েক দশক ধরে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই থাকে বাংলার রাজধানী এবং নিকটস্থ শহর কাশিমবাজারের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ হয়ে ওঠে বয়নশিল্প উৎপাদন ও সরবরাহের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

পরিশিষ্ট

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি এবং মোঘল কর্তৃক বাংলা আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে বাণিজ্যের বিশেষ করে বয়ন ব্যবসার প্রসার ঘটে। ছোট বড় নানান আকার এবং মাপের নগর গড়ে ওঠে। উত্তরে রাজধানী গৌড়, দক্ষিণে বন্দর চট্টগ্রাম, পশ্চিমে সপ্তগ্রাম এবং পূর্বে সোনারগাঁও। এই চার গুরুত্বপূর্ণ উপনগরী যেন এক চতুর্ভুজ তৈরি করে। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রভাবের আগে যে সমস্ত পর্যটক এই বন্দর, নগরগুলি ভ্রমণ করেন তাঁরা ছিলেন আরবের ইবনবতুতা, চীনদেশের মা হুয়ান, ইতালির ভার্তেমা লুদোভিকো এবং ভেনিসের ফ্রেডরিক সিজার। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বেশ কিছু পোর্তুগিজ ব্যবসায়ীও আসেন। এদের মাধ্যমেই জানা যায়,

সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রধানত চাল, চিনি, কাপড় রপ্তানি করা হত এবং আমদানি দ্রব্য ছিল ধাতু। ধাতব মুদ্রার প্রচলন তখন বাংলায় ছিল না। দৈনন্দিন লেনদেনের জন্যে কড়ির প্রচলন ছিল। এই বাণিজ্য পর্যটকদের বর্ণনা থেকেই জানা যায়, সে সময়ের বাজারে মানুষজনের মধ্যে বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষত পোশাক এবং গহনার ক্ষেত্রে। সংখ্যালঘু উচ্চবিত্তরা উৎকৃষ্ট ভালো পোশাক এবং দামি গহনা ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চল থেকে আসা বেশিরভাগ মানুষের পরনে থাকত খুবই স্বল্পবাস। শাসকশ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের বৈষম্য লক্ষণীয় ছিল। আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক থেকে আসা স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী এই মানুষজন অন্যের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাভোগী ছিল।

বিভিন্ন জনের বিবরণী থেকে তৎকালীন স্থাপত্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেছে, এমনকি উচ্চবিত্তরাও বসবাস করতেন সাধারণ গৃহে। দরিদ্র শ্রেণির মানুষজনেরা তাদের বাড়ি বানাত বাঁশ, কাঠ ও মাটি দিয়ে। অনেকের মতে সে সময়ে টেকসই নির্মাণসামগ্রী, যেমন পাথর পাওয়া যেত না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হল মোগল উপনিবেশ স্থাপনের আগে পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষ ছিল বিদেশ থেকে আসা। তারা এখানে সাময়িকভাবে স্থিতু হয়ে বাণিজ্য করার জন্যে আসতেন। সে কারণেই দীর্ঘস্থায়ী গৃহ নির্মাণের ইচ্ছা তাদের থাকত না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সে সময়ে বাংলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্থাপত্য আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এমন এক শাসক যিনি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশিদিন বাংলায় বসবাস করেন। মোগল সাম্রাজ্য কায়েম হবার পর প্রতিনিয়তই সাধারণ মানুষকে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু সম্পদ সম্রাটকে পাঠাতে হত। স্বাভাবিকভাবে কেউই তাদের সম্পত্তির পরিমাণ লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করতে চাইত না।

ইউরোপীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বয়ন-ব্যবসা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ব্যবসা এবং কৃষিকাজ থেকে অর্জিত অর্থের বেশ বড় একটা অংশই ব্যয় হয়েছিল প্রথমে ঢাকায় এবং পরে মুর্শিদাবাদে রাজধানী নির্মাণের কাজে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে আগে যে সমস্ত অঞ্চলে বসবাস করা অসম্ভব বলে মনে হত বয়ন-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হবার তাগিদে মানুষজন সেই সমস্ত অঞ্চলে বসবাস করা শুরু করে। ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা পৃথক অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করে। এর ফলে গোটা শহরের চিত্রটাই বদলে যায়।

মন্তব্য

১. টমাস বাংলার মুদ্রা শহরের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন : লাখনৌটি, ফিরোজাবাদ (পান্ডুয়া), সপ্তগ্রাম, শাহর-ই-নাও, যায়েসপুব, সোনারগাঁও, মুজাম্মাবাদ। ব্লচমান আরও তিনটি শহরের উল্লেখ করেছেন; ফতাবাদ, খিলাফতাবাদ, হুসেইনাবাদ (ব্লচমান, এইচ, ১৯৬৮ : ৬)।

২. ১৪৯০ থেকে ১৫৯৩ পর্যন্ত নানা মানচিত্রে এই নামের নানা বানান লক্ষ করা যায়; বারাকুরা, বরাতুল্লা, বাটাকৌটা, বাগদালা, বাগনেলা, বোগলা, বেনগেল্লা, ভাকুলিয়া, বাকালিয়া, বালখাদা, বাটেকাল্লা, বাকলা প্রভৃতি (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮ : ১৪৪)

৩. বারবোসার বিবরণীর সম্পাদকের মতে সপ্তগ্রামেই ' বাঙ্গালা' হওয়া স্বাভাবিক। ১৫৫৩ সালে প্রকাশিত বিবরণীর প্রথম সংস্করণে, বারবোসার মতামতকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন : 'রাজত্বের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে বেঙ্গলাই প্রধান। নগরের নাম থেকেই

রাজত্বের পরিচয়। গঙ্গা মোহনা থেকে এই শহর দুইদিনের পথ। চল্লিশ হাজার বাড়ি আছে নগরে। রাজা সবসময় থাকেন। রাজপ্রাসাদ ভালো ইটে তৈরি, টালির চালের।' সম্পাদকের মতে, নগরটি নদী মোহনার কাছে অবস্থিত ছিল (বারবোসা ডুয়ার্টে, ১৫১৮: ১৪৩-১৪৪)

৪. গ্রন্থটির সম্পাদক ব্যজারের মতে, ভার্তেমা বাঙ্গালার রাজধানী গঙ্গার পূর্ব মোহনায় অবস্থিত বলেছিলেন। ফলে সোনারগাঁও-এর দাবি জন্মেছে। যদিও ব্যজারের নিজের মত, গঙ্গা মোহনা থেকে দূরে হওয়া সত্ত্বেও ভার্তেমা গৌড়ের কথাই বলেছেন। কর্নেল ইয়ুলের মত অবশ্য, যেহেতু ভার্তেমা বাঙ্গালার রাজধানীকে বন্দর শহর হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সে কারণে এই শহর কোনওভাবেই গৌড় হতে পারে না- চট্টগ্রাম বা সাওগ্রাম হওয়া সম্ভব (ভার্তেমা, ল্যুডোভিকো ডি, ১৮৬৩)।

৫. "বাংলার সুলতান ফকরুদ্দিন একজন যোগ্য শাসক। সুফিসন্তদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে। এই দেশের শাসনভার সুলতান নাসিরুদ্দিন-এর উপর ছিল। দিল্লির সুলতান তাঁর নাতিকে বন্দি করেন। দিল্লির সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার শর্তে, সুলতান মহম্মদ দিল্লির মসনদের বসার পর, বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। নাসিরুদ্দিন শর্তভঙ্গ করায়, সুলতান মহম্মদ যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে হত্যা করেন এবং এক বৈবাহিককে মসনদে বসান। সৈন্যেরা তাঁকে হত্যা করলে আলি শাহ লাখনৌটি থেকে ক্ষমতা দখল করেন। ফকরুদ্দিন যখন দেখলেন সিংহাসন থেকে নাসিরুদ্দিনের বংশধররা উৎখাত হতে চলেছে, সুদক্যন এবং বাংলায় তিনি বিদ্রোহ করেন এবং সিংহাসন দখল করেন" (বতুতা, ইবন, ১৯২৯ : ২৬৭-২৬৮)।

৬. 'রুহমি' নামটি কক্সবাজারের এক অংশ রামু চট্টগ্রাম থেকে আসা সম্ভব। আরেকটি মত, আরাকান ভাষায় 'শাত-টা-গোয়িং' - থেকে এসেছে। এর অর্থ, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ভুল। কথিত আছে, কোনও এক আরাকানী রাজা এই অঞ্চল দখল করার পর যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন (রহিম, এম.এ., ১৯৮২, খণ্ড ১ : ৩৪-৩৬)। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে রুহমি শব্দ পাল রাজত্বের নির্দেশক (মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭১ : ১২২)।

৩:৪

সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র
১২০৪-১৭৫৭

ভূমিকা

সংস্কৃতি শাসকশ্রেণির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটি অঙ্গ। বলা চলে, সংস্কৃতি একটা নরম পথ। যখন সেই নরম পথে কাজ সিদ্ধ না হয় তখন স্বভাবতই শাসকশ্রেণির কাছে অন্য অস্ত্র আছে। যেমন—পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র, স্বভাবতই শাসকশ্রেণি চায় যে, সবচেয়ে কম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকবে। তাদের শাসন যদি সবাই মেনে নেয় তাহলে পুলিশ বা সৈন্য ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। সংস্কৃতি এই কাজটাই করে। সংস্কৃতি সাধারণ মানুষের সামনে শাসকশ্রেণির সংস্কৃতিকে তুলে ধরে, এবং ওই নরমপথ যদি কাজে দেয় তাহলে সৈন্য বা পুলিশ নামাবার প্রয়োজন থাকে না। বিচার ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রকে ব্যবহারের প্রয়োজনও কমে যায়। তাই শাসকশ্রেণি সবসময়ে চেষ্টা করে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে বাজ্য চালাতে। যদি কাজ না হয় তাহলে প্রকাশ্য পীড়নযন্ত্র; যেমন পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী তো আছেই।

যাকে আমরা গণসংস্কৃতি বলি সেটা আসলে শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি। মুসলিম আমলে, ১২০৪ সালেব পর এমনকি কট্টর ব্রাহ্মণরাও চোগা-চাপকান পরে মুসলমান সুলতানের দরবারে যেতে আপত্তি করেননি অথবা ফারসি শিখতে কার্পণ্য করেননি। ইংরেজ আমলে খুব গরিবও সাহেব হতে চেয়েছিলেন এবং ইংরেজদের মতো পোশাক পরে সাহেবিখানা খেতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর সব দেশেই শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য একথাও সত্য যে, শাসকশ্রেণি শাসিত সংস্কৃতি থেকে বহু উপাদান আহরণ করে। কোথাও একজন দেবতা নেয়, কোথাও অন্য কোনও আচার। এইভাবে গণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

তার মানে এই নয় যে, কোনও সাবকালচার বা উপসংস্কৃতি থাকে না। কিন্তু সেই সাবকালচার শাসকশ্রেণির সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ পর্যন্ত একটা পর্ব। তারপর থেকে ১৭৫৭ সালের পর পলাশির যুদ্ধের পর আর একটা পর্ব। ভুল করে প্রথম পর্বকে 'হিন্দু' যুগ বলা হয়, কেন না তখন পর্যন্ত হিন্দু নামটা সড়গড় হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে 'হিন্দু' মানে ছিল সিন্ধু নদীর এপারে সবাই — হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই। এখনো বহু মধ্যপ্রাচ্যের দেশে হিন্দু মানে এক ভৌগোলিক সংজ্ঞা যার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। ইংরেজরাও প্রথম দিকে 'হিন্দু' কথাটা বলত না। বলত পুতুল পুজো করে এমন গোষ্ঠী (idol worshiper) বা অসভ্য মানুষ বা স্থানীয় সংখ্যাধিক্য। অনেক পরে 'হিন্দু' কথাটা এসেছে, সেটাও ইংরেজ আমলে, বলা চলে ১৯০০ সালের পর। কাজেই যে যুগ নিয়ে আমরা কথা বলছি তার ক্ষেত্রে 'হিন্দু' কথাটা

বেমানান। তবুও ঐতিহাসিকরা যেহেতু ১২০৪ সালের আগের পর্বকে 'হিন্দুযুগ' বলেন, আমরাও বলছি।

স্থানীয় সংস্কৃতি এবং সর্বজনীন সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক এক বড় জিনিস। আমাদের চারপাশে এর প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন—প্রত্যেক অঞ্চলেই একজন মাতৃদেবতা নানান নামে থাকতেন। তাদের যোগ করে হল দুর্গা, একটি সর্বজনীন চিন্তা, অন্যদিকে স্থানীয় দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তাকে সর্বজনীন হতে হবে। তাই মনসা থেকে শুরু করে সমস্ত স্থানীয় দেবতা বা দেবীকে দেখাতে হয়েছে যে তাদের আর্যাবর্তের শিবের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে বা সংশ্লিষ্ট জাতিকে কোনও ব্রাহ্মণ ডেকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে সেই জাতির উৎস আর্যরা। এরকম বহু কাহিনি আছে যা বলে পাঠকদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না। সংস্কৃতির অর্থ অনেক সূক্ষ্মভাব কাজ করে।

যাকে আমরা বাঙালি জাতি বলি, সেটা আসলে তিনটি উপাদান দিয়ে তৈরি। প্রথমত, উত্তর দিক থেকে মোঙ্গলীয় রক্ত এসেছে। এইজন্য উত্তরপূর্ব ভারতবর্ষ এবং উত্তরবঙ্গে চেহারায় ও বেশবাসে আমরা স্পষ্টতই মোঙ্গলীয় প্রভাব দেখি। এছাড়া উত্তর থেকে বহু আক্রমণ বাংলায় হয়েছে, যেমন তিব্বত থেকে সাং গামপোর সৈন্যবাহিনী এসে বাংলা দখল করেছে, বা কাশ্মীরের রাজা অতদূর থেকে সৈন্য পাঠিয়ে বাংলা শাসন করেছেন, এদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। দ্বিতীয়ত, পাশেই ছোটনাগপুরের মালভূমি। যেখান থেকে বাউড়ি এবং বাগদি ও অন্যান্য সম্প্রদায় এসেছেন। একসময়ে বর্ধমানের সংখ্যাধিক্য মানুষ ছিল বাউড়ি। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর সংলগ্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছোটনাগপুরের মালভূমির নানা সম্প্রদায়ের প্রভাব রয়েছে। তৃতীয়ত, দক্ষিণ থেকে, বিশেষ করে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মানুষ বহুবার বাংলায় ভিড় করেছেন। এই তিন উপাদানকে নিয়েই বাঙালির জনগোষ্ঠী, এর মধ্যে ব্রাহ্মণরা অনুপস্থিত, যদিও এইকথা অনেকের ভালো লাগবে না। যেটা আমরা আর্য সংস্কৃতি বলি তার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ছিলই না বলা চলে।

অনেকে বলেন, যার মধ্যে ভাষাবিদ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও আছেন, যে চর্যাপদই বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। বহু ভাষাই মনে করে যে চর্যাপদই হল তাদের ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন। চর্যাপদ বাংলা ভাষাতে আলাদা করে ভাবতে দেয় না। অহমীয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি এরকম অনেক ভাষাই আছে যারা চর্যাপদকে তাদের পূর্বসূরি বলে ঘোষণা করেছেন, অতএব বাংলা ভাষার জন্ম চর্যাপদে হয়নি। বাংলাভাষায় সবচেয়ে পুরোনো বই বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। এই বই অন্যরা দাবি করেন না এবং খাঁটি বাংলায় লেখা।

বাঙালি জাতির গঠনে নিশ্চয়ই পালবংশের অবদান আছে, ওরা প্রায় চারশো বছর বাংলার মসনদে ছিলেন। পালেরা বৌদ্ধ হলেও তাদের মতামত আপামর জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেননি। তাই পাল আমলে একই পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা ধর্ম থাকতে পারত এবং সেটা কেউ অন্যায় বলে মনে করত না। কিন্তু পালদের নিয়ন্ত্রণ একটা অংশে থাকলেও পাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশে তাদের নিয়ন্ত্রণ খুব আলগা ছিল। তাই পালদের বৌদ্ধ এবং সেনদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবক্তা বলে বলা চলে না। পালবংশের নিয়ম ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন ব্রাহ্মণ। তাই পালদের সময়েও বাংলা পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। পালেরা

নিজেদের বাঙালি বলে ভাবত না, নিজেদের পরিচয় দিতে গৌড়ের রাজা হিসেবে। বাংলাও বহু ভাগে বিভক্ত ছিল যার একটা অংশের নিয়ন্ত্রণ ছিল পালদের।

পালদের সময় এক বড় ঘটনা হল, রাজা দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনচ্যুত হন এবং কিছু ছোট জাতি বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। বহুদিন ওই ছোট জাতির হাতে শাসন ক্ষমতা থাকবার পর এবং তিনজন কৈবর্ত রাজা শাসন করার পর, রাজা রামপাল ওদের হঠিয়ে আবার পালবংশের সূচনা করেন। এই ঘটনা সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত মানস'-এ বিশদভাবে লেখা আছে।

দ্বিতীয় ঘটনা, যা আগেই ঘটেছে, পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজা হওয়া। আমরা জানি যে, গোপাল রাজা হওয়ার আগে বাংলায় মাৎস্যন্যায় চলছিল। বাংলা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, যে কেউ বাংলায় ঢুকে পড়তে পারত। গোপালকে রাজা করলেন বাংলার মানুষ—এই কথা আমরা প্রায়ই বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের এই ব্যাপারে কোনও ভূমিকা ছিল না। গোপালকে মনোনীত করেছিল সমাজেব বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী অংশ, সাধারণ মানুষ তাকে নির্বাচিত কবেনি। তবে গোপাল উঁচুজাতির লোক ছিলেন না।

বিভিন্ন সময় ও শাসনকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংস্কৃতি বরাবরই রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েমের এক প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শাসকশ্রেণি বরাবরই চেয়ে এসেছে তাদের প্রবর্তিত সংস্কৃতি সমগ্র জাতির সংস্কৃতি হিসেবে প্রচলিত হোক।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

সবসময়ই দেখা গেছে সর্বজনীন সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী আপন আপন সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু আপন সংস্কৃতির চরিত্র যাই হোক না কেন শাসকশ্রেণি প্রবর্তিত সংস্কৃতিই সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। এরফলে, বিভিন্ন অঞ্চলেব অধিবাসীরা দ্বৈত সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে নিজেদের অভ্যস্ত করে নেয়। একদিকে রাজ্য প্রবর্তিত সর্বজনীন সাংস্কৃতিক নিয়ম মেনে চলা অন্যদিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে নিজ সংস্কৃতি অভ্যাস বজায় রাখা। সংস্কৃতি চর্চার দু নৌকায় পা দেওয়া মানুষজনের কাছে অনুগামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেত।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে ও ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পরে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনায় এক বিরাট পার্থক্য বোঝা যায়। রাষ্ট্রীয় স্তরে কাজকর্মেব সময় উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাষ্ট্র প্রবর্তিত ফারসি, আর্‌বি এবং কোরান প্রভাবিত সংস্কৃতি চর্চাই করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে আচার আচরণে নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখতেন। এখন প্রশ্ন হল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে ও ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পরে কেন এই তফাৎ। যদিও সেন বংশীয় শাসকরা মুসলমান শাসকদের মতো বিদেশি ছিলেন কিন্তু বাংলায় প্রায় একশো বছর বসবাস করার পর তারা প্রায় বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথমদিকে ইসলামীয় শাসকদের কাছে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবে অগ্রাধিকার পেত। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের পথ যে খুব সহজ হবে না তা অতি বড় ইসলাম সমর্থকও বুঝতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া বাংলা প্রদেশের মতো বিশাল

রাজ্য শাসন করা ছিল যথেষ্ট কঠিন কাজ এবং কোনও অবস্থাতেই মুসলমানি শাসকরা স্থানীয় অধিবাসীদের রোষের কারণ হতে চাননি। শুরুর দিকে ধর্মান্তরিত অধিবাসীরা অন্যদের কাছে নিন্দার পাত্র হয়ে উঠত, অন্যরা কখনই তাদের সমধর্মী বলে মনে করত না (শরিফ, আহমদ, ১৯৯২ : ১৯৮, ২০০-২০২)।

ইসলামি শাসকরা স্থানীয় অমুসলমান সহযোগীদের অনুভূতিগুলোকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারেননি। তাঁরা নিজেরা বিলাসে শহরে বসবাস করতেন এবং কদাচিৎ বিদ্রোহ বিবাদ দমনে গ্রামাঞ্চলে আসতেন। উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেলেই তারা ফিরে যেতেন শহরের আরাম বিলাসে। যেহেতু তারা যুদ্ধবিদ্যায়, অস্ত্রপ্রয়োগে অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন সেহেতু প্রেমে নয়, ভয়ে সাধারণ মানুষ তাদের কথা শুনে চলত। শাসকশ্রেণি এঁ জানতেন যে তাদের বিলাস আরাম বজায় রাখার প্রয়োজনীয় অর্থ আঞ্চলিক বিত্তের সাহায্য ছাড়া সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। তাছাড়া শাসকশ্রেণি সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে কোনও মতেই গ্রামীণ জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ ছিল না (রহিম, এম. এ. ১৯৮২, খণ্ড ১ : ২২৮)।

সে সময়ে গ্রামীণ প্রশাসন চালাতেন আঞ্চলিক রাজারা[১]। ইসলামি শাসক সম্প্রদায় গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্যে এই রাজাদের সঙ্গে জোট বাঁধতেন। এই অমুসলমান সঙ্গীর বিভিন্ন প্রয়োজনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে বাধ্য হতেন। ইসলামি শাসকরা শহরে বাস করতেন, কিন্তু স্থানীয় শাসকরা গ্রামে থাকতেন। কৃষিতে কেন্দ্রীয় শাসকদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ষোড়শ শতকে উত্তরভারতে মোগলবাহিনীর তাড়া খেয়ে অনেক আফগান সৈন্য প্রথম বাংলার গ্রামে ঢুকে পড়ে।[২] ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত গ্রাম ও শহরের ছবিটা ছিল একই রকম। ফারাকটা প্রায় চোখেই পড়ত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গ্রাম শহরের বিভেদ ভীষণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শহর ছিল শাসকশ্রেণি ও সেনাবাহিনীর। পাঁচিল তুলে শহরকে আলাদা করে রাখা হত গ্রাম থেকে। শহরে বসবাসকারী মানুষজনের শরীর, পোশাক, আচার, আচরণ, খাদ্য, অভ্যাস, জীবন-ধারণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। (সরকার, জগদীশনারায়ণ, ১৯৯৭ : ৮৬)।

দরজি, রাজমিস্ত্রী বা স্যাকরা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষজন যখনই কোনও জিনিস তৈরি করতেন তা আগে আসত শহরের বাজারে। দীর্ঘদিন পরে তা বহু হাত ঘুরে গ্রামে পৌঁছাত। এর ফলে পেশাগত দিক থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক মূল্যবোধের বিস্তর ফারাক গড়ে ওঠে। আশরফ এবং উচ্চবিত্ত মুসলমানেরা স্পষ্টতই স্থানীয় বাঙালি মুসলমানদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে নিজেদের সৈয়দ বা খান বলে পরিচয় দেওয়া শুরু করলেন। গ্রামে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যেও সামাজিক স্তরে মানুষজন বিভক্ত হতে শুরু করল। যেমন যারা কৃষিকাজ করতেন তাদের উচ্চস্তরের মুসলমান বলে বিবেচনা করা হত, তেমনই জোলাদের নিম্নস্তরের মুসলমান বলে বিবেচনা করা হত (দাশগুপ্ত, রতন, ১৯৯৭; ৬৮-৬৯)। অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন থাকবে তা নিয়ে মুসলমান শাসকেরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। গ্রামীণ প্রশাসক রাজাদের তাঁরা সহ্য করে চলতেন বটে কিন্তু রাজ্যস্তরে অমুসলমানদের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হবে কি না সে ব্যাপারে উচ্চবর্গীয় শাসকরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে শাসন করে আসছেন যে সমস্ত সফল সুলতান যেমন সিকন্দর শাহ, ইলিয়াস শাহ, আলাউদ্দিন

হুসেন শাহ এঁরা অমুসলমানদেরও উচ্চপদের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু সুফি পীর এবং মোল্লা সম্প্রদায়ের লোকেরা এর স্পষ্ট বিরোধ করেন (করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ১২৭-১২৮, ১৩১)।

উদার মনোভাবাপন্ন এবং সংকীর্ণ মনোভাবাপন্নদের মধ্যে অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা—না রাখা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে পলাশির যুদ্ধকাল অবধি এবং এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে সুলতান এবং সুফি পীর সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন হয় (করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ১২৭-১২৮, ১৩১)। শাসক এবং শাসিতের দ্বন্দ্ব, বহিরাগত এবং আঞ্চলিক অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব যখন সারা বাংলা জুড়ে চলছে, তখন, মানুষের মনে আর এক অন্য দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ক্রমশ স্থানীয় উচ্চবিত্তেরা ফারসি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। মুসলমানী পোশাক-বিধি, আচার-আরণ আয়ত্ত করেন।[৩] কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করে তাদের অকৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, তাদের নিজেদের সংস্কৃত ভাষাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের প্রতি গর্ববোধ বজায় রাখেন। জনসমক্ষে এই গোষ্ঠী শাসকশ্রেণির হয়ে কাজ করতেন কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে খাঁটি হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবেই পরিচয় দিতেন।

ইসলামি শাসকরা ব্রাহ্মণ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে অসমর্থ হন। অমুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেও ব্যর্থ হন। অমুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ ব্রাহ্মণদেরই তাদের নেতা হিসেবে মানতে থাকেন এবং তাদের প্রদর্শিত আচার-বিধি পালন করতে থাকেন। অপরপক্ষে, এটাও সত্যি যে উর্দু ইসলামকেন্দ্রিক সংস্কৃতি তখনও মৌলবাদকে আশ্রয় করেনি। তা না হলে রাজা গণেশ-এর মতো এক অমুসলমান মানুষের পক্ষে ক্ষমতা দখল করে বেশ কয়েক বছর ধরে রাখা সম্ভব হত না। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সন্তানকে ক্ষমতায় বসিয়ে যান।

সুতরাং অমুসলমান ব্রাহ্মণরা তাঁদের এই সমাজে নেতৃত্ব বজায় রাখতে চান এবং সেই প্রয়োজনে তাদের নিজস্বতা বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই সম্প্রদায়ের আচরণগত বিভেদের দিকটা তুলে ধরতে থাকেন। যেমন গোমাংস ভক্ষণ, সুন্নত করা এবং মৃতদেহকে কবর দেওয়া, তৃণমূল স্তরে এই বিভাজন আরও স্পষ্ট করে তোলা হয় অন্য দিক থেকে। যেমন, পিঁয়াজ-আলু, মুরগি-হাঁস কিংবা ধুতি-লুঙ্গি, এ সমস্ত ব্যবহার্য আহার্য দ্রব্যগুলি মুসলমানী-অমুসলমানী জিনিস হিসেবে পরিচিত হয়।

ব্রাহ্মণরা সারা বছর নানা আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবে ব্যস্ত থাকত। যেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজ্য কর্তৃক সমর্থিত ছিল না, সেহেতু ব্রাহ্মণদের কাছে অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায় ছিল এই উৎসব পালন, যেখানে তারা নিম্নবর্গীয়দের কাছ থেকে দক্ষিণা হিসেবে নানান উপহার পেয়ে থাকেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় নিয়মকানুন আরও দৃঢ় করা হয় এবং তা প্রায় মৌলবাদের পর্যায়ে পৌঁছয়। যদি কোনও অমুসলমান কোনওভাবে গোমাংস ভক্ষণ করে ফেলত, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোনও মুসলমানের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধর্মচ্যুত করা হত। স্পষ্টতঃই এ সকল ধর্মচ্যুত মানুষদের জন্যে ইসলাম প্রচারকদের আর কিছুই করতে হত না। স্বাভাবিকভাবে তারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হত। কারণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এর অন্য কোনও উপায় ছিল না। ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা বাংলায় প্রবেশ করার পর এই সকল ধর্মচ্যুত

মানুষদের আর একটি বিকল্প হয় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কখনওই তাঁদের মনোভাব নমনীয় করেননি। তাঁরা কখনই ধর্মচ্যুত মানুষদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নিতে চাননি। বরং তাঁরা চেয়েছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণকেন্দ্রিক এক ব্যবস্থা এবং তাঁদের অধীনস্থ আর এক সমাজ। যার ফলে নিম্নবর্গীয়রা অনায়াসেই ইসলাম ধর্মের কাছে পৌঁছে যান (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৩৫)।

ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া

বাংলায় তুর্কি এবং আফগানি শাসন কায়েম করতে অনেকটা সময় লাগে। রাজা লক্ষণ সেনের বংশধররা বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের পর প্রায় এক শতক পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো যেমন বঙ্গ, সমতট ইত্যাদি শাসন করতে থাকেন। এ সময়ে ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধও ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার (আবদুল, করিম, ১৯৫৯ : ১৯)। সব মিলিয়ে গোটা বাংলাদেশই তখন অস্থির। এমনই এক পরিস্থিতিতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যে কোনও শাসকের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব ছিল। যত সে শাসক হিসেবে ইসলাম প্রসারের কাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে ততই সে উচ্চবিত্তের শাসককুলের কাছ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবে। বিশেষত পরিস্থিতি যেখানে এমন কেউই কারুর বিশ্বাসভাজন নয় সেখানে ধর্মীয় সহনশীলতার স্থান ছিল না।

শাসককুল তাদের কৃত কাজকর্মের সমর্থন যোগাড় করত পশ্চিম এশিয়ার খলিফা বা দিল্লির সুলতানের কাছ থেকে। আঞ্চলিক জনসাধারণের মতামত গুরুত্ব পেত না। রাজা গণেশের পুত্র, জালাউদ্দিনের সময় থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে গুরুত্ব দেওয়া যদিও চালু হয় কিন্তু তিনিও তাঁর পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্যে ইজিপ্ট শাসকের শরণাপন্ন হন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সে সময়ে রাজ্য শাসনের শিকড় প্রোথিত ছিল বাংলা এবং ভারতবর্ষের বাইরে (ইটন, আর. এম. ১৯৯৩ : ৫৬-৬১; করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ৪৬)।

শাস্তি হিসাবে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ

ইসলামি শাসককুল কখনওই গণ-ধর্মান্তরকরণের কথা ভাবতে পারেননি । এটাও সত্য যে বহু মানুষ শাসককুলের পক্ষেই থাকতে চেয়েছিলেন। ধর্মান্তকরণের পথকে আরও সহজ করার জন্যে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির কর মকুব করা হয়েছিল।[8] সুতরাং ধর্মান্তকরণ চলতেই থাকে যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় তবুও বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনাও কম ছিল না। ১৯০১ সালের আদমশুমারির প্রধান গেইট এই মতই পোষণ করতেন।

অনেক সময় ভুল কাজের শাস্তি হিসেবে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হত। যদু যখন সুলতান জালালউদ্দিন হয়ে সিংহাসনে বসেন, তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের যাঁরা তাঁকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করেছিল তাঁদের জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। ঠিক একই ঘটনা ঘটে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ক্ষেত্রেও। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সহনশীল শাসক। কিন্তু তিনিও ক্ষমা করেননি তাঁর শৈশবের শিক্ষক সুবুদ্ধি রায়কে। শৈশবে তাঁর শিক্ষক সুবুদ্ধি রায় তাঁকে বেত্রাঘাত করার শোধ হিসেবে তাঁকে ধর্মান্তরিত

করেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৬৩২-৬৩৩; সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ২৩৭-৩৮)।

এক্ষেত্রে কালাপাহাড়ের ঘটনারও উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ যুবক। মুসলমান তনয়া দুলারীর সঙ্গে তাঁর প্রেম হয় এবং তিনি মুসলমান না হয়ে দুলারীকে বিয়ে করতে চান। ফলত, সুলতান মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠান। কিন্তু তিনি দুলারীর সহায়তায় পালিয়ে আসেন পুরীতে। সেখানে তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হন যাতে তারা বিধান দেন যে তিনি দুলারীকে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণদের রায় ছিল যে মুসলিম কন্যাকে বিয়ে করতে হবে মুসলিম হয়েই। স্বভাবতই, কালাপাহাড়ের ধর্মান্তরিত না হয়ে আর উপায় থাকে না এবং দুলারীকে বিবাহ করেন মুসলমান হিসেবেই। প্রতিশোধ হিসেবে পরে তিনি হিন্দু মন্দির আক্রমণ করেন এবং বহু হিন্দু বিগ্রহ ধ্বংস করেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৬৪০-৬৪২)।

আর একটি ক্ষেত্রে, শাসক সাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহ এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা ফুলমতিকে অপহরণ করেন এবং অ-মুসলমান সমাজে নিন্দিত হন। তখন তিনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানান যাতে কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান তাকে বিবাহ করে যোগ্য সম্মান দেন। স্বভাবতই কোনও ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং সেই মেয়েটি উপায়ান্তর না দেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২, ৬৫২-৬৫৩)। অপর একটি ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ এক স্থানীয় হিন্দু রাজার দুই সুপুরুষ সন্তানকে অনুরোধ করেন তাঁর দুই কন্যাকে বিবাহ করার জন্যে। তাঁর দুই কন্যাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতেও তাঁর অনীহা ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। পরে রাজার দুই সন্তান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তারপর সুলতানের কন্যাদের বিবাহ করেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২, ৬৫৪)।

এই কাহিনির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে উচ্চবিত্ত মুসলমান ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেছে। একইভাবে জাতীয় স্তরে মোগল রাজপরিবারেও এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সেখানে মোগল সন্তানরা রাজপুত নারীদের বিবাহ করেন। এই বিবাহ কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত এবং কিছু ক্ষেত্রে বলপূর্বক হয়ে থাকত। এর ফলে, বেশ কিছু বিখ্যাত মুসলমান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ রক্ত বহন করেছিলেন। যেমন ইসা খাঁ থেকে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং অবশ্যই জালাউদ্দিন।

সুফি-পীরের ভূমিকা

যেখানে জোর করে ধর্মান্তরকরণের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত সেখানে ইসলাম সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে অন্য পথে। সুফি-পীর সম্প্রদায় বাংলাদেশে আসেন অন্যান্য ইসলাম রাষ্ট্র যেমন, পারস্য, আরব, তুরস্ক এবং আফগানিস্তান থেকে। এই সম্প্রদায়ের লোকজন ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ ভূমিকা নিতে পেরেছিল। অন্য উচ্চবিত্ত যোদ্ধা বা মুসলিম সম্প্রদায় আশরফ-এর তুলনায় সুফি-পীর সম্প্রদায়ের মুসলমানরা ছিলেন আলাদা। তাঁরা গ্রামে গিয়ে থাকতেন। গ্রামবাসীদের সমস্যা সমাধান করতেন। তাঁদের সারল্য এবং সততা, ইসলামের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গেছেন

এবং প্রায় প্রতিটি জায়গায় দর্‌গা ও খাকোয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন, মাদ্রাসা খুলেছেন। বহু ক্ষেত্রে তাঁদের এই কাজ রাষ্ট্র সমর্থন করেছে। দর্‌গায় লোকে আল্লার উপাসনার জন্যে জড়ো হত, খানকোয়ায় খাদ্য বিতরণ করা হত এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদান করা হত। গ্রামবাসীরা তাদের সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। খুব অল্প সময়ে এই সুফি-পীর সম্প্রদায়ের অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার দাবানলের মতো গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে (করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ১২৪, ১৩৭)। এই পবিত্র মানুষজন ধর্মযুদ্ধও করতেন। রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাদ লাগত গো হত্যাকে কেন্দ্র করে। পীর সম্প্রদায় সবসময়ে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ নিতেন। যখন স্থানীয় রাজা পরাজিত হতেন, তখনই শুরু হয়ে যেত ধর্মান্তরকরণের কাজ (করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ১২৫)।

ইসলামের সপক্ষে প্রচার চালানোর কাজ তাঁরা ত্বরান্বিত করতে পেরেছিলেন আর একটা উপায়ে। যেখানেই স্থানীয় ধর্মের উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেই ভগ্নস্তূপের ওপর তাঁরা দর্‌গা বা খাকোয়া স্থাপন করতেন। এতে তাদের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হত। প্রথমত, ওই স্থানে আবার অন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার আর কোনও উপায় থাকত না। দ্বিতীয়ত, ওই স্থানকে ব্যবহার করে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা যেত। হিন্দুরা যারা এই স্থানগুলিতে এক সময় বছরের পর বছর পূজা-অর্চনা করে এসেছিলেন, পীরের অনুপ্রবেশে তাঁরা তাঁদের অতীত ভুলে যেতে থাকেন এবং ক্রমশ ইসলাম ধর্মের কাছাকাছি আসেন, এক সময় আপনিই ধর্মান্তরিত হয়ে যেতেন (কানুনগো, কে. আর., ১৯৭৩ : ৬৯-৭০; করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ১৬৪)।

সাধারণভাবে, পীর সম্প্রদায় সকল স্তরের মানুষের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারতেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে যে পরিস্থিতি ছিল সেই পরিস্থিতির কোনও ইতরবিশেষ বদল তখনও হয়নি। তখন রাজা এবং পুরোহিত জোট বেঁধে ধর্মকে রক্ষা করতেন এবং দুয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে শাসকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে পারত। এতে রাজা এবং পুরোহিত উভয়েরই স্বার্থ রক্ষিত হত। রাজা তাঁর কাজের বৈধতা আদায় করতে পারতেন এবং পুরোহিত তাঁর কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় পেতেন। পীর সম্প্রদায় বাংলায় আসা শুরু করে যখন বখতিয়ার খিলজি নদিয়ার রাজপ্রাসাদ আক্রমণের সময় থেকে। বল্লালচরিতে বায়াদুমা (সম্ভবত আদম সাহিব) বলে এক পীরের উল্লেখ আছে। শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজির অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা বাংলায় লেখা হয়েছিল শেখ সুভোদয় গ্রন্থে। যদিও এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রশ্নাতীত নয়।[৫] এই গ্রন্থ থেকে ধারণা করা হয়েছিল ভারতবর্ষ মুসলমান অধ্যুষিত হবেই কারণ এটাই ছিল ভবিতব্য। শেখ জালাল কুন্যায়ী নামক আর এক পীরের উল্লেখ পাওয়া যায় ইবন বতুতার রচনায়।

বহিরাগত ছাড়াও এমন অনেক পীর ছিলেন যাঁরা গ্রামেই থাকতেন এবং জনগণের জন্যে উন্নয়নমূলক কাজ করে ধর্মান্তরকরণের কাজটিও করতে পারতেন। এই পীরের দলও একইভাবে আঞ্চলিক রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। হিন্দু নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরকরণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ মৃত্যুর পরে লোকনায়কের স্থানে পৌঁছে

গিয়েছিলেন। বহিরাগত পীর দলের তুলনায় সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে এই পীর দলের যোগাযোগ ছিল আরও গভীর এবং আরও নিয়মিত। কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস ছিল, এই পীররা প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। এই পীরদের কয়েকজনের কার্যকলাপ লোককথা হয়ে উঠেছে। যেমন, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের প্রতিপক্ষ বড়গাজি (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ৮২-৮৭), বদরপীর, মানিকপীর এবং সত্যপীর প্রমুখ উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পূজিত।

বাঙালি মুসলমান লেখক

সাধারণ জনমানসে ইসলাম ধর্মের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ সহজে করতে পেরেছিলেন ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান লেখকরা। তাঁদের কেউ কেউ মক্কা মদিনা পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত বাঙালি লেখকেরা বাংলায় ইসলামি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন বাঙালিদের পড়াবার জন্যে। সে সময়ের রক্ষণশীল মুসলমানদের কাছে বাংলা ভাষা ছিল নিম্নস্তরের ভাষা। বাংলা ভাষাকে ইসলামের বাণী প্রচারের উপযুক্ত মনে করতেন না তাঁরা। তাঁদের পছন্দ ছিল ফারসি এবং আরবি। অন্য বিজাতীয় ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার তাঁদের কাছে অপমানজনক ছিল। মোগল যুগে ফারসির গুরুত্ব বেড়েছিল (দত্ত, চিন্ময়, ১৯৮৬)।

রক্ষণশীল মুসলমান লেখকদের কাছে ইসলাম ধর্মগ্রন্থ রচনার কাজটি খুব বিভ্রান্তিকর হয়ে দেখা দেয়। কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন বাংলার ঘরে ঘরে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গেলে তা বাংলা ভাষাতেই হতে হবে এবং তা স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসারী হতে হবে। এই ঐতিহ্য ছিল দুই মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারত। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত সমস্ত চরিত্রই সব ধর্মের বাঙালিদের কাছে পরিচিত ছিল। ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য। সুতরাং ইসলাম ধর্মের ধারণা যদি এই ঐতিহ্যের অনুসারী না হতে পারে তাহলে হয়তো শ্রোতা পাওয়া মুশকিল হবে। অন্যদিকে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না বিজাতীয় ভাষায় ইসলাম রচনা হলে তা অধর্মমূলক হবে কি না।

শেখ মুতালিব্ যিনি বাংলায় মুসলমান ধর্মীয় আইন রচনা করেছিলেন তিনি সারাজীবন পাপবোধে আক্রান্ত ছিলেন (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ৬৮)। শাহ্ মহম্মদ সাগির যিনি বাংলায় ইউসুফ-জুলেখা প্রেমকাহিনি রচনা করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন সে সময়ে কেউই ধর্মীয় কাহিনি লিখতে চাইত না নিন্দিত হবার ভয়ে। কিন্তু তাঁর মতে : শব্দ যদি সত্য হয়, ভাষায় কোনও দোষ নেই। তাঁর এই দ্বিধা শেষ হয়ে গেলেই তিনি বাঙালি পাঠকের কথা চিন্তা করে তাঁর লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখায় বাঙালি পোশাক এবং গহনার উল্লেখ পাওয়া যায়। জুলেখার বাবা-মা পান খেতেন আর রাজা আসতেন চতুর্দোলায় (করিম, আবদুল, ১৯৫৯)।

আর এক কবি মহম্মদ খাঁ ক্ষমাপ্রার্থনা করে ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কেন বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর মতে হিন্দুস্থানের জনসাধারণ ইসলাম গ্রন্থ বুঝত না যার ফলে অজান্তে রোজই পাপের অংশীদার হয়ে পড়ত। এতগুলো মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যেই তিনি বাংলাভাষায় লেখা শুরু করেন। নবীবংশ-এর লেখক সঈদ্

সুলতান বলেন বাংলার মানুষ তাদের চরম দুর্ভাগ্যের ফলে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা আরবি বোঝে না, ধর্ম বোঝে না। স্থানীয় পুরাণ কাহিনিতেই মজে থাকে। দুর্বল এই জাতির অনেকেই না জেনে, না বুঝে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। অথচ অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির ভাষায় লিখিত লোককাহিনি, পুরাণকাহিনি এমনকি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিতে মগ্ন থাকে (করিম, আবদুল, ১৯৫৯ : ৮১)।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে খিলজি আক্রমণের আগে বাঙালিদের কাছে সংস্কৃত ভাষাটি যেমন ছিল, বাংলার মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের কাছে ফারসি বা আরবি ভাষাও একই রকম দুর্বোধ্য ছিল। ইসলাম ধর্মের আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো পৌঁছতে পারত, যদি তা কথ্য ভাষায় লেখা বা বলা হত। ইসলাম ধর্মের সার কথা কখনই স্থানীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রসারিত হয়নি। সঈদ সুলতান আল্লা এবং আদ্যাশক্তির একতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে আল্লা এবং আদ্যাশক্তির একতা যে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের ধারণা অনুযায়ী নয় (তরফদার, এম. আর., ১৯৬৫ : ১৬৪)।

প্রায় মহাভারতের মতো এক মহাকাব্য কিংবা নিদেনপক্ষে মুসলিমদের জন্য এক মঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে সঈদ সুলতান বাইশ হাজার ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের 'নবিবংশ' রচনা করেন। তাঁর সমস্ত লেখাই স্থানীয় লোকগাথা থেকে নেওয়া। জনসাধারণের পরিচিত পুরাণ কাহিনির চরিত্রই তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামীয় ইতিহাস এবং পৌরাণিক নায়কদের মেলবন্ধন ঘটানো। এখানে ইতিহাস এবং পুরাণ এক তারে বাঁধা ছিল। তাঁর লেখায় তিনি বিভিন্ন জাতক বা বিষ্ণু অবতারের উল্লেখ করেন। যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম এবং কৃষ্ণ। এই তালিকায় পয়গম্বর মহম্মদের নামও সংযুক্ত হয় এবং এভাবেই বিষ্ণু এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে মহম্মদেরও কল্কি-অবতার হিসেবে একাত্মীকরণ ঘটে (রায়, অসীম, ১৯৮৩)। এই কাহিনিতে মহম্মদের প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁরই কাকা, যিনি নানা উপায়ে মহম্মদকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, মহম্মদ বেঁচে যান। ঠিক যেমনভাবে মামা কংসের নানা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে ভগবান কৃষ্ণ বেঁচেছিলেন।[৬] অমুসলিম ইরাক বা হিন্দু রাষ্ট্ররূপে বর্ণিত ছিল যেখানে জয়াকুমকে রাজা মনে করে গোস্বামীদের বন্দনা করা হত। মহম্মদ তাঁদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেন। সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে প্রচলিত বিশ্বাস থেকে চরিত্র-চয়ন করে মুসলিম ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন। জয়াকুম এবং আলির যুদ্ধ অনেকটাই মহাভারতের যুদ্ধের মতো।[৭] আমির হামজা গৌড়দেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং রাজাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। এই গ্রন্থে ভগবান শিব এবং কৈলাস পর্বতের-ও উল্লেখ আছে (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ১০৪-০৫)।

বাইবেলের যুগের ইজিপ্টের পটভূমিতে যে কাহিনি রচিত হয় তাতে গভীর অরণ্য এবং বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার যেমন—বাঘ, হাতি, ময়ূর, টিয়া এবং অরণ্যবাসী যাঁদের আহার্য ছিল ভাত, মাছ, ঘি, জল এবং পান, তাদের উল্লেখ রয়েছে। কবির কল্পনায়, ইজিপ্টের বর্ণনার সঙ্গে বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী-নালার এবং গাছপালার প্রচুর মিল পাওয়া যায়। মিশরের নীলনদ যেন ভারতের গঙ্গা। এখানে অগ্রাণ মাসকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বছরের হিসেব তৈরি হয়েছিল। এই সময়েই বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও লোকাচার

অনুষ্ঠিত হত। যেমন নবান্ন উৎসব। এখানকার মেয়েরা সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে সিঁদুর, চন্দন, কাজল ব্যবহার করতেন। আনন্দ অনুষ্ঠানে আবিরে রাঙানো হত এবং প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢাক-ঢোল-কাঁসি-মন্দিরা-মাদল বাজানো হত। বিবাহিত দম্পতিদের আশীর্বাদের উদ্দেশ্যে ধান এবং দূর্বা ব্যবহার করা হত। কোনও এক যুদ্ধের বর্ণনায় একবার নবি যুদ্ধ করেন গাণ্ডীব নিয়ে, অন্য একটি যুদ্ধে তিনিই ব্যবহার করেন ব্রহ্মাস্ত্র। সেনাবাহিনীকে দধিচির ধনুর্বাণ ব্যবহার করতেও দেখা গেছে। সঈদ সুলতানের যুদ্ধ বর্ণনায় অস্ত্র হিসেবে গদা এবং খড়্গার-ও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় 'ইভ' হয়ে ওঠেন এক বাঙালি সুন্দরী যার চোখে কাজল, গলায় মুক্তোমালা এবং কপালে রক্তিম সিঁদুর। কেশবিন্যাস সারতেন পুষ্প দিয়ে (রায়, অসীম, ১৯৮৩; ইটন, আর. এম., ১৯৯৩)।

সুলতানের অন্যান্য লেখাগুলো একইভাবে ঐতিহ্য এবং ইসলামীয় চরিত্রের সমন্বয়ে রচিত। তাঁর রচিত 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থে আলি মহম্মদকে ঈশ্বর হিসেবে সম্বোধন করেন এই বলে—'তুমিই মাটি, সাত সমুদ্র, তুমিই এই বিশ্ব চরাচরের রক্ষাকর্তা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই চন্দ্র, তুমিই সূর্য, তুমি স্থিতি, তুমি গতি, তুমি নিরঞ্জন, তুমি শ্যাম, তুমি-ই বিষ্ণু।'

সারকথা হল বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের লেখকদের এই ইসলাম ধর্মের প্রচারে সাধারণ বাঙালি জনগণের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া তৈরি করেনি। একই সঙ্গে ঐতিহ্যের প্রতি যাঁরা আস্থাশীল, তাঁদের কাছে, গ্রামীণ মুসলিম সম্প্রদায় কখনওই বিপদ হিসেবে বিবেচিত হয়নি বরং তাঁরা তাঁদের একই সমাজের এক পৃথক জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন।[৮] প্রায়শই তাদের কৃষক বলে সম্বোধন করা হত।

ইসলাম ধর্মের প্রচারে বাঙালি মুসলমানরা যে পথ নিয়েছিলেন হজরত মহম্মদ নিজেও কিন্তু আরবি ভাষায় একই পথ নিয়েছিলেন। মহম্মদ কখনই স্থানীয় ঐতিহ্য এবং জনগণকে অস্বীকার করেননি বরং তিনি তাঁর ধর্ম প্রচারের কাজে খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক মোজেস এবং যিশুকে পয়গম্বর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মহম্মদ-ই শেষ পয়গম্বর, যিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কোনও উত্তরসূরি পাওয়া যায়নি।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কি এবং আফগান শাসনকালে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য আরও সুসংবদ্ধ হয়েছিল। মোগল যুগে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে, মোগল শাসকরা জাতীয় বিধি ব্যবস্থায় বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। এবং সেই সময়ে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নয়ন ঘটে। বিশেষ করে রোসাং, ত্রিপুরা, কুচবিহার, সিলেট, কাছাড় এবং মল্লভূমে। এই সময়ের দুই প্রধান মুসলমান কবি দৌলতকাজী এবং সৈয়দ আলাওল রোসাং রাজসভার সভাকবি ছিলেন। এঁরা একসঙ্গে 'লোরচন্দ্রাণী' গ্রন্থটি রচনা করেন (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ২৩)। সৈয়দ আলাওলের রোসাং রাজসভায় যুক্ত হওয়ার ঘটনাটি রীতিমতো রোমাঞ্চকর। পোর্তুগিজ জলদস্যুরা আলাওলকে অপহরণ করে রোসাং-এ বিক্রি করে। এখানে থেকেই তিনি আরবি, ফারসি থেকে বহু গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। আমরা সকলেই জানি, 'পদ্মাবতী' এর অনন্য উদাহরণ। পদ্মাবতী ছিলেন চিতোরের রানি (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ৪৬)।

কীভাবে ইসলামিকরণ বাংলাদেশে কাজ করেছিল। এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দুই গবেষকের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এরা হলেন অসীম রায় এবং আমেরিকার রিচার্ড ইটন।[৯] তাঁরা দুজনেই লোকসাহিত্য সমীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম নিজের নিয়মেই প্রসার লাভ করেছিল। সুফিবাদ এবং ভক্তিবাদই ইসলাম ধর্মকে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল (ইটন, আর. এম., ১৯৯৩ : ২৬৮)।

ইটনের মতবাদ অনুযায়ী ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া তিনটি ধাপে বিভক্ত—এগুলি হল অন্তর্ভুক্তি, পরিচিতি এবং অপসারণ। প্রথম ধাপে ইসলামের ঐতিহ্যের পরিসরেই অতিমানবিক ইসলামীয় মতবাদের প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ঈশ্বর বা পবিত্র গ্রন্থের সঙ্গে তাঁদের একাত্মীকরণ ঘটানো হয়েছে। তৃতীয় ধাপে ঈশ্বর ইসলামীয় নায়কদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে (ইটন, আর. এম., ২৬৮)।

বাংলায় ইসলামিকরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সূর্যকে কেন্দ্র করে বছরের হিসেব থেকে চন্দ্রকে কেন্দ্র করে বছরের হিসেব (মুখার্জি, রীলা, ২০০০, ২৩১) শুরু করা।

ব্যাপক ধর্মান্তরিতকরণের অন্যান্য কারণ

এতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল কী কারণে ক্ষমতাসীন শাসকরা ধর্মান্তরকরণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরকরণ সম্ভব হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অ-মুসলিমদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। ১৮৭২-এ ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে মুসলিমরাই ছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যা হিন্দু-মুসলিম এবং ইংরেজ তিন সম্প্রদায়ের কাছেই আশ্চর্যের ছিল। প্রশ্ন ছিল কেন ভারতবর্ষের একমাত্র বাংলা প্রদেশেই মুসলিমরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত হবে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যের নানা কারণ ব্যাখ্যাত হতে থাকে। সকলেই একটা ব্যাপারে একমত হতে পারেন যে, আরব, তুরস্ক, পারস্য বা আফগানিস্তান থেকে ভারী সংখ্যার অনুপ্রবেশ কখনই এর কারণ ছিল না। কারণ ধর্মান্তরণ হয়েছিল বেশির ভাগই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে।[১০] আবার ইসলামের মাহাত্ম্যও এর কারণ ছিল না। কারণ হিসেবে ইসলামের সামরিক ক্ষমতাকে বলা সম্ভব নয়, কারণ উত্তর ভারতে ইসলামি শাসকদের সামরিক আগ্রাসন বাংলার তুলনায় অনেক বেশি হলেও, সেখানে ধর্মান্তরণের হার অনেক কম।[১১] দারিদ্র্য, জাত-পাতের বৈষম্য, বৌদ্ধদের অবশেষ অংশ, কোনও কিছুই শুধুমাত্র বাংলা প্রদেশে ইসলামিকরণের এই আধিক্যের কোনও রকম সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে বেশিরভাগ নিম্নবর্গের মানুষই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ আবার নমঃশূদ্র (অতীতে এদের 'চণ্ডাল' বলা হত) ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ।[১২] বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বহু অংশ ইসলামে যোগ দিয়েছিলেন সেটাও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক সময়ের জনপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম কীভাবে তার জনপ্রিয়তা হারাল সেও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এ সম্পর্কে এই পুস্তকের ২.৪ পরিচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ৮২ : ৮৩)।

অনেকের মতে সেন শাসনকালে অত্যাচার ও দমননীতি সহ্য করতে না পেরে বৌদ্ধরা ধর্মঠাকুর, বৈষ্ণব কিংবা ইসলামের আশ্রয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিভ্রান্তির ব্যাপার হল এই যে উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের তুলনায় শুধুমাত্র বাংলাতেই যে নিম্নবর্গের বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার বেশি হয়েছিল তার কোনও প্রমাণ কিন্তু নেই। বরং ইতিহাসের সমীক্ষা জানায় যে সেন শাসনকালে শাসকদের চেষ্টা সত্ত্বেও দমন নীতি বা জাত-পাতের বৈষম্য অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাতে ছিল অনেক কম। আবার জাতীয় স্তরের সমীক্ষায়ও জানা যায় যে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারের পরিসংখ্যানও তুলনায় অনেক কম ছিল (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ৩৩)।

১৮৭২ সালের জনগণনায় স্পষ্ট দেখা যায় যে বাংলায় মুসলিম আধিক্য কোনও শহরেই ছিল না। বরং পিছিয়ে থাকা গ্রামাঞ্চল ঘিরেই ছিল মুসলিম ধর্মান্তরকরণের ঢেউ। উত্তর ভারতে কিন্তু ছিল বিপরীত চিত্র। সেখানে বেশিরভাগ মুসলমান মানুষই ছিলেন শহরবাসী। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে গ্রামীণ এবং শহরে মুসলমান মানুষজন এসেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে। এর মধ্যে গ্রামীণ মুসলমান মানুষজনের সঙ্গে রাজবংশী ও নমঃশূদ্রের আচরণগত মিল ছিল সব থেকে বেশি (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ২৫-২৯)।

বিকল্প ব্যাখ্যায় বলা হল, যেহেতু রাজবংশী ও নমঃশূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা জাতিব্যবস্থা তেমনভাবে প্রচলিত ছিল না সেহেতু ইসলাম প্রচারকদের পক্ষে পূর্ববাংলায় তাদের প্রাধান্য কায়েম করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং জাতি বৈষম্যের স্থবির কাঠিন্য নয়, অনুন্নত অঞ্চলে এর দুর্বলতাই ইসলাম ধর্ম বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

ধর্মান্তরকরণ কিন্তু শুধুমাত্র নিম্নবর্গের মানুষজনদের মধ্যে থেকেই হয়নি। বলা ভালো, বেশিরভাগ ধর্মান্তরকরণ হয়েছিল নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে থেকে (মজুমদার, ডি. এন. ও সি. আর. রাও, ১৯৬০ : ৭৭, ৯৬, ১১৪)। তন্তুবায়, চর্মকার, রাজমিস্ত্রি বা অন্যান্য পেশার মানুষজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও নিজেদের জাতিগত পরিচয় কিন্তু বজায় রাখেন। অবশ্য মুসলিম শাসকরা কিন্তু চাইতেন স্থানীয় উচ্চ শ্রেণির মানুষজনের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের কাজ আরও বেশি করে হোক (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ৩৬-৩৭, ৬৩-৬৭)।

পরিবেশগত পরিবর্তন ও জমির ঔপনিবেশিকতা

ইসলাম ধর্ম প্রসারে গণ আন্দোলনের ভূমিকা কেমন ছিল তা বুঝতে গেলে ব্যাপারটা বঙ্গ সংস্কৃতি ও বঙ্গ সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচিত হওয়া দরকার (রায় রায়, ১৯৮৩ : ৪৩)।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই সুন্দরবন অঞ্চলের কর্মব্যস্ত জীবনের কথা জানা যায়। কাঠ ও মধু সংগ্রহ, নতুন গ্রাম নির্মাণ ও সীমান্তে কৃষি কর্ম এই ধরনের ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ডের কথা যদিও প্রথম থেকে অজানা ছিল না কিন্তু পরের দিকে পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক কারণে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই সময়ে যেহেতু গঙ্গার জল আরও বেশি করে পদ্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে সেইহেতু ঔপনিবেশিকদের পক্ষে জলপথে পূর্ব অংশের বনাঞ্চলের এক বড় অংশ জুড়ে কাজ

করা সহজ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক কারণে কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ তখন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শুধুমাত্র নদীপথের পরিবর্তনই পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গকে আরও বেশি সক্রিয় করতে পেরেছিল। স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানি, বস্ত্র ব্যবসার প্রসার, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রবেশ—এ সবই অর্থনৈতিক দিক থেকে উপনিবেশ গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করে। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির পরপরই বর্ধিত শুল্কের একটা বড় অংশ এই কাজে ব্যয় করা হত। স্বভাবতই এই উদ্যোগ ক্রমশ আরও প্রসারিত হতে থাকে। জমি বণ্টন, কৃষি সামগ্রীর সরবরাহ এ সবই ঔপনিবেশিকদের উৎসাহিত হতে সাহায্য করেছিল (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ৪৩-৫৭)।

নদীপথ পরিবর্তনে যারা সব থেকে সুবিধাভোগী হতে পেরেছিলেন তাঁরা হলেন 'হাওলাদার' গোষ্ঠী। তাদের কাজ ছিল মানুষ, অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহ করে কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই হাওলাদারেরা অনেকে এলাকায় কিন্তু পরিচিত ছিলেন "মোল্লা" বলে। এঁরা ছিলেন একাধারে ধর্ম প্রচারক ও কৃষিবিদ। এই মোল্লা সম্প্রদায়কে সম্রাট-এর তরফ থেকে জমি, অর্থ ইত্যাদি বরাদ্দ করা হত মসজিদ স্থাপন করার জন্য। ঔপনিবেশিকদের জীবনে এই হাওলাদারেরা ছিলেন দেবদূতের মতো (রায়, অসীম, ১৯৮৩; ইটন, আর. এম., ১৯৯৩)। কাঠুরে, জেলে, মাঝি-মাল্লাদের কাছে এঁরা ছিলেন জ্ঞানী মানুষ, বন্ধু, দর্শনবিদ ও পথ প্রদর্শক। সীমান্তের সাধারণ মানুষের জীবনে এই মোল্লারা ছিলেন পবিত্র , দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানকারী প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ।

এই মোল্লা তথা হাওলাদারেরা তাঁদের নিজ নিজ লোক লস্কর নিয়ে জঙ্গলে যেতেন। নানা লোকাচার তথা ঈশ্বর আরাধনায় ব্যস্ত হতেন। মসজিদে জড়ো হতেন। প্রতি শুক্রবার মসজিদে আল্লার কাছে উপাসনার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হত। যে সমস্ত মানুষজন হাওলাদারের অধীনে কাজ করতেন , তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে, মসজিদে জড়ো হতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতেন। যেহেতু মোল্লারা এক অর্থে বৃহত্তর পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, প্রায় নিঃশব্দে সহজেই ধীরে ধীরে ধর্মান্তরকরণের মতো কঠিন ও বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত। সাধারণ মানুষের প্রায় অজ্ঞাতসারেই এই বৃহৎ পরিবর্তন সাধিত হত।

যতদিন মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকে, ততদিন ধর্মান্তরকরণের হার ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রধান সুবিধাভোগী কিন্তু ছিলেন শহরে এগিয়ে থাকা সম্প্রদায় ও আশরফ সম্প্রদায় মানুষজন। ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়—এঁদের উদ্ধত আচরণ অগ্রাহ্য করেই রাষ্ট্র প্রবর্তিত ইসলাম সংস্কৃতিকে নিজ সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায় যদিও রাষ্ট্র প্রবর্তিত ইসলাম সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী বাঙালি উপ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বর্জনও করতে পারেননি। তাঁরা গো মাংস ভক্ষণ করতেন, সুন্নত করতেন, মৃতদেহকে কবর দিতেন। তাঁদের কাছে ইসলাম সংস্কৃতি ও ইসলাম আচারই উৎকৃষ্ট, সেরা বলে বিবেচিত হত। ধর্মের আড়ালে তাঁরা মুসলমান শাসনের দীর্ঘমেয়াদকেও আরও সুনিশ্চিত করে তোলেন। কিন্তু তাদের ব্যক্তি জীবনের ধরন, পোশাক, নাম, জাতি পরিচয় এবং ভাষা অপরিবর্তিত থাকে।

সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখ

ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই পাঁচালি বা বিভিন্ন ধর্মমূলক কাব্যে অসংখ্য মুসলমান চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এক মুসলমান ঠিকাদার দাফর মিঁয়ার উল্লেখ আছে যিনি কালকেতুর শহর নির্মাণের জন্য ২০০০ দিনমজুর নিয়োগ করেন এবং কাজ শুরু করেন পীর ও পয়গম্বরের উপাসনার মধ্য দিয়ে (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ৬৬-৬৯)। যাঁরা শহরে বসবাস শুরু করেন তাঁদের মধ্যে ছিল পীরের দল যাঁরা কোরান, নামাজ ইত্যাদি পড়ে রোজা করে সময় কাটাতেন। কবিরা তাঁদের কবিতায় এও উল্লেখ করেছেন কীভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা সমাজে নতুন নামে অভিহিত হতেন। যেমন, জোলা (তাঁতি), মাগরী (কৃষিজীবী), পিঠাহরি (এক ধরনের মোদক), কাবাড়ি (মৎস্যজীবী), সনকার, তীরকর, কাগতি, কালান্দার (ফকির) ইত্যাদি (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ৭৮-৭৯)।

কবি কৃষ্ণদাসের রায়মঙ্গল কাব্যে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় এর সঙ্গে তাঁর মুসলমান প্রতিপক্ষ বড় গাজির লড়াই কাহিনিতে বর্ণিত। সেই লড়াই শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে এর সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের হস্তক্ষেপে। এই পরমেশ্বর বোধ হয় ছিল ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক যাঁর শরীর ছিল দ্বিখণ্ডিত। তার এক অংশ ছিল কৃষ্ণ (কালো), এবং অন্য অংশ পয়গম্বর (সাদা)। তাঁর এক হাতে কোরান অন্য হাতে পুরাণ, অর্থাৎ পরমেশ্বরের দেহ যেন ছিল দুই মূল ধর্মের সংমিশ্রণ (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮ : খণ্ড ২, ২৬৭-২৬৯)।

ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় বা তাঁর মুসলমান প্রতিপক্ষের যে সব ভক্ত অনুগামীর দল ছিল তাঁরা সুন্দরবন উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের জঙ্গলেও যেতে হত। তাঁরা ছিলেন কাঠুরিয়া, মউলে, বুনো, নৌজীবী, শিকারী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক। এছাড়াও ছিল পোদ, বাগদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (সেন , সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ২৬৩, ২৬৫)।

গাজি-দক্ষিণ রায়ের আর এক কাহিনি বিবৃত আছে। লিখেছিলেন এক মুসলমান লেখক। সে কাহিনিতে হিন্দু দেবদেবীর দল গাজিকে নিজেদের সন্তান করে নেন। আর গাজি আল্লার সহায়তায় এক হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কাহিনি শেষ হয় রাজার গাজিকে এবং তার সহচর কালুকে সম্মান প্রদর্শন এবং মসজিদ তৈরির প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে। ঘটনাচক্রে, কুমিরদের দেবতা হিসেবে কালুর আরাধনা অমুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। অন্য কাহিনিতে, গাজি সাতজন কাঠুরেকে 'মাসি' গঙ্গার কাছে পাওয়া সোনা দিয়ে সাহায্য করেন। 'ব্রহ্মনগর', যেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান দেখলে প্রায়শ্চিত্য করত, সেখানে গিয়ে গাজি পরীদের সাহায্যে রাজকন্যাকে গান্ধর্ব্য মতে বিয়ে করেন।

গাজি-দক্ষিণ রায়ের অন্য আরেক কাহিনিতে দেখা যায় নানান হিন্দু দেব-দেবীর আশীর্বাদ ও সাহায্যপুষ্ট হয়েও দক্ষিণ রায় গাজির হাতে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় যখন গাজীর সঙ্গে গঙ্গা দেবীর বোনঝি রাজকুমারীর বিবাহ হয় এবং রাজকুমারী ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন অন্য লোককথায় গাজি ব্রাহ্মণ বেশে রাজার সামনে উপস্থিত হন এবং রাজকুমারীকে বিয়ে করেন (রায়, অসীম,

১৯৮৩ : ২৩৬-২৪০)।

মনসামঙ্গল কাব্যের নতুন তরজমায় দেখা গেছে সর্পদেবতা মনসাকে লড়তে হয় তাঁর দুই মুসলমান প্রতিপক্ষ হাসান-হোসেনের বিরুদ্ধে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিষ্ণুপাল রচনা করেন হাসান-হোসেন পালা। মনসা এসে পড়েন এক সুন্দর শহরে, যা তৈরি করেছেন শিবের বরপ্রাপ্ত দুই অজেয় অমর ভাই হাসান আর হোসেন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ১৬৭-১৬৮; খণ্ড ২ : ২৩০)।

এই কাব্যে মুসলিম উপনিবেশের বর্ণনা লক্ষ করা যায়। যদিও প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য সাধারণভাবে আলাদা করে বোঝা যায় না। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য যেমন — সর্বত্র মুরগি ঘুড়ে বেড়ায়, বাজি পোড়ানো, ড্রাম বাজানো, বিবির থালি থেকে নিয়ে স্বামীর খাওয়া ইত্যাদি (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ২)। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর থেকেই কিন্তু কাব্যে 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এই সময়ের সাহিত্যে এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে। পরিচিত দেবদেবী, পুরাণ কাহিনি ও ইসলাম ধর্ম নায়কের সমন্বয় কাহিনি। মুসলিম লেখকদের লেখায় সর্বদাই ইসলামের জয় ও ধর্মান্তবকরণের মধ্য দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর অ-মুসলমান লেখকদের লেখার চরিত্র রক্ষণাত্মক। স্পষ্টতই তাঁদের লেখায় ইসলামের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সমন্বয়ের যুক্তি হিসেবে বলা যায় সর্বদাই চেষ্টা করা হয়েছে রাষ্ট্র প্রবর্তিত সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে ইসলাম ধর্মের সামাজিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার।

এ যাবৎ আলোচিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ শাসন শুরুর অব্যবহিত পরেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সুস্পষ্ট দুটি ধারা। একদিকে মুসলমান সম্প্রদায় যারা প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাঁদের আচার-আচরণ, জীবনধারণ, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বা বিশ্বাসের থেকে ভিন্ন। অন্যদিকে স্থানীয় মুসলমান যাঁরা ঐতিহ্যবাহী প্রচলিত বিশ্বাসের পথেই সামগ্রিকভাবে বেঁচে ছিলেন। দুই ধারার মানুষই আবার একই আল্লার প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন, আপন সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গ্রহণ করেছেন। যখন দুই সম্প্রদায়ই নতুন উপনিবেশ গঠনের কাজে বা বনাঞ্চল সাফাইয়ের কাজে শামিল হয়েছেন, একই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কলেরা, জল বসন্ত জাতীয় একই ধরনের রোগে কিংবা শিশুমৃত্যুতে আক্রান্ত হয়েছেন। একই দেবদেবী (ভিন্ন নামে) বন দেবী-বনবিবি, ওলাই চণ্ডী-ওলাই বিবি ইত্যাদি মেনেছেন।

প্রচলিত বিশ্বাস এবং মুসলমানী আচারের ক্রমান্বয় পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে গড়ে ওঠে নতুন ধর্মবিশ্বাস। এদের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্ম ঠাকুর ও সত্যপীর-এর ভক্তি বিশ্বাস।

ধর্মঠাকুর

বিষ্ণু অবতার কূর্ম[১৩] হিসেবে আবির্ভূত ধর্ম ঠাকুরকে সকলে শক্তির প্রথম উৎস আদিশক্তি বলে মান্য করতেন। ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা সম্ভবত ১২০৪ সালের আগেই চালু ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসকদের আমলেই তা বিকশিত হয়। 'নাথ' সম্প্রদায়ের মতো সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক ধারণার সংমিশ্রণ। এই ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মের

আগে কিছুই ছিল না। ঈশ্বর নিরাকার এবং অসীম শূন্যের মাঝে এক শূন্য বিশেষ। প্রথমে জল পরে মাটি শেষে এক ডিম্ব থেকে উদিত ত্রিশক্তির বিকাশ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ৩৬৫)। এই ধর্মবিশ্বাসের অনুগামীদের কাছে ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ ছিল রামাই পণ্ডিতের লেখা 'শূন্য' ধারণার দর্শন 'শূন্য পুরাণ'। মূল অনুগামী এবং এই দেবতার পুরোহিত ছিলেন নিম্নবর্গীয় ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ জন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫; ভট্টাচার্য, এ., ১৯৫০)।[১৪]

খিলজি শাসনের অব্যবহিত পরে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম ঠাকুর সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম ঠাকুর কল্কি অবতার হিসেবে গৃহীত হন। তাঁর ইসলামিকরণ হয় পয়গম্বর হিসেবে। নানান হিন্দু দেবদেবীর ইসলামিকরণ সম্ভব হয়। দেবতাদের পোশাক হয়ে ওঠে ধুতির বদলে পাজামা। ব্রহ্মা হয়ে যান মহম্মদ, গণেশ কাজি, ইন্দ্র মৌলানা, চণ্ডি হয়ে যান হায়া বিবি (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ২)। আর কার্তিক হয়ে উঠলেন গাজি। অনুগামীদের মধ্যে মুসলমানী আচার-এর প্রভাব লক্ষিত হয়। শুক্রবারকেই প্রার্থনা জানাবার দিন বলে গ্রহণ করেন তাঁরা। পশ্চিম মুখে অর্থাৎ মক্কার দিকে মুখ করে পশুবলির প্রথাও চালু হয়। অনেকের মতে পূর্বে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বর্গের মানুষজনের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্যই এই পরিবর্তন গৃহীত হয়েছিল (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ৩০৪-৩০৬)।

সুফিবাদ

ইসলাম সংস্কৃতি প্রসারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন পীর সম্প্রদায়। এঁদের বেশির ভাগই আবার ছিলেন সুফি মতবাদে বিশ্বাসী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে সুফীবাদের প্রভাব ভারতীয়দের মনে স্থান করে নেয়। সুফিবাদ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল যেমন চিস্তি, সুহরাবর্দী, কোয়াদিরি বা নক্সবন্দী ইত্যাদি। সূক্ষ্ম ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা না করেও বলা যায় যে, সুফিবাদের এই স্তরীকরণ সকলের থেকে আলাদা ছিল। সাধারণ মুসলমানী আচরণ থেকে ভিন্ন, প্রচলিত প্রথায় বিশ্বাসের থেকেও ভিন্ন। বরং বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রেখে সুফি সম্প্রদায়ে নৃত্য-গীত হয়ে ওঠে প্রধান অবলম্বন, যা পূর্বে ইসলামি সংস্কৃতিতে ছিল না। বাংলার সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতন সুফিবাদ গুরু ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। বিভিন্ন প্রচলিত লোকাচার ও প্রথা যেমন উপবাস, হজযাত্রা ইত্যাদি সুফিবাদে বর্জিত হয়। ঈশ্বরকে তাঁরা মনের মানুষ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

সুফি ধারণা অনুযায়ী সকল সৃষ্টির উৎসই হল ঈশ্বর। প্রথমে এ বিশ্ব চরাচরে শুধুমাত্র ঈশ্বরই বিরাজ করতেন। পরে তিনি তাঁরই এক প্রতিকল্প আদম সৃষ্টি করেন। একই দেহে দুই আত্মার বাস এই ছিল সুফী বিশ্বাসের মূলমন্ত্র। প্রেমই হল বিশ্বক্রিয়ার আসল কথা, আদম ও স্বর্গীয়ের প্রেম। বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, পানি এদের প্রেম ভক্ত আর ভগবানের প্রেম, প্রেমই আদি, প্রেমই মধ্য আবার প্রেমই অন্ত। সহজিয়া আগে না সুফীবাদ আগে এ তর্ক নিরর্থক। দুই সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিশ্বাসের অঢেল মিল কিন্তু ভীষণ স্পষ্ট ছিল সে সময়ে (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ১৯১-২১৩)।

সুতরাং ইসলামীয় সংস্কৃতি স্পষ্টতই দুটি স্তরে সক্রিয় ছিল। একদিকে মোল্লা প্রভাব, তারা ছিলেন ইসলামের রক্ষণশীল অভিভাবক, অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব,

বিশ্বাস, সামাজিক আচার ইত্যাদি। মনসা, ধর্ম, বা সত্যপীরের প্রভাব ছিল ব্যাপক। শরিয়ত বা কোরান সর্বমান্য হলেও জনজীবন নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রভাবশালী ছিল না। কিন্তু প্রেম রসের প্রভাব অনেক বেশি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছিল। প্রেমকাহিনির অসামান্য জনপ্রিয়তা এই ধারণাকেই আরো বদ্ধমূল করে যেমন — রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগাথা তেমনই লায়লা-মজনুর প্রেমকাহিনি আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ১৪৪-১৪৬, ১৪৮)।

যত দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে ততই সুফিবাদও সময়ের সঙ্গে সমৃদ্ধ হতে থাকে। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেখ জাহিদের যে সুফিবাদের উপর কাজ দেখা যায় তার মূল ভাবনাই কিন্তু ছিল ধর্মঠাকুর প্রবর্তিত শূন্য পুরাণকে আধার করে (তরফদার, এম. আর., ১৯৬৫)।

সুফিবাদ ও পীরসম্প্রদায়

বাংলায় পীরেরা এক বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। এঁদের অনেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বাংলার গ্রামে গ্রামে বসবাস করা শুরু করেন এবং ধর্মান্তরকরণকে সহায়তা করেন। পীর সম্প্রদায়কে নিয়ে নানা কাহিনি বর্ণিত আছে। মঙ্গলকাব্যের ধরনে লিখিত এ সমস্ত কাহিনিতে মূলত পীর সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পাওয়ার ঘটনাই ছিল প্রধান উপজীব্য। অনেক কাহিনিতে, কৃষ্ণ স্বয়ং অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে পীরকে মানতে বলেছেন (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ২১৫-২১৮)।

বদরপীর ও মানিক পীর

সে সময়ের লোককথায় পীর সম্প্রদায় বিশেষ করে সত্যপীর-এর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জলের অভিভাবক আত্মা বদরপীর ও তার সন্তান মানিক পীরও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বদর পীরের কাহিনিতে ছিল নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি লাভের বিবরণ। প্রথমে গঙ্গার সঙ্গে আত্মীয়তা, পরে ত্রিবেণীতে মসজিদ নির্মাণের প্রচেষ্টা এবং শেষে বাদশার অপরূপা কন্যার সঙ্গে বিবাহ—এই ছিল বদর পীর কাহিনির প্রধান উপজীব্য।

মানিক পীরের কাহিনির সঙ্গে মহাভারতের কর্ণ-কুন্তী কাহিনির অনেক মিল পাওয়া যায়। বদর পীরের স্ত্রী দুধবিবি বিবাহের দু বছর পর তাঁদের সন্তান মানিকের জন্ম দেন। এই মানিককেই জন্মের পর এক তাম্রপাত্রে ভাসিয়ে দেন জলে। পরে মধু নামে এক মালীর লালনে মানিক বড় হয়ে ওঠে। এর পরের কাহিনি মানিকের সঙ্গে ঈশার (যিশু খ্রিস্ট) বন্ধুত্ব, ঈশাকে বাঁচিয়ে তোলার ও মানিকের অলৌকিক ক্ষমতার গল্প (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ১১৩-১২৩)।

সত্যপীর

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত শঙ্করাচার্যের কবিতায় প্রথম সত্যপীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পরে আরিফ ও ফকির রামভূষণ-এর লেখায়ও সত্যপীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবতার বর্ণনায় মুসলমানী লক্ষণ বিলুপ্ত হতে থাকে। পাজামা ছেড়ে ধুতি চাদর-এ সজ্জিত হন সত্যপীর এবং ক্রমশ সত্যপীর থেকে হয়ে ওঠেন বিষ্ণু অবতার

সত্যনারায়ণ, একমাত্র মুসলমানী বৈশিষ্ট্য যা থেকে যায় তা হল ভোগের পরিবর্তে দুধ-ময়দা-কলা-চিনি দিয়ে তৈরি সিন্নির নৈবেদ্য প্রদান (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ৯৯-১০১)। কৃষ্ণহরি দাসের (হিন্দু নাম হলেও সম্ভবত মুসলমান ছিলেন) সত্যপীর সংক্রান্ত লেখা শুরু হয় আল্লাকে সম্ভাষণের মাধ্যমে। এ কাহিনিতে বিবৃত রয়েছে সত্যপীরের জন্মগাথা। ফকিরদের প্রতি ময়দানবের[১৫] অত্যাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে চাঁদবিবি বেহেস্ত থেকে পৃথিবীতে এসে সত্যপীরের জন্ম দেন। সত্যপীরকে লালন করে এক কাছিম। বড় হয়ে সত্যপীর রাজা মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অন্য এক কাহিনিতে বলা হয় সত্যপীর ছিলেন সুলতান হুসেন শাহর কন্যার সন্তান। দুটি লেখাই বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সত্যপীরের উদ্ভব ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে (রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ২১৫-২১৮; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ৯৯-১১৩, ৬৭৭)।

সত্যপীরের বেশিরভাগ পাঁচালিই প্রচলিত বিশ্বাসের অনুগামীদের লেখা, কিন্তু সে পাঁচালি গান গাইতেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। সুকুমার সেনের মতে সত্যপীর, ধর্মঠাকুরের ধারণার বিবর্তনেই সৃষ্ট। দুই কাহিনিতেই কচ্ছপের উল্লেখ এই বক্তব্যের পক্ষে জোরালো যুক্তি। বিদ্যাপতি সত্যপীরকে কলিযুগে ফকিব হিসেবে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে দেখেছিলেন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, খণ্ড ২ : ৩৯৮, ৪০০)।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত

বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রচলিত স্তরে উভয় সম্প্রদায়ের তবফ থেকেই প্রচেষ্টা ছিল যাতে দুধরনের বিশ্বাস মিলিয়ে এক নতুন বিশ্বাসেব প্রচলন করা যায়। ঐতিহ্যবাহী, প্রথাগত পুরাণকথার সঙ্গে মেলানো হয়েছে ইসলামীয় চরিত্র, কাহিনি এবং পীরের সাহিত্যকে। এর ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচিত বিষয়-এর সঙ্গে বিজাতীয় বিশ্বাসেব বৈধকরণ সম্ভব হয়েছে। তৃণমূল স্তরে দুই সম্প্রদায়ের মানসিক বাধা দূরীভূত হয়েছে। যার ফলে ধর্মান্তরণ অনেক সহজ হতে পেরেছে এবং রাজ্য প্রবর্তিত সহায়িত ইসলাম সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকারও পরম্পরাগত বিশ্বাসের সঙ্গে ইসলামীয় ধ্যান-ধারণার মেলবন্ধন ঘটেছে। একটি ক্ষেত্রে প্রভু, দিব্যগুরুকে মর্তে পাঠান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। এখানে উল্লেখ রয়েছে আবদুল্লা-আমিন, আল্লা রসুল-এর কন্যা ফতেমার। একই সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে সূর্যদেবতা, বৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণের। এ থেকে বোঝা যায় কত সহজে সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে ইসলামীয় অতিমানবিকতার প্রবেশ ঘটানো হয়েছে (ইটন, আর. এম. ১৯৯৩ : ২৭১-২৭২)।

এমনকি যখন কোনও মুসলমান কবির সৃষ্টির মূলভাব ছিল হিন্দু বিরোধিতা, তখন সেই বিরোধিতা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে অমুসলমানী আচার ও আধারকে আশ্রয় করে। বরুণকন্যা রাজকুমারী মল্লিকার গল্পে দেখা যায় যে মল্লিকা-হানিফের যুদ্ধ পরিণত হয়েছে মল্লিকা-হানিফের বিবাহতে এবং শেষে মল্লিকা ও তার পিতা বরুণের ধর্মান্তরকরণে (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪ : ১২৪-১৩৪)।

মন্দির/মসজিদ স্থাপত্যের সংশ্লেষ

বরাবরই মুসলিম শাসককুল তাদের কাজের বৈধ স্বীকৃতি চেয়েছেন বহিঃশক্তির কাছ থেকে যেমন পশ্চিম এশিয়ার খলিফা, দিল্লির সুলতান ইত্যাদি। কিন্তু কখনওই প্রজাদের অনুমোদনের তোয়াক্কা করেননি। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কিন্তু ঘটে সুলতান জালালুদ্দিন -এর আমল থেকে। স্থানীয় অধিবাসীদের খুশি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইনি মুদ্রার নকশা তৈরি করেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই পরিবর্তিত চিন্তার প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্য ছিল মূলত ইসলামীয় বৈশিষ্ট্য মেনে বড় একটা গম্বুজাকৃতি কক্ষ, চার কোণে আজান মিনার। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য যেমন কুঁড়ে ঘরের আদলে বাঁকা আর্চ, টেরাকোটার কাজ ও হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার (ম্যাকক্যাচিয়ন, ডেভিড, জে., ১৯৭২ : ১)।

উল্টোদিকে মন্দির স্থাপত্যও ইসলামি স্থাপত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেক মন্দিরই নির্মিত হয়েছিল বড় এক গম্বুজাকৃতি কক্ষর আদলে (ম্যাকক্যাচিয়ন, ডেভিড জে, ১৯৭২ : ১০)।

বৈষ্ণববাদ

শাসককুলের অপছন্দের কারণে যখন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ বিলুপ্তপ্রায়, বিজাতীয় ধর্মের প্রভাব নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং উচ্চবর্গীয়দের আধিপত্য যখন নিম্নবর্গীয়রা মানতে নারাজ এমনই সময় বৈষ্ণববাদের আবির্ভাব ও প্রসার ঘটে। অবশ্যই অরক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে এক অন্য ধরনের বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে এসময়। শ্রী চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বাংলার ঘরে ঘরে বৈষ্ণববাদ গৃহীত হতে থাকে। ক্রমশ এই জনপ্রিয়তা এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নেয়, যা পূর্বে কোনওদিন কল্পনাও করা যায়নি (ম্যাকক্যাচিয়ন, ডেভিড জে, ১৯৭২ : ১)।

বিষ্ণু থেকে কৃষ্ণ

বখ্‌তিয়ার খিলজির আমলের আগে রাজাদের মধ্যে বিষ্ণু আরাধনাই প্রচলিত ছিল। এমনকি বাংলার হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলেও এর প্রভাব ছিল। বিষ্ণু পূজিত হতেন শক্তির দেবতা হিসেবে, যিনি তাঁর চক্র দিয়ে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করতে পারতেন। বিষ্ণু দশ অবতার হিসেবেও পূজিত হয়েছেন। জীবন এবং মানবজাতির এক একটি পর্যায়ে একজন অবতার। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, কল্কি। মৎস্যপুরাণের দশটি অবতারের তালিকায় মিল নেই। একটি তালিকায় কৃষ্ণের বদলে আছেন বুদ্ধ (কান্টাওয়ালা : ১৬৫)।

চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ সনে। তখনও কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসের ধারণা অজানা ছিল না। কিন্তু চৈতন্যদেবের আমলে এই ভক্তি বিশ্বাস নতুন মাত্রায় জনমানসে জায়গা করে নিতে সমর্থ হয় (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮; সেন দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩)। এই ভক্তি বিশ্বাস অনুযায়ী কোনও ধার্মিক মানুষের জন্য জ্ঞান বা বোধ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচ্য হত না। ভগবানের কাছে পৌঁছোনোর জন্য পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তাকেও

এই ধারা অস্বীকার করে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এই ভক্তিবাদ সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়।[১৬] বৈষ্ণববাদের মতো অনুযায়ী ভগবানকে পাওয়া যেতে পারে একমাত্র অবিচলিত ভক্তি রসের মধ্য দিয়ে। পাঁচ উপায়ে তাকে পাওয়া যেতে পারে—শান্তির মাধ্যমে, ভৃত্য হিসেবে, পিতা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে ও প্রেমিক হিসেবে।

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত আচারের মধ্যে ছিল গীত-বাদ্য সহকারে কৃষ্ণ-গুণগান করে নগর সংকীর্তন করা। সেই মিছিলে সবাই যোগ দিতে পারত। এর ফলে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত প্রচলিত অভ্যাস ভাঙতে শুরু করে ও কৃষ্ণকীর্তন জনজোয়ারে প্লাবিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মে যে কোনও বর্গের মানুষই উপবীত ধারণ করতে পারত। এই নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কাজির দরবারে চৈতন্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানায় (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৬৯)।

বৈষ্ণববাদের আরেক বিশেষত্ব ছিল, এব সরলতা। এই ধর্মে কখনওই কোনও মঞ্চ থেকে সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া হত না। এর ফলে সাধারণ জনমনে বৈষ্ণববাদ সহজেই জায়গা করে নিতে পেরেছিল (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ২৫২-২৫৫; দাশগুপ্ত, কাশীভূষণ, ১৯৫৭ : ২১৪)। যদিও চৈতন্যদেব সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে সন্ন্যাসী তিনি হননি। সাবাক্ষণই তিনি জনসমক্ষে কীর্তনে-মিছিলে, কৃষ্ণ-গুণগানে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ কবে বেড়াতেন। এভাবেই গীত-বাদ্যর মধ্যে দিয়ে গভীর এক ধর্ম প্রক্রিয়ার প্রচলন হয়েছিল।

রাধাকৃষ্ণ লীলা

বিষ্ণুর মানব অবতার ছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু ভাগবতপুরাণে[১৭] রাধার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিষ্ণু প্রসঙ্গে হয়তো বা লক্ষ্মীর কথা উল্লিখিত হয়েছে কোথাও কিন্তু রাধার উল্লেখ নেই। সে সময়ের যে কোনও ভাস্কর্যেই রাধা অনুপস্থিত।[১৮] রাধাকৃষ্ণ প্রেমগাথা মূলত লোক মুখেই প্রচারিত ছিল বেশি (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১-৬)।[১৯]

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণববাদের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমরাগ বর্ণনা। যে পঞ্চ উপায়ে ঈশ্বর লাভের কথা বৈষ্ণবরা বলে থাকেন এটি ছিল সেগুলিরই অন্যতম এক উপায়। চৈতন্য অনুগামীদের মতে রাধা ছিলেন ভক্তকুলের নারী প্রতিনিধি। পুরুষ ভগবানের প্রেমিকা ও পূজারিণী। বংশীবাদক রাখাল বালকের এক বিবাহিতা নারীর প্রতি অবৈধ প্রেমকীর্তন জনমানসে বিশেষ প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। রাধা চরিত্রে, আধ্যাত্মবাদ ও মানবগুণ দুই মাত্রায় প্রকটিত হয়েছিল। আধ্যাত্মবাদের নিরিখে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কখনওই সাধারণ নর-নারীর প্রেম ছিল না। তা ছিল ভক্ত-ভগবানের প্রেম, অচিন্ত্যভেদের তত্ত্ব অনুযায়ী রাধা-কৃষ্ণ কখনওই দুটি আলাদা সত্তা ছিল না। একজন ছিল অপরের পরিপূরক, অর্থাৎ দুয়ে মিলে এক। রাধা-কৃষ্ণ বা তাদের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন কখনওই অবাস্তব বলে বিবেচিত হয়নি ববং ক্ষণস্থায়িত্বে চিরন্তনের রূপ প্রকাশিত হয়েছে এই প্রেমকথায় (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ১৪৭)।

শঙ্খ দর্শন এর শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির যেমন দ্বিত্ব, বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা-উপায় যেমন দ্বিত্ব, রাধা-কৃষ্ণর দ্বিত্বও ঠিক তেমনই। শঙ্খ দর্শন ও বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রচুর মিল

পাওয়া যায় রাধা-কৃষ্ণ প্রেম কাহিনিতে। কিছু বৈষ্ণব পণ্ডিত যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দ্বিত্ববাদে প্রেম ও কামের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ করতে পেরেছিলেন। সহজিয়া সম্প্রদায় কিন্তু এই ধরনের পার্থক্যকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে প্রেম হচ্ছে কামেরই উচ্চ স্তরের প্রকাশ (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ১৫৭)।

রাধা বিতর্ক

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধের কারণ ছিল কৃষ্ণর সঙ্গে রাধা ও অন্যান্য গোপিনীর প্রেম ও দৈহিক সম্পর্ক কেমনভাবে ব্যাখ্যাত হবে। দুটি মতবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বকীয়া ও পরকীয়া। যাঁরা স্বকীয়া মতবাদের পক্ষে তাঁরা বলেন, রাধা ও অন্যান্যরা আসলে কৃষ্ণর সঙ্গে বিবাহিত হয়েছিলেন। সুতরাং সে অর্থে তারা কৃষ্ণর বৈধ স্ত্রী। শুধুমাত্র যোগমায়ার বলে এদের স্বামীরা কিছুই টের পায়নি।

যাঁরা পরকীয়া[২০] মতবাদের পক্ষে ছিলেন তাঁরা মনে করতেন কৃষ্ণ, রাধা ও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে প্রেমে মগ্ন ছিলেন। এই মহিলারা ছিলেন অন্যের স্ত্রী। কিন্তু এতে কোনও অন্যায় ছিল না কারণ কৃষ্ণ ছিলেন ভগবান। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব নয়, ভগবান অবশ্যই তা করতে পারেন আর মানুষ ভগবানের কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে পারেন না। এ সবই ভগবানের লীলা। এ লীলা মানুষের যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। মানুষের কাজ হল ভগবানের এই কাজকে (কৃষ্ণের প্রেমকে) ভক্তিরসের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করা। এটা সম্পূর্ণই বিশ্বাসের ব্যাপার (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১০৫-১০৭)। তাছাড়া যা রাধাকৃষ্ণ প্রেমগাথায় যা বর্ণিত হয়েছে তা 'ব্যভিচারের ভান' মাত্র। এটা করার কারণ হল প্রেমের পূর্ণ আনন্দকে উপভোগ করা, রসের পুষ্টি সাধন করা।

বৈষ্ণববাদীদের অন্যান্য কাজের মধ্যে সে সময়ের নিয়মিত এক কাজ ছিল স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদীদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ আয়োজন করা। বেশির ভাগ বিতর্কেই পরকীয়াবাদীরা জয়ী হতেন (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ১৩৮)। সম্ভবত বাংলায় এর আগে কখনওই নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে এভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা হয়নি।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল ভগবান হলেন পুরুষ, আর তাঁর সমস্ত ভক্ত (নারী, পুরুষ নির্বিশেষে) হলেন স্ত্রীলোক (প্রকৃতি)। আর এই হল ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক। সুতরাং ভগবানের প্রতি প্রেম আসলে স্ত্রীলোকের প্রেম তাঁর পুরুষের প্রতি। বৈষ্ণববাদের এই ধারণার সঙ্গে সুফিবাদের ধারণার প্রচুর মিল দেখতে পাওয়া যায়। সুফি গজলেও ভক্তিবাদের উল্লেখ এবং নর-নারীর প্রেমের সম্পর্কই সেখানে প্রধান উপজীব্য (রাসেল, আর, ১৯৯২ : ২৭-৪৫; রায়, অসীম, ১৯৮৩ : ১৮৯; তরফদার, এম. আর., ১৯৬৫ : ২২৫-২২৬)।

চৈতন্য অনুগামীরা কিন্তু বরাবরই স্বয়ং চৈতন্যদেবের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছেন। চৈতন্যদেব কি নিজে রাধার প্রতীক ছিলেন? নাকি তিনি একাধারে রাধা-কৃষ্ণ দুইই ছিলেন? কিংবা শুধুই কৃষ্ণ ছিলেন? অনেকের মধ্যে তিনি বিষ্ণুর আরেক অবতার ছিলেন। রাধার বৈবাহিক অবস্থান ও কৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরেকটি

বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। যখন ব্রহ্মবাদীরা দাবি করেন রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথায় যৌনতার কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবীয় বহু কাব্যে ও গানে দেহতত্ত্বর কথা খুবই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১১৭-১১৯, ৩১০-৩১১)।

সাহিত্যে বৈষ্ণববাদ

রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথা সম্ভবত কর্ণাটক থেকে এসেছে। বাংলার কর্ণাটকি সেন বংশই এই প্রেমকথা আনয়ন করে বলে বিশ্বাস। জয়দেব বিরচিত গীত-গোবিন্দ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকাহিনি বর্ণিত রয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা দরকার যে কবি জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার সদস্য। সে সময়ে তাঁর রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মগুলির মধ্যে অবশ্যই অন্যতম ছিল। তাঁর কাব্যেও দেহতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে।[২১] গীত-গোবিন্দ'র মূল বার্তা ছিল লীলার মাধ্যমে সুখের সন্ধান করা (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৭-৮; দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ১৩৭-১৩৮)। জয়দেবের সমসাময়িক কবি গোবর্ধনাচার্য্য রাধাকে লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং প্রেমিকা হিসেবে রাধাকেই শ্রেষ্ঠ বলে ব্যাখ্যা করেছেন (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১৩)। ষোড়শ শতাব্দীতে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথা, বিষ্ণু-লক্ষ্মীর জনপ্রিয়তাকে পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে যায় এবং সে সময় সংস্কৃত ভাষা নয়, বাংলা ভাষাতেই এই প্রেমগাথা বিবৃত হয়েছিল। বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাস প্রমুখ বা সুবোধ্য সংস্কৃতে সাহিত্যচর্চায় অভ্যস্ত হলেও, এখন, বাংলা বা ব্রজবুলি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। বিদ্যাপতি বাঙালি ছিলেন কিনা এ বিষয়ে বাংলা এবং বিহারের মধ্যে মতানৈক্য আছে। বিদ্যাপতি সম্ভবত বাংলা এবং বিহারেব মধ্যবর্তী কোনও অঞ্চলের মানুষ। কৃষ্ণ এবং রাধার প্রেম বর্ণনায়, মৈথিলি ও বাংলাব মিশ্রণে এক নতুন ভাষা ব্রজবুলি তাঁরই অবদান। বিদ্যাপতি কিন্তু বৈষ্ণব ছিলেন না, ভক্তিবাদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ২০-২৫; চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭০ : ১০৩)। শিব-পার্বতীর সম্পর্ক নিয়েও তাঁর সৃষ্টি' রয়েছে-যদিও তা বহুল প্রচারিত নয়। তাঁর কাব্যে রাধা কৃষ্ণের স্ত্রী, পরস্ত্রী নয়। তাঁর রাধা, ভক্তিবাদীদের পরকীয়া দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কীত নয় (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ২০-২২)। কেউ কেউ বলেন চণ্ডীদাস কোনও একক ব্যক্তি নন, বহু কবি চণ্ডীদাস নাম ব্যবহার করে কাব্য রচনা করেছেন (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৩৩৯)।

বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখেছিলেন চণ্ডীদাসের কয়েক যুগ আগে, চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। তাঁর রচনায়, রাধিকা এক গ্রাম্য কন্যা, রাখাল এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতাশালী কৃষ্ণ অহরহ তাকে বিরক্ত করে চলে। তাঁর পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয় যেন তা পুতুল নাচের জন্য লেখা। এর থেকে বোঝা যায় রাধা-কৃষ্ণ কথা সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। জয়দেবের মতো, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও বহু যৌন ইঙ্গিত রয়েছে। কৃষ্ণ নানাভাবে রাধাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, অবশেষে রাধাও সমর্পণ করে নিজেকে। লক্ষ করার বিষয়টি হল, এই কাব্যে রাধা এবং কৃষ্ণ—দুজনেই গ্রাম্য বালক-বালিকা—একেবারে রক্তমাংসের মানুষ। এই রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সহজেই একাত্ম

হতে পারে (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ২৪-২৭; সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ১২০-১৫১)।

অন্য চণ্ডীদাস, পদাবলীর সেই অমর রচয়িতা, চৈতন্যদেব যার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। দুই চণ্ডীদাস আলাদা ব্যক্তি না একই ব্যক্তি দুটি ভিন্ন ধারায় কাব্য রচনা করেছেন-এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ১২৬-১২৭)।

চৈতন্যের মৃত্যু পরবর্তী ভাঙ্গন

চৈতন্যের মৃত্যুর পর, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের বহু গুণগত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হল। চৈতন্য পাণ্ডিত্য প্রচারের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণববাদ বহু পণ্ডিত শিষ্য যথা রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখের দার্শনিক চিন্তায় প্রভাবিত হল (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : পরিচ্ছেদ ৫)। তাঁদের দর্শন, বৈষ্ণববাদের মধ্যে বহু জটিল অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত চিন্তার আমদানি করল- চৈতন্য যা কখনওই চাননি (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : পরিচ্ছেদ ৫)।

চৈতন্যের চিন্তায় ভক্তিই ছিল মুখ্য, জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল না। ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বা প্রাজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলে চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হতেন (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১২৬-১২৭)। জীবৎকালে চৈতন্য মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর শিষ্যরা, তাঁরই মূর্তি বানিয়ে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো আরম্ভ করলেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ, হয়তো বা জীবন্তও, বহু বিতর্কের ফলে আন্দোলন বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল, বহু গোষ্ঠী গড়ে উঠল। চৈতন্য চেয়েছিলেন ভক্ত এবং ভগবানের মাঝে মাধ্যমের বিলুপ্তি। কিন্তু, তাঁর জীবনাবসানে গুরুবাদ ফিরে এল প্রবল বিক্রমে। এক একজন গুরুর আলাদা আলাদা শিষ্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠল (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৩১৯-৩২১)। বৈষ্ণববাদের মূল বিষয়টিই নষ্ট হয়ে গেল। চৈতন্যর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র নিত্যানন্দই, শেষ পর্যন্ত, এই বুদ্ধিবাদ ও বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে গেছেন।

চৈতন্য শিষ্যদের বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে। আসলে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে এক বিশেষ ধারার বৈষ্ণববাদের দূরত্ব ঘোচানোর এ এক সচেতন প্রয়াস। এই বৈষ্ণববাদ এখন ব্রাহ্মণ্যবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ বলে উপস্থাপিত হল। চৈতন্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য অদ্বৈত, শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণববাদকে, ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১১৮৫ : ১৩১, ১৩৪-১৩৫)। যে মানুষটি সকল আনুষ্ঠানিকতা আর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তিনিই হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের অবতার। পুরোনো ব্রাহ্মণ্য আচারের জায়গায় অন্য এক ধরনের আচার সর্বস্বতা স্থান করে নিল (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮)। তাঁর অনেক শিষ্যও দেবত্বে উত্তীর্ণ হলেন। অদ্বৈত হলেন মহাদেবের অবতার, হরিদাস ব্রহ্মার, নিত্যানন্দ অনন্তদেবের। তাঁর বহু শিষ্য-শিষ্যা পরবর্তীকালে, হনুমান, অঙ্গদ এবং শ্রীরাধার গোপিনী সহচরী বিশাখা, ললিতা ও মধুমতির অবতার হিসেবে প্রচারিত হলেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : খণ্ড ২; চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১৪৭)।

চৈতন্য ও রাষ্ট্রশক্তি

পঞ্চদশ শতকের শেষে, হুসেন শাহ্-এর মতো একজন উদার শাসকের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠান বৈষ্ণববাদ প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। হুসেন শাহের দরবারে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন হিন্দু। প্রধানমন্ত্রী গোপিনাথ বসু, যাঁর পুরন্দর খান নামে একটি মুসলমান নামও ছিল, বা, তাঁর দুই ভাই রূপ এবং সনাতন, যাঁরা দবির খান ও শাকির মল্লিক নামেও পরিচিত ছিলেন—এদের অন্যতম। এঁরা সংস্কৃতভাষায় বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেকালের অনেক কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে শাসকের পৃষ্ঠপোষণার উল্লেখ থাকত (খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬ : ২০; সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ৯৩-৯৪, ৯৯, ২০৯)। শুরুতে হুসেন শাহ্ চৈতন্য এবং তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন, নবদ্বীপে বসে চৈতন্য এবং তাঁর দলবল তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। কিছুদিন তিনি এই মতাবলম্বীদের দমন করার চেষ্টা করেন কিন্তু যখন সত্য অনুধাবন করেন, হুসেন শাহ্ নিজেই চৈতন্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

চৈতন্য অসামান্য সংগঠক এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন। সুলতানের সঙ্গে সংঘাত তিনি সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলেছেন। হুসেন শাহ্-এর পূর্বতন নিয়োগকর্তা সুবুদ্ধি রায় একদা তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন। সুলতান হওয়ার পর, সুবুদ্ধি রায়কে মুসলমানের উচ্ছিষ্ট জল খাইয়ে হুসেন শাহ প্রতিশোধ নেন। শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও, চৈতন্য সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি এই অবিচারের কোনও প্রতিবাদ করেননি। চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে রূপ যখন কারারুদ্ধ হলেন, তখনও চৈতন্যের কিছুই করার ছিল না (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ২৩৭-২৪০)। কোনও এক কাজির সঙ্গে সামান্য বিরোধ ছাড়া, প্রশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কোনও উল্লেখ চৈতন্য জীবনীতে নেই (সেন,সুকুমার,খণ্ড,১৯৭৮ : ২৩০-২৩১)। চৈতন্যের আন্দোলন ধর্ম ও ভক্তির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁর কাজে, সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্-র সে ক্ষেত্রে কিছুই বলার ছিল না।

চৈতন্য পুরীতেও একইভাবে নিজের মত প্রচার করেছেন। জীবনাবসানের আগে দীর্ঘদিন তিনি পুরীতে অতিবাহিত করেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন তাঁর বন্ধু। এখানেও, অত্যন্ত সচেতনভাবে চৈতন্য রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের অন্যতম হরিদাস ছিলেন জন্মসূত্রে মুসলমান। পুরীতে হরিদাস চৈতন্যের সহচর ছিলেন। পুরীর মন্দিরে মুসলমানের প্রবেশাধিকার না থাকায়, চৈতন্য কোনওদিন হরিদাসকে জগন্নাথ দর্শনে উৎসাহিত করেননি। পুরীতে অবস্থান কালে চৈতন্য, নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে ফিরে যেতে বলেন। তাঁর ভয় ছিল, নিত্যানন্দের মতো স্পষ্টভাষী, খোলামেলা বন্ধু এবং সহচর পুরীর নানা অন্যায়, অব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারবেন না। চৈতন্যের প্রিয়জন, বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী গোপিনাথকে কর না দেওয়ার কারণে শাসক মৃত্যুদণ্ড দিলে, শিষ্যদের বহু অনুরোধেও, চৈতন্য তার প্রাণরক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ২৩৪-২৩৮; দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৫৭ : ২০৭-২০৯)।

জনপ্রিয়তার ভিত্তি

এই নব-বৈষ্ণব ভাবনার উত্থানের অনেক কারণ নির্দেশ করা যায়। কিন্তু মুখ্য কারণ হল, আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিসর্বস্বতা এবং ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা অস্বীকার করা। প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যধিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন এক প্রতিবাদ। মুসলমান শাসন কায়েম হওয়ার পর এই রক্ষণশীলতা বেড়েই চলছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় নেতারা সম্ভবত ভেবেছিলেন, মুসলমান শাসকদের বিরোধী রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মোকাবিলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিবিধ অনুশাসনের কঠোর প্রয়োগই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করবে।

এই কঠোরতার পেছনে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লোভও কাজ করেছিল। তারা বারো মাসে ৪২টি পার্বণের নিদান হেঁকেছিলেন। এর মধ্যে কেবল কার্তিক মাসেই ছিল ৬টি পার্বণ। যত বেশি পার্বণ, পার্বণী বাবদ তাঁদের রোজগারও তত। সমর্থক শাসকরাও এই ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। সাধারণ মানুষ, পার্বণ পালনে যত ব্যস্ত থাকবে, বিদ্রোহী চিন্তার বিকাশ ততই রুদ্ধ হবে (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৩৩-৩৪)। জনপ্রিয়তার আরেকটি ব্যাখ্যা হল, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় নিম্ন বর্ণের মানুষরা ছিল অধিকার-বঞ্চিত, অত্যাচারিত। এই বঞ্চনা তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করছিল (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৪৬)। বৈষ্ণব ভাবনার এই নব্য ভক্তিবাদ বর্ণবৈষম্যহীন, পুরোহিতদের প্রতিপত্তিহীন এক নতুন ব্যবস্থার সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল। নিম্ন বর্ণের মানুষরা এই মতবাদের মধ্যে, তাঁদের অ-ইসলামি বিশ্বাসে স্থিত থাকার যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল (তরফদার, এম. আর., ১৯৬৫ : ১৭৭)।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের একাংশ অনুভব করেছিলেন, নিম্নবর্ণ সমাজের সংস্কৃতির নানা কিছুকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল ধারায় গ্রহণ করে এই সমাজের সামাজিক ভিত্তির প্রসার ঘটানো দরকার। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ, বিবদমান শৈব এবং বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের মতবিরোধ মিটিয়ে দুটি মতের মিলন ঘটাতে আবেদন করেছিলেন। একইভাবে, কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন যে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধদের বিরোধের নিরসন প্রয়োজন। আর্য দেবদেবীর সঙ্গে, বহু আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের দেবতার সম্পর্কের বংশতালিকা বানিয়ে, এ ধরনের বহু দেবদেবীকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল কাঠামোর মধ্যে গ্রহণ করা হল (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : চক্রবর্তী, রমাকান্ত,১৯৮৫ : ১৪-১৯)। এই ধরনের সংস্কারের গতি সর্বত্রই একরকম ছিল-তা নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নেতৃত্বের একাংশ অনুভব করেছিলেন যে, নিম্ন বর্ণের সমাজের জন্য ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে কোনও সংস্থান না থাকলে এই সমাজের মানুষরা দ্রুত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে। দুটি ধর্মের নানা বিষয়কে মেলাবার জন্য নানা সমন্বয়বাদী সাধনাও গড়ে উঠল। ধর্মঠাকুর বা সত্যপীর-এর আরাধনা এ রকমই এক সমন্বয় ভাবনার সৃষ্টি। সে ভাবনা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় বিশ্বাসের এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল।

একই অঙ্গে বহুরূপ

বৈষ্ণববাদ, পরস্পরবিরোধী বহু উপাদান, বর্ণ, এমনকি মুসলমানদেরও, আকৃষ্ট করেছিল।

হরিদাস জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন। চৈতন্যের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক বিশ্বাসীরা, এমনকি নাথ ও ধর্ম উপাসকরাও বৈষ্ণববাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কৃষ্ণ উপাসক যাযাবর সঙ্গীতজীবী, যারা জোড়ায় জোড়ায় বসবাস করত, সেই বাউল সম্প্রদায়কে সম্মান দেয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদ। ভক্তিবাদের সহজিয়া ধারা, অচিরাচরিত বিশ্বাস এবং জীবনচর্চা সকলের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

চৈতন্যদেবের কয়েকজন অনুগামী, যথা, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার নারীসুলভ জীবনাচরণ করতেন। সরকারের 'গৌরনাগর' তত্ত্বে, বয়স এবং অবস্থান নির্বিশেষে নবদ্বীপের সকল নারী চৈতন্যকে প্রেমিক হিসেবে কল্পনা করে (তরফদার, এম.আর, ১৯৬৫ : ১৭৮-১৮১, ১৮৩-১৮৪; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৮৩, খণ্ড ২ : ৭৭১-৭৭৪; চক্রবর্তী, রামাকান্ত, ১৯৮৫ : ১৪৯, ১৯৩)। সহজিয়া ধারার আড়ালে কিছু সমকামী এবং উভলিঙ্গ মানুষও আশ্রয় নিল। কিছু ভক্ত 'মঞ্জরি' সাধনরীতি গ্রহণ করল। এরা নিজেদের কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী গোপবালিকা হিসেবে কল্পনা করত এবং নিজেদের পুরুষ শরীর শাড়ির আড়ালে ঢেকে নারীসুলভ আচার ব্যবহার করত (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ১১৭-১১৯, ৩১০-৩১১)। চৈতন্য এবং তাঁর মুখ্য শিষ্যদের জীবনাবসানের পর ঘটে চলা এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এক শ্রেণির বৈষ্ণববাদীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের উত্থান ঘটল।

আনুষ্ঠানিকতা, পুরোহিততন্ত্র এবং বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা করে চৈতন্যের ভক্তিবাদের উত্থানের সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইউরোপে লুথার বা কেলভিনের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারবাদী আন্দোলনের মিল রয়েছে। চৈতন্যের এই ভক্তিবাদ এক বিশাল সাংস্কৃতিক ও জনপ্রিয় আন্দোলনের রূপ পেয়েছিল। বাংলার ইতিহাসের এর কোনও তুলনা নেই।

যাই হোক, ঐতিহাসিক বিচারে, এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত যুক্তিহীনতা এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করাই অসাম্প্রদায়িক ধারণা ও বিজ্ঞানের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। চৈতন্যের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বৈষ্ণব ধারণার পক্ষের বিতর্কগুলির সঙ্গে, প্রায় সমসময়ে ইউরোপে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যকার বিতর্কগুলির তুলনা করলেই বোঝা যাবে কেন কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের ব্যাপক বস্তুগত বিকাশ ঘটা সম্ভব হল এবং ইউরোপীয় শক্তি ভারত দখলেও সমর্থ হল (পরিচ্ছেদ ৪.৫ দ্রষ্টব্য)।

কর্তাভজা সম্প্রদায়

বৈষ্ণববাদের আবির্ভাবের সঙ্গে বহু সহজিয়া বিশ্বাসী, যারা সমাজের নিম্নবর্গের অধিবাসী ছিল, সেই কৈবর্ত এবং ভুঁইমালিরা এই নতুন বিশ্বাসের আশ্রয় নিল। বৈষ্ণববাদ, শৈব এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধারণার সংমিশ্রণে বহু নতুন সাধনধারা জন্ম নিল। এ ধরনের একটি ধারা কর্তাভজা সম্প্রদায়, যারা গুরু পূজায় বিশ্বাসী। "সত্যমহাপ্রভু" আওলচাঁদ নামে একজন ২২ জন শিষ্যকে নিয়ে নদিয়ার ঘোষপাড়াকে কেন্দ্র করে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৮৬ সালে একটি বাউড়ি পরিবার নবজাত শিশু হিসাবে তাঁকে কুড়িয়ে পায় এবং তিনি সবসময় ফকিরের পোশাক পরে থাকতেন। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে বিশেষ

জানা যায় না (সেন, সুকুমার, খণ্ড ২ : ৫২৫-৫২৭; চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৩৪৬-৩৮৪)। গুরুবাদ নির্ভর বহু নতুন সম্প্রদায়ের মধ্যে এটি অন্যতম। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই ধরনের বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। গুরুবাদ হল গুরুর প্রতি আত্মসমর্পণ, ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে গুরুই হলেন যোগসূত্র। এই সম্প্রদায়গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শিষ্যদের রোজগারের একটা অংশ সম্প্রদায়ের স্বার্থে দান করতে হত, এভাবে সম্প্রদায়গুলি আর্থিকভাবে যথেষ্ট সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। এঁরা সকলেই চৈতন্যদেবকে গুরু মানতেন, কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে চৈতন্যের মূল শিক্ষার সঙ্গে গুরুবাদ সঙ্গতিপূর্ণ নয় (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৩৬১-৩৬২, ৩৭৪-৩৭৫)।

বাউল

বহু শতাব্দী ধরে বাউলরা গ্রাম বাংলায় অত্যন্ত পরিচিত। এদের মধ্যে একদল সহজিয়া বৈষ্ণববাদের অনুসারী, অন্যদল, যারা ধর্মে মুসলমান, মূলত সুফি সাধনায় বিশ্বাসী। এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গান গেয়ে ভিক্ষা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। কোনও আনুষ্ঠানিকতা বা উৎসবে এরা বিশ্বাসী নন। বাউল বিবাহে কোনও মন্ত্র নিষ্প্রয়োজন, কণ্ঠি বদলই যথেষ্ট। বৌদ্ধ তান্ত্রিক বিশ্বাসের সঙ্গে এদের মতৈক্য রয়েছে। এদের বিশ্বাস, মানবদেহই বিশ্বের প্রতিবিম্ব। চর্যাপদের কবি সারহ-পদের মতের প্রতিধ্বনি করে এরাও বলেন, 'তোমার ঘরে (শরীরে) যে আছে, তুমি তাকে বাইরে খোঁজ কেন? তোমার প্রভু তোমার মধ্যেই রয়েছেন, প্রতিবেশীদের প্রশ্ন করে লাভ কী (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬ : ১৯০)?' বাউলদের যৌন-যোগ সাধনায় বৈষ্ণব ধারার 'প্রেম' ধারণার অত্যধিক প্রভাব রয়েছে। মানব-মানবীর প্রেম আসলে ভগবান ও ভক্তের প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। বাউল সাধকদের মধ্যে লালন ফকির, তাঁর গানে, রবীন্দ্রনাথকেও আবিষ্ট করেছিলেন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, খণ্ড ২ : ৫২৫)।

বাঙালি পরিচিতি নির্মাণ

আমরা লক্ষ করেছি, ১২০৪ সালের আগে, অঞ্চল, ভাষা বা সংস্কৃতির বিচারে, জাতি হিসেবে বাঙালির কোনও আলাদা পরিচয় গড়ে ওঠেনি। সে সময় বেঙ্গল বা বাংলা বলে কোনও অঞ্চল ছিল না। পরবর্তীকালেও বাংলা বলতে যে অঞ্চল বোঝাত তা বহু রাজত্বে বিভক্ত ছিল (ব্লকমান, এইচ, ১৯৬৮ : ৪)। পাল রাজত্বের দীর্ঘস্থায়িত্বের ফলে, সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলে এক ধরনের সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। সেন রাজত্বেও তা বজায় ছিল। কিন্তু বাংলা বলতে যে অঞ্চলকে আমরা বুঝি তা রূপ পেয়েছিল ১২০৪ সালের পর। আমরা লক্ষ করেছি, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের কয়েক যুগ পর অঞ্চল হিসেবে বাংলা এক কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়। যদিও একটা সময় সোনারগাঁও গোটা দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে ছিল, চট্টগ্রাম বা ত্রিপুরাকে দীর্ঘকাল বাংলার অংশ বলে ধরা হত না, কিন্তু এই ভূভাগের অধিকাংশ অঞ্চল একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে, বাংলার বিভিন্ন অংশের সামন্তব্যবস্থার সম্পর্ক, শাসকের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি যে, একজন

শাসকের গড় রাজত্বকাল ছিল অতি স্বল্প। অধিকাংশ শাসকেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, প্রাসাদ বিদ্রোহ ছিল খুবই নিয়মিত ঘটনা। এ সব সত্ত্বেও, উল্লেখ করার মতো বিষয়টি হল, বাংলা বলে পরিচিত অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ধরে একইসঙ্গে ছিল। মোগলরা আসার আগে পর্যন্ত, বাংলার শাসকরা, দিল্লির সুলতানের প্রভাবনিরপেক্ষভাবেই শাসন চালিয়েছেন। এমনকী, মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পরও বাংলার সুবেদাররা যথেষ্ট স্বাধীনভাবেই চলেছেন। তাঁদের কেবলমাত্র লক্ষ রাখতে হত, দিল্লির দরবারে রাজস্বের স্রোত যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয়। পাঁচটি শতাব্দী ধরে একই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হওয়ায় বাংলা একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি পৃথক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার বিকাশ বাঙালি পরিচিতি গড়ে ওঠার দ্বিতীয় কাবণ। বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং তার সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আমরা জানি, একদল ভাষাবিদ চর্যাপদকে বাংলাভাষার আদিরূপের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু অন্য ভাষাভাষীরা বিপরীত দাবী করেন। চর্যাপদের ভাষা, ওড়িয়া, অহমিয়া, হিন্দি এমনকি পাঞ্জাবিভাষাবও উৎস হিসেবে বিবেচিত হয। নিজস্ব পরিচিতির সন্ধানে, দেশি, লৌকিক, প্রাকৃত বা ভাষা শব্দের ব্যবহারে স্পষ্ট হয় যে তা একটি স্থানীয় ভাষা। কিন্তু সে ভাষা যে বাংলা, সে কথা প্রমাণিত হয় না (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৫)।

বড়ু চণ্ডীদাস বা চণ্ডীদাসকে নিয়েও দাবি, পাল্টা দাবি রয়েছে। তবে বিদ্যাপতি,বাংলা এবং বিহার-দুই রাজ্যেরই। যতদূর মনে হয়, চর্যাপদের পরই ভাষা হিসেবে বাংলা তার স্বতন্ত্রতা নিয়ে গড়ে উঠতে শুরু করে। বড়ু চণ্ডীদাস, ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেছেন। ত্রয়োদশ শতকে রচিত এই কাব্যগ্রন্থই এ তাবৎকাল প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। এই কাব্যে বিবরণী এবং সংলাপ, উভয়ই রয়েছে—সবটাই ছন্দবদ্ধ (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭১ : ৩৯)। বাংলাভাষার বিকাশে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলেই মনে হয়। গুণগত মান এবং সংখ্যার বিচারে এটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রেম ও ভক্তিকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় রেখে, চৈতন্যের আন্দোলনও বাংলা ভাষার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার ফলে, সংস্কৃত ভাষাও, স্থানীয় ভাষার বিকাশ আটকাতে পারেনি। নতুন শাসকরা অমুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাভাষার প্রসারের বিরোধী ছিলেন না (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ৮১-৮৩)।

বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে, হিন্দু-মুসলমান—দুই প্রধান সম্প্রদায়েরই অবদান রয়েছে। বহু মুসলমান লেখক বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। রঞ্জাবতী ও লাউসেনের মতো প্রচলিত বহু প্রেমকাহিনি মুসলমান লেখকদের অবদানেও সমৃদ্ধ হয়েছে। কবি বা পাঁচালিকাররা একই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করলেও, নিজস্ব শ্রোতাদের স্বার্থে তাতে বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৯৭ : ৩৫৪-৩৭৩)।

বাংলা ভাষা বা বাঙালি সত্তা নির্মাণে রাষ্ট্রশক্তির কী ভূমিকা ছিল? ১২০৪ সালের বিজয়ের পর প্রায় আড়াইশো বছর, স্থানীয় সংস্কৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তি বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। রাষ্ট্রীয় ঔদাস্যের এই বছরগুলিতে বাংলাভাষা তার নিজস্ব ধারাতেই বেড়ে উঠছিল। রাষ্ট্র ওই সময়, সম্ভবত, ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশের স্বার্থে ফারসি ভাষার প্রসারকে উৎসাহিত করতেই ব্যস্ত ছিল। পৃথক একটি ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠার পথে

বাংলাভাষায় বহু ফারসি শব্দও স্থান পেয়েছিল (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১, ১৯৭৮ : ৮১-৮২)। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি, সুলতান হুসেন শাহের আমলেই রাষ্ট্র বাংলাভাষার বিকাশে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে, নানাভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে।

বাংলা ভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার অন্যতম কারণ হল, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির পক্ষে তা বিপজ্জনক ছিল না। সংস্কৃত ভাষাব প্রতি রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষ ছিল। কারণ, সংস্কৃত ভাষা হল পরাজিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষিত ভাষা। ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসেবে ফারসি ভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্র সংস্কৃত ভাষার উচ্ছেদে উদ্যত ছিল। রাষ্ট্রীয় সমর্থন বঞ্চিত সংস্কৃত ভাষার বিনিময়েই বাংলাভাষার বিকাশ ঘটল, বাংলাভাষার পক্ষে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পেতে কোনও সমস্যা হল না।

বাংলার সংস্কৃতিতে মৌখিক ঐতিহ্যের প্রাধান্যের জন্য যথাযথ সময়টি নির্ধারণ করা দুরূহ। পাঁচালি তৈরি হয়েছিল গান হিসেবে। কতদিন পরে, কীভাবে তা লিখিত আকার পেল বা সেই লিখিত ভাষ্য কীভাবে রূপান্তরিত হতে হতে আজকের রূপ নিল, তা চিহ্নিত করা কঠিন। আজকের বাঙালি লোকসংস্কৃতি মৌখিক ঐতিহ্য ধরেই গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু, লিখিত পাণ্ডুলিপির শতশত অনুলিপি নানা হাতে পড়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। বৈদিক দেবতারা জনপ্রিয় রূপ নিয়েছেন। কৃষ্ণ হয়েছেন কানু বা কানাই, রাধা হয়েছেন রাই, অভিমুন্য হয়েছে আয়ান। জনপ্রিয় ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য অবস্থানও পাল্টেছে। বহু অনার্য বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা উচ্চবর্ণের সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছেন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৮, খণ্ড ১ : ৮১- ৮৩)।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, তুর্ক ও আফগান রাজত্বকালে বাংলাভাষা এবং বাঙালি সত্তা একটি সংহত রূপ পেয়েছিল। মোগল শাসনকালে সেই বিকাশ বিঘ্নিত হয়। বাংলার মোগল প্রশাসক ছিলেন দিল্লির বাদশাহের প্রতিনিধি কর্মচারী মাত্র, কোনও স্বাধীন শাসক নন। সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদের কোনও আগ্রহই ছিল না। তা সত্ত্বেও রোসাং (আরাকানের রাজধানী), ত্রিপুরা, কোচবিহার, শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং মল্লভূম প্রভৃতি সীমান্ত সন্নিহিত রাজ্যে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশ পেল। সেই সময়ের দুই শ্রেষ্ঠ কবি, দুজনেই ধর্মে মুসলমান, দৌলত কাজি এবং আলাওল রোসাং-এর রাজকবি ছিলেন। এরা দুজনে মিলেই লোর-চন্দ্রানী নামে এক প্রেমকাহিনি রচনা করেছিলেন (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ২৩)। আলাওলকে পোর্তুগিজ জলদস্যুরা অপহরণ করে রোসাং-এ বিক্রি করে দেয়। নিজ প্রতিভায় তিনি রাজকবি হিসেবে স্বীকৃতি পান। বহু আরবি এবং ফারসি গ্রন্থ তিনি বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। রাজস্থানের লোককথার অন্যতম প্রধান চরিত্র, চিতোরের রানি পদ্মাবতী সম্পর্কে কাব্য তাঁরই সৃষ্টি (সেন, সুকুমার, ১৯৯৩ : ৩৪-৩৫)।

উপসংহার

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা ১২০৪ পরবর্তী যুগের সম্প্রদায়, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে শাসক শ্রেণির রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত সংস্কৃতিই, সময়কালে গোটা জনগোষ্ঠীর সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।- নানা

সম্প্রদায়ের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে বহু উপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে বটে, কিন্তু তারাও রাষ্ট্রপোষিত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব মেনেই নেয়।

এই পরিচ্ছেদে যে সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে, কিছু পার্থক্যও ঘটেছে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে কেবলমাত্র শাসক বদল হয়নি। সেই সময় যে আক্রমণকারী শক্তি ক্ষমতা দখল করল, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে, পূর্বে বিরাজমান সংস্কৃতির আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল। নতুন শাসকশ্রেণি ফারসিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করে নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্ত্র ব্যবহার করল। আরবি হল ধর্মাচরণের ভাষা, কোরান ও শরিয়ত নির্দেশিত ঐসলামিক সংস্কৃতি উৎসাহ পেল। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমিদান, পরবর্তীকালে ধর্মীয় নেতা ও অভিযাত্রীদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে লাঙল ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সহায়তার মাধ্যমে শাসকরা বোঝাতে চাইল যে রাষ্ট্র তাদের পাশে রয়েছে। কিন্তু বহিরাগত এই শাসকরা ছিলেন সংখ্যায় অল্প। এদের বসবাস ছিল নগরাঞ্চলে। সংস্কৃত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ধর্ম, পরাধীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে, ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে, অপ্রধান সার্বিক সংস্কৃতি হিসেবে বহাল রইল।

নতুন শাসকরা নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে পরাধীন জনগোষ্ঠীর ধর্ম এবং সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবলেও, ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি। এর অনেকগুলি কারণ ছিল। একটি কারণ, শাসকদের সংখ্যাল্পতা, অন্যটি, কৃষি এবং কর আদায়ের প্রশ্নে তারা ছিল স্থানীয় রাজাদের উপব নির্ভরশীল।

তা সত্ত্বেও, ধর্মান্তরকরণ হয়েছিল। এর একটা কারণ, বহু মানুষ শাসকদের সঙ্গে থাকতে আগ্রহী ছিলেন। বলপূর্বক ধর্মান্তরণের জন্য কখনও কখনও শাস্তির অস্ত্রও ব্যবহৃত হয়েছে। বিদেশি যোদ্ধা সুফি-পীর, শহরবাসী বিদেশি অভিজাত শাসকদের সঙ্গে যাদের চরিত্রগত পার্থক্য ছিল, গ্রামে বসবাস করাই পছন্দ করেছিল। ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় এরাই মূল মাধ্যম হয়ে উঠল। রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এরা স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল, ধর্মান্তরকরণকে সাহায্য করল। পুরোনো ধর্মস্থানের উপর গড়ে তোলা, এদের খাকোয়া যে কোনও আশ্রয় প্রার্থীকে খাদ্য ও আশ্রয় দিত, দরগাগুলি হয়ে উঠল স্থানীয় মানুষের উপাসনাস্থল। মাদ্রাসাগুলিতে চলত যুবকদের ঐসলামিক আদর্শে দীক্ষিত করার কাজ। সুফি-পীরদের ঐশ্বরীয় ক্ষমতা সম্পর্কে নানা গল্পকাহিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এ ক্ষেত্রে, স্থানীয় মুসলমান লেখকদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের ভাষায় ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে, বহুল প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনিগুলির মধ্যে নতুন ধর্মের নানা অনুষঙ্গ যোগ করে, তাঁরা সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত বাংলাভাষায় ইসলাম ধর্মকে প্রচার করলেন। ইসলামকে প্রচলিত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থিত করা হল না। ইসলাম হয়ে উঠল, কিছু পরিশীলন-সহ প্রচলিত ধর্মেরই অংশ। এভাবে প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে নতুন ধর্মের মানসিক ব্যবধান ঘোচানো হল, ধর্মান্তরকরণ সহজসাধ্য হল।

পরিবেশগত কারণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গঙ্গার শাখা পদ্মানদী দিয়ে বেশি জল বইতে শুরু করায় পূর্ব বাংলার এক বিশাল অঞ্চল, সুগম্য হয়ে উঠল। ঔপনিবেশিকরা, কৃষির স্বার্থে, পূর্ব বাংলার দিকে যেতে শুরু করল। উপনিবেশ বিস্তারের এই প্রক্রিয়ায় মোল্লা তথা হাওলাদারদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এরাই লোকজন

জড়ো করে জঙ্গল নিকাশ করত, একসঙ্গে বসবাস করে সামাজিক জীবনের অংশ হত, প্রয়োজনে পরামর্শ দিত। অস্থায়ীভাবে তৈরি মসজিদগুলিতে কখনও সখনও, ইচ্ছেমতো যাওয়া আসা দিয়ে শুরু হয়ে, শেষ হয়েছিল ধর্মান্তরকরণে। ঔপনিবেশিকরা ছাড়াও, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও প্রচলিত ধর্মের সম্পর্ক ছিল খুবই ক্ষীণ। তারা নতুন ধর্মকেই গ্রহণ করল।

দুই প্রধান ধর্মের অনুসারীরা, ইতিমধ্যে, কয়েক শতাব্দী ধরে একসঙ্গে কাজকর্ম, বসবাস করে ফেলেছেন। দুটি ধর্মের মধ্যে এক ধরনের সংমিশ্রণও ঘটেছে এর ফলে। এই সংমিশ্রণের ফলে এক নতুন মিশ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতিও বিকশিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের একদল মানুষের প্রচারিত এবং আরাধ্য ধর্মঠাকুর বিশ্বাসীদের কাছে মহম্মদ হয়ে উঠলেন বিষ্ণুর কল্কি অবতার—দুই সম্প্রদায়ই সত্যপীরের আরাধনা শুরু করলেন। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন, দুর্গপ্রতীম নগরবাসী, বহিরাগত বিদেশি স্বল্পসংখ্যক শাসকদের সংস্কৃতি হিসেবে যার পথ চলা শুরু, কালক্রমে, অন্ততপক্ষে গ্রামীণ পূর্ব বাংলায়, তাই হয়ে উঠল অধিকাংশ মানুষের সংস্কৃতি। মিশ্র সংস্কৃতির যেমন বিকাশ ঘটল, ধর্মান্তরকরণও হল সমতালে।

এই প্রক্রিয়ায়, বৈপরিত্যের মধ্যে ঐক্য অনুভব করা যায়। ধর্মান্তরকরণের এই প্রক্রিয়ায়, সব চেয়ে উপকৃত হয়েছিলেন নগরভিত্তিক সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণি, যদিও এ বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল না। ধর্মান্তরকরণের ফলে তাঁদের সামাজিক সমর্থন ভিত্তি প্রসারিত হয়েছিল। স্থানীয় ধর্মান্তরিতরা, নতুন ধর্ম সম্পর্কে কিছু না জেনেই এবং প্রচলিত বর্ণব্যবস্থার বাধাকে অতিক্রম না করেই, বহিরাগত অভিজাতদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে অবশ্য বস্তুগতভাবে এরা বিশেষ লাভবান হয়নি, অভিজাতরা এদের নিচু বলেই গণ্য করত।

একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার যে, স্থানীয় মানুষ নিজেদের শর্তেই ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে ইসলামকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেননি। পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামের প্রসারের অনুরূপ কিছু এখানে ঘটেনি। যে ভাবে ধর্মান্তরণ হয়েছিল, তাতে এ কথা স্পষ্ট যে, নতুন ধর্মান্তরিতরা প্রচলিত ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেনি। গরু খাওয়া যেতে পারে, শবদেহকে কবর দেওয়া হবে, নামাজ পড়তে হবে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ঘোষণা করতে হবে—এ কারণেই একজন মুসলমান। এছাড়া, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে তার আর কোনও তফাত নেই। তার নাম, পোশাক, বিবাহপ্রথা, ভাষা, বর্ণ, সঙ্গীতসব এক। পৃথিবী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনও পরিবর্তন নেই। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এরকমই ছিল। পরবর্তীকালে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে, গোঁড়া মুসলমান ভাবনার উত্থানের ফলে এক বড় অংশের মুসলমান, তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা হয়ে গেল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতে এ রকম স্বেচ্ছা ধর্মান্তরকরণ হল না কেন? এ প্রশ্নের কেবলমাত্র সম্ভাব্য উত্তর দেওয়াই সম্ভব। সমসাময়িক তথ্য এবং বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, ক) গঙ্গার শাখা পদ্মানদী দিয়ে বেশি জল বইতে শুরু করার ফলে, পূর্ব বাংলার নতুন অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে ওঠা, এবং খ) বস্ত্রশিল্পের বিকাশ। ইউরোপীয়

বণিকদের আগমন এবং উঁচু মানের কাপড়ের নতুন নতুন বাজার গড়ে ওঠার ফলে, বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে, এই ধরনের উপনিবেশ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। তৃতীয় একটি পার্থক্যের কথাও ভাবা যেতে পারে। গ) বাংলা ছিল মূলত একটি অনার্য অঞ্চল। ব্রাহ্মণ্যবাদ কোনওদিনই এখানে শিকড় গাড়তে পারেনি। অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় ব্রাহ্মণ্যবাদ এ অঞ্চলে এসেছেও অনেক পরে।

ভক্তি ও প্রেমকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে, জ্ঞানের বিরোধিতা করে, চৈতন্যের বৈষ্ণববাদ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে মাধ্যমের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছিল, বর্ণব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করেছিল। এর ফলে নিম্নবর্ণের জনগণ নিজেদের প্রচলিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই একটা বিকল্প খুঁজে পায়, ধর্মান্তরণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এখানেও, একজন বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাবেন। চৈতন্য, ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রচলিত সংস্কৃতির ডানা ছেঁটে দিয়েছিলেন। স্বল্পকালীন ভিত্তিতে তা ব্রাহ্মণদের উপার্জন বন্ধ করেছিল। কিন্তু, দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে, চৈতন্যের বৈষ্ণববাদ প্রচলিত ধর্মকে রক্ষাই করেছিল, পরবর্তীকালে যা হিন্দু ধর্ম হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

চৈতন্যেব মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র নিত্যানন্দই তাঁর শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁর বহু পণ্ডিত শিষ্যরা সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যের বৈষ্ণববাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন এবং এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে তার দূরত্ব কমিয়ে আনেন। তাঁদের কাছে ভক্তি বা প্রেমের চেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁদের আলোচনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কের গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে, চৈতন্য কি বিষ্ণুর অবতার—সে বিষয়ে। বেঁচে থাকতে চৈতন্য, তাঁকে ভগবান বানাবার বিরুদ্ধে ছিলেন।

জ্ঞানের গুরুত্ব হ্রাসের মাধ্যমে চৈতন্য আসলে পুরোহিততন্ত্র ও গোঁড়ামির প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু, এর ফলে, তিনি জিজ্ঞাসু মন বা জ্ঞানের পিপাসাকে ধ্বংসও করেছিলেন—এর দীর্ঘকালীন কুফল ফলেছিল। সমকালে, ইউরোপে একদম অন্যরকম কিছু ঘটছিল। ইতালীয় রেনেসাঁস এক 'যুক্তির যুগ'-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এই যুক্তির যুগ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন মহাদেশ খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছিল। বিশ্বাস ও আস্থা নির্ভরতা কাটিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা গড়ে তুলেছিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থার অহিংস অস্ত্র হিসেবে, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি সরাসরি শাসিত জনগণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে। সম-ধর্ম হওয়ার কারণে, প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র কারুজীবীও শাসকশ্রেণির সঙ্গে একাত্ম বোধ করতেন এবং শাসকের রক্ষায় যুদ্ধ করতেও সম্মত হতেন। প্রচলিত ধর্মের সমর্থকরা, অবশ্যই, শাসকশ্রেণির সঙ্গে একাত্ম ছিলেন না। কিন্তু এদের মধ্যে উচ্চবর্ণের মানুষজন শাসকদের পোশাকের অনুকরণে পোশাক পরতেন, ফারসি চর্চা করতেন এবং শাসকদের তরফে গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে চৈতন্যের শিষ্যরা, রাষ্ট্র প্রচারিত ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করতে পেরেছিলেন কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সমন্বয়বাদী

ধারণায় ইসলামি প্রভাবই বেশি ছিল। ইসলাম যদি প্রচলিত ধর্মের মতো ভালোই হয়, তবে তা গ্রহণে আপত্তি কী? এর ফলে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে তো থাকা যাবে। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা সমন্বয়বাদী ধারণার মধ্যে নিজেদের বিপদ অনুভব করলেন। এক ধরনের দোদুল্যমানতা তৈরি হল তাঁদের মধ্যে। অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে যা দেখা গেছে, সমন্বয়বাদের সঙ্গে চললেও, তাঁরা যে রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রতি ঝোঁককে আটকাতে পারবেন—তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে গোঁড়ামির পথ ধরে হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রপোষিত ধর্মকে পৃথক করে ফেললে, নিম্নবর্ণের মানুষ রুষ্ট হয়ে ইসলামকে গ্রহণ করবে। ইউরোপীয় অনুপ্রবেশ, প্রথমে অর্থনীতিতে এবং পরে রাজনীতিতে প্রভূত পরিবর্তন নিয়ে এল। রাষ্ট্রশক্তি থেকে ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করে এবং নতুন রাষ্ট্রপোষিত সার্বজনীন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করে দেশে সাংস্কৃতিক চালচিত্রে তারা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এল।

এই সাড়ে পাঁচশো বছরে, অঞ্চল, ভাষা এবং সংস্কৃতি হিসেবে বাংলার নিজস্ব সত্তা চিহ্নিত হল। এই বিকাশ গতি পেল, কারণ, এই বিকাশ প্রতিরোধ করার শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না সংস্কৃত ভাষার। এছাড়া অতীতের সার্বজনীন সংস্কৃতির তুলনায়, স্থানীয় ভাষার বিকাশে সহায়তা করাই শাসকশ্রেণির কাছে স্বার্থপোযোগী মনে হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব, চৈতন্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।

এই যুগের শেষে, ইউরোপীয়রা, বিশেষ করে পোর্তুগিজরা মগদের সঙ্গে মিলে বাংলা সাহিত্যে হার্মাদ হিসেবে ঢুকে পড়ল (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০ : ২২৪)।

মন্তব্য

১. কর আদায়ে অমুসলমানদের যে যথেষ্ট ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ মেলে মজুমদার বা সরকার উপাধিগুলির হিন্দু পদবি তালিকায় স্থান মেলায় (ব্লকমান, এইচ, ১৯৬৮ : ৬)।
২. মুর্শিদকুলি খাঁ-র কালেও, কর আদাযের দায়িত্ব হিন্দু রাজাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। কারণ মুসলমান যোদ্ধাদের চেয়ে কর ব্যবস্থার খুঁটিনাটি তাঁরা ভালো বুঝতেন। সম্রাট বা সুবেদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও তাঁরা অনাগ্রহী ছিলেন (ফার্মিঙ্গার, ওয়াল্টার কেলি, ১৯১৭)।
৩. উচ্চপদের হিন্দুরা, মুসলমান সংস্কৃতি গ্রহণ করতেন (করিম, কে. এম., ১৯৯৭ : ৬০)।
৪. কেউ একবার মুসলমান হলে তাকে তীর্থকর, কামানো বা স্নানকর ইত্যাদি দিতে হত না। সরকারে ভালো কাজ মিলত। উচ্চ বর্ণের বহু লোক রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি থাকার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন। কেউ কেউ খাদ্য বা বিবাহ সংক্রান্ত প্রচলিত ধর্মের অনুশাসন ভেঙে ধর্ম পাল্টেছিলেন। অনেক সময় তাদের ঠকিয়ে নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়ানো হত, ফলে তারা জাতিচ্যুত হত। উত্তর ভারতে রাজপুত, জাঠ এবং গুর্জর প্রভৃতি উঁচু জাতির মধ্যে ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে বেশি। কিন্তু বাংলায় ধর্মান্তরণ হয়েছে ব্যাপকহারে-মূলত নিম্নবর্ণের মধ্যেই।
৫. কোনও কোনও জ্যোতিষী সম্ভবত এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। তারা এও বলেছিল যে তুর্কি আক্রমণকারীদের হাত হাঁটু ছোঁয়। রাজা তা যাচাই করে দেখেন যে, সত্যিই বখতিয়ারের হাত হাঁটু ছুঁচ্ছে (খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬ : ১-২; মিনহাজু, এস.সিরাজ, ১৯৬৯ : ৩০৮)।
৬. তাঁর রচনায়, ধর্মদ্বেষীদের সঙ্গে ইসলামের সংঘাত, ভারতীয় পরিবেশে প্রচলিত ধর্ম বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। আরবে নবির ভূমিকাকে হিন্দু বিরোধী আহ্বান হিসেবে দেখানো

হয়। নবির কাকা এবং শত্রু আবু জালকে হিন্দুদের প্রধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়—ব্রহ্মা তার দেবতা। নবিকে বিষ্ণু এবং নিরঞ্জন বলে চিহ্নিত করা হয়। জাল নবিকে হত্যা করতে নানা কৌশল নিয়েছিল। মহম্মদ তাঁর জন্ম গোপন করেন, অন্য একটি শিশুকে মহম্মদ বলে চালানো হয়। জাল তাকে ধ্বংস করে। মহম্মদের জন্ম ইন্দ্র এবং অন্য বৈদিক দেবতাদের আতঙ্কগ্রস্ত করেছিল। এদের সঙ্গে মহম্মদের যুদ্ধও হয়।

৭. মহাকাব্য মহাভারতের তিন চরিত্র, কৃপাচার্য, বিরাট এবং অভিমন্যুকে জয়াকুমের পক্ষে বলে উল্লেখ রয়েছে। অভিমন্যু হলেন জয়াকুমের পুত্র জনা, অর্জুনের মতো ধনুর্ধর। জনা হলেন ক্ষমতায় ব্রহ্মার তুল্য, দানে ও সততায় কর্ণতুল্য। আলিও সেই ধারারই এক দুর্দান্ত ধনুর্ধর। যমও রয়েছেন এছাড়া রয়েছে রামায়ণের কুম্ভকর্ণের মতো এক চরিত্র। অন্য একটি চরিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের মিল রয়েছে। ইজিপ্টের শাসক ইউসুফের তুলনায় রাম কিছুই নয়। আমির হামজা, ইন্দ্র প্রমুখ যোদ্ধাদের সঙ্গে একাসনেই রয়েছেন। তাঁর প্রেমিকা তিলোত্তমার মতো সুন্দরী এক নারী। আমির হামজা আর তাঁর স্ত্রী রূপা বানু হলেন শিব-পার্বতীর মতো। এই কাহিনিব চরিত্রগুলি বাঙালির পরিচিত, একসঙ্গে ইসলামি বিশ্বের বেশ কিছু চরিত্রের নামও এখানে স্থান পেয়েছে।

৮. বহু মুসলমান জাতি বিন্যাসও লক্ষ করা যায়। দরজি আর রিফুগরের স্থান জোলার উপরে। সাধারণত কৃষিজীবীদের স্থান উচ্চই ছিল (দাশগুপ্ত, রতন, ২০০১ : ৬৮)।

৯. ইটনের দশ বছব আগে রায় পরিবেশগত পরিবর্তন এবং প্রচলিত সংস্কৃতিতে আত্মস্থ করার ইসলামি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন। ইটনের গ্রন্থে যদিও তার বিশেষ উল্লেখ নেই। বস্ত্র রপ্তানি থেকে আয় করা অর্থের একটা বড় অংশ গ্রামে পৌছাত এবং উপনিবেশ বিস্তারে সাহায্য করেছিল—এই অর্থনীতি সংক্রান্ত বক্তব্য বর্তমান লেখকের।

১০. রক্তের চরিত্র বিচারে, বাঙালি মুসলমানরা ভারতের বাইরের মুসলমানদের থেকে পৃথক (মজুমদার ও রাও : ১১৩)।

১১. ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে গেইট বলেছেন, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের হার খুবই সামান্য। অধিকাংশই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

১২. "শিক্ষিত মুসলমানরা মানতে অপছন্দ করেন যে, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় ধর্মান্তরিতদের অধিকাংশই ছিল চণ্ডাল বা কোচ। সম্ভবত সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিষয়ে হিন্দু ধারণার প্রভাবই এর কারণ। হিন্দু ধারণায় এই সম্প্রদায়গুলির স্থান সমাজেব একেবারে নীচে" (গেইট, সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, ১৯০১ : ১৭১)।

১৩. কেউ কেউ বলেন, ধর্মের প্রস্তরমূর্তি কচ্ছপের প্রতীক নয়, বৌদ্ধস্তূপের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কেউ কেউ ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কচ্ছপের সম্পর্ক মানেন না (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০: ৪৭৭-৪৭৯)।

১৪. ডোম সম্প্রদায় যে এক সময় যোদ্ধা ছিল তার প্রমাণ মেলে শিশু ভোলানো ছড়া 'আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে'-তে। এর অর্থ, ডোমরা যুদ্ধযাত্রায় মূল শিবিরের দুধারে থাকতো—তারা ঘোড়সওয়ারও ছিল। ধর্মঠাকুর, শীতলা আর কালী পুজায় তারা ছিল পুরোহিত (ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০ : ২১; সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ১ : ৫১৭)। হতে পারে, ইউরোপের জিপসি বা রোমানিরা আদতে যাযাবর 'ডোম' (সেন, সুকুমার, খণ্ড ১ : ১৯৭৮ : ৮)।

১৫. ময়দানব হলেন দানবদের প্রধান স্থপতি, পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁরই তৈরি।

১৬. এমনকী, চৈতন্যদেবও আনুষ্ঠানিকতাকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারেননি। ভক্তদের তাগিদে, নিজের বিচারবুদ্ধির বিপরীতে গিয়ে, তিনি নিজের অবতারত্ব এবং বৈষ্ণবদের

প্রধান গুরু হিসেবে স্বীকৃতি মেনে নিয়েছিলেন। অবতারত্ব স্বীকারের এই অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকে শেষ হয়েছিল (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৫৭)।

১৭. এই পুরাণে রাধার উল্লেখ না থাকলেও গোপিনীদের উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণের গোপিনী লীলার বর্ণনা আছে। 'অন্যায়রাধিতা' শব্দের মধ্যে রাধার উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। পদ্মাপুরাণে রাধার উল্লেখ রয়েছে অনেক। কিন্তু কৃষ্ণের গোপিনী লীলার সঙ্গে তার সংযোগ নেই। সম্ভবত, পুরাণের বিভিন্ন সংস্করণে রাধার উল্লেখ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। মৎস্যপুরাণে রাধার উল্লেখ রয়েছে যে শ্লোকে—তাও সম্ভবত পরেই সংযোজন করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্য পুরাণে রাধা বা কৃষ্ণের সঙ্গে তার বিবাহের উল্লেখও পরবর্তীকালে সংযোজিত (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৯৭ : ১০৮, ১১০, ১১৩, ১১৬-১১৮)।

১৮. মৎস্যপুরাণে কৃষ্ণের ষোলো হাজার স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই। লক্ষ্মীই এই পুরাণে কৃষ্ণের স্ত্রী। রাধা হলেন দেবীদের রানি, বৃন্দাবনে যাঁর আরাধনা হত (কান্টাওয়ালা, এস.জি., ১৯৬৪ : ১৬৩-১৬৪)।

১৯. পুরাণে রাধার উৎস সন্ধান সম্ভব নয়। দ্বাদশ শতকের লোকসাহিত্যই তার উৎস। কারও মতে রাধার সৃষ্টি নিহিত রয়েছে জ্যোতির্বিদ্যায়-বিশাখা নক্ষত্রে। কৃষ্ণের স্ত্রী লক্ষ্মীর অন্যরূপ হিসেবেও রাধাকে ভাবা যেতে পারে (দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৯৭ : ১০৩-১০৪, ১৩৭-১৩৮।)

২০. দীনেশচন্দ্র সেন সতি-সাবিত্রী ধারণার চেয়ে পরকীয়া ধারণাকে অনেক মহান এবং সাহসী মনে করতেন (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২, ৭৭৮)।

২১. রতিক্রিয়ার নানা ভঙ্গি বিশ্লেষণের স্তরে গিয়ে এই প্রেমতত্ত্ব পৌঁছেছিল (৪ ও ৫ নং কাব্য)। লী সেইগেল একে পবিত্র ও নিষিদ্ধ প্রেমের মিলন বলে বর্ণনা করেছেন (চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫ : ৭-৮)।

৪.১

রাজনৈতিক ইতিহাস

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস কিছুটা অন্যভাবে লিখছি। প্রকৃতপক্ষে এই সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস ইতিমধ্যেই আগের দুই অংশে লেখা হয়ে গিয়েছে। যেখানে আমরা রাজা, সামন্ত এবং সেনাপতিদের কথা বলেছি। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হয়। এখানে আমরা রাজা, সামন্ত বা সেনাপতিদের নিয়ে কারবার করছি না, তার বদলে বণিক, বাণিজ্যিক কোম্পানি এবং তাদের জাহাজ ভর্তি জামাকাপড় নিয়ে কথা বলছি। যে বণিকদের কথা বলছি তারা স্থানীয় নয়, সেই সমস্ত ইউরোপের বণিক যারা ন্যায় বা অন্যায় বাণিজ্যের পথে শেষ অবধি নিজেদের শাসক, সামন্ত ও সেনাপতিতে রূপান্তরিত করেছিল। এই অংশে আমরা কীভাবে একটা কোম্পানি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশগুলির একটার শাসক হয়ে গেল সেই রূপান্তরের কাহিনি লিপিবদ্ধ করছি। আমরা দেখব যে তারা নিছক অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগে জড়িত কোম্পানি ছিল না।

মোগলদের যেখানে একটামাত্র লক্ষ্য ছিল, বোলান এবং বামিয়ন হয়ে, ভাবত দখল করা, ইউরোপীয়দের বহু লক্ষ্য ছিল। ওরা ভাব করত যেন বাণিজ্যই ওদের লক্ষ্য, কিন্তু নানা ভাঁজের বস্ত্রের আড়ালে ওরা ওদের ঔপনিবেশিক লক্ষ্য প্রথম থেকেই লুকিয়ে রেখেছিল।

রেনেসাঁস এবং ইউরোপ

১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট পৌছন। এই ঘটনা ঘটে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ছয় বছর পরে। কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপ দখল করে ভাবেন যে ভারতে পৌছেছেন। তার ভূগোলের জ্ঞান ভালো ছিল না, কিন্তু তার ধারণায় কোনও ভুল ছিল না যে, পৃথিবী গোল এবং পূর্ব বা পশ্চিম দিক থেকে ভারতে পৌছনো যায়। আমরা এখন বুঝব না, যে অনেকের ধারণায় তখন ছিল সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত। কলম্বাসের ধারণা ছিল বৈপ্লবিক এবং রেনেসাঁসের ফসল।

ভাস্কোর ভারতে আসার সময়, ২০০ বছর ধরে ইউরোপ ইতালিকে কেন্দ্র করে একটা বড় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। রেনেসাঁস মানে শুধু শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য ছিল না। এটা ছিল যুক্তির যুগ। রেনেসাঁসের ফলে প্রচুর জিনিস তৈরি হয় এবং পুরনো জিনিস নতুনভাবে আমরা করতে শিখি। এছাড়া প্রকৃতি সম্পর্কে, তার বিভিন্ন অংশ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা তৈরি করে দেয় ওই রেনেসাঁস। জ্ঞান আহরণের লোভ বাড়ে, এবং পুরনো জ্ঞান, যা রাজকীয়

হোক বা দৈবিক হোক, এখন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়। এর ফলেই খোলা সমুদ্রে অভিযান সম্ভব হয়, তখন ভারতের জাহাজ শুধু উপকূলেই আবদ্ধ ছিল।

ভাস্কো-ডা-গামার পৃথিবী ভ্রমণ এবং ভারত আগমন ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া ফেলে এবং ভারত এবং তার লোকদের সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করে। যারা ভূ-পর্যটক হিসেবে ভারতে আসেন তারা নানা রকমের ছিলেন। প্রথমে আসেন পোর্তুগিজরা, তারপর ইতালিয়ানরা এবং তারপর দিনেমার, ফরাসি এবং ইংরেজ। কেউ ছিলেন রেনেসাঁসের সন্তান, জ্ঞান এবং তথ্য আহরণই ছিল যাদের লক্ষ্য। কেউ চাইতেন তাদের পথ ধরে বণিকরা আসুক এবং বাণিজ্য করুক। কেউ ছিলেন মিশনারি, কোনও না কোনও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের, যাদের লক্ষ্য ছিল ভগবানের পথে ভারতের পৌত্তলিকদের আনা। কেউ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, যিনি ভগবান, পোপ, বা রাজার নামে ভারতকে উপনিবেশ করতে চান, এবং সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

বাণিজ্যের মানগত পরিবর্তন

বিদেশি পর্যটকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো ভারতবর্ষের বাজারে ঢোকে। এর ফলে ভারতের বাণিজ্যের এবং অর্থনীতির এক মানগত পরিবর্তন আসে। কেন না, তাদের বাণিজ্য অনেক বড়ভাবে হত। ওদের কোম্পানিগুলো ছিল সমষ্টিগত মালিকানায় এবং যেখান থেকে মাল আসত, তার সঙ্গে, যেখানে মাল ভোগ হত তার একটা সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হল। এখন আর বহু হাত ঘুরে মাল পেতে হত না। এছাড়া এই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর পিছনে ছিল তাদের সরকার, যারা সামরিকভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে কোম্পানিগুলোকে প্রচুর সাহায্য করত, বিশেষ করে সংকটের সময়। কোম্পানির সঙ্গে সরকার যে একই লক্ষ্যে আবদ্ধ, সেটা ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, এবং লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার থেকে আলাদা।

পোর্তুগিজ বাণিজ্য

ভাস্কো-ডা-গামার আগমনের পর ১০০ বছরেরও বেশি পোর্তুগিজরা ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং আরব উপসাগরে প্রভুত্ব করেছে। ভারতের পশ্চিম অংশে, গোয়াকে কেন্দ্র করে, তারা একটা সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। ওদের কাছে সেটাই ছিল "ভারত"। ভারতের পূর্ব অংশে সেরকম কোনও সাম্রাজ্য ওরা তৈরি করেনি। কিন্তু ওখানেও প্রচুর পোর্তুগিজ যান, অনেকেই গোয়া থেকে পালিয়ে। এরাই হুগলিতে তখনকার সবচেয়ে বড় বন্দর তৈরি করে। এরাই বাংলার সুতিবস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যেতো এবং বাংলার বণিকদের মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরি করেন, যাতে ইউরোপ থেকে সেই জাহাজ এলে নানা জিনিসে ভর্তি করা যায়। তারা বাংলার সুতিবস্ত্র এবং মশলার ভালোই বাণিজ্য করতেন।

প্রথম থেকেই ইউরোপের বাণিজ্য ছিল ভয় এবং হিংসার সঙ্গে জড়িত। তাদের ন্যায্য ব্যবসা ছাড়াও ইউরোপীয় শক্তিগুলি ওদের নৌযুদ্ধের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর শক্তি প্রয়োগ করত ভারতের চারপাশের জলপথ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য। কোনও জাহাজ যদি ওই জলে যেত তাকে ওই বিশেষ জলপথের জন্য 'কারতাজ' উপকূলবর্তী কোনও ইউরোপীয়

অফিসারের কাছ থেকে কিনতে হত। যদি কারতাজ না থাকত তাহলে ওই জাহাজ, মালপত্র এবং কর্মচারী শুদ্ধ, দখল হতে পারত। এই প্রথা অন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলো অন্যায় মনে করত কিন্তু পোর্তুগিজরা চলে যাবার পর তারা একই প্রথার অনুসরণ করল। বিদেশি কোনও জাহাজ সুযোগ পেলেই দখল করা তারা ন্যায্য ম'' করত এবং এই দখল করার কাজটাকে প্রাইজ আখ্যা দিত।

এই যে ন্যায্য বাণিজ্য থেকে পোর্তুগিজরা সরে গেল-এবং কারতাজ, জাহাজ দখল, বোম্বেটেগিরি, বিভিন্ন ভারতীয় যুবরাজের হয়ে যুদ্ধ করা, দাস ব্যবসা এগুলোই বড় হয়ে উঠল—সেটাই শেষ পর্যন্ত তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ওরা গঙ্গানদীর মুখের কাছে ওদের পত্তন গেড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ শিকার করে আনত, যেমনভাবে তারা ব্রাজিল এবং অন্যত্র করেছে, এবং উপকূল অঞ্চলে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করল। শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাট শাহজাহানের ধৈর্য আর থাকল না, এবং তিনি ১৬৩২ সালে পোর্তুগিজদের আক্রমণ করেন হুগলিতে। মোগল সম্রাটের রাগের একটা বড় কারণ ছিল ওদের ঔদ্ধত্য। এমনকি সরকারি জাহাজকেও ওদের অনুমতি নিয়ে হুগলি বন্দরে ঢুকতে হত। কিন্তু ১৬৩২ সালের যুদ্ধে নিঃসংশয়ে পোর্তুগিজরা পরাজিত হয়। এর পর আর তাদের ভারতে বিশেষ ভূমিকা থাকে না। অবশ্য তার আগে প্রায় ১০০ বছর ধরে ওরা ভারতের টেক্সটাইল বাণিজ্য এবং ভারতের চারপাশের জল নিয়ন্ত্রণ করেছে।

পোর্তুগিজ প্রভাব চট্টগ্রাম, সন্দীপ, দিয়াংগা এবং অন্যত্র ১৬৩২ সালের মোগল আক্রমণের পর আর বিশেষ রইল না। যেটুকু রইল সেটাও ধ্বংস হল ১৬৭০ সালের দশকে যখন শাহজাহানের উত্তরাধিকারী ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে ওই অঞ্চলে আক্রমণ করা হল। অবশ্য ১৬৭০ দশকের আক্রমণ ছিল সরকারিভাবে আরকানের রাজার বিরুদ্ধে, এবং পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধে নয়, তবু এই আক্রমণ ওই অঞ্চলে পোর্তুগিজ প্রভাব কমিয়ে দিল, এবং পোর্তুগিজ জনসংখ্যার এক বড় অংশকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল, ওদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখবার জন্য।

১৬৩২ সালে পোর্তুগিজদের পরাজয় এবং হুগলি বন্দর থেকে বিতাড়ণ অন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে জায়গা করে দিল। মোগল সম্রাট ইউরোপীয় রাজস্ব ছাড়া চলতে পারত না। ইউরোপীয়, পোর্তুগিজ নয় এমন, শক্তিগুলো সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৫৮০-র দশকে তারা স্থলপথে ভারতে আসবার জন্য সচেষ্ট ছিল। কেন না, পোর্তুগিজ প্রভাবিত জলপথ তারা ভয় পেত। শেষ অবধি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাটে অনেক কষ্ট করে একটা জায়গা পায়। ১৬৩২ সালে পোর্তুগিজদের পতন ওদের হুগলিতে কারখানা করবার সুযোগ করে দিল।

১৬৮০-র দশকের সামরিক সংঘাত

ডাচ ভি.ও.সি. এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য। ব্যবসার কাজে ডাচ্‌রা পোর্তুগিজদের থেকে বেশি সময় দিত। আমরা জানি না যে, প্রথম থেকেই ওদের ঔপনিবেশিক শাসন করবার অভিলাষ ছিল কি না, না দুর্গ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ওরা চেয়েছে শুধুমাত্র ওদের ব্যবসার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, বিশেষ করে অন্য ইউরোপীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতীয় শাসকদের শাসন থেকে

নিজেদের বাঁচাবার জন্য। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, মোগলদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কী রূপ নেয়। এখানে এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, ইংরেজরা চট্টগ্রাম দখল করবার পরিকল্পনা করে এবং ভারতীয় যুবরাজদের চাপানো কর প্রতিরোধ করে, যদিও স্থানীয় শাসকরা এই কর চিরাচরিত সামন্ত কর হিসেবে মনে করতেন। ১৬৮০-র দশকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগলদের সঙ্গে এক দ্বন্দ্বে নামেন, যখন মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে ভালো অবস্থায়। মোগলরা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে সহজেই ওদের হারিয়ে দেয়। কিন্তু মোগল সম্রাটেরা চাননি যে, ওরা ভারতবর্ষ ছেড়ে পুরোপরি চলে যাক। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবসা আবার চালু হয়।

যখন কোম্পানির প্রধান জব চার্নক হুগলির বিকল্প কিছু খুঁজছিলেন। তখন মূল চিন্তা ছিল এমন জায়গা বার করা যেটা সহজেই সুরক্ষিত করা যাবে। এই ব্যাপারে জব চার্নক সুতানুটির সুপারিশ করলেন কিন্তু লন্ডন অফিসের মত পেলেন না। লন্ডনের কেউই এইসব জায়গা চিনত না। ওরা কলকাতার উল্টো দিকে, পশ্চিমে, উলুবেড়িয়া পছন্দ করল। অন্যদিকে জব চার্নক নদীর পূর্বদিকে সুতানুটির ওপর জোর দিলেন। চার্নকের সিদ্ধান্তের দুটো কারণ ছিল। এক, সুতানুটি ছিল নদীর "ভুল" দিকে, দেশের মূল ভূখণ্ডের প্রায় বাইরে। তারা ভাবত যে একটা নদী যদি ইংরেজদের এবং মোগলদের মধ্যে থাকে, তাহলে ইংরেজদের হারানো কঠিন হবে। দুই, সুতানুটিতে সুতোর এক বড় হাট ছিল। এছাড়া কোম্পানির পুরনো এবং বিশ্বাসী ভৃত্য জব চার্নকের কথা ফেলতে পারল না লন্ডনের অফিস। কিন্তু ওরা নানা শর্ত চাপাল যাতে সুতানুটি করতে গিয়ে কোম্পানির কোনও লোকসান না হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অদূর ভবিষ্যতে সুতানুটি, কলকাতা হয়ে দাঁড়াল।

পাঁচ দশকের শান্তি

১৬৯০ থেকে ১৭৪১, মানে কলকাতা হবার পর থেকে মারাঠা আক্রমণ পর্যন্ত, বাংলায় শান্তি থেকেছে এবং টেক্সটাইলের ব্যবসা বেড়েছে। ১৭২০-এর দশক পর্যন্ত ডাচ ভি.ও.সি. কোম্পানি বাংলা থেকে ইংরেজদের থেকে বেশি রপ্তানি করত। কিন্তু, তারপর থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই টেক্সটাইল বাণিজ্যে প্রভুত্ব করত। যে পাঁচ দশক শান্তি ছিল এবং টেক্সটাইল বাণিজ্য ফুলেফেঁপে উঠেছিল, ইংরেজরা চেয়েছিল যে, একটা দুর্গ হোক এবং একটি পাঁচিল হোক জলসুদ্ধ। এই সময় সবচেয়ে বড় ভয় ছিল শাসকদের যথেচ্ছাচার এবং বেশি কর আদায়ের। মুর্শিদকুলি খান নবাব হওয়ার পর ইংরেজদের থেকে ৪৩ হাজার টাকা দান হিসেবে চান। অনেক শাসক মোঘল সম্রাটকে যাতে কিছু না দিতে হয় সেই জন্য নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেন। (ফার্মিংগার, ওয়ালটার কেলি, ১৯১৭ : ৪-৫৭, ভূমিকা; প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৬-৩৩, ৪৭)। জোর করে আদায় ছিল ওই সময়কার সামন্ত রাজত্বের অঙ্গ, বাংলার নবাব দিল্লির কোষাগারে যত বেশি অর্থ দিতেন নিজেকে তত নিরাপদ মনে করতেন। এইভাবে বাংলা থেকে দিল্লিতে প্রচুর টাকা যেত, অনেক সময়ই বাংলার সাধারণ মানুষের মূল্যে। শায়েস্তা খান প্রতি বছর ৮০ লাখ থেকে ১৭৫.৫ লাখ দিল্লিতে দিতেন। মোট বাইশ বছরে ৩৮ কোটি ৬২ লাখ তিনি দিয়েছেন, আর একটা হিসেবে তিনি ১৭ কোটি দিয়েছেন। (খান, আকবর আলি, ১৯৯৯ : ১৭০-১৭২)

ইংরেজরা চেষ্টা করত মাঝেমাঝে জাহাজ আটকে, গঙ্গার মুখ আটকে বা দুর্গ করে

শক্তি পরীক্ষা করার। যাতে ওদের ওপর চাপানো কর কমের দিকেই থাকে। ১৬৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলার নবাব ওদের দুর্গ করার অনুমতি দেননি। শোভা সিংহের বিদ্রোহ এবং আফগান সহকর্মী রহিম খানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হুগলি দখল, তারপর নদীর প্রায় সমস্ত পশ্চিম অংশ মুর্শিদাবাদ সুদ্ধ দখল, ওদের দুর্গ করবার অনুমতি দেওয়ার পক্ষে যুক্তি তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত শোভা সিংহকে হত্যা করেন বর্ধমানের রাজার মেয়ে, যখন তিনি তাকে বলাৎকারের চেষ্টা করেন। রহিম খানকে পরাজিত করে মোগলরা তার মস্তকচ্ছেদন করেন। (উইলসন, সি.আর.১৮৯৫ : ১৪৭-১৫০)। নবাব তিনটে ইউরোপীয় উপনিবেশকে তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য দুর্গ করাব অনুমতি দেন। কিন্তু এই নিয়ে পরবর্তীকালে মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের অনেক জলঘোলা হয়। মোগলরা বলেন যে, ইংরেজরা অনুমতির বাইরে খাল কেটেছে এবং দুর্গ করেছে।

আর তিনটি প্রশ্ন ওঠে। এক, রাজকীয় সনদের ব্যাখ্যা নিয়ে। এককালীন তিন হাজার টাকা ছাড়াও, এই সনদ বহির্বাণিজ্যে প্রযোজ্য, না আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও ওই সনদ শুল্ক না দিয়ে ব্যবহার হতে পারে? প্রশ্ন ওঠে যে, সনদের কোনও ব্যক্তিগত ব্যবসায় ব্যবহার করা যায় কিনা? তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, নবাব কবের বাইরে কিছু চাইতে পারেন কিনা? কোম্পানি হিসেবে ইংরেজরা চাইত যে, যা তারা দেবে তা হবে ন্যায্য এবং নিয়মসঙ্গত। ওরা অতিরিক্ত খাজনার বিরুদ্ধে ছিল। অন্যদিকে তৎকালীন ভারত বা বাংলার এটাই ছিল চল যে, নতুন কোনও নবাব সিংহাসনে বসলে, তার বিয়ে হলে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে শাসক কিছু অতিরিক্ত চাইতে পারেন। (রায়, ইন্দ্রানী, ১৯৯২ : ১২১)।

ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহ্ আলম, যখন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন, তখন প্রত্যাশা করেছিলেন যে, কোম্পানিগুলো উপঢৌকন দেবেন। কত দিতে হবে সেটা অবশ্য ঠিক হত দরদাম, ভয় এবং উল্টো ভয় দিয়ে। যেমন, মোগলরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সনদ দিতে অস্বীকার করে, যতক্ষণ না তারা ডাচদের সমান ৩৫ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়। উল্টো দিকে কোম্পানিও বলে যে তারা ব্যবসা প্রত্যাহার করবে। এই উল্টো ভয় অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাজ দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিকে ৪৫ হাজার টাকা নবাবের একজন লোককে দিতেই হল। পরবর্তীকালে আর একজনকে ২০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল, তবে কোম্পানির ভাগ্য ভালো যে, ওই লোকটি টাকা দেওয়ার আগেই মারা যান। (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ১৮০-১৮৪)।

যখন সামন্ত রাজাদের টাকায় টান পড়ত ওরা প্রত্যাশা করত যে, ব্যবসায়ীরা এবং বণিকরা ওই টাকা দিয়ে দেবে। ইংরেজরা চোখ ধাঁধানো খরচা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত এবং কলকাতায় বড় বড় বাড়িতে থাকত। কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ওদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে। প্রচুর টাকা এইভাবে নবাবকে দিতে হয়েছে, কিন্তু টেক্সটাইল থেকে লাভ এত হত যে, তাতে ওদের কিছু যেত আসত না। কত টাকা দিতে হবে সেটা নবাবের খামখেয়ালীপনার ওপর নির্ভর কবত। সেটা ওদের পছন্দ ছিল না। (রায়, ইন্দ্রানী, ১৯৯২ : ১২১)।

এটা বলা যায়, সব দিক বিচার করে, যে কোম্পানি এই ধরনের টাকা দিতে অভ্যস্ত ছিল—ভারতে এবং ইংল্যান্ডে। রাজাদের প্রচুর টাকা দিতে হত সনদ নতুন করে পেতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূরে রাখতে। যদিও চুক্তির ধারণা ক্রমশ সর্বজনীন হয়ে উঠছিল,

তবু টাকা দেবার সামন্ত পদ্ধতি পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়নি। (বোল্টস, উইলিয়াম, ১৭৭২, খণ্ড-১ : ৯)।

দুই পক্ষ যেন দুটো জগতে বাস কবত—সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং সমস্ত রকম অর্থে। এর ফলে দুপক্ষের মধ্যে মাঝেমাঝেই ঝগড়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু কোনও পক্ষই চাইত না যে, দ্বন্দ্ব আয়ত্তের বাইরে চলে যাক। দুই পক্ষই পরস্পরের যোগাযোগ থেকে বেশ কিছু পেত, কোনও পক্ষই চাইত না অন্য পক্ষকে পুরোপুরি বাদ দিতে।

মারাঠা আক্রমণ, উৎকোচ এবং ষড়যন্ত্র

তারপর এল মারাঠা আক্রমণ। বলা যায় ১৭৪০-এর দশকে পর্যন্ত সব মিলিয়ে, কিছু ইতিবাচক কিছু নেতিবাচক, কোম্পানির সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারাঠা আক্রমণ বাংলার সমাজে এবং অর্থনীতিতে এক বড় বিপর্যয় আনল, বিশেষ করে বিহারের সীমান্তে। ১৭৪১ সাল থেকে শুরু করে বেশ কয়েকবার মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করল। প্রতিবারই এল মুর্শিদাবাদের খুব কাছে এবং প্রত্যেকবারই নবাবকে ওদের প্রচুর টাকা দিতে হল। যেন মারাঠারা দিল্লির সম্রাটের হয়ে খাজনা আদায় করতে এল। (বোল্টস, উইলিয়াম, ১৭৭২, খণ্ড-১ : ৫)।

প্রথম মারাঠা যিনি আক্রমণ করেন ১৭৪২ সালে তিনি ছিলেন নাগপুর-বেরারের মারাঠা নেতা রঘুজী ভোঁসলে। পরের বছর, ১৭৪৩ সালে, দুটি মারাঠা বাহিনী বাংলা আক্রমণ করে। রঘুজী তো ছিলেনই, তাছাড়া বালাজী রাওয়ের নেতৃত্বে একদল মারাঠা আক্রমণ করে। কিন্তু তারা চৌথের প্রতিশ্রুতি পেয়ে চলে যায়। রঘুজী ভোঁসলেকে অবশ্য বাংলার নবাব বাধ্য করেন লড়াই করতে এবং ১৭৪৩ সালে তিনি চলে যান। কিন্তু পরেব বছর, এবং আবার ১৭৪৫ সালে, বহুবার তারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে। ১৭৪৮ সালে আবার বিহার আক্রমণ হয়, ১৭৫০ সালে মুর্শিদাবাদ এবং ১৭৫১ সালে পশ্চিমবাংলা।

শেষ পর্যন্ত, ১৭৫১ সালে আলিবর্দী খান ওদের ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা চৌথ হিসেবে দিতে অঙ্গীকার করেন এবং কার্যত পুরো ওড়িশা ওদের দেওয়া হয়। (মার্শাল, পি. জে., ১৯৮৭ : ৭০-৭১)। সুশীল চৌধুরীর মতে মারাঠা আক্রমণের প্রভাব একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। যদিও মারাঠা আক্রমণে কিছু ক্ষতি হয়েছে কিন্তু তার মতে বাণিজ্যের তেমন কিছু ঘাটতি হয়নি (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৭)। এই মতামত শুধুমাত্র চৌধুরী দৃশ্যমান ঘটনার কথা বলছেন, কিন্তু যা দৃশ্যমান নয়, বিশেষ করে ছোট অঞ্চলগুলোতে মারাঠা আক্রমণ, বিশেষভাবে বাণিজ্যকে, ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

জনৈক গঙ্গারাম মারাঠা আক্রমণ নিয়ে ১৭৫১ সালে একটি বড় কবিতা লেখেন, যার নাম তিনি দেন "মারাঠা পুরাণ"। এই কবিতায় তিনি মুলত ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণাবলির বিবরণ দেন। তার পুরাণের মতে, ভগবান পৃথিবীতে ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠান বাংলার রাজার স্বেচ্ছাচারিতা দূর করবার জন্য। ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা আক্রমণ করেন সম্রাটের হয়ে চৌথ (মানে এক চতুর্থাংশ) আদায়ের জন্য। এই পুরাণে দেখা যায় যে, কীভাবে মারাঠা আক্রমণ জনজীবন ও বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। সাধারণ মানুষ কলার বিচি খেয়ে বেঁচে ছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সৈন্যের পিছনে যান

এবং গ্রাম লুঠ করতে থাকেন। লোকে পালাতে শুরু করে : ব্রাহ্মণ তার বই নিয়ে পালায়, স্যাকরা তার মানদণ্ড নিয়ে, পটুয়া এবং কামাররা তাদের চক্র নিয়ে, জেলে তার জাল নিয়ে, মেয়েরা মাথায় একটা ঘোমটা দিয়ে, এবং রাজপুত ও ক্ষেত্রীরা তাদের তরোয়াল নিয়ে পালায়। এইভাবে শেখেরা, সৈয়দরা, পাঠানরা, মোগলরা, শিকদাররা, পাটোয়ারিরা, গোঁসাইরা এবং মহান্তরা পালায়। ভাস্কর পণ্ডিত এমনকী কাটোয়ার কাছে দাইঘাট বলে একটা জায়গায় দুর্গাপূজার বন্দোবস্তও করেন, কিন্তু পূজার কিছু আগে তিনি মারা যান। আর একটা কবিতায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রশ্ন করা হয়, কেন তিনি তার প্রজাদের বর্গী আক্রমণ থেকে রক্ষা করেননি। (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড: ৪৫০-৪৫৪)। সর্বমোট ৪০ হাজার মানুষ এই আক্রমণে প্রাণ হারায় (মার্শাল, পি. জে., ১৯৯৭ : ৭৩; সরকার, যদুনাথ, ১৯৭৩ : ৪৫৫-৪৬৭)।

নবাব আলিবর্দী খাঁ, কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে টাকা চান মারাঠাদের দেবার জন্য। তার যুক্তি ছিল যে, কোম্পানিগুলো তার অধীনে ভালোই উপার্জন করছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ফতেচাঁদ জগত শেঠের সঙ্গে আলোচনা করে, নবাবকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেয় (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩৮-৩৯)। জগত শেঠ নিজেও তিন কোটি টাকা দেন এবং শোনা যায় যে, ওই টাকা দিতে তিনি দ্বিধা করায় তাকে চড় মারা হয়। ডাচেরা সাড়ে চার লক্ষ এবং ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ দেয় (মার্শাল, পি. জে., ১৯৮৭ : ৭৬)। এই আক্রমণের ফলে ইংরেজদের খুব ভালো হয়। বিশেষ করে শোভা সিংহের আক্রমণের পর ওরা আর একটা অজুহাত পায় দুর্গ করবার। এখন কলকাতায় যেখানে সার্কুলার রোড সেখানে একদা মারাঠা ডিচ কাটা হয়েছিল ওই আক্রমণ ঠেকাবার জন্য (এডয়ার্ডস, মাইকেল,১৯৬৩ : ২২)।

মারাঠাদের ফিরিয়ে দিতে নবাবকে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়, যা তারা তোলেন বড় বড় বণিক, জমিদার এবং বিদেশি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির থেকে। নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জেলে যান, যেহেতু নবাব তার কাছ থেকে যে ১২ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন তা পাননি (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড: ৪২৭)। পরে জমিদাররা, সামন্তরা, বণিকরা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি, সবাই এককাট্টা হল ওই প্রশ্নে নবাবের বিরুদ্ধে।

পরবর্তী বড় ঘটনা ছিল ১৭৫৬ সালে নবাব আলিবর্দী খাঁয়ের মৃত্যু এবং তাঁর মসনদে তাঁর নাতি সিরাজদৌল্লার বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব হিসেবে অভিষেক। তিনি এক বছরের মতো শাসন করেন এবং তার শাসন শেষ হয় ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে, তখন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুগ শুরু হল। যেখানে মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য ছিল, স্বাধীনচেতা হলেও দিল্লির মোগল সম্রাটকে নিয়মিত খাজনা দিতেন। তার ফলে আলিবর্দীর উত্তরাধীকারী সিরাজদৌল্লাকে তার নিজের যুদ্ধ নিজেকেই করতে হয়, দিল্লি বা ভারতের অন্য শরিকদের কোনও সাহায্য ছাড়াই, যদিও ফরাসি সাহায্য তিনি পান। আমরা এই সমস্ত ঘটনা শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করব।

৪.২

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী

ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসের, বিশেষ করে বখতিয়ার খিলজির ক্ষমতা দখল থেকে ইংরেজদের বাংলায় আগমন অর্থ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১২০৪ সাল থেকে ১৬৩৪ পর্যন্ত, সংবাদে এক বড় সূত্র হল যে, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ। এদের মধ্যে বার্নিয়ার বা ইবনবতুতা বিখ্যাত নাম। (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯)। এরা অনেকেই ভারতে যথেষ্ট সময় থেকেছেন। এইসব বিদেশি পর্যটক বহু দেশ ঘুরেছেন এবং তাদের বিবরণে একটা প্রেক্ষিত রয়েছে যা অন্যদের লেখায় পাওয়া যায় না। এরা বাংলায় যা দেখেছেন তার সঙ্গে বাংলার বাইরে বহু বিষয়ের তুলনা করতে পেরেছেন, যা শুধু তাঁরাই পারেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে।

এঁদের উদ্দেশ্য ছিল নানা রকম। কেউ কেউ চেয়েছেন ভারতবর্ষে ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করতে। কেউ আবার চেয়েছেন যে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে পর্যটন বাড়ুক, এবং তাদের পর্যটন ওই উদ্দেশ্য সফল করুক। এ ছাড়া কেউ কেউ ঘুরেছেন অজানাকে জানতে এবং জ্ঞান বাড়াতে। উদ্দেশ্য যাই হোক, এরা সকলেই ভালো পর্যবেক্ষক, যা দেখেছেন তাই লিখে ফেলেছেন এবং বিশাল বিশাল বই লিখেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভারতীয় ভাষাও শিখেছেন এবং সেই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছেন।

তাঁদের লেখা পর্যালোচনা করবার এক বড় সমস্যা হল যে, তাদের সময়ের এক সংক্ষিপ্ত অংশ তাঁরা বাংলায় দেন, এবং তুলনায় উত্তর, মধ্য, পশ্চিম ভারতে বেশি সময় কাটান। বাংলা ওদের সময় রাজনীতির প্রান্তসীমায় ছিল, তাই এঁরা কেউই বাংলায় পৌঁছবার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেননি। ওঁরা চেয়েছিলেন পেগু, আরাকান, শ্রীলঙ্কা, চীন বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে এবং বাংলা ওদের পথে পড়েছে। বাংলাকে মূল গন্তব্যস্থল করে ওরা কখনও যাত্রা শুরু করেননি। তাই কয়েকশো পৃষ্ঠার এক একটা মোটা বইয়ের আদ্যোপান্ত খুঁজে অবশেষে দুই-তিন পাতা হয়তো বাংলা নিয়ে লেখা পাওয়া যায়। তারপর আবার বাংলার মধ্যেই এক বড় সময় কাটে নদীপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে।

যে অল্প সময় তাঁরা বাংলায় কাটাতেন তারও এক বড় অংশ যেত শহরে বা বন্দরে। গ্রামাঞ্চল তাঁরা দেখতেনই না বলা চলে, শুধু এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার সময় যেটুকু দেখা। তাই ওদের লেখা থেকে শহর বা বন্দর সম্বন্ধে আমরা যতটা জানতে পারি সেই তুলনায় গ্রামের মানুষ কীভাবে থাকত তা জানতে পারি না। গ্রামাঞ্চলেও ওরা লক্ষ করেছেন যা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর, যা রোজকার জীবনে ঘটে তা নয়। যেমন, নদীর তীরে স্নান করবার সময় ব্রাহ্মণরা যে তর্পণ করতেন বা কোনও নদীতে হয়তো কুমিরের ভিড়, হয়তো সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপ কোনও বাঘ

সাঁতরে পার হচ্ছে, অন্ধকারে জোনাকির ঝিকিমিকি অথবা আকাশে রামধনু বা ডলফিন এক ঝাঁক মাছ তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে এই সবই আমরা বেশি পাই ওদের লেখায়।

এটাও বলা কঠিন যে, তাঁদের লেখার কতটুকু শুনে লেখা এবং কতখানি তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত। এছাড়া তারা যেসব শহর ও বন্দর দেখেছেন তাদের নাম অনেক সময় যা তারা দিয়েছেন তা আমাদের জানা শহর বা বন্দরের নামের সঙ্গে মেলেনি, এর ফলে ওদের দেখা শহর বা বন্দরের সঙ্গে আজকের কোনও শহর বা বন্দরের তুলনা করা কঠিন। প্রায়ই তারা শহর ও রাজ্য গুলিয়ে ফেলেছেন এবং শহরের নামের সঙ্গে রাজ্যের নাম এক করে দিয়েছেন। যার ফলে নাম দেখে তুলনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেওয়া নাম থেকে ইতিহাসকে নতুন করে লেখা খুবই শক্ত।

তা সত্ত্বেও যেহেতু ভারতের লিখিত ইতিহাস নেই সেই জন্য এই সমস্ত ভূ-পর্যটকদের এই বিবরণীর এক বিশেষ মূল্য আছে। বিশেষ করে, ১২০৪ সাল থেকে ১৬৩৪ সাল পর্যন্ত। ১২০৪ সালের আগের ইতিহাসের দুই বড় সূত্র দুজন চীনা ভূ-পর্যটকের কাহিনি—পঞ্চম শতাব্দীতে য়ুয়াং চোয়াং এবং তার আগে ফা-হিয়েন। (ওয়াটার্স, টমাস ১৯৬১) এরা দুজনেই তাম্রলিপ্ত অবধি গিয়েছিলেন। তাদের লেখার মূল সমস্যা হল যে ওরা বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে বুঁদ হয়ে ছিলেন। তাই ওদের লেখায় যতটা জানি কত বৌদ্ধ বিহার ওই অঞ্চলে ছিল, ততটা জানি না তখনকার মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকতেন। বা কী ধরনের প্রতিষ্ঠান ওদের ছিল। তাদের লেখা এবং বখতিয়ার খিলজির অভিযানের মধ্যে কোনও নাম করা পর্যটক ভাবতবর্ষে আসেননি। সেই সময় বাংলার বহির্বাণিজ্য তলানিতে পৌঁছেছিল যা আমরা আরও বুঝি এই থেকে যে ওই সময়ের বিদেশি মুদ্রা খুব অল্পই পাওয়া যায়।

১২০৪ সালের পর প্রচুর ভূ-পর্যটক, মূলত উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে, ভারতে আসেন। যা থেকে বুঝি যে, ওই সব অঞ্চলের সঙ্গে সেই সময় ভারতের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য থেকে মাত্র একজন বড় পর্যটক আসেন, নাম মা-হুয়ান। তিনি যে মুসলমান ছিলেন এবং নৌবাহিনীর মুসলমান কমান্ডারের সঙ্গে ভারতে আসেন সেটা হয়তো আশ্চর্যের নয়। ভাস্কো-ডা-গামা আসার পর ইতালীয়, ফরাসি, পোর্তুগিজ ও ইংরেজরাও আসেন।

এই পরিচ্ছেদে আমরা বাংলায় যে পর্যটকরা এসেছিলেন তাদের কথা দ্বিতীয় অংশে বলছি। তৃতীয় অংশে তাঁরা যা দেখেছেন সেই সম্পর্কে লিখছি। চতুর্থ অংশে আমরা সেই সমস্ত পর্যটকের কথা বলছি যারা কখনও বাংলায় আসেননি কিন্তু, বাংলা সম্পর্কে অন্যদের কাছে শুনেছেন এবং তার ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন। পঞ্চম অংশে আমরা সব মিলিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত টানবার চেষ্টা করছি।

কিছু বিদেশি পর্যটকের রূপরেখা

য়ুয়াং চোয়াং-এর ৭০০ বছর পরে আসেন মরোক্কো থেকে ইবন বতুতা। তিনি চেয়েছিলেন যে, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্ব এশিয়া এবং স্পেনে যত মুসলমান শাসিত

দেশ আছে সেই সমস্ত দেশে ঘুরে আসবেন। ১৩০৪ সালে টাঞ্জিয়ারে (মরক্কো) এক কাজি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইবন বতুতা। উত্তর আফ্রিকায় তখন, যেমন এখনও, বার্বাররাই সংখ্যাধিক্য জাতি। তিনি মক্কায় ইসলাম অধ্যয়ন করে ভারতে যান। ভারতের সম্রাট তাকে খুব পছন্দ করেন এবং চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। চীন যাবার পথে তিনি শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মালাবার, বাংলাদেশ ও সুমাত্রা, আন্দালুসিয়া এবং নাইজার দেখে যান। বাংলায় তিনি কিছুদিন ছিলেন, যেহেতু নৌকো পাননি। ১৩২৫-১৩৫৪ সাল, মোট ২৯ বছর তিনি ভারতে কাটান। বই লিখবেন বলে কোনও পরিকল্পনা করেননি। মরক্কোয় ফিরে বতুতা আবার কাজির কাজ নেন। কিন্তু মরক্কোর রাজা তাকে বাধ্য করেন যেটুকু মনে আছে তা বলতে এবং লিখতে। সম্ভবত ১৩৪০ সালে ইবন বতুতা বাংলায় এসেছিলেন। (বতুতা, ইবন, ১৯২৯)

মা-হুয়ান-ইয়াং-শেং-লান ছিলেন এক চীনা পরিব্রাজক। তিনি চীনের নৌবাহিনীর কমান্ডার নপুংসক চেং-হোর সঙ্গে ভারতে আসেন। চেং-হো সাতবার অভিযান করেন বলে তাকে নানকিং-এর প্রতিরক্ষাকারী বলা হয়। তিনি "গ্র্যান্ড ইউনাক" পদবি পান এবং ১৪৩৫ সালে ৬৫ বছর বয়সে মারা যান। ওই সাতটি অভিযান ১৪০৫-৭ থেকে ১৪৩১-৩৩ সালের মধ্যে সংগঠিত হয় এবং তিনি শ্রীলঙ্কা, জাপান, পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সমস্ত অভিযানের সময় যান। বলা হয় একবার তিনি শ্রীলঙ্কার রাজাকে বন্দি করে চীনে নিয়ে যান। কালিকটের জামোরিনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। (মা হুয়ান-ইং-ইয়াই-শেং-লান, ১৯৭০)

১৩৮০ সালে এক কাঠুরে পরিবারে মা-হুয়ান জন্মান। সম্ভবত হো-র চতুর্থ অভিযানে, ১৪৩১-৩৩ সালে, তিনি হো-র সঙ্গে ছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি মুসলমান হন এবং হো-র এক শাখা অভিযানে, হুয়াং-পো নামে এক নপুংসকের নেতৃত্বে, বাংলায় আসেন। তিনি আবার একবার, সম্ভবত সপ্তম অভিযানে, হুয়াং-পোর সঙ্গে চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ, এবং গৌড়ে আসেন।

লুডোভিক-ডি-ভার্তেমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু আমরা জানি যে, তিনি বোলোনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব অল্প বয়সে ভেনিসে আসেন। তিনি পর্যটন করতেন দেশ দেখা এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য। ১৫০২ সালে তিনি ইতালি ত্যাগ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন। ১৫০৩ এবং ১৫০৮-সালের মধ্যে সিরিয়া, আরব মরুভূমি, পারস্য এবং ভারত ও পেগু (মায়ানমার) যান। পরে ইথিওপিয়া হয়ে তারপর তিনি ইতালিতে ফিরে যান। একবার সাময়িকভাবে মুসলমানও হয়ে যান এই কারণে যে, তা না হলে মদিনা যেতে পারছিলেন না। তিনি তার ভ্রমণকাহিনি এই কারণে লিপিবদ্ধ করেন যে, অন্যরা এর থেকে সাহায্য পাবেন এবং বাণিজ্যও বাড়বে। (ভার্তেমা, লুডোভিকো ডি, ১৮৬৩)

একজন পোর্তুগিজ, ডুয়ার্টে বারবোসা, সম্ভবত ইউরোপীয়দের মধ্যে যিনি বাংলায় এসেছিলেন। তিনি গুজরাট যান (গুজরাট তখন ক্যাম্বে হিসেবে পরিচিত ছিল) এবং কেরালায় পোর্তুগিজ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ১৭ বছর কাটান এবং স্থানীয় ভাষা শেখেন। ভাস্কো-ডা-গামার ঐতিহাসিক সফরের দু বছর পরেই তিনি কোচিন যান। তিনি পোর্তুগালে ফিরেই, ১৫১৮ সালে, তাঁর বই লিখে ফেলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সেবুতে

তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে তিনি একটা অভিযানে গিয়েছিলেন। (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮)

টোম পিরেস একজন পোর্তুগিজ ছিলেন। ১৪৬৮ সালে তার জন্ম হয়। তিনি চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই ভারতে আসেন ১৫১১ সালে। পিরেস এক সময় চীনে পোর্তুগালের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং চীন যাবার পথে তিনি বাংলাদেশ, আরাকান, পেগু, বার্মা, কম্বোডিয়া, চম্পা, এবং কোচিন-চিন দেখেন। এইসব কথা তার তৃতীয় বিবরণীতে তিনি লিখেছেন। বরবোসার আগেই তিনি তাঁর বইগুলো লেখেন, যদিও তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত নয়। (মিরেস, টোম, ১৯৪৪)

সিজার ফ্রেডরিক ভেনিসের একজন বণিক ছিলেন এবং তিনি ভারত ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দেখেন, যেমন, জাপান। তুরস্ক হয়ে দেশে ফিরে, ১৫৮৮ সালে তিনি এই ভ্রমণকাহিনি লেখেন। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য বইতেই লিপিবদ্ধ আছে: "বণিকদের সাহায্যের জন্য, এবং অন্য ভ্রমণকারীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য।" ইতালীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে এই বইটি ইংরেজিতে অনুদিত হয়। (ফ্রেডরিক, সিজার, ১৫৮৮)

১৫৫০ সালে রাল্ফ ফিচের জন্ম হয। তিনি প্রথম ইংরেজদের একজন যিনি ভারতে আসেন। এই সময়ের মধ্যে পোর্তুগিজরা কেপ হয়ে ভারতে আসবার পথ আবিষ্কার করেছে এবং সেই পথ তাদের নিয়ন্ত্রণে। ফিচের ভ্রমণ ব্যয় ইউরোপের কিছু কোম্পানির এক সিন্ডিকেট বহন করে যাতে ফিচ্ স্থল পথে ভারতে যাবার জন্য কোনও পথ, সিরিযা এবং চীন হয়ে, বের করতে পারেন। তিনি ওদের নেতা, জন নিউবারির সঙ্গে যান। নিউবারির সঙ্গে সম্রাট আকবরকে উদ্দেশ করে ইংল্যান্ডের রানির একটা চিঠি ছিল, যেখানে ভুল করে আকবরকে ক্যাম্বের রাজা বলা হয়। (ফস্টার, উইলিয়াম (সম্পাদিত), ১৯২১)

তারা ১৫৮৩ সালে ভারত রওনা হন। কিন্তু ইতালীয়রা ওদের বন্দী করে গোয়ায় পোর্তুগিজদের কাছে দিয়ে দেন। যাহোক, ফিচ সেখান থেকে পালিয়ে আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে পৌছন। সেখানে আকবরের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেখান থেকে তিনি বাংলায় আসেন। তখন টান্ডা বাংলাদেশের রাজধানী। টান্ডা থেকে তিনি কুচবিহার, হুগলি, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, শ্রীপুর হয়ে বার্মার পেগুতে যান। ফিচ্ ১৫৯১ সালে ইংল্যান্ড ফিরে যান এবং ১৬০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূত্রপাতে যুক্ত ছিলেন।

টমাস বাউরি একজন ব্রিটিশ নাবিক। তিনি ১৯ বছর ভারতে থাকেন, বিশেষ করে মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জে। ১৬৬৯ সাল থেকে ১৬৭৯ পর্যন্ত দশটি বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি বই লেখেন, যার মধ্যে অনেক ছবি তিনিই আঁকেন। ওই লেখা তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে যান। কিন্তু ওই রচনায় বা অন্যভাবে বাউরির বাবা বা মা কে ছিলেন ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না। (বাউরি, টমাস, ১৯০৫)

এই ভ্রমণকারীদের মধ্যে ছিলেন দুজন নামকরা ফরাসি লেখক, জন ব্যাপটিস্ট ট্যাভেরনিয়ার, জন্ম ১৬০৫ সালে এবং ১৬৮৯ সালে ভারত ভ্রমণ করেন। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার, ফরাসি রাজার চিকিৎসক ছিলেন এবং ১৬২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

ভারতে ১৬৫৯ সালে আসেন ও ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত থাকেন। বার্নিয়ার ট্যাভারনিয়ারের সঙ্গে একসঙ্গে বাংলাদেশে যান। (ট্যাভারনিয়ার, মসিয়ে জন ব্যাপটিস্টা, ১৯৮৪)

ফ্রে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক একজন পোর্তুগিজ পাদরি ছিলেন। তিনি বাংলায় ভালোভাবে ঘোরেন এবং অনেক কু-সংস্কার ও ভুল ধারণা থাকলেও অনেক কিছুই সুন্দরভাবে লেখেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনি মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ নিয়ে লেখা, যখন ব্রিটিশরা সবেমাত্র বাংলায় নেমেছে। (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭)

এদের ছাড়াও আমরা ম্যানুয়েল ডি ফেরিয়া ওয়াই সৌফার কিছু মন্তব্য দেখেছি। সৌফা তিন খণ্ডের এক ঢাউস বই লেখেন, যার নাম "দি হিস্ট্রি অফ দি ডিসকভারি অ্যান্ড দি কংকোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া বাই দি পোর্তুগিজ"। (সৌফা, ম্যানুয়েল, ডি ফেরিয়া ওয়াই, ১৬৯৪,) এই বইটিতে বাংলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু এমন সময় বইটি লেখা যখন বাংলায় ইংরেজরা সদ্য এসেছে। এই পরিচ্ছেদের শেষে আমরা দুজন বড় মাপের ভ্রমণকারীর মন্তব্য দিচ্ছি, যাঁরা কখনও বাংলায় না এলেও অন্যদের কাছে শুনেছেন, যাঁদের নাম মার্কো পোলো (পোলো, মার্কো, ১৯৯৩) এবং ভাস্কো-ডা-গামা।

ভ্রমণকারীদের নানা মন্তব্য

এই অংশে আমরা ওই বিখ্যাত ভ্রমণকারীদের কিছু মন্তব্য দিচ্ছি।

প্রাচুর্য্য

পর্যটকদের প্রায সবাই বলেছেন বাংলার প্রাচুর্য্যের কথা। সব কিছুই নাকি সস্তায় পাওয়া যেত। বাংলার খাবার নিয়ে সবচেয়ে বেশি বলেন বার্নিয়ার। বিশেষ করে তিনি তুলনা করেন ইজিপ্টের সঙ্গে যেখানে বহুদিন তিনি কাটিয়েছেন। নীচে বার্নিয়ারের উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'ইজিপ্টকে যে মর্যাদা দেওয়া হয় তা বাংলারই প্রাপ্য। বাংলায় এত সস্তায় ধান তৈরি হয় যে শুধুমাত্র বাংলার প্রতিবেশীরাই এই ধান পান না , অন্যেরাও পান। এই ধান গঙ্গা ধরে পাটনা অবধি যায় এবং তারপর সমুদ্র পথে যায় মসলিপট্টম্ এবং করমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে। এছাড়া এই ধান যায় বিদেশে। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কায় এবং মালদ্বীপে। একইভাবে বাংলায় প্রচুর চিনির উৎপাদন হয়। যা মূলত যায় গোলকুণ্ডা এবং কার্ডিয়াটিক (কর্নাটক?) রাজ্যে, যেখানে অল্পই চিনি পাওয়া যায়। এছাড়া আরব এবং মেসোপটেমিয়া এমনকি পারস্যের বন্দর-আবাস পর্যন্ত এই চিনি যায়।" বার্নিয়ার একইভাবে বাংলার মিঠাই, আম, আনারস, লেবু, আদা এবং শুকনো ফল নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তিনি বিশেষ করে মুগ্ধ হন বাংলায় খাবার এবং অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এত সস্তায় পাওয়া যায় বলে। তিনি দেখেন যে, মাত্র এক টাকায় ২০টা মুরগি কেনা যায়, এবং শুয়োর এত সস্তা ছিল যে, পোর্তুগিজরা এবং ইংরেজরা প্রচুর খেত। (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯ : ৪৩৭-৪৩৮)। তিনি এই সঙ্গে একটি পোর্তুগিজ, ইংরেজ ও ডাচ প্রবাদ বলেন, যে, বাংলা রাজ্যে শত শত দরজা ঢুকবার জন্য খোলা, কিন্তু বেরোবার একটা দরজাও নেই (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া ১৯৬৯ : ৪৩৯)।

ইবন বতুতা ১৪০০ সালের মাঝামাঝি, প্রায় ৩০০ বছর আগে, বাংলা ঘুরে গিয়ে

প্রায় একই কথা বলেন। তিনি মালদ্বীপে প্রায় ৪৩ রাত্রি কাটিয়ে বাংলায় পৌছন, ওই দেশের নাম তিনি দেন বাঙালিদের দেশ, বলেন, "এটা একটা মস্ত বড় দেশ। এখানে ধান সস্তায় পাওয়া যায়। আমি পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের কথা জানি না যেখানে দাম এত সস্তা। বেশ মোটা মুরগি মরক্কোর এক ডিরহামে ৮টা পাওয়া যায়। এছাড়া ১৫টা ছোট পায়রা এক ডিরহামে পাওয়া যায়। দুই ডিরহামে একটা মোটা ভেড়া পাওয়া যায়। আমি দেখেছি দুই দিনারে ৩০ কিউবিট লম্বা কাপড় পাওয়া যায় এবং একটা সোনার দিনার দিয়ে, যার মানে মরক্কোর টাকায় আড়াই দিনার দিয়ে, একটি দাস মেয়ে পাওয়া যায়"(বতুতা, ইবন, ১৯২৯ : ২৬৭)।

মা হুয়ান, বাংলায় কয়েক দশক পরে পৌছে, প্রায় একই কথা মুগ্ধ হয়ে বলেন, তিনি দেখেন নানা ধরনের ধান বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে, "ধান এবং অন্য ফসল বছরে দুবার তৈরি হয়। হাস্কড রাইস লম্বা এবং চিকন, তার গোড়ায় ছোট লাল চাল। আনহাস্কড রাইস, গম, সিসম, নানা ধরনের বিন, মিলেট, আদা, সরষে, পেঁয়াজ, রসুন, গুড্স এবং সবজি, এই সবই ওদের আছে। ফলের মধ্যে আছে কলা। মদও আছে নানা রকম, কোনওটা নারকেল দিয়ে তৈরি, কোনওটা ভাত দিয়ে বা গাছ বা অন্যকিছু দিয়ে। চিয়াও-চ্যাঙ বলে এক রকম পান আছে, এইগুলো নানাভাবে তৈরি হয়। চা বাজারে বিক্রি হয় না। মানুষেরা সুপারি দিয়ে আতিথেয়তা করেন"(মা-হুয়ান, ১৯৭০: ১৬১)। তিনি যোগ করেন, "ফলের মধ্যে আছে, কাঁঠাল, টক-ফল, মিষ্টি আখ এবং অন্য অনেক কিছু। মিঠাইয়ের মধ্যে আছে অনেক কিছু"। মা-হুয়ান তারপর নানা রকমের বস্ত্রের কথা বলেন। (মা-হুয়ান : ১৬২)।

সিজার ফ্রেডারিক উল্লেখ করেছেন বাংলার হাট সম্পর্কে, যা সপ্তাহে সাত দিনই বসে। প্রচুর জিনিসের পসরা নিয়ে কখনও একই জায়গায় বসে, কখনও নানা জায়গায়। টাভারনিয়ার ছিলেন বাংলার প্রায় সব কিছু নিয়েই বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু একটা জিনিস তাঁকেও খুব উৎসাহিত করে, সেটা হল, হুগলি নদীতে নৌকাবিহার আর সঙ্গে সুস্বাদু খাবারদাবার। তিনি লেখেন, "নৌকো করে আমরা বেশ কয়েকবার বেড়ালাম। আর উপভোগ করলাম নানারকম খাবারের সুস্বাদ, যা তুলনীয় ইউরোপের বাগান বা ক্ষেত থেকে আনা খাবারের সঙ্গেই"। (ফ্রেডরিক, সিজার ১৫৮৮) বাংলার শহর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভার্তামা বলেন, "এ দেশে আছে প্রচুর পরিমাণে শস্য, সব রকমের মাংস, অঢেল চিনি ও আদা, আর প্রচুর তুলো। পৃথিবীর আর কোথাও এসব এত পাওয়া যায় না"। (ভার্তেমা, লুডোভিকোডি, ১৮৬৩)।

ম্যানরিক বাংলার আমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, বাংলার জল জীবাণুমুক্ত। খাবার অঢেল ও সুস্বাদু। এখানকার সুগন্ধী চালকে তাঁর মনে হল ইউরোপের চালের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। তিনি উল্লেখ করেছেন বাংলায় পোষা ও বুনো জীবজন্তুর মাংস পাওয়া যায়, পাওয়া যায় আখ, ঘি, গম। তেলের দামও সস্তা। (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭)।

বাউরি মন্তব্য করেন, "বাংলার ভূখণ্ডে নানা রকম জিনিস উৎপন্ন হয়। মাংস, মাছ, গম—সব কিছুই খুব সস্তা।" বাউরি বাংলায় উৎপন্ন ও কেনাবেচা হওয়া জিনিসপাতির একটা বিস্তারিত বিবরণ দেন তিনি বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে বাংলাই বেশি প্রসিদ্ধ

ও অগ্রসর। চারপাশে সরস গাছপালার ঝাড় ও উর্বর ক্ষেত। চিনি, তুলো, লাক্ষা, মধু, মোম, মাখন, তেল, চাল, সুতীর সব রকম কাপড়, আফিং এবং ঔষধে ব্যবহৃত গোলমরিচ সবই মেলে এখানে।" (বাউরি, টমাস, ১৯০৫)

খারাপ পরিবেশ

বাংলার খাদ্য ও প্রাচুর্যে বতুতা প্রীত হলেও এখানকার পরিবেশ তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁর ভাষায় বাংলা "একটা বিষণ্ণ জায়গা," বা "ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ একটা নরক।" এদেশ তাঁর কাছে বিষণ্ণ লেগেছিল হয়ত এই কারণে যে, এখানে প্রচুর জলবাহী রোগ হত, যাকে ভয় পেত মোগল রাজকর্মচারীরাও। তাই বাংলায় বদলিকে একটা শাস্তি হিসেবেই দেখত কর্মচারীরা। এখানে বাস করা মোগল সৈন্যরা চেষ্টা করত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং যত বেশি সম্ভব এখান থেকে টাকাকড়ি চুরি বা লুঠ করে বা অন্য কোনওভাবে হাতিয়ে উত্তর বা মধ্য ভারতে বদলি হতে। বার্নিয়ার বাংলার প্রাচুর্যের প্রশংসা করলেও এখানকার পরিবেশ পছন্দ করেননি। তাঁর ভাষায়, "বাইরে থেকে আসা লোকদের কাছে বাংলার জলবায়ু কদাচিৎ সতেজ ও স্বাস্থ্যকর বলে মনে হত।" সমুদ্রের কাছে থাকা লোকরাই বেশি মারা যেত। তিনি বালেশ্বরে দুটো পরিত্যক্ত ব্রিটিশ জাহাজ দেখেছিলেন, যার অধিকাংশ লোকই মারা গিয়েছেন। অন্যদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, বাংলার জল খেতে ভালো, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। বাংলার পরিবেশ সম্পর্কে এই রকমই মত যখন প্রচলিত তখন ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসা বারবোসা মন্তব্য করেন, "জায়গাটা বিশাল, ফলেফুলে ভরা এবং স্বাস্থ্যকর।" তিনি এই রকম মন্তব্য করেছিলেন, সম্ভবত অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলার সুদূর প্রসারিত বাণিজ্যিক যোগসূত্রের কথা ভেবেই। (বতুতা, ইবন, ১৯২৯)।

বাংলা সম্পর্কে ভারতীয়দের লেখায় অবশ্য বাংলার জলবায়ুকে এত খারাপ বলা হয়নি। শের খানের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হবার আগে সম্রাট হুমায়ুন কিছুকালের জন্য বাংলায় বাস করেছিলেন। এখানকার জলবায়ুকে তাঁর ভালোই লেগেছিল। উত্তর ভারত থেকে যারা নতুন আসত, তাদের একটু সময় লাগত বাংলার জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে। কিন্তু যারা এখানে দীর্ঘকাল ধরে বাস করেছে (যেমন মির্জা নাথান) তারা এখানকার জলবায়ু সম্পর্কে বিশেষ অভিযোগ করেনি। (নাথান, মির্জা, ১৯৩৬)।

দুষ্টু লোকজন

বাংলার জলবায়ু নিয়ে ট্যাভারনিয়ারের বিশেষ অভিযোগ না থাকলেও এখানকার মানুষদের তাঁর মনে হয়েছিল অসৎ, প্রতারক ও অনির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে এখানকার বণিক সম্প্রদায় ও রাজকর্মচারীদের। তিনি বিশেষভাবে রুষ্ট হয়েছিলেন এখানকার শাসক শায়েস্তা খাঁয়ের ব্যবহারে। শায়েস্তা খাঁ আবার সম্রাটের কাকা ছিলেন। ট্যাভারনিয়ারের কাছ থেকে দামী রত্নরাজি নিয়ে তিনি সেগুলোর দাম দিতে চাইছিলেন না। তাঁর চেনা রত্ন বিশেষজ্ঞদের হুকুম দেন রত্নগুলোর দাম কম করে বলতে। ট্যাভারনিয়ার লক্ষ করেন ওই রত্ন বিশেষজ্ঞদের ঘুষ দিলে তারা রত্নের দাম বাড়াচ্ছে আর মনের মতো ঘুষ না পেলে অর্ধেকেরও কম করে দিচ্ছে। রত্নগুলোকে ওখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায়

বেচবেন সে উপায়ও ছিল না। কারণ, ওই রত্ন বিশেষজ্ঞরা তাদের নির্ধারিত দাম বাজারের অন্যান্য ক্রেতাদের কাছেও প্রকাশ করে দিয়েছিল।

এই রত্ন বিশেষজ্ঞ বা বেনিয়াদের সম্পর্কে ট্যাভারনিয়ারদের নিন্দাসূচক মনোভাবের একটা নমুনা লক্ষ করা যাক : "এই বেনিয়ারা ইহুদিদের চেয়েও হাজার গুণ খারাপ। নানা ছলচাতুরী ও বিদ্বেষ ভরা প্রতিহিংসায় ইহুদিদের চেয়েও অনেক বেশি পটু।" এর পর তিনি লক্ষ করেন বাংলা বেড়াতে আসা অন্যান্য ইউরোপীয়রাও—যেমন, ডাচ, ইংরেজ বা পোর্তুগিজ—তাঁকে উপদেশ দিচ্ছে তিনি যেন সঙ্গে টাকাকড়ি না রাখেন, কারণ জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। (ট্যাভারনিয়ার, জন্ ব্যাপটিস্ট, ১৯৮৪)।

অন্যান্য বিদেশি পর্যটকের মতো ম্যানরিকেরও বাঙালিদের সম্পর্কে প্রশংসা করার কিছু ছিল না। বাঙালিদের তাঁর মনে হয়েছে অলস, ভীরু, স্বার্থপর, সংকীর্ণ, প্রভু হবার চেয়ে চাকর হবার ব্যাপারে বেশি উপযুক্ত, সহজেই বশ মানে এবং ক্রীতদাস হতে রাজি হয়। তিনি পরামর্শ দেন বাঙালিদের সঙ্গে যত রূঢ় ও খারাপ ব্যবহার হয় ততই ভালো, কারণ তাতেই তারা ঠিক থাকে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য তিনি বাংলার একটা প্রবাদ বাক্যকেও ব্যবহার করেন। সেটা হল : "মারে ঠাকুর, না মারে কুকুর।" অর্থাৎ, "যে মারতে পারে সে প্রভু। আর যে পারে না সে কুকুর।" স্থানীয় আদিবাসীদের সম্পর্কে তার মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কখনও কখনও ডাকাত ঘোষণা করে তাকে ও তার সঙ্গীদের জেলে পোরা হয়েছে, আবার কখনও এই রকম হয়েছে যে, গরু ও শুয়োর সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সত্ত্বেও তাদের অপবাধ লঘু চোখে দেখা হয়েছে।

বাউরি আর এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেন, "বাংলার সব বণিক চোর"। এবং তিনি বলেন, যদি কাউকে তিনি অপমান করতে চান তবে তাকে বাঙালি বলে ডাকেন। এই লোকগুলো বিশ্বাসঘাতক আর খুব চালাক।" অন্য এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন, "বেশিরভাগ বাঙালিই ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ ও সুন্দর। অন্য যে কোনও জাতির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।" অপর দিকে ট্যাভারনিয়ারের মতোই ফিচ্ মন্তব্য করেন, "বাঙালিরা ইহুদিদের চেয়েও খারাপ। এদের চাতুরীর সঙ্গে ইহুদিরাও পারবে না।" বাউরির মত হল, বাঙালিরা খুব অর্থলোভী। যেভাবেই হোক টাকা রোজগার করবে। বার্নিয়ারকে অবশ্য মুগ্ধ করেছিল বাঙালি মেয়েদের সৌন্দর্য ও কোমলতা। (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭)।

ক্যাম্পোস বলেন যে, মতামতকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রশংসামূলক, কিন্তু আদপে তা নয়। তিনি বলেন, "স্থানীয় অমুসলমানরা হল শান্তিপ্রিয়, নিরীহ ও হাসিখুশি।" তাঁর একটা মন্তব্য : "বাংলার মানুষ বিদেশি শাসনকে সহজেই মেনে নেন।" এই সঙ্গে তিনি এটাও বলেন, "যদি ঠিক মতো সুযোগ পায়, বাংলার মানুষ ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের তাড়াতে পিছপা হবে না।" তাঁর মতে এরকম ঘটেছিল যখন গন্‌জালভেসের নেতৃত্বে পোর্তুগিজরা চট্টগ্রামের কাছে সন্দীপ দ্বীপটি দখল করেছিল। (ক্যাম্পোস, জে. জে. এ, ১৯১৯)।

দ্য ব্যারোস, আর একজন বিখ্যাত পর্যটক, মন্তব্য করেন, "বাংলার নিজস্ব অধিবাসীরা হল প্রায় সবাই হিন্দু। এরা যুদ্ধ করতে ভয় পায়। কিন্তু অন্যভাবে এত

বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসঘাতক যে, গোটা পূর্ব ভারতে এদের জুড়ি মেলা ভার। ফলে কারোকে যদি অপমান করতে চাও তবে তাকে শুধু বলো, তুই একটা বাঙালি।" অন্যদিকে কামপোস, যিনি পোর্তুগিজ ও ইউরোপীয়দের ছ-শো বছর ধরে শাসন করার জন্য মুসলমানদের ঘৃণা করতেন, বলেন মুসলমানরাই বেশি বিশ্বাসঘাতক। তাঁর মতে, বারবোসা হিন্দুদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সেটা আসলে মুসলমানদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। (ক্যাম্পোস, জে. জে. এ, ১৯১৯)।

অদ্ভুত প্রথা

প্রচলিত নানা সব প্রথার মধ্যে ট্যাভারনিয়ারের চোখে পড়েছিল সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ প্রথা (বেনিয়ারা যে নীচু জাতের লোক সেটা দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন, চড়কপুজো, যেটায় ভক্তেরা নিজের শরীর কেটে ক্ষত সৃষ্টি করত। এসবই ট্যাভেরনিয়ারের কাছে লোকক্ষয়ের লক্ষণ বলে মনে হয়েছিল। (ট্যাভেরনিয়ার, জন ব্যাপটিস্ট, ১৯৮৪) ফিচ্ একজন ভণ্ড সাধুকে দেখেছিলেন। লোকটা চোখ বুজে একটা ঘোড়ার উপর বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, অথচ সবাই ওকে ভক্তি করত। তাঁর ভাষায়, "সবাই ওকে মহাত্মা ভাবে, কিন্তু লোকটা একটা অকর্মা পরজীবী ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি যতক্ষণ ছিলাম সে ওরকম ঘুমিয়েই থাকল। এদেশের মানুষ এরকম ভণ্ড প্রতারকদের প্রতি প্রায়ই আকৃষ্ট হয়।" (ফস্টার, উইলিয়াম [সম্পাদিত], ১৯২১)।

এরপর ফিচ্ মন্তব্য করেন, "স্থানীয় পুরোহিতরা অনেক পুজোআচ্চার মধ্যে দিয়ে গলায় একটা সুতো ঝোলায়, তারপর দুহাত দিয়ে টেনে টেনে প্রচুর জল দিয়ে ওটা ধুতে থাকে। শীত গ্রীষ্ম যাই হোক ঠাণ্ডা বা গরম জল ঢেলে ঢেলে ওরা নিজেদের গা ধোবে। এই ভদ্র লোকেরা মাছ-মাংস খায় না, প্রাণী হত্যা করে না। তারা ভাত, মাখন, দুধ ও ফলমূল খেয়ে প্রাণ ধারণ করে।" ফিচ্ লক্ষ করেন এখানে বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ খুবই ঘটে। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় ১০ বছর বা তার আগেই। পুরুষরা সাত জন করে বউ রাখতে পারে। তিনি আর লক্ষ করেন পরস্পরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য লোকেরা হাত দুটো কপালে তোলে, আর "রাম রাম" উচ্চারণ করে। অবশ্য এরকম প্রথা যে মূলত অবাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত, এটা হয়তো ফিচের নজর এড়িয়ে যায়। (ফস্টার, উইলিয়াম [সম্পাদিত], ১৯২১)।

ম্যানরিক, স্থানীয় ধর্ম সম্পর্কে যার জ্ঞান দুর্বল ছিল, মন্তব্য করেন দেবী দুর্গা হলেন "অস্বীকৃত দেবতাদের গণিকা।" (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭)।

বাউরি উল্লেখ করেন, "দেবতা পুজা করার অদ্ভুত সব রীতি বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত।" তাঁর চোখে পড়ে "জঘন্য আকৃতির" দেবদেবীর মূর্তি, যা চড়ক উৎসব তিনি দেখেন। আরও লক্ষ করেন যে গঙ্গায় ডুবে মরাকে এখানকার লোকেরা খুব পুণ্যকর্ম বলে মনে করে। বিদেশে যাবার সময় এখানকার লোকেরা বাড়ির মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য হিজড়েদের নিয়োগ করে। তিনি দুটো সতীদাহ অনুষ্ঠান দেখেছিলেন। একটায় বিধবাটি চিতায় উঠতে রাজি হয় না, চিৎকার করে পালাবার চেষ্টা করে। অন্যটায় বিধবাটি বেশ সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু, চিতায় ওঠার আগের মুহূর্তে একজন পুরোহিতকেও আগুনের ভেতর টেনে নেয়। (বাউরি, টমাস, ১৯০৫)।

বেশভূষা ও অলংকার

ম্যানরিক লক্ষ করেন যে, এখানকার লোকদের দেহ সুঠাম ও শ্যামবর্ণ। কিন্তু গায়ে জামাকাপড় খুব কম। অথচ বাংলায় উন্নতমানের বস্ত্র তৈরি হয়। লোকেরা গায়ে জড়িয়ে সেলাইহীন কাপড় পরে। কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। এছাড়া পায়ে কেউ জুতো পরে না। যারা একটু বড়লোক শুধু তারাই মাথায় পাগড়ি পরে, বা কাঁধে একটা বাড়তি কাপড় ঝোলায়। উৎসবের দিনে তারা অবশ্য খুব নকশা করা রঙিন পোশাক পরে। ধনীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণিই মঙ্গোলদের মতো করে সাজে। মেয়েরা কাপড় দিয়ে গোটা শরীর ঢেকে রাখে। হাতে পরে বাহুবন্ধ আর কানে ও নাকে দুল। (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭)।

ফিচের ভাষায়, "লোকেরা নগ্নই থাকে, শুধু কোমর থেকে ঝুলতে থাকা এক টুকরো কাপড় ছাড়া এমনকী, বাংলার রাজধানী তাণ্ডায়। সময়টা আকবরের শাসনকাল এবং যেখানে নাকি কাপড়ের এক বড় ব্যবসাবাণিজ্য হয়, লোকেরা প্রায় নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, শুধু কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়ানো।" পূর্ববাংলার বরিশালে তিনি দেখতে পান মজবুত বাড়িঘর, চওড়া রাস্তা, ধানভর্তি গোলা, তুলো ও রেশম। মেয়েরা পরে আছে গলায়, হাতে ও পায়ে রুপোর অলঙ্কার, আঙুলে হাতির দাঁতের আংটি। কিন্তু পুরুষেরা সেখানেও প্রায় নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোমরে শুধু এক টুকরো কাপড়। বাকি গা খালি। (ফস্টার, উইলিয়াম [সম্পাদিত], ১৯২১)।

বাড়িঘর

ম্যানরিক লেখেন বাঙালিরা নিচু ছাদের কুঁড়েঘরে থাকে। দেওয়াল ও মেঝে কাদামাটির, গোবর দিয়ে নিকানো। ঘরে আসবাব বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। শুধু একটা মাদুর বা কাঁথা। আর ভাত ও ঝোল রান্নার জন্য কয়েকটা বাসনপত্র। তারা নুন দিয়ে ভাত খায়। সঙ্গে হয়তো সামান্য শাক। যারা একটু অবস্থাপন্ন শুধু তারাই একটু দুধ বা ঘি, মাছ বা মাংস এবং একটু মিষ্টি খায়।

শহরের বাড়িঘরের অবস্থা কোনও পর্যটকেরই ভালো লাগেনি। তারা লক্ষ করেছিলেন পদস্থ রাজকর্মচারীরাও সাধারণ বাড়িতে থাকে। বেশিরভাগ বাড়িই কাদামাটি ও খড়ের তৈরি। কিছু বাড়ি হয়তো কাঠের। পাথরের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ইটের বাড়িও তেমন নেই। রাজপ্রাসাদ বা অট্টালিকা কোথাও চোখে পড়ে না। এমনকী, সুবেদাররাও থাকে তাঁবুতে। শায়েস্তা খাঁ থাকতেন কাঠের প্রাসাদে, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও বাঁশ ও কাঠের বাড়িতে। (ম্যানরিক, ফ্রে সোবাস্টিয়ান, ১৯২৭)।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

বার্নিয়ার ও ম্যানরিক দুজনেই লক্ষ করেন বাংলায় শাসক ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা আছে। বার্নিয়ারের মতে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলায় আছে এখানকার প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হয়ে। শুধু হুগলিতেই আট থেকে ন-হাজার থাকত। আর সারা বাংলায় তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের মতো। জেসুইট্‌ ও অগাস্টানরা বড় বড় গির্জা নির্মাণ করেছিল এবং নিজেদের ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল।

ম্যানরিক স্বীকার করেন স্থানীয় প্রশাসক ভিনদেশি ধর্মমত প্রচার করার ব্যাপারে উদার অনুমতি দিয়েছে। একটু আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একবার তাঁর দলবল গো-মাংস ও শুয়োরের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের অপরাধকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমার চোখে দেখা হয়। (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯)।

বারবোসা অবশ্য লক্ষ করেছেন রাজ-অনুগ্রহ পাবার লোভে লোকেরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। স্থানীয় লোকেরা শাসকদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য প্রায় রোজই ধর্মান্তরিত হয়ে চলেছে। (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮)। ইবন বতুতা উল্লেখ করেন জালাল-আদ-উদ্দিন নামক এক শেখ সম্পর্কে, যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় শ্রীহট্টে (যদিও তিনি বলেন কামরূপ ও আসামে)। হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে এই ব্যক্তি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। "এই লোকটার চেষ্টাতেই এখানকার পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেরা মুসলমান হয়ে যায়। তারপর সে নিজেও তাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করে।" ব্যক্তিটি ইবন বতুতাকে ছাগলের চামড়ায় করা তার জোব্বাটা উপহার দেয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে জোব্বাটা একদিন একজন বিশ্বাসঘাতক সুলতানের হস্তগত হবে, তাই ঘটল। ইবন বতুতা বলেছেন পিকিং-এ একজন সুলতান ওটা কেড়ে নিয়েছিল। (বতুতা, ইবন, ১৯২৯)।

বাণিজ্য

মা-হুয়ানের বিবরণে পাওয়া যায় ধনী জাহাজ নির্মাতা ও বণিকদের কথা, যারা দূর-দূরান্তে গিয়ে বাণিজ্য করত। আর পাওয়া যায় সেই সব অসংখ্য মানুষদের কথাও, যারা বিদেশে গিয়ে চাকর হিসেবে খাটত। তিনি দেখেন এখানকার অধিবাসীরা তুঁতগাছ লাগায়, চাষ করে রেশমের গুটিপোকা এবং মোটা ও মিহি রেশম বোনে। বানায় ফুলতোলা রেশমের রুমাল। কিন্তু রেশমের সুতো তৈরি করার কৌশলটা ওদের ঠিক জানা ছিল না। এছাড়া তারা বেচে বার্নিশ করা নানারকম জিনিস, বা কড়াই, বাটি, ইস্পাত, বর্শা, ছুরি ও কাঁচি। হরিণের চামড়ার মতো মসৃণ ও চকচকে গাছের ছাল থেকে বানানো এক ধরনের কাগজও তারা বেচে।

বাংলায় আসা গোড়ার দিককার ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে বারবোসা প্রশংসা করেন এখানকার বন্দরগুলোয় জাহাজের মসৃণ চলাচল ব্যবস্থাকে। "মুরেরা থাকে বন্দরগুলোয়, যেখানে দিনরাত নানারকম মালের ওঠানামা হচ্ছে এবং ছোটবড় নানা জাহাজ দেশ-বিদেশে যাতায়াত করছে।" (মা হুয়ান ইং-ইয়াই-শেং-লান, ১৯৭০)

বারবোসার বিবরণে উল্লেখ আছে সেই সব বিদেশি বণিকদের কথাও, যারা এখানকার বন্দরে আসত আরব বা পারস্য থেকে। এবং আছে চীন, মালাক্কা, সুমাত্রা, পেগু, শ্রীলঙ্কা, কাম্বে (যা আসলে গুজরাট), মালাবার ও করমণ্ডলের সঙ্গে হওয়া ব্যবসাবাণিজ্যের কথা। যেসব জিনিসের কেনাবেচা হত তাদের মধ্যে প্রধান তুলো, চিনি, আদা ও গোলমরিচ। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু, পাতিলেবু ও অন্যান্য ফল। তবে চিনি ও তুলোর ব্যবসাই সবচেয়ে বড় ছিল। তিনি বলেন, "বাংলার শহরে নানা জাতের খুব মসৃণ ও রঙিন পোশাক তৈরি হয়। এগুলো তারা নিজেরা ব্যবহার করে।

আর সাদা কাপড়গুলো বিদেশে রপ্তানি করে। এই কাপড়গুলো খুব দামি। এছাড়া তারা তৈরি করে খুব পাতলা একরকম কাপড়, যা মাথায় বাঁধতে মেয়েরাও খুব পছন্দ করে এবং পাগড়ি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ওটা পছন্দ করে মুর, আরব ও পার্সিরা।"

শহরের আশপাশে তিনি প্রচুর কার্পাসের ক্ষেত দেখেন আর জায়গায় জায়গায় আখের ক্ষেত। তাঁর মতে, "নৌকো করে অঢেল চিনির বস্তা নানা দেশে চলে যায় বিক্রির জন্য। ওটাই প্রধান রপ্তানির সামগ্রী।" চিনি প্রধানত যায় মালাবার ও কাম্বোয়। সেখানে ভালো দাম পাওয়া যায়। ফলে বণিকরা প্রচুর উপার্জন করে। কিন্তু চিনি তৈরি করার পদ্ধতি বারবোসার পছন্দ হয়নি। "এখানকার আখ দিয়ে চমৎকার সাদা চিনি তৈরি হতে পারে। কিন্তু এরা জানে না কি করে চিনির বাঁট তৈরি করতে হয়। ফলে এরা চিনিকে পিষে কাঁচা চামড়ার থলেয় ঢুকিয়ে মুখ সেলাই করে দেয়।"

তখন সামুদ্রিক বাণিজ্য মূলত আরব বণিকরাই নিয়ন্ত্রণ করত। ওদের কেউ কেউ ক্রীতদাসের ব্যবসাও চালাত। "আরব বণিকরা বাংলায় এসে গ্রামের ভেতর ঢুকে বালকদের কিনে নিত তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে। কিনত অন্য লোকেদের কাছ থেকেও, যারা এই বালকদের চুরি করে নিয়ে আসত এবং খোজা করে দিত। ছেলেগুলো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকত, কেউ কেউ মারাও যেত। যারা বেঁচে থাকত তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে ভালো দামে বিক্রি করা হত। আরবরা তাদের নিজের দেশে নিয়ে যেত মেয়েদের পাহারা দেওয়ার জন্য বা জমিজমা ও অন্যান্য কাজ দেখাশোনা করার জন্য। সৎ চরিত্রের জন্য এই খোজাদের তারা খুব প্রশংসা করত। এদের কাউকে কাউকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারও তারা দান করত। কেউ কেউ মুর রাজাদের অধীনে শাসকের পদ পর্যন্ত লাভ করত এবং কালক্রমে প্রচুর ধন ও ভূসম্পত্তির মালিক হত।" (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮)

বেশিরভাগ বিবরণেই বাংলার রপ্তানির সামগ্রী হিসেবে চাল, চিনি, ও তুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বার্নিয়ার পুনরুক্তি করেন, "বাংলায় এত পরিমাণে তুলো ও রেশম পাওয়া যায় যে বলা যেতে পারে যে গোটা বাংলাই ওই দুটো বস্তুর একটা গুদাম। শুধু হিন্দুস্থান বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, ওটা যেন আশপাশের অন্যান্য দেশ, এমনকী, ইউরোপেরও গুদাম। নানারকম বস্ত্র এখানে পাওয়া যায়। ওগুলো কিনে নিয়ে যায় ব্রিটিশ, ডাচ, পোর্তুগিজ। কাবুল ও লাহোরেও যায়। যায় জাপান ও ইউরোপে। এখানকার রেশমের পোশাক অবশ্য পারস্য, সিরিয়া, সৌদি বা বেইরুটের রেশমের মতো মসৃণ নয়। কিন্তু ওদের চেয়ে দামে অনেক সস্তা।"

বার্নিয়ারের মতে, রেশমের কাপড় তৈরি করার ব্যাপারে এখানকার কারিগরেরা যদি আরও একটু যত্নবান হত তবে অনেক লাভ করতে পারতো। "ঠিকমতো বেছে নিলে ও বুনলে ওই রেশম দিয়ে চমৎকার সব কাপড় তৈরি করা যেত।" তিনি উল্লেখ করেছেন কাশিমবাজারে অবস্থিত ডাচদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে সাত-আটশো স্থানীয় লোক কাজ করে। তাঁর মতে পাটনায় উৎপাদিত সোরাও একটা বড় রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য। এছাড়া আছে লাক্ষা, আফিং, মোম, গন্ধগোকুলের সুগন্ধী, গোলমরিচ, ঔষধ ও ঘি। বাণিজ্যের ওপর আর্কানিজ বা পোর্তুগিজদের জলদস্যুতার খারাপ প্রভাব সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন। (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯)

সিজার ফ্রেডারিক তখনকার বাংলার প্রধান বন্দরগুলো পরিদর্শন করেন। যেমন, সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের বন্দর। সপ্তগ্রাম থেকে প্রতি বছর তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশটি জাহাজ চাল, চিনি, লাক্ষা ও গোলমরিচ বোঝাই করে যাত্রা করত। ফ্রেডারিকের বিবরণে পাওয়া যায় চাল, চিনি ও নানারকম বস্ত্রের বিপুল বাণিজ্য চট্টগ্রাম ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে প্রচলিত ছিল। (ফ্রেডারিক, মেজর, ১৫৮৮)

ট্যাভারনিয়ার লিখেছেন এখানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত সোরা, যা কিনত ডাচেরা। আর বিক্রি হত কাশিমবাজারের হলদেটে রেশম, যাকে একধরনের গাছের ছাল পুড়িয়ে সেই ছাই ঘষে সাদা করা হত। ওটা বিক্রি হত গুজরাটে, কার্পেট তৈরি করার জন্য। কাশিমবাজার থেকে বছরে প্রায় বাইশ হাজার গাঁট রেশম বিক্রি হত। প্রতিটি গাঁটের ওজন একশো পাউন্ড। এর মধ্যে মাত্র হাজার গাঁট কিনত ডাচেরা, সাত হাজার মোগল সম্রাট। আর অবশিষ্ট রপ্তানি হত সুরাট ও আমেদাবাদে। বাংলা থেকে অন্য যে বস্ত্র রপ্তানি হত তাদের মধ্যে ট্যাভারনিয়ার উল্লেখ করেছেন সাদা সুতির বস্ত্র, তুলোর পাকানো সুতো আর নীলের কথা। (ট্যাভারনিয়ার, জন ব্যাপটিস্ট, ১৯৮৪)।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাল্ফ ফিচ্ মন্তব্য করেছেন, "সোনারগাঁও একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, যেখানে সারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভালো ও মিহি কাপড় তৈরি হয়। সেই সঙ্গে প্রচুর চালও। এই চাল খাদ্যের জোগান দেয় সারা ভারতবর্ষে এবং সিংহল, পেরু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য দেশে"। তিনি উল্লেখ করেছেন তুলো, চিনি এবং আফিং-এর একটা ভালো বাজার হল পাটনা। গ্রামবাংলায় কেমন বাজার-হাট বসে সে সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন, "রোজই কোনও না কোনও জায়গায় বাজার বসে।" ২৪ দাঁড়ের নৌকো মাল নিয়ে নানা জায়গায় জিনিস কেনাবেচা করে। সপ্তগ্রামের ব্যবসা তার মনে ছাপ ফেলেছিল। "আমি আগ্রা থেকে বাংলার সপ্তগ্রামে এলাম। সঙ্গে ১৮০টা নৌকোর পসরা। নৌকোয় আছে লবণ, আফিং, হিং, সিসে, কার্পেট এবং আর ও নানা সামগ্রী। যমুনা নদী বেয়ে আমরা সেখানে পৌঁছই। বণিকদের মধ্যে হল মুর ও অইহুদি সম্প্রদায়ের লোক। গৌড়ের রাজধানী তাণ্ডয় দেখলাম তুলো ও কাপড়ের বিপুল কেনাবেচা।" (ফস্টার, উইলিয়াম [সম্পাদিত] ১৯৪৪)

ভার্তেমা লিখেছেন বাংলায় সবচেয়ে ধনী বণিকরা বাস করে। তাঁর ভাষায়, "আমার দেখা সবচেয়ে ধনী বণিক এরা। তুলো ও রেশম ভর্তি করে প্রতি বছর ৫০টি জাহাজ এখান থেকে যায় তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব ও ইউথোপিয়ায়। এবং গোটা ভারতবর্ষে তো বটেই। এছাড়া এখানে অন্যান্য দেশ থেকে অলঙ্কারের বণিকরাও আসে। তবে তুলো ও রেশমের জিনিসপত্রেই—যা শুধু পুরুষরা তৈরি করে, মেয়েরা নয় - এখানকার প্রধান বাণিজ্য-সামগ্রী। এছাড়াও বাংলায় পাওয়া যায় অঢেল চিনি ও আদা।" (ভার্তেমা, লুডোভিকো ডি, ১৮৬৩)

ম্যানরিক লিখেছেন, শঙ্খ বাংলার একটি প্রধান বাণিজ্যের জিনিস। এছাড়া আছে মালদ্বীপের কড়ি, মালাবারের গোলমরিচ, সিংহলের দারুচিনি। চীন থেকে কেনা হত পোর্সেলিন, মুক্তো, রত্ন, লেখার ডেস্ক, টেবিল এবং পালঙ্ক। মালাক্কা থেকে আমদানি হত জায়ফল ও ধাতুর রাজদণ্ড আর বোর্নিও থেকে কর্পূর। মেদিনীপুরের ফুলের নির্যাস থেকে সুগন্ধী তেল ও অন্যান্য সুরভিত দ্রব্যের তিনি প্রশংসা করেন। এদেশে প্রচুর

বণিকের সমাগমও লক্ষ করেন এবং মন্তব্য করেন বাংলার বন্দরে প্রতি বছর অন্তত একশো জাহাজ চাল, চিনি, তেল, মোম ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে বিদেশ পাড়ি দেয়। বস্ত্রের ক্ষেত্রেও ম্যানরিক মন্তব্য করেন এত নরম ও নিখুঁত বস্ত্র আর কোথাও তিনি দেখেননি। "এখানে সবচেয়ে মিহি মসলিন উৎপন্ন হয়। ৫০-৬০ গজ লম্বা ৭-৮ হাত চওড়া। পাড়ে সোনা, রুপো বা রঙিন রেশম। এই মসলিন এতই পাতলা যে বণিকরা ওগুলো ফাঁপা বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, তারপর নিশ্চিন্ত মনে কোরাজান, পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে নিয়ে যায়।" তিনি উল্লেখ করেন পোস্ত সম্পর্কেও, যা বিদেশিরা কিনত যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭)

টোম পিরেস বলেন, "বাঙালিরা মস্ত বড় বণিক, ওরা স্বাধীনচেতা, ছোটবেলা থেকেই ব্যবসায় হাত পাকায়, তবে একটু ঘরকুনো।" এরপর তিনি বলেন, "বাঙালিরা খুব বিত্তশালী বণিক, দলবেঁধে সমুদ্র যাত্রা করে। বাংলায় প্রচুর সংখ্যায় রুমি, তুর্কি, আরব এবং চোল ও দাভোল ও গোয়া থেকে আসা বণিক বাস করে।" (পিরেস টোম, ১৯৪৪)

টোম পিরেশ মন্তব্য করেন, "বছরে একবার বা দুবার বাঙালি বণিকের একটা বড় অংশ মালাক্কায় যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় সাত রকম মসৃণ সাদা কাপড়, তিন রকম চাদর, নানারকম রঙিন কাপড় এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। আর বিনিময়ে নিয়ে আসে প্রায় কুড়ি রকম দ্রব্য। যেমন, ইস্পাত, পালঙ্কের উপর টাঙানো সামিয়ানা, খুব সুন্দর ছিট, দেওয়ালে ঝোলানো গৃহসজ্জাব কাপড়। এছাড়া আদা, কমলালেবু, গাজর, আঙুর, লেবু, মোরোব্বা, ডুমুর, কুমড়ো, লাউ ও অন্যান্য ফল। এসবের কিছু কিছু ভিনিগারে চোবানো। তারা নিয়ে আসে তীব্র গন্ধ মাখানো মাটির ফুলদানী, যা ওই অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ও সস্তা। মালাক্কা থেকে আর যা আনা হয় তা হল লবঙ্গ, চন্দনকাঠ, রেশম, মুক্তো, সাদা পোর্সেলিন, তামা, টিন, সিসে, রুপো, পশমের জামা-কাপড় ও কার্পেট। তাঁর বিবরণে বিনিময়মূল্য হিসেবে বড় বড় কড়ির ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে। তিনি অবশ্য অভিযোগ করেন, "সরকারি কর্মচারীরা তিরিশ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছিল।" (পিরেস, টোম, ১৯৪৪)

বাংলায় যাঁরা আসেননি সেই সব পর্যটকদের মতামত

ভেনিসের বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন এবং ৬৯ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ইতালি থেকে চীন এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় ভ্রমণ করেছিলেন, বাংলায় তিনি কখনও আসেননি। কিন্তু পূর্ববিহার ও বার্মায় গিয়েছিলেন। সেসব দেশেই তিনি বাংলার নাম শুনে থাকবেন। বাংলা সম্পর্ক তাঁর লেখায় তখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ আছে, এখানকার সাধারণ মানুষের কথা নয়। তাঁর ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল যে, বাংলা ও বার্মাকে একই রাজা শাসন করেন। তাঁর মতে, এই রাজার প্রচুর সৈনিক ও যুদ্ধাস্ত্র আছে। প্রায় দু-হাজার বিশালাকার হাতি আছে, যাদের প্রতিটির পিঠে একটা করে কাঠের দুর্গ। দুর্গগুলো মজবুত ও কাজের, যার মধ্যে সব সময় বাস করে ১২ থেকে ১৬ জন সশস্ত্র সৈনিক। এছাড়া তাঁর আছে ৬০ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য। সংক্ষেপে, এই রাজার ভালো সৈন্যবল আছে। এরকম শক্তি নিয়ে তিনি যা খুশি করতে পারেন। মার্কো পোলো সম্ভবত পেগু সম্পর্কে

বলতে গিয়ে ভুল করে বাংলা সম্পর্কে বলেছেন। এটাও অবশ্য ঠিক যে, পেগুর রাজা নিজেকে বাংলারও রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

মার্কো পোলো আরও মন্তব্য করেছেন, বাংলার লোকেরা শুধু অদ্ভুত ভাষায় কথাই বলে না, বা, এখানে প্রচুর হিজড়ে বাস করে বা দাস ব্যবসা চালানো হয়, শুধু তাই নয়, এই "জঘন্য পৌত্তলিকেরা" তুলো উৎপাদন করে এতই যে ওটার ব্যবসা করে প্রচুর রোজগার করে। তিনি লিখেছেন, "পূর্ববিহারের চম্পা নামক জায়গায় প্রতিটি তরুণীকেই বিয়ে দেবার আগে প্রথমে রাজার কাছে উৎসর্গ করা বাধ্যতামূলক।" (পোলো, মার্কো, ১৯৯৩)

ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটে পৌঁছন ১৪৯৮ সালের ২০শে মে এবং ভাবেন এটা খ্রিস্টানদের শহর। তিনি ভাবতেন বাংলায় থাকে শুধু মুর ও খ্রিস্টানরা। এখানে ২৫ হাজার সৈন্য আছে। এর মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী, অবশিষ্ট সৈন্য পদাতিক। এ ছাড়া আছে ৪০০ যুদ্ধ হাতি। তিনি শুনেছিলেন বাংলায় প্রচুর শস্য ও উন্নতমানের তুলো উৎপন্ন হয়। বাংলায় যে কাপড় ১০ ক্রুজাডোয় কেনা হয়, সেটা কালিকটে বিক্রি হয় ৪০ ক্রুজাডোয়। বাংলায় প্রচুর রুপোও পাওয়া যায় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

পোর্তুগিজ ঐতিহাসিক সৌফিয়ার ছিল বাঙালি সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা। "এরা ধর্মহীন কাপুরুষ, এরা বিশ্বাসঘাতকও। এখানে এলে গোটা জগতের মনে হবে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা হাত ধরে হাঁটে।" তিনি আরও বলেন, "এখানে গত ৪০ বছরে তেরোজন রাজা পাল্টানো হয়েছে। মার্টিন আলফানসো পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাংলার রাজাকে সাহায্য করেন। এই রাজার ১০ হাজার রক্ষিতা আছে। মার্টিন আলফানসো বাংলার রাজার কাছে কিছু উপহার সামগ্রী ও লোক পাঠান। রাজা ওদের সন্দেহ করে কয়েকজনকে হত্যা করলেন। পরে রাজার কাছে নটা জাহাজে করে ৩৫০ জন লোককে পাঠানো হয়, যাতে তিনি বাকি বন্দিদের ফেরত দেন সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে চিঠির জবাব আসতে দেরি হওয়ার ভাবা হল তিনি এই লোকগুলোকেও হত্যা করেছেন। প্রতিশোধ হিসেবে চট্টগ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।" এই ঐতিহাসিক অবশ্য বাংলার তুলোর খুব প্রশংসা করেন। "এখানে অঢেল তুলো উৎপন্ন হয়। এখানকার তোশক অসাধারণ।" (রাভেনস্টিন, এস জি [অনুবাদ ও সম্পাদনা] ১৪৯৭-৯৯)

টমাস ফোরিয়াট ভারত ভ্রমণ করেন ১৬১২ থেকে ১৬১৭ সালের মধ্যে। আজমীর ও আলপোয় ভ্রমণ করার সময় তিনি বাংলার কথা শোনেন। সেখানে তিনি কিছু অদ্ভুত জন্তু দেখেন। ওগুলো আসলে গণ্ডার। "ওগুলো বাংলা থেকে আনা হয়েছে। দেশটা খুবই উর্বর এবং তাঁর শাসনাধীন এলাকার মধ্যেই পরে। এখান থেকে প্রায় চার মাসের রাস্তা। বিখ্যাত নদী গঙ্গার নানা শাখাপ্রশাখার পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়।

আর একজন ইংরেজ পর্যটক এডওয়ার্ড টেরি ১৬১৬ সালে ভারতবর্ষে এসে তিন বছর ছিলেন। তিনি শোনেন বাংলার প্রধান শহরের নাম গৌড় এবং সেখানে প্রচুর পাহাড়পর্বত আছে। আর শোনেন সরস্বতী নামক নদী যা গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে—এখানেই তার উৎপত্তি। এই ভ্রান্ত তথ্যের পর তিনি একটা তথ্য দেন যা সম্ভবত অভ্রান্ত : "বাংলা একটা খুবই বিস্তীর্ণ ও উর্বর ভূখণ্ড।" (ফস্টার, উইলিয়াম [সম্পাদিত], ১৯২১)।

উপসংহার

বাংলার নানা দিক সম্পর্কে পৃথিবীর কিছু খ্যাতনামা পর্যটকের করা এই সব পর্যবেক্ষণের ঠিক কেমন সারসংক্ষেপ করা উচিত? এটা পরিষ্কার যে, তাঁদের মতামত পরস্পরবিরোধী, এমনকী বিভ্রান্তিকর। আবার এটাও সত্যি যে, কিছু কিছু জায়গায় তাঁদের মতামত প্রায় একই রকম, নানা কাল ও নানা দেশজাত দৃষ্টিকোণের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও। যে মতৈক্যে প্রায় সবাই পৌঁছেছেন সেটা হল, বাংলায় নানা জাতের প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়, আর জিনিসপত্রের দাম সস্তা।

এটা ঠিক যে সবাই মূলত বাংলার শহরাঞ্চলেই ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁদের এই মত শহরাঞ্চলের খাদ্যের প্রাচুর্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। বাংলার গ্রাম সম্পর্কে তাঁদের আলোচনায় বিশেষ কিছু জানা যায় না, যদিও পরোক্ষভাবে এটা বোঝা যায় যে, বাংলার গ্রামে প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস উৎপাদিত হত। শহরে তো সেটাই আসত, গ্রামের চাহিদা মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকত। মোটের ওপর এটা ঠিক যে জোব করে অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে বঞ্চিত করে এই উদ্বৃত্ত তৈরি করা হত না। কারণ, এ রকম করা হলে নানা শহরে নিয়মিত খাদ্যবস্তুর জোগান রাখা এবং তাও বছরের পর বছর ধরে—এটা সম্ভব হত না। মনে রাখতে হবে, ইবন বতুতা থেকে ফিচ—এই দুই পর্যটকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তিন শতাব্দীর এবং বাংলার খাদ্য প্রাচুর্যের কথা দুজনেই বলে গিয়েছেন।

বাংলার জলবায়ু ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শস্যের এরকম প্রাচুর্যের ছবি মানানসই। এখানে প্রচুর উর্বর জমি, প্রচুর বৃষ্টি, জমি ও মানুষের অনুপাত মোটামুটি অনুকূল, আর দুই-তৃতীয়াংশের জমি গভীর অরণ্যে ঢাকা। বন্যার জলোচ্ছ্বাস এখানকার জনপদ ধ্বংস করত না, বরং সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত মাঠের পর মাঠ। তারপর রাস্তাঘাট বা রেলপথ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে আস্তে আস্তে জল নেমে যেত। ততদিনে মাটিতে জমা হয়েছে গাঢ় পলি। মাথাপিছু জমির ভাগ ভালো হওয়ায় গ্রাম ও শহরের ক্ষমতাবানরা সাধারণ মানুষের ওপর বিশেষ শোষণ চালাতে পারত না। স্বেচ্ছাচারী শাসকেরা অত্যাচার চালালে গ্রামের মানুষ তাদের বলিষ্ঠ পা-জোড়া দিয়ে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারত। অর্থাৎ পালিয়ে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে নতুন জনপদ তৈরি করত। নদীনালার জটিল গতিপথ ও দুর্গম অরণ্যের জন্য এখানে কোনও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা দুঃসাধ্য ছিল। ফলে ছোট ছোট নৃপতির অধীনে জায়গীরদার হয়ে চাষবাস করার প্রথা গড়ে ওঠে। রাজার প্রতি যে আনুগত্য থাকত তা নামমাত্রই।

অবশ্য এই সন্দেহও মনে আসে যে এই পর্যটকদের দেওয়া আর্থিক সমৃদ্ধির কথা হয়ত পুরোপুরি সত্যি নয়। প্রশংসার আতিশয্যে কোনও কোনও ঐতিহাসিক এরকম মন্তব্যও করেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য এরকম চমকপ্রদ মতের সমর্থনে তারা কোনও তুলনামূলক তথ্য দেননি। বরং সুশীল চৌধুরীর মত সত্যের বেশি 'কাছাকাছি'। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসন চালু হবার আগে বাংলার আর্থিক অবস্থা বেশি ভালো ছিল। অবশ্য

সুশীল চৌধুরীও নিজের মতের সমর্থনে কোনও তথ্য পেশ করেননি। অন্যদিকে একটা জোরালো নিবন্ধে আকবর আলি খান উল্টো কথাই বলেছেন। তাঁর মতে সোনার বাংলো একটা কল্পিত বস্তু ছাড়া কিছু নয়। তিনি বলেছেন বাংলা কখনওই ভূস্বর্গ ছিল না, ছিল একটা সাধারণ, প্রাক-শিল্প, সামন্ততান্ত্রিক দেশ মাত্র, যেখানে মানুষেরা ছিল গরিব, নোংরা, বুনো ও স্বল্পায়ু। এখানে জিনিসপত্রের দাম সস্তা; এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন জিনিসের দাম ঠিক করে মানুষের রোজগারের মাত্রা। কম দাম মানে কম রোজগারও। ইবন বতুতার সময়ে বাংলায় একজন ক্রীতদাস মেয়ের দাম ছিল মাত্র এক দিনার। ওই একই সময়ে দিল্লিতে তার দাম ছিল ১০০ দিনার আর তখন ইবন বতুতার বার্ষিক আয় ছিল ১৭০০ স্বর্ণ দিনার।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, বাংলায় জিনিসপত্রের সস্তা দাম আর্থিক সমৃদ্ধি নয়, আর্থিক দুর্গতিই চিহ্নিত করছে। ব্রিটিশ শাসনে সাধারণ মানুষের দুর্গতি আরও বাড়ে, কারণ বাংলার বড়লাটরা এখানকার মানুষদের শোষণ করে সম্পদ পাঠাত দিল্লিতে। এরকম জবরদখল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিচার করলে বলতে হয় এখানে জিনিসের দাম কম এ কারণে ছিল না যে এখানে প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হত। এই কারণে যে, এখানে লোকদের ক্রয় ক্ষমতা খুব দুর্বল ছিল। ১৬৪৯ থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যে শুধু চন্দননগরেই পাওয়া যায় অন্তত ১০০ বিক্রির দলিল, যেখানে সাধারণ মানুষ শুধু দুবেলা খাবারের প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের বিক্রি করছে। সম্মত হয়েছে দেহরক্ষী বা বাড়ির চাকর বা ক্রীতদাস হয়ে থাকার মতো অনার্থিক কাজ করতে। অবশ্য আলি খান এটা বিশ্লেষণ করেননি যে, ১৭৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে হওয়া ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের জন্য এদের মধ্যে কজন এসব করতে বাধ্য হয়েছিল।

উল্টোদিকে আকবর আলি খান যুক্তি দেন দুর্ভিক্ষ নামক ঘটনা বাংলায় বেশি ঘটেইনি, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হবার আগে। হাবিব দুটো দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন, যা ঘটেছিল ১৬৪২-৪৩ সালে, এবং যা মূলত ঢাকাতেই সীমিত ছিল। আর মার্শাল উল্লেখ করেছেন ১৭৫১-৫২ সালে মুর্শিদাবাদে হওয়া দুবার খাদ্য সংকটের কথা। ওটার কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় মারাঠীদের ক্রমাগত বাংলা আক্রমণ, যা এখানকার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ক্ষতি করেছিল। এগুলোর সঙ্গে আকবর আলি খান আরও তিনটি খাদ্য সংকটের ঘটনা যোগ করেন। এক, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে উৎকীর্ণ মহাস্থান শিলালিপির কথা, যাতে রাজা নির্দেশ দিচ্ছেন সরকারি শস্যাগার থেকে দুর্গতদের খাদ্য পাঠাতে। দুই, বৌদ্ধ পুস্তক মঞ্জুশ্রী—মূলাকল্পে লেখা আছে নবম শতাব্দীতে ঘটা একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কথা। তৃতীয় ঘটনাটা ঘটে ১৬৬১-৬৩ সালে যার উল্লেখ আছে ফতীয়া-ই-ইব্রাতে। সেই সময়ের সাহিত্যেও দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ এসেছে। খানের মতে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে বাংলায় বন্যাটাই বেশি ঘটত। এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় দুর্ভিক্ষ এখানে কম দেখা দিত।

বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে পর্যটকদের মন্তব্যগুলিতে একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। একদিকে এবিষয়ে সবাই একমত যে বাংলায় খুব উঁচু মানের কাপড় তৈরি হত। অন্যদিকে এটাও নজর এড়িয়ে যায় না যে, বাংলার মানুষেরা গায়ে খুব কম জামা-কাপড় জড়াত। দৈনন্দিন জীবনে ওরা খালি শরীরের নিম্নাঙ্গ কাপড়ে ঢাকত। ঊর্ধ্বাঙ্গ

মাঝে মাঝে ঢাকা হত উত্তরীয় বা উড়নি দিয়ে। নর্তকীরা পরত আঁটোসাঁটো পায়জামা। সৈনিক ছাড়া আর কেউ পায়ে জুতো পরত না। এই তথ্যগুলো যে সত্য সেটা বোঝা যায় সমকালীন বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা পড়লে।

যদিও বাংলা থেকে প্রচুর বস্ত্র রপ্তানি হত, তবু এই গবেষকদের লেখা থেকে এটা পরিষ্কার যে, বস্ত্রই তখন এখানকার প্রধান রপ্তানি সামগ্রী ছিল না। ওটা প্রধান রপ্তানি সামগ্রী হয় পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু পর্যন্ত। বস্ত্রের পাশাপাশি চাল ও চিনিও কম রপ্তানি হত না। তা ছাড়া মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় রপ্তানি হওয়া কাপড়গুলো সাধারণ মানের ছিল, কারণ উৎকৃষ্ট কাপড়গুলো এখানকার সম্ভ্রান্তদের পরার জন্য এদেশেই রাখা হত।

পর্যটকদের লেখা থেকে বোঝা যায় কাপড়ের ব্যবহারে ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবদের মধ্যে চরম অসাম্য ছিল, মান ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই। হিন্দুরা প্রধানত পছন্দ করত সেলাই না করা কাপড়, যদিও রাজসভা ও দপ্তরে যাওয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মুসলিমদের মতো করে পোশাক পরত। আর মুসলমানেরা, যারা সংখ্যায় সব সময়ই কম থাকত, দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল— : বাইরে থেকে আসা ধনী ও শাসক গোষ্ঠীর মুসলমান এবং গ্রামবাংলার জমি-চাষ-করা গরিব মুসলমান। এই দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমানদের জামাকাপড় হিন্দুদের মতোই ছিল।

এরকম স্বল্পবাস—পুরুষ ও নারী উভয়ই শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখত আর উত্তরীয় ও উড়নি পরত প্রধানত নর্তকীরাই—থাকার মূল কারণ অবশ্যই বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া। অন্যদিকে, শহরে আসা বিদেশিরা পরত তাদের নিজের নিজের দেশের পোশাক। যাহোক, বাংলার মানুষের গায়ে এত কম জামা-কাপড় থাকাটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। তেমনি এতেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না যে, বিদেশিরা বাঙালিদের এরকম স্বল্পবাসে দেখে অবাক হত বা তাদের অবজ্ঞা করত। বাঙালিদের পোশাক তাদের দারিদ্রের কথা যত না তুলে ধরত, তার থেকে বেশি তুলে ধরত জলবায়ুর উপযোগী পোশাক ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা। কিছুকাল আগে পর্যন্ত গ্রাম বাংলার ধনীরাও গায়ে খুব কম জামা-কাপড় তুলত, জুতোর ব্যবহারও বিশেষ ছিল না। ওটা পরত মূলত যোদ্ধারা।

বাংলার সংস্কৃতি বা আর্দ্র আবহাওয়া সম্পর্কে ওপরে যা বলা হল সেটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, বাংলার সমাজ—বিশেষ করে উত্তর আদিবাসী যুগ থেকে—নিদারুণ দারিদ্র ও অসাম্যের দ্বারা পিড়ীত ছিল। শহরেই এটা বেশি চোখে পড়ত। যদিও গ্রামও এ থেকে মুক্ত ছিল না। কিছু কিছু দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বন্যা বা খরার প্রকোপ নয়। লোকেরা এত গরিব থাকত যে তারা খাবার-দাবার কিনতেই পারত না।

এমনকী, ভালো করে খেতে পরতে পারলেও এটা বলা যায় না যে, বাঙালিরা সৌখিন বা অমিতব্যয়ী জাতি। ধনী ও গরিবদের ফারাকটা এখানে খুব বেশি নয়, কারণ চাহিদা উভয়েরই কম। পর্যটকদের লেখায় এরকম কোনও উল্লেখ নেই যাতে এই জনশ্রুতিকে সমর্থন করা যায় যে, বাংলার ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই ইউরোপীয়রা এই সমতল ভূখণ্ডে আসে এবং এটাকে দখল করে।

একটা ধন্দ মনে প্রায়ই জাগে। সেটা হল, এই পর্যটকদের প্রায় সবাই বাঙালিদের সম্পর্কে এরকম খারাপ ধারণা কেন পোষণ করত? ঐতিহাসিক তপনকুমার রায়চৌধুরীও লক্ষ্য করেছেন, বাঙালি সম্পর্কে কোনও পর্যটকই ভালো কিছু বলেননি। তাঁর মতে, "এটাকে নিছক বিদেশিদের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। হয়ত বাংলায় অনেকদিন ধরেই একটা অবক্ষয় চলছিল। হয়ত বাঙালির নৈতিক মান ও মূল্যবোধ খুবই ভেঙে পড়েছিল।" বিদেশিরা যে মনে করত বাঙালি অলস ও কাপুরুষ, পুরুষালি যোগ্যতা তাদের মধ্যে নেই, তার কারণ হয়ত এই যে, তারা লক্ষ করত বাঙালিরা বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। বাঙালির ইতিহাসে একের পর এক বিদেশি যোদ্ধা এসে বাংলা জয় করেছে। আরব থেকে আসা যোদ্ধাদের সাংঘাতিক প্রতাপ দেখেও বিদেশিরা বাঙালি সম্পর্কে ওরকম ধারণা করে থাকবে।

বাঙালির হীনবলের জন্য আর যা দায়ী, তা হল, এখানকার জলবাহিত রোগগুলো। কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগগুলো এখানকার মানুষদের প্রায়ই মেরে ফেলত বা তাদের রুগ্ন ও দুর্বল করে দিত। পর্যটকরা এই রোগগুলোর নাম ও লক্ষণ ঠিক জানত না। কিন্তু এটা তারা লক্ষ করত যে বাংলায় মৃত্যুর হার খুব বেশি। এখানকার স্যাঁতসেঁতে মাটি, প্যাচপ্যাচে আবহাওয়া বা পোকামাকড়দের সঙ্গে থাকতে থাকতে এক সময় বিদেশি আক্রমণকারীরাও দুর্বল হয়ে যেত এবং নতুন বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হত।

বাঙালিদের ধান্দাবাজ জাতি চিহ্নিত করার ব্যাপারে বলা যায় যে, পর্যটকরা কিছু ভুল বাঙালির খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। বাংলার সাধারণ মানুষেরা পর্যটকদের চিনতই না, বা ওদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে কোনও উৎসাহ দেখাত না। যারা ওদের সঙ্গে মিশত তারা দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারী বা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির প্রতিভূ বা শহরে থাকা চতুর, নীতিহীন ব্যবসাদার, যাদের স্বভাব পৃথিবীর যে কোনও চতুর, নীতিহীন ব্যবসাদারদের মতোই।

এটা লক্ষ করার যে, য়ুয়াং-চুয়াংদের মতো পর্যটক—যাঁর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে—বাঙালিদের বেশ প্রশংসাই করেছেন। কিংবা কলহনের মতো ব্যক্তির দেওয়া বিবরণও আমাদের উৎসাহিত করে, যেখানে তিনি ললিতাদিত্যের শাসনকালে কাশ্মীরে বাঙালির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পর্যটকদের বিবরণ ও ১৩০০ শতাব্দীতে আসা পর্যটকদের বিবরণের মধ্যে এত গভীর তারতম্য কেন ঘটে গেল?

বিদেশি পর্যটকদের কিছু কিছু মন্তব্য যে অখ্রিস্টানদের সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাবই ব্যক্ত করেছে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। মুসলমানরা তো তাদের ঘোষিত শত্রু সেই ধর্ম যুদ্ধের কাল থেকেই। স্পেন ও পর্তুগালের একটা বিশাল ভূখণ্ডকে মুরেরা প্রায় ৬০০ বছর ধরে নিজেদের কবলে রেখেছিল, এজন্য পোর্তুগিজরা তাদের কখনওই ক্ষমা করেননি। যাহোক, ওদের মধ্যে কেউ কেউ মহানুভবতা দেখিয়ে এটুকু অন্তত স্বীকার করেছে যে, মুসলমান শাসকেরা বিদেশি ধর্মের ব্যাপারে উদার এবং তাদের ধর্মকে এখানে প্রচার করার ব্যাপারে বাধা দেয়নি। হিন্দুদেরই বরং এই পর্যটকরা কম চিনত। নিজেদের লেখায় হিন্দুদের তারা উল্লেখ করেছে কখনও "নেটিভ",

কখনও "হীদেন", "প্যাগান" বা মূর্তি-উপাসক বলে। অদ্ভুত সব প্রথা বা রীতি পালন করে বলে মনে হওয়ায় তারা সমস্ত অ-মুসলমানদের ঘেন্নার চোখে দেখত। সেই সঙ্গে ওরা লক্ষ্য করত মাত্র একমুঠো বিদেশি কী সহজেই না বাঙালিদের কব্জা করে নিতে পারে।

সবশেষে, এই বিবরণগুলো থেকে দেশটা সম্পর্কে কী ছবি পাওয়া যায়? বেশিরভাগ বিবরণই ঘোষণা করে বাংলা একটা সামন্ততান্ত্রিক, ভূমি-নির্ভর সমাজ, যা শাসন করছে বাইরে থেকে আসা শহুরে সম্ভ্রান্তরা, যারা থাকে আলাদা, দেখতে আলাদা, এবং যাদের বেশবাস ও জীবন-যাপনের রীতিনীতি বাংলার সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংখ্যায় কম বলে এই শাসকেরা বাংলার গ্রামজীবনকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, বাংলার গ্রাম থেকে আসা কোনও প্রতিরোধ বা সমান্তরাল শাসনের চেষ্টা তারা সমূলে উৎখাত করে দিতে পারত।

জমিদারদের অধীনে বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে খুব কম জানা যায়, বিশেষ করে এই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলো থেকে এবং নিজের গোটা ইতিহাসে বাংলা যেহেতু কখনওই কোনও কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় পড়েনি, তাই এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে মহৎ কোনও স্থাপত্যও এখানে নির্মিত হতে পারেনি। এটাও সম্ভবত ঠিক যে, কৃষকদের শাসন করা জমিদাররাও কৃষকদের মতোই সহজসরল জীবনে অভ্যস্ত ছিল। এবং সমকালীন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো বা বিদেশের মতো বাংলা ঠিক বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধ উম্মাদনায় বিশ্বাস করত না। স্বৈরাচারী শাসকদের দৃষ্টান্ত বাংলার লোককথাতেও বিশেষ পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম শুধু কবি মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রায়শ দেওয়া হয় শেষ অধ্যায়ের উদ্ধৃতিটুকু। ওটাকে অবশ্য দক্ষিণবঙ্গের যে অত্যন্ত উন্নত অঞ্চলে তিনি থাকতেন সেখানকার একক দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করতে হবে।

৪.৩

পোর্তুগিজরা ও বাংলা

ভূমিকা

১৪৯৮ সালে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ বেয়ে, ভাস্কো-ডা-গামার সাগর পাড়ি রূপকথায় পরিণত হয়েছে। এই সমুদ্র যাত্রা, সারা পৃথিবীতে, মানব সভ্যতা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যাত্রা মানবসমাজের যোগাযোগকে একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা দিয়েছে, বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়েছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতির বিষয়ে চর্চা করতে গেলে, বিশেষ করে প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকে মূল্যায়ন করতে গেলে ওই ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই আলোচনা, আমরা বাংলার সমাজ এবং অর্থনীতিতে পোর্তুগিজদের আগমনের প্রভাব বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। পশ্চিম ভারতে, পোর্তুগিজদের মশলার বাণিজ্য ধীরে ধীরে উপনিবেশ স্থাপনের পথ ধরেছিল। যদিও ওই উপনিবেশের আকার ভারতের গোটা ভূখণ্ডের তুলনায় যৎসামান্য ছিল। এই উপনিবেশ, ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের থেকেও বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল। অন্যদিকে প্রায় দেড়শো বছর ধরে ভারতীয় সমাজে পোর্তুগিজ বণিক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, কোনও চিহ্ন না রেখেই, পোর্তুগিজরা এদেশের মাটি থেকে আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে গেল। নির্বিচারে ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের তুলনায়, খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের প্রতি উদার এবং সমান আচরণ পোর্তুগিজদের ভারতীয়করণ ত্বরান্বিত করেছিল। চামড়ার রং এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয়নি।

আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে হারিয়ে গেলেও, কোনও কোনও দেশীয় সম্প্রদায়ের পদবিতে পোর্তুগিজ প্রভাব এখনও লক্ষ করা যায়। পোর্তুগিজরা তাদের সঙ্গে এমন অনেক কিছু এনেছিল যা আজকের ভারতীয় সংস্কৃতি বা ভারতীয় খাদ্যাভাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এদেশের পরিবেশের সঙ্গে তা এমন মিশে গেছে যে, সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি বিদেশি বলে মনে হয়নি। "মগের মুলুক"[১] বা "ভাঁড়ের মেয়ে"[২] প্রভৃতি বাংলাভাষায় অত্যন্ত চালু শব্দগুলির উৎপত্তি এভাবেই (ঘোষ, যামিনী মোহন, ১৯৬০-৩৩)। গোটা প্রেক্ষিতটা ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে বিচার করলে, একথা খুব পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, পোর্তুগিজদের এদেশে আসার ফলে দেশীয় বাণিজ্য আর সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বদল ঘটেছিল—যে বদল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাস্তা খুলে দিয়েছিল।

মোগল এবং পোর্তুগিজ

পোর্তুগিজ আর মোগলরা সমসাময়িক। কিন্তু মোগলরা ভারতে এসেছিল তুলনামূলক

কম দূরত্বের পথ ধরে, পোর্তুগিজ আগমনের কয়েক যুগ পরে। ভারতের সমাজে এবং ইতিহাসে, পোর্তুগিজদের তুলনায় মোগলদের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পোর্তুগিজরা এদেশে এসেছিল সাগর পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে, মোগলরা এসেছিল উত্তরপূর্ব প্রান্ত থেকে হিমালয় পেরিয়ে।

মোগলরা ভারতে এসেছিল আক্রমণকারী হিসেবে। সামরিক শক্তিতে তারা ভারতজোড়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। পোর্তুগিজদের সঙ্গে মোগলদের পার্থক্য হল, মোগলরা এদেশে থাকতেই এসেছিল—ফিরে যাওয়ার কোনও বাসনা তাদের ছিল না। অন্যদিকে, পোর্তুগিজদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল একটাই—বাণিজ্যিক যোগসূত্র তৈরি করা। পরবর্তিকালে, বহু পোর্তুগিজ বণিক এদেশকেই নিজের দেশ করে নিয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রেরণা আর ধর্মীয় চেতনার উৎস ছিল সাগরপাড়ের ওদের নিজেদের দেশ। দৃষ্টিভঙ্গির এই গুণগত পার্থক্যই মোগলদের ভূমিকাকে ভারতীয় সমাজে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল।

এই দুই বিদেশি শক্তি বাংলায় পৌঁছেছিল এই বিশাল দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে। পোর্তুগিজরা এসেছিল জলপথে, মোগলরা আসে স্থলপথ ধরে। পোর্তুগিজরা আসে আগে—ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে। মোগলরা ১৫৭৫-এ বাংলায় তাদের শক্তি সংহত করে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খান, বাংলার স্বাধীন শাসক দাউদকে পরাস্ত করেন। মোগলদের বাংলায় পৌঁছনোর যুগে, বহু বাঙালি গোষ্ঠীপতি পোর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্যকে নিজেদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেছিল। এই সৈন্যদের সাহায্যে তারা প্রতিটি ইঞ্চি জমি রক্ষার জন্য লড়াই করেছিল।

পোর্তুগালের স্বর্ণযুগ

১৪৮০ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল, আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিচারে, পোর্তুগালের সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনের পর, পোর্তুগিজরা ১৫০৩ সালে কোচিনে দুর্গ তৈরি করে। গোয়া দখল করে ১৫১৫ সালে। ১৫৫৪ সালে দমন ও দিউ তাদের কবজায় আসে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত কোঙ্কন ভূমিতেও তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর মধ্যে পোর্তুগিজরা মালাক্কা (১৫০৯), সুমাত্রা (১৫০৯), সিংহল (১৫০৫), মাদাগাস্কার (১৫০৬), মোম্বাসা (১৫০৫), মালদ্বীপ (১৫০৭), কিউটা কেজ, মরক্কো, মাকাও, মোজাম্বিক, কংগো, গিনি ওরমাজ, ব্রাজিল (১৫০০)-এ উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ব্রাজিলের মোট ভৌগোলিক এলাকা ভারতের তিনগুণ। পশ্চিমে জিব্রাল্টার, পূর্বে মালাক্কা, আরও পশ্চিমে ব্রাজিল থেকে দক্ষিণে ভূভাগ পোর্তুগালের দখলে এসেছিল (ক্যামপোস, জে. জে. এ., ১৯৯৯ : ১২-১৪)। অতলান্তিক আর ভারত মহাসাগর সহ বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগরের মতো বহু সমুদ্রে তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (গ্রে, এডওয়ার্ড, ১৮৯২ : ১০-১২; ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯৯৯ : ২)।

পোর্তুগালের প্রাধান্যে প্রথম বাধা দেয় ডাচেরা। ১৬০৩ সালে তারা গোয়া অবরোধ করে। এই শত্রুতা বহু দশক ধরে চলেছিল। ডাচ সামরিক শক্তির প্রবল প্রতাপে পোর্তুগালের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৬৪০-৪১ সালের মধ্যে ডাচেরা,

পোর্তুগিজদের সিংহল, মালাক্কা থেকে শুরু করে এশিয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসহ পূর্বভারত থেকে বিতাড়িত করে। কোচিন এবং তুতিকোরিন বন্দর, যা পোর্তুগিজদের দখলে ছিল, থেকেও তারা বিতাড়িত হয় (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৯০৩ : ১৭১; গ্রে, এডওয়ার্ড, ১৮৯২ : ১৩)।

পূর্বভারতে পোর্তুগিজরা

পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় যে পোর্তুগিজরা এসেছিল, তারা পশ্চিমভারতে তাদের জাতভাইদের মতো সংগঠিত ছিল না। দু-একটা ছোটখাটো চেষ্টার বাইরে, উপনিবেশ তৈরি করার উদ্যোগেও তারা সাফল্য পায়নি। এদের একটা বড় অংশই ছিল গোয়া থেকে পলাতক অপরাধী, সৈন্যবাহিনী ছেড়ে আসা অথবা দুর্বৃত্ত। পোর্তুগিজদের পেছন পেছন ভারতে আসা অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের তফাত ছিল। এরা জলদস্যুতা বা দাসব্যবসায় বেশি আগ্রহী ছিল (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ১৮৩; মুখার্জী, রামকৃষ্ণ, ১৯৫৮ : ২১)। আইনসম্মত বাণিজ্যের চেয়ে এদের উৎসাহ ছিল বিভিন্ন সামন্ত শাসকদের বাহিনীতে ভাড়াটে সেনা হিসেবে কাজ করার দিকে।

অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের আগেই এদেশে আসার ফলে ভারতীয় বাজার দখল করার যে সুবর্ণসুযোগ পোর্তুগিজদের সামনে ছিল তা তারা হেলায় নষ্ট করে। মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে তারা মোগল আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। ফলে ১৬৩২ সালে মোগলবাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে পোর্তুগিজরা তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলি ছাড়তে বাধ্য হয়। পোর্তুগিজদের পতন ব্রিটিশ, ফরাসি এবং ডাচ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের সামনে বাণিজ্য পথ খুলে দেয়। উড়িষ্যার উপকূলে সুবর্ণরেখা নদীতীরে পিপলিতে যে ব্রিটিশ বসতি গড়ে উঠেছিল তা তৈরি হয়েছিল একটি পোর্তুগিজ কারখানার ধ্বংসাবশেষের উপর (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯ : ৪৪৩এন) পোর্তুগিজদের এই অঞ্চলে আসার কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। বাংলার উন্নত বস্ত্রসম্ভারকে বিশ্বের দরবারে প্রথম হাজির করেছিল এরাই। হুগলির মতো শহরের পত্তন হয়েছিল এদের হাতে। সপ্তগ্রাম বা চট্টগ্রামের মতো প্রাচীন বন্দর শহর নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল পোর্তুগিজদের প্রভাবে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের পোর্তুগিজ রাজ্য থেকে কয়েকজন রাজ কর্মচারীই, সম্ভবত, প্রথম দিকে পোর্তুগাল থেকে বাংলায় পৌঁছেছিল। এদেরও আগে, ১৫১৬-১৭ সালে, পোর্তুগিজর কারনাও পেরেস দ্য আন্দ্রের নেতৃত্বে সুমাত্রা আর চীন ঘুরে বাংলায় অভিযান করেছিল। কিন্তু পথে তাদের জাহাজে আগুন লাগে। জ্যাক কোলহো নামে একজনকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। কোলহোই প্রথম পোর্তুগীজ নাগরিক যিনি গোলাম আলি নামক একজন মুসলমান সঙ্গীকে নিয়ে মালাক্কা হয়ে বাংলার মাটিতে পা রাখেন। ডা জোয়াও ডি সিলভেইরা মালদ্বীপ থেকে চারটি জাহাজ নিয়ে এদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু মালদ্বীপ থেকে ক্যাম্বে যাওয়ার পথে সিলভেইরা একটি বাঙালি জাহাজ আটক করেছিল। সেই জাহাজের পথপ্রদর্শক এই সংবাদ চট্টগ্রামের শাসকের কাছে পৌঁছে দেন। সংবাদ পেয়ে চট্টগ্রামের শাসক পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ফলে সিলভেইরা বেশিদিন বাংলায় থাকেন নি। ছোটখাটো সংঘর্ষের পর কোলহো এবং

সিলভেইরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। প্রথমজন চীনের দিকে, দ্বিতীয়জন আরাকানের দিকে রওনা হন। সিলভেইরা মাঝপথে আরাকান যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করে সিংহলের দিকে রওনা হন, কারণ সিলভেইরা জানতে পেরেছিলেন যে, আরাকানের শাসকরা তাকে জলদস্যু বলে সন্দেহ করছে, ফলে সে দেশে তার অভ্যর্থনা সুখকর নাও হতে পারে। বাংলায় পোর্তুগিজদের এই প্রথম অভিযান এইভাবেই ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই অভিযানের গুরুত্ব ছিল। এরপর থেকে প্রতি বছরই পোর্তুগিজ জাহাজ বাণিজ্য পসরা নিয়ে বাংলায় আসতে শুরু করে (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯৭২, খণ্ড ২ : ২৪; ক্যাম্পোস, জে. জে.এ., ১৯১৯ : ২৫-৩০; সৌফা, ম্যানুয়েল ফারিয়া, ১৬৯৪ : ২২০; হান্টার, ডব্লু, ডব্লু. খণ্ড ৫ : ৪৪)।

১৫২৮ সালে মার্টিন আলফানসো দ্য মেলো-র নেতৃত্বে বাংলায় দ্বিতীয় পোর্তুগিজ অভিযান ঘটে। ঝড়ের দাপটে সিংহলের বদলে পোর্তুগিজ জাহাজ চট্টগ্রামের চাকারিয়াতে নোঙ্গর ফেলে (ক্যাম্পোস, জে. জে.এ., ১৯১৯ : ৩১)। তৃতীয় বারে, ১৫৩৪ সালে, অনেক আটঘাঁট বেঁধে শুরু করলেও পোর্তুগিজদের অভিযাত্রা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। সেবার প্রচুর উপহার নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে পোর্তুগিজরা গৌড়ের নবাবের দরবারে দূত পাঠিয়েছিল। কিন্তু নবাব রুষ্ট হওয়ায় দূতদের স্থান হয় কারাগারে। নবাবের রাগের অন্যতম কারণ ছিল, উপহারের মধ্যে বেশ কয়েক পেটি গোলাপের আতর মুর জাহাজ থেকে আলফানসোর লুঠ করা। এই সব ছোটখাটো ঘটনা থেকে সেকালের পোর্তুগিজদের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও জাহাজ দখল করে মালপত্র লুঠ করার সুযোগই তারা ছাড়ত না। দূতদের কারা অন্তরীণের খবর পেয়ে নুনা দ্য কুন্‌হা ৩৫০ জন সৈন্য নটি জাহাজের বহরের সঙ্গে বাংলায় পাঠায়। কুন্‌হা ছিলেন গোয়ার শাসক। এই বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দর জ্বালিয়ে দেয়—বহু লোককে হত্যা করে (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৩৩-৩৬)। ওই বহরের সেনাপতি অ্যান্টনি দ্য সিলভো মেনেসেস-এর সম্ভবত ধারণা ছিল যে গৌড়ের দরবারে পাঠানো দূতদের, যারা আবার তার বার্তাবাহকও ছিল, গৌড়ের নবাবের হুকুমে ধরা হয়েছে। এদের ভাগ্য সম্পর্কে তার কাছে কোনও সংবাদ ছিল না (সৌফা, ম্যানুয়েল ডি ফারিয়, ১৬৯৪ : ৪১৮)।

পোর্তুগিজ বাণিজ্যিক স্বার্থের পক্ষে এই ঘটনাগুলি অনুকূল ছিল না। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ অবশেষে পোর্তুগিজদের পক্ষে বইতে শুরু করল। গৌড়ের শাসক, আফগান গোষ্ঠীপতি শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পোর্তুগিজদের সাহায্য চাইলেন। এই শের শাহ্-ই পরে ভারত সম্রাট হয়েছিলেন। পোর্তুগিজদের সাহায্য চেয়ে শর্ত হিসেবে গৌড়ের শাসক অন্তরীণ পোর্তুগিজ বন্দিদের মুক্তি দিলেন (বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৫ : ১৩৬-১৩৮; ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৩৬; সৌফা ম্যানুয়েল ডি ফারিয়া, ১৬৯৪ : ৪০৯-৪১১)। ১৫৩৫ সালে, করমণ্ডল অঞ্চলে মুক্তো বাণিজ্যখ্যাত, দিয়েগো রেবেল্লো সপ্তগ্রাম বন্দরে এসে, বন্দরটি ধ্বংস করার হুমকি দেন। ক্যাম্পোসের মতে, এই হুমকির পিছনে বন্দিমুক্তির তাগিদ ছিল (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৩৭-৩৯)। মাহমুদ শাহ্, তৎকালীন বাংলার শাসক, শের শাহের বিরুদ্ধে পোর্তুগিজদের সহযোগিতা পেয়ে খুশি হন। সপ্তগ্রামে পোর্তুগিজদের কারখানা (দুর্গ নয়) স্থাপনের অনুমতি মেলে। চট্টগ্রামের শুল্ক বিভাগের

প্রধান করা হয় একজন পোর্তুগিজকে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হয় তাকে (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৩৯)। একই বিবরণীর অন্যত্র ক্যামপোস লিখেছেন যে, শুল্ক বিভাগের দায়িত্বের পাশাপাশি পোর্তুগিজদের চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম—দুই স্থানেই কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয় (ক্যাম্পোস জে. জে. এ., ১৯১৯ : ৪৭)।

প্রথমদিকে, পোর্তুগিজ বণিকরা মূলত শীতকালের ৫-৬ মাস এদেশে কাটিয়ে চলে যেত। ধীরে ধীরে তারা এদেশে থিতু হয়। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু পসরা নিয়ে এসে তারা ভারতের বাজারে বিক্রি করত। সম্রাট আকবর যেদিন প্রথম এই বিদেশি বণিকদের কথা জানলেন, সে সময় তারা নিজেদের দেশে ফিরে গেছে, কিন্তু ভারতীয় সহযোগী বণিকদের কাছে প্রায় দু লক্ষ টাকা গচ্ছিত রেখে গেছে। ১৫৭৯ সালে, সম্রাটের আমন্ত্রণে পেড্রো ট্যাভারেস আগ্রায় সম্রাটের দববারে হাজির হয়ে ফরমান হাসিল করলেন। এই ফরমানের জোরে পোর্তুগিজ বণিকরা ভারতের সর্বত্র নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার পেল (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ২৫, ২১-৩৩; ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৫১-৫৩)। ১৬২৩ সালের নভেম্বরে সম্রাট জাহাঙ্গীর, পোর্তুগিজদের অবাধ বাণিজ্য অধিকারকে পুনর্নবীকরণ করলেন (রায়চৌধুরি, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ৬০)।

এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে আমরা মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। মূলত বিশ্ব বাণিজ্যে ১৪৯৮-এর সাগরপাড়ির প্রভাব এবং পুঁজিবাদের উত্থান প্রসঙ্গে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে বাংলায় পোর্তুগিজ বণিকদের ভূমিকা এবং সেই ভূমিকার প্রেক্ষিতে নগর গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত নিয়ে। চতুর্থ অংশে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে ১৬৩২ সালে, পোর্তুগিজদের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ প্রসঙ্গে। পঞ্চম অংশে আলোচিত হয়েছে ভাড়াটে সৈন্য, জলদস্যু এবং দাসব্যবসায়ী হিসেবে পোর্তুগিজদের ভূমিকা। ষষ্ঠ অংশে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়গুলি আলোচনার পাশাপাশি সপ্তম অংশে আমরা সমগ্র আলোচনার উপসংহার টেনেছি। পরিশিষ্ট 'ক' এবং 'খ'-এ বাংলা ভাষায় কোনও কোনও পোর্তুগিজ শব্দের মিশ্রণ হয়েছে আর কী কী ফল এবং গাছ পোর্তুগিজরা এদেশে নিয়ে এসেছে তাব একটি তালিকা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন ধারার সূত্রপাত

বাংলায় পোর্তুগিজরা মূলত হার্মাদ, দাসব্যবসায়ী অথবা ভাড়াটে সৈন্য বলেই পরিচিত। এই ধারণার বাস্তবতাও আছে। পোর্তুগিজদের মূল বাণিজ্যিক স্বার্থ কিন্তু বাংলা বা বাংলার তাঁতবস্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল না। তাদের মূল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল কেরালা এবং ওই অঞ্চলের মশলা। পরবর্তীকালে ডাচেরা যখন ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে পোর্তুগিজদের তাড়িয়ে দেয়, ইংরেজদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত তাদের হতে হয়নি। কারণ কেরালায় উৎপাদিত মশলার বাজার তাদের দখলেই ছিল। পোর্তুগিজরাই প্রথম বাংলার তাঁতবস্ত্র ইউরোপের বাজারে পৌঁছে দেয় পরবর্তীকালে বাংলার বস্ত্রশিল্পের

ইউরোপজোড়া জনপ্রিয়তার পেছনে তাদের অবদানও ছিল।

১৪৯৮ সালের ঐতিহাসিক সাগরযাত্রা, বিশ্ব বাণিজ্য চিত্রে চারটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছিল। এক, এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ তৈরি হল। দুই, বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ব্যবস্থা আর ব্যক্তিনির্ভর রইল না। তিন, নতুন ব্যবসায়, রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত কোম্পানিগুলি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কাছ থেকে সব রকম পৃষ্ঠপোষকতা পেতে শুরু করল—সামরিক এবং কূটনৈতিক দুই দিক থেকেই।

কোনও কোনও সময় এই সমর্থন সীমানার বন্ধনও মানত না। সারা বিশ্বে, ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান পোপ, এই অভিযাত্রামূলক, বাণিজ্যিক এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিক উদ্যোগকে খ্রিস্টধর্ম প্রসারের সুযোগ বলে গণ্য করেছিলেন। 'হিদেন' আর 'মূর্তিপূজকদের' মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রসারের এই সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এই উদ্যোগকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।[৩] শুধুমাত্র আশীর্বাদ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। বাণিজ্যিক বিস্তারে আগ্রহী ক্যাথলিক দেশগুলির মধ্যে অঞ্চল নিয়ে সংঘর্ষের নিরসনেও তাঁকে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য, পোপ অ-ইউরোপীয় বিশ্বকে, বিশ্ব মানচিত্রে একটি রেখা টেনে দুভাগে ভাগ করে দেন। রেখার পূর্বদিকের গোটা অঞ্চল, সে জানা হোক বা অজানা হোক, পড়ল পোর্তুগালের ভাগে। পশ্চিমের গোটা এলাকা বরাদ্দ হল স্পেনের জন্য। এই সিদ্ধান্ত বেশ কয়েকটি পোপ অনুশাসন দ্বারা সিদ্ধ করা হল (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ২; স্টিনসগার্ড, নেইল, ১৯৭৩ : ৮৯)।

ভাস্কো-ডা-গামার প্রত্যাবর্তনের পরপরই, পোর্তুগাল সরকার এশিয়ায় বাণিজ্যের বিষয়ে একটি সিন্ডিকেট তৈরি করল। অন্য ইউরোপীয় দেশগুলিও পিছিয়ে রইল না। তারাও নিজস্ব বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলল। এই সংস্থাগুলি, সে দেশের সামরিক এবং কূটনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেল। বাণিজ্য ব্যবস্থার চরিত্র, বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, আমূল বদলে গেল। আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে একাধিক দেশ সমষ্টিবদ্ধ হল। প্রযুক্তিও পাল্টাল। হাজার হাজার সীমানাহীন সাগর পেরিয়ে আসা জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটল।

তখনকার মাঝারি মাপের জাহাজগুলির পরিবহনক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জায়গার ঠিকমতো ব্যবহার হলে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ যেমন হত, তেমনি পরিকল্পিত ব্যবহার না হলে ব্যাপক ক্ষতিও হতে পারত। জাহাজের একটা অংশ মাসাধিক কাল সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হত। পরবর্তীকালে, গোটা যাত্রাপথে, কিছু বন্দরে থেমে থেমে চলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে ওই বন্দরগুলি থেকে প্রয়োজনীয় রসদ তুলে নেওয়া হতো। অন্তরীপ অঞ্চলে ডাচ উপনিবেশ গড়ে ওঠার শুরু হয় প্রয়োজনীয় খাদ্য ফসল উৎপাদনের চিন্তা থেকেই। যাই হোক, রসদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাণিজ্য সম্ভার নেওয়া যেত না।

হাল্কা অথচ বহুমূল্য মশলা পরিবহনের জন্য আগ্রহের এটাও ছিল একটা কারণ। বাংলায় পোর্তুগিজ বাণিজ্যের অন্যতম সামগ্রী ছিল শঙ্খ। কিন্তু শাঁখ ছিল ওজনে ভারী, ফলে জাহাজের ওজন বেড়ে যেত, অগভীর জলে জাহাজ চালাতে সমস্যা হত (ম্যানরিক,

ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ১১)। বাংলার তাঁতবস্ত্র তাদের মনে ধরায়, বিদেশি কোম্পানিগুলি আগ্রহী হল। তাদের মনে ধরার একটা কারণ, গুণগত উৎকর্ষ ছাড়াও এগুলি ওজনে ছিল হাল্কা, জায়গাও কম নিত—বহুমূল্য তো ছিলই। সহজ করে বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ পরিবহন সংক্রান্ত ব্যয় উশুল করেও ভালো মুনাফা দিতে পারে এমন সামগ্রীর প্রতিই তাদের আগ্রহ ছিল।

বড় জাহাজ আর উন্নত নৌবিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে ঝড়-বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অগ্রাহ্য করে বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ জুটল বটে (ভন, লিয়ার জি.সি., ১৯৫৫: ১৩৩ ; স্টিন্সগর্ড, নেইলস্, ১৯৭৩ ; পরিচ্ছেদ ১), বহু নতুন নতুন ঝামেলাও তৈরি হল। তার মধ্যে সামুদ্রিক ঝড় যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিশাল সামুদ্রিক প্রাণী থেকে হিংস্র জলদস্যু পর্যন্ত। ওই নতুন ঝামেলার মোকাবিলার ব্যবস্থাও নিতে হল। জাহাজে কামান-বন্দুক রাখার জন্য জায়গা দিতে হল। শুধু তাই নয়, সেই জায়গার আশপাশটা ছেড়ে রাখতে হল যাতে কামান বন্দুক চালাবার জন্য ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, যে সব দেশ থেকে বাণিজ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হত, সে সব দেশের উৎপাদনের ধরনটাই দূর বিদেশের উপভোক্তাদের চাহিদায় পাল্টে গেল। এই উপভোক্তাদের সম্পর্কে উৎপাদকদের কোনও সুদূরতম ধারণাও ছিল না। যে সব কোম্পানিগুলো এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদেরও পরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়েই চলতে হত। বাণিজ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে এমনভাবে তা প্রস্তুত রাখতে হত জাহাজ বন্দরে পৌছলেই মাল বোঝাই করার কাজ শুরু করা যায়। যাতে অহেতুক সময় নষ্ট না হয়, ফেরৎ যাত্রার সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়। আর্থিক প্রশ্নটিও ছিল, মাল সংগ্রহ এবং গুদামজাত করার জন্য অর্থের দরকার ছিল, দাদন দেবার জন্যও টাকা লাগত। বাংলার ক্ষেত্রে, স্থানীয় মহাজন আর বণিকদের কাছ থেকে ধার মিলত। জাহাজ ফিরে গিয়ে আবার আসার মধ্যের সময়কালে এই ঋণের টাকাতেই কাজ চলত।

ভারবাহী পশু বা নৌকার ব্যবহারও ছিল। কিন্তু সমুদ্রবাণিজ্যের এই বিকাশের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য সাগরনির্ভর হয়ে পড়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। পুরানো ব্যবস্থা গুরুত্ব হারাল (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ২৩)। দেশীয় বাজার থেকে মাল সংগ্রহ অব্যাহত রইল কিন্তু বহু সামগ্রী অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকেও রপ্তানির জন্য বন্দরে আসতে শুরু করল।

এশীয় বণিকরা কি কেবল ফেরিওয়ালাই ছিল ?

ভন লিয়ার বা স্টিনসগার্ডের মতো ডাচ ঐতিহাসিকরা ইউরোপীয়রা আসার আগে এশীয় বাণিজ্য ব্যবস্থাকে "ফেরিওয়ালা বাণিজ্য" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ভালো করে অনুধাবন করলে স্পষ্ট হয় যে, এই আখ্যাকে আভিধানিক অর্থে বিচার করলে চলবে না। তাঁরা, বৃহৎ, বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক সংস্থাগুলির এশীয় বাজার দখল করার উদ্যোগের ফলে যে বিরাট গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি বহু মালিকানার অধীন ছিল, তা সত্ত্বেও নিজ রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল (ভন লিয়ার, জে.সি., ১৯৫৫ : ১৩৩; স্টিন্সগার্ড, নেইলস, ১৯৭৩; পরিচ্ছেদ ১; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৪)। ভারতীয়

সহযোগীদের তুলনায়, বাণিজ্যের বিষয়ে তারা অনেক বেশি দক্ষ এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিল(প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৩)।

এশীয় বাণিজ্যের বিশালতা এবং গুরুত্ব লিয়ার অস্বীকার করেননি। তাঁর অভিযোগ হল, এশীয় বণিকরা বাজার থেকে বাজার ঘুরে ফেরি করার ধরনে বাণিজ্য করতেন। বহু শতাব্দীতেও তাদের এই বাণিজ্য প্রথা বদলায়নি। বিলাসে তাদের আগ্রহ বেশি ছিল।

অশীন দাশগুপ্ত এ বিষয়ে সহমত হয়েছেন যে, ভারতীয়দের সমুদ্র বাণিজ্যের ধরনটা "ফেরিওয়ালা বাণিজ্য" ধরনেরই ছিল। যে সব ভারতীয় বণিকরা এই বাণিজ্যে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই "ছোট বণিক, তারা কাপড়ের গাঁটি নিয়ে ঘুরত। এরা অধিকাংশই যা বিক্রি করত বা বাণিজ্য করত সেটুকুরই মালিক ছিল" (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৭)। অশীন দাশগুপ্ত তাঁর বিস্তারিত গবেষণার অন্য অংশেও একথা স্বীকার করেছেন। ভারতীয় বাজারে অস্থিরতা ছিল। যুদ্ধ বা দুর্যোগে প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হত। ফলে বড় মাপের বাণিজ্য কর্মসূচি নেওয়ার ঝুঁকি ছিল। বহু সমৃদ্ধ ভারতীয় বণিকও ছিলেন। জগৎ শেঠ, ভারাজি বহরা, আবদুল গফ্ফর—তার মতো রাজকীয় ধনী বণিকরাও ছিলেন। এদের ক্ষমতাও ছিল, সামর্থ্যও ছিল, কিন্তু মুনাফার মানসিকতার দ্বারা চালিত ছিল। "বিশাল আন্তর্জাতিক বিশ্বের এক প্রান্তে পড়েছিল এরা। সেই বিশ্বকে প্রভাবিত করার কোন ক্ষমতাই ছিল না এদের। নিজেদের তৈরি করা এক টুকরো জগতই ছিল এদের সর্বস্ব, তার বাইরে পা রাখা বা নিজেদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করা—এদের সামর্থ্যে ছিল না। পরের দিন কী হবে তা নিযে নিশ্চয়তা ছিল না তাদের, কোনও অসম্ভব কল্পনাও এদের সাধ্যাতীত ছিল। বাণিজ্যের বিশালতায় তারা ফেরিওয়ালা ছিল না—কিন্তু ফেরিওয়ালার মানসিকতাকে তারা অতিক্রম করতে পারেনি।" (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ১০-১১, ৩৫৫)।

এই বৃহৎ বণিক গোষ্ঠী, মধ্যস্বত্বভোগী এক বিশাল বাণিজ্যশৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর তাদের বিশেষ প্রভাবও ছিল না। প্রত্যেকেই যেন নিজস্ব একটি ছোট 'মৌচাকের' মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই 'মৌচাক' আবার ছিল "বিশাল বাজারের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ" (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ১৩-১৪)। ভারতের এই বণিকদের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যেরত দৈত্যাকৃতি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও তুলনাই চলে না। ভারতীয়দের সমুদ্র বাণিজ্য বিকশিত না হওয়ার পিছনে পোর্তুগিজদের যান চলাচল বাবদ শুল্ক (কারতাজ) বিন্যাসেরও ভূমিকা ছিল। পোর্তুগিজরা, যে কোনও কারণেই হোক, ছোট নৌকাকে এই শুল্ক থেকে রেহাই দিয়েছিল (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪: ৩৫৭)। আর্মেনিয়ান বণিক খাজা ওয়াজিদ সম্ভবত এই ফেরিওয়ালা মানসিকতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তিনি পলাশি যুদ্ধের সময়, অন্তরালে থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করেছিলেন। অবশ্য তার ছয়টার বেশী জাহাজ ছিল না। অশীন দাশগুপ্ত বলেছিলেন, "হুগলির নৌ-বণিকদের গুরুত্বহীনতা ওয়াজিদকে দিয়েই অনুভব করা যায়" (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৩৬০)।

বেদখল হওয়ার ভয়ে ভারতীয় বণিকরা নিজেদের সম্পদ লুকিয়ে রেখে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন—এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। সাধারণ জীবনযাপন করা সে-সময়ের সংস্কৃতি ছিল। কেউ কেউ হয়ত সামন্ত প্রভুর স্বেচ্ছাচার আর অত্যাচারের

শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে বণিকরা এই সময় স্বচ্ছল জীবন যাপন করতেন। সমস্যা দেখা দিল পলাশির যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে, যখন মোগল শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে। ১৭০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি সমুদ্র বণিকের সংখ্যা ছিল ১৯। ১৭৩৪ সালে, ইংরেজ বেসরকারি বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য, এই সংখ্যা কমে হয় ১১। দেশীয় বণিক শ্রেণি, সুরাট, কালিকট, হুগলি, মসলিপত্তম প্রভৃতি বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস এবং বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি নতুন বন্দরের উত্থানের ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৯, ১৮১, ১৯৯-২০০)। লিয়ার এশীয় বাণিজ্য ধারার যে চরিত্রায়ন করেছিলেন তাতে বিশেষ ভুল ছিল না। কিন্তু মহার্ঘ্য সূচিকর্মের পাশাপাশি যে কাপড়ের বাণিজ্য চলত তা মূলত সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যই তৈরি (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৩-৫)

ওম প্রকাশের মতামত এই রকমই। তাঁর মতে, "বণিকরা তাদের বাণিজ্য দ্রব্য নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, বস্তুত তারা ভারত মহাসাগরে ফেরিওয়ালাই ছিলেন" (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৯)। সত্যি কথা বলতে কী, এশীয় বণিকরা পোর্তুগিজদের প্রভুত্ব মেনেই কাজ করত। মালাক্কা দখল করার পর, পোর্তুগিজরা এশীয় বণিকদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। (সুব্রহ্মানিয়াম, সঞ্জয়, ১৯৮৭ : ২৬৬, ২৭১)।

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে একমাত্র সুশীল চৌধুরী এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি এমন কয়েকজন দেশীয় বণিকের উল্লেখ করেছেন যাদের সরাসরি ফেরিওয়ালা বলা চলে না। কিন্তু ইউরোপীয় বণিকদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বাণিজ্যের যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছেন (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৪)। সুশীল চৌধুরির মতে এশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয় বাণিজ্যের থেকে বেশি ছিল—দ্বিগুণেরও বেশি (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৯৫ : ৪)। চৌধুরি বলেছেন, "কোনও বিশেষ দ্রব্যের বাজার দর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা প্রভাবিত করতেও সক্ষম ছিল না" (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ১৩১)। বস্ত্র বাণিজ্যের সম্পর্কে এত সমৃদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও তিনি কীভাবে এই সিদ্ধান্ত করলেন তা স্পষ্ট নয়।

চৌধুরী আরও বলেছেন, "বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেখানোর যে প্রবণতা ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে তা বন্ধ হওয়া দরকার। ইউরোপীয় রপ্তানি বাণিজ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলার সামগ্রিক বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।" নেইল স্টিন্সগার্ড যেভাবে এশীয় বাণিজ্যকে ফেরিনির্ভর এবং বিলাসদ্রব্য বাণিজ্যের যোগফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সুশীল চৌধুরী তার বিরোধিতা করে উর্মিচাঁদ, জগৎ শেঠ, খাজা ওয়াজিদ প্রমুখ ভারতীয় বণিকদের বৃহৎ বণিক বলে উল্লেখ করেছেন[৪] (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭)। "এশীয় বাণিজ্য"-কে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি এর মধ্যে বাংলার বাইরের ভারত ভূখণ্ডের বাকি অংশকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। "ইউরোপীয় বাণিজ্য" বলতে তিনি আজকের ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের বাইরের গোটা ভূভাগকে বুঝিয়েছেন। এছাড়াও, তার দেওয়া পরিসংখ্যান যদি ঠিকও হয় তাহলেও, ইউরোপীয়দের মোট বাণিজ্যের অর্ধেক

অথবা তার সামান্য কম যে বিকাশশীল দ্রব্যের তা তার চোখ এড়িয়ে গেছে। "গুণগত" মানের বিষয়টিও তিনি বিবেচনা করেননি। ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবেই বাংলায় গুণগত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ বহু উৎপাদনের জন্য নতুন বাজার তৈরি হয়। এশীয় বাজারে এদের চাহিদা ছিল না।

হিংসা ও শিল্প ?

পোর্তুগিজ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ ছিল বাণিজ্য বিস্তার এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন নতুন অঞ্চল দখল করা। এইভাবেই তারা অ-ইউরোপীয় দুনিয়ায় বাণিজ্যের পাশাপাশি আধুনিক সমর কৌশলও আমদানি করল। ভারতের সব দিকের জলপথেই তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। অতি দ্রুত পোর্তুগিজরা জলপথে আরব প্রধান্যের অবসান ঘটাল। সমুদ্রের বুকে বলপূর্বক দখলদারির ফলে, দ্বীপ বাণিজ্যও মধ্যস্বত্বভোগী বণিক শৃঙ্খলের মাধ্যমে তারাই চালাত।

পোর্তুগিজরা, পরবর্তীকালে অন্যান্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক রাষ্ট্রগুলিও, তাদের দখলদারিতে থাকা সমুদ্রপথ দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার জন্য এক ধরনের অনুমতিপত্র চালু করল। এই অনুমতিপত্রগুলিতে (পোর্তুগিজ ভাষায় কারতাজ) যাত্রাপথ উল্লেখ করা থাকত। এই পথ ধরে যাত্রা করা সকল জাহাজকেই এই অনুমতিপত্র নিতে হত। পরবর্তীকালে অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রও এই ব্যবস্থা চালু করে। এই অনুমতিপত্র নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কর দিতে হত।[৫] এই কর না দিলে এই জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা, ধ্বংস করা বা লুঠ করার সম্ভাবনা থাকত। এই ভাবেই সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, ইউরোপীয় শক্তিগুলি আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর বা ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাণিজ্য বিস্তারের চেয়েও জলপথে প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পোর্তুগিজদের কাছে বাণিজ্যের থেকেও জরুরি হয়ে ওঠে বহির্শুল্ক আদায়ের কাজ (লিয়ার, জে.সি., ১৯৫৫ : ১১৮)।

পোর্তুগিজ ঐতিহাসিকরা দুর্বলভাবে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করার চেষ্টা করে এসেছেন। তাঁদের যুক্তি তিনটি। এক, এর ফলে জলদস্যুদের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। দুই, খ্রিস্টধর্ম প্রসারের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। তিন, পোর্তুগিজ অঞ্চল রক্ষা করার জন্য এর দরকার ছিল। ফ্রেইটাস যেমন বলেছিলেন যে, "পোর্তুগিজ অঞ্চল রক্ষা করা এবং কিছু আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালনে পোর্তুগালের বাধ্যবাধকতাই এই ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিল। জলদস্যুদের মোকাবিলা করা এবং খ্রিস্টধর্ম প্রসারের জন্য পোপের নির্দেশ পালন করাই এ ধরনের বাধ্যতা সৃষ্টি করেছিল" (স্টিন্সগার্ড, নেইল, ১৯৭৩ : ৮৯)। কখনও কখনও স্বপক্ষের এই যুক্তিবিন্যাস খুব সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। লেন 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' আর 'রক্ষাশুল্ক'-এর মধ্যে ভেদরেখা টেনেছেন। 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' অর্থে রক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যয়কে ছাপিয়ে যাওয়া স্থানান্তরিত আয়। 'রক্ষাশুল্ক' মানে বিভিন্ন ধরনের রক্ষা ব্যবস্থা থেকে অর্জিত আয়ের তারতম্য (লেন, ফ্রেডারিক সি, ১৯৬৬ : ৪১২-৪২০)।

প্রকৃতপক্ষে, শুরু থেকেই খাঁটি বাণিজ্য বা লাভ লোকসানের বাইরে পোর্তুগিজদের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। পোর্তুগালের সম্রাটের গালভরা উপাধি—নৌচালনা, বিজয় এবং

ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য এবং ভারতে বাণিজ্যের প্রভু—এ সত্যই প্রকাশ করে। "পোর্তুগিজদের ধারণায় প্রতিটি পোর্তুগিজ জাহাজের অধিনায়ক কেবলমাত্র দক্ষ এবং যোগ্যই নন, সম্রাটের এই উপাধির প্রতি দায়বদ্ধও। পোপের অনুশাসন যে খ্রিস্টীয় প্রভাবাধীন দেশের বাইরে আইনত এবং নৈতিকভাবে প্রযোজ্য নয় এ সত্য তাদের অনুভবেই ছিল না" (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩৫৩)।

পারস্য উপসাগরে, বিভিন্ন নৌযানের উপর পোর্তুগিজদের নিয়মিত হামলাই মশলা বাণিজ্যকে ধ্বংস করেছিল (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৪৫)। সামরিক বলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতাই শেষ পর্যন্ত পোর্তুগিজদের পতন ডেকে আনে। ১৬৩২ সালে, মোগল সাম্রাজ্য যখন ক্ষমতার শীর্ষে তখন মোগল সৈন্যদের হাতে পোর্তুগিজরা পর্যুদস্ত হয় এবং হুগলি বন্দর থেকে বিতাড়িত হয়। স্টিন্সগার্ডের মতে, "পোর্তুগিজরা লাভের অর্থ কোনও উৎপাদনশীল বা উৎপাদন বিকাশ উপযোগী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ না করে, রাজকীয় জীবন-যাপনে ব্যয় করত। অনুৎপাদনশীল পুনর্বন্টন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করত। পোর্তুগিজরা ছিল কর সংগ্রাহক, এস্টাডো ডা ইন্ডিয়া ছিল এ ধরনের অনুৎপাদনশীল পুনর্বন্টন সংস্থা" (স্টিন্সগার্ড, নীলস, ১৯৭৩ : ৮৬)।

বাণিজ্যের বড় অংশই ছিল বেসরকারি মালিকাধীন। এমনকী, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি যাদের নাবিক হিসেবে নিয়োগ করেছিল, তারাও, তাদের নির্দিষ্ট কাজের পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবসা চালাত। নাবিক এবং কিছু কিছু ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেওয়া হত। প্রথা অনুসারে, জাহাজের ক্যাপ্টেন তার জাহাজে নিজের ব্যবসার মালপত্র রাখবার জন্য কিছুটা জায়গা সংরক্ষিত রাখতে পারতেন—স্বাভাবিকভাবেই সেরা স্থানটাই এ জন্য থাকত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৫৩-৫৪)। ১৫৬৪ থেকে ১৫৭০ পর্যন্ত, রাষ্ট্রের একচেটিয়া ভূমিকা নিয়ে বিশেষ জোরাজুরি করা হত না। কখনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এশীয় বাণিজ্যে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও কোনও বিশেষ জিনিসের, একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার, বিশেষ একটা সময়ের জন্য, অর্থের বিনিময়ে কোনও বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেও দেওয়া হয়েছে।

খুব সম্ভবত, মোট বাণিজ্যের ৯০ শতাংশই বেসরকারি বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটা হিসেবে, মোট বস্ত্র বাণিজ্যের আর্থিক মূল্যের নিরিখে ৬২ শতাংশই নিয়ন্ত্রিত হত বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৩৭)। বাংলার তিনটি লোভনীয় বন্দরের পথ ছিল, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম এবং ওড়িশার পিপ্‌লি হয়ে (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৫৫)। এই বন্দরগুলি নিয়ন্ত্রণ করত 'ছাতিন'রা। পোর্তুগিজ সেনাবাহিনী থেকে পলাতক এই 'ছাতিন'-দের প্রতি গোয়ার প্রশাসন শত্রুভাবাপন্ন ছিল। গোয়ার ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও এদের বিরুদ্ধে ছিল। কারণ, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার এদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ডাচ কর্তৃপক্ষ এ কারণে, ১৬২৯ সাল থেকে ১৬৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ে 'ছাতিন'-দের ১৫৫টি জাহাজ হয় বাজেয়াপ্ত নয় ধ্বংস করেছিল (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৬০-৬২)।

বাণিজ্যের বড় অংশটাই বেসরকারি হাতে থাকলেও, রাষ্ট্রের ভূমিকা মোটেই কম ছিল না। রাষ্ট্রের নৌশক্তি, কূটনৈতিক প্রভাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা পরিকাঠামো ব্যক্তি মালিকের সহায়তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল।

ইউরোপের বাজার দখলে ছিল ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির?

ইউরোপীয় বাণিজ্যের এই বিশেষ দিকগুলি—বড় মাত্রায় ব্যবসা চালানো, আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহার এবং এলাকা দখলের চেষ্টা—সমসাময়িক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের চোখ এড়িয়ে গেছে। ডাচ বাণিজ্য সম্পর্কে ওম প্রকাশের বিবরণী বা তপন রায়চৌধুরীর আলোচনা অবশ্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। ভারতে এবং বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে এই বিষয়গুলি এত অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত যে, বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গেলে, সমস্ত ঘটনা এবং প্রভাব বিষয়ে আমরা একটি খণ্ড চিত্রই মাত্র পাব।

বস্ত্রশিল্পে বাণিজ্য বাংলার অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বণিকরাই এই বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করত। ইউরোপের বাজারে ভারতীয়দের সরাসরি প্রবেশাধিকার ছিল না। ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমেই তারা বাণিজ্য করত। ভারতীয় পণ্যবস্তু নিয়ে একটি ভারতীয় জাহাজও সে সময় ইউরোপের বন্দরে পৌছায়নি। নৌ-বিজ্ঞান, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় গণিত বিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার জন্য মহাসাগর অতিক্রম করে বাণিজ্য প্রসার করতে পারেনি ভারতীয়রা। এই সমস্যা যদি নাও থাকত, জলদস্যু কণ্টকিত আরব সাগর পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করার সামরিক ক্ষমতাও তাদের ছিল না। একমাত্র ইউরোপীয় বণিকদের হাতেই ছিল উপযুক্ত জাহাজ, আধুনিক নৌবিজ্ঞানের সাহায্য আর সামরিক শক্তি।

১৬৩২ সালে হুগলি বন্দর থেকে মোগলরা যখন পোর্তুগিজদের উচ্ছেদ করল, তার আগের বছরে প্রায় ৬০ থেকে ১০০টি পোর্তুগিজ জাহাজ নিয়মিত এই বন্দরে আসত (মার্শাল, পি.জে., ১৯৭৫ : ৫১)। এই জাহাজগুলি পাটনার সুতি বস্ত্র, রেশম, সোনা আর গহনা নিত। বাংলার রেশম আর বহু সুগন্ধী এখান থেকেই পৌছত। মালদ্বীপ থেকে আসত ঝিনুক, শঙ্খ আসত টিনেভেলি উপকূল থেকে, গোলমরিচ আসত মালাবার থেকে, সিংহল থেকে আসত এলাচ। এছাড়াও মুক্তা আর হাতি আসত সিংহল থেকে (রায়চৌধুরী, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ১৭৯)।

পোর্তুগিজরা যে বাণিজ্য ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরাও সেই প্রথা মেনে চলেছিল। ভারতীয় বণিক আর দালালদের সাহায্য নিয়েই তারা কাজ করত। এতে ভাষা বা লোকাচারগত সমস্যাগুলি মোকাবিলা করা যেত। পরবর্তীকালে, পোর্তুগিজরা যখন এদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেল—এদের মধ্যে কয়েকজন প্রত্যক্ষ বাণিজ্যে যুক্ত হয়ে পড়ল। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের একটি দলিলে আমরা দেখি কসমে গোমেজ বলে একজন পোর্তুগিজ নামধারী ফরাসি কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৭৫ : ৬-৭, ১১৪)। গোয়া এবং কোচিন থেকে অনুমতিপত্র নিয়েই এদের অধিকাংশই ব্যক্তি বাণিজ্য করতেন বটে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় বাণিজ্যের গুরুত্ব হ্রাস পায় (সুব্রহ্মনিয়ম, সঞ্জয়, ১৯৮৭ : ২৭৩)।

বন্দর শহরের জন্ম

পোর্তুগিজদের সংস্পর্শে এসে বাণিজ্যের বিকাশের ফলে হুগলির মতো বেশ কিছু নতুন বন্দর গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রামের মতো বেশ কিছু প্রাচীন বন্দর সমৃদ্ধি হয়েছিল। এই অংশে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বাংলার মাটিতে প্রথম পা রেখেছিল পোর্তুগিজরা। এর আগে পর্যন্ত, যতদিন বাংলার সঙ্গে তাদের যোগ ছিল, চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর সঙ্গে তারা একটা আত্মিক যোগসূত্র বজায় রেখে গেছে। চট্টগ্রামকে পোর্তুগিজরা বলত "পোর্তো গ্র্যান্দে" অর্থাৎ মহান বন্দর (বারবোসা, ডুয়ার্টে ১৫১৮ : ১৩৯, ক্যামপোস, জে.জে .এ., ১৯৯৯ : ২১)। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে, ডি বারোস তাঁর এক লেখায় চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলার সমৃদ্ধতম বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতি পোর্তুগিজদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ তার অবস্থান। সমুদ্র এই বন্দর ছুঁয়ে রয়েছে—পোর্তুগিজদের তা খুব পছন্দের। আরেকটি কারণ, চট্টগ্রাম—তার ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়েই কোনও কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় ছিল না। বাংলার রাজা বা নবাবদের দখলদারির বাইরে থাকার জন্য, কখনও কখনও আরাকানের রাজা এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব করেছে। আরাকানের রাজা পোর্তুগিজদের বন্ধু। চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে পোর্তুগিজরা সমুদ্রপথের অন্য পণ্যজাহাজ থেকে টাকা আদায় করেছে, বাংলার শাসন ক্ষমতায় যখন যিনি ছিলেন, তার প্রতি কোনও করণে রুষ্ট হলেই পোর্তুগিজরা গঙ্গা মোহনা অবরোধ করেছে, বাংলার উপকূলবর্তী জলপথ ব্যবহার করে গ্রামে গ্রামে হামলা চালিয়ে ইচ্ছামতো দাস সংগ্রহ করে চালান করেছে (মার্শাল, পি.জে., ১৯৮৭ : ২১)।

সমুদ্রের গায়ে, কর্ণফুলি নদীর চারপাশের পরস্পরযুক্ত বিশাল জলাভূমি জুড়ে অবস্থিত ছিল চট্টগ্রাম, বাংলার বহু প্রাচীন সাগর বন্দর। নানা কারণে, এ সত্ত্বেও, চট্টগ্রামের জনবসতি ছিল খুবই ছোট। একটা কারণ হতে পারে, ইতিহাসের অধিকাংশ সময়, চট্টগ্রাম বাংলার অংশ ছিল না ফলে এই প্রদেশের মোট বাণিজ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশই এই বন্দরে আসত। আরাকান, ত্রিপুরা আর বাংলার মধ্যে এই বন্দরের অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল। আরাকানের রাজা ছিল প্রধান দাবিদার। উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এই বন্দর কয়েকটি গ্রামের সমাহার ছাড়া কিছুই ছিল না। জলাভূমির জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যকরও ছিল না (হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৮৭৬, ষষ্ঠ খণ্ড ১৫০, ১৯৯)। ১৫১৭ সালে জন দ্য সিলভিয়েরা চট্টগ্রামেই প্রথম পোর্তুগিজ কারখানা (অথবা ইউরোপীয়) স্থাপন করেন। ডিয়াঙ্গা (দক্ষিণডাঙ্গা অথবা ব্রহ্মডাঙ্গা)- তে প্রথম পোর্তুগিজ বসতি গড়ে ওঠে। হুগলি থেকে নৌকায় ডিয়াঙ্গায় যেতে সময় লাগত ১৪ দিন।

হুগলি

প্রথম দিকে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ বন্দরকে পোর্তুগিজরা আদর করে ডাকত "পোর্তো পিকেনো" বা ছোট্ট বন্দর নামে। চট্টগ্রাম সব সময়েই ছিল "বড় বন্দর"। সপ্তগ্রাম মরে যাওয়ার পর তার বাণিজ্য স্থানান্তরিত হয় হুগলিতে। হুগলি বন্দর পোর্তুগিজদেরই তৈরি। এই বন্দরই তাদের আদরের ডাকে হয়ে দাঁড়ানো "পোর্তো পিকেনো"। এই বন্দরের প্রতিষ্ঠাতা কোনও এক টাভার্স। এই ব্যক্তিই আমরা দেখেছি সম্রাট আকবরের কাছ থেকে ফরমান পেয়েছিলেন।

হুগলি নামটির উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক আছে। কারও মতে এই শব্দটির উৎপত্তি 'গোলা' অর্থাৎ শস্যভাণ্ডার থেকে। কেউ বলেন 'হোগলা' থেকে 'হুগলি' হোগলা ঘাসে, সে সময় ভরে থাকত আশপাশের মাঠঘাট। নদীর নাম হিসেবে 'হুগলি' কিন্তু যথেষ্ট সাম্প্রতিক। ১৫৭৭ সালে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কিন্তু 'হুগলি' বলে কোনও নদীর উল্লেখ নেই (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ২৭এন, ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৬৪-৬৫)। ১৫৩৭ সালের পর সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের ফলে হুগলির গুরুত্ব বাড়ল (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ২৭এন, হান্টার, ডব্লু.ডব্লু. ১৮৭৬, ৩য় খণ্ড, ২৯৯, ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ২৯৯)। আকবর বাদশার ফরমান সম্ভবত এরপরে এসেছিল, ১৫৭৯-৮০ সালে। ১৫৮৮ সালে ফিচ গোটা হুগলি শহরকেই পোর্তুগিজ শাসনে দেখেছিলেন।

ক্যাব্রাল হুগলি বন্দরকে ভারতীয় এবং এশীয় বাণিজ্যের মিলনক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছিলেন (রায়চৌধুরী, তপন, ১৯৫৩)। শুরুতে স্থানীয় শাসকরা বণিকদের দুর্গ দূরের কথা, ইটের বাড়ি তৈরি করার অনুমতিও দিত না। এমনকী, ১৬৩২ সালে যখন পোর্তুগিজরা মোগল বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল, তখনও, কোনও দুর্গ বা প্রাকারের সাহায্য তারা পায়নি। যদিও সেই সময়ের মধ্যে তারা বেশি কিছু বড় বড় পাকা বাড়ি তৈরি করে ফেলেছিল।

পাকা বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে, স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন ছিল না। পোর্তুগিজরা নিজেরাই এ কাজ করেছিল—এ সম্পর্কে একাধিক মত আছে। আকবর জীবনচরিত "বাদশানামা"র রচয়িতা আবদুল লাহোরির মতে, সন্দীপ থেকে আগত পোর্তুগিজরা "বিক্রিবাটার জন্য দরকারি এই অজুহাতে বাংলো ধরনের অনেকগুলি বাড়ি তৈরি করা শুরু করে। বাংলার শাসকদের অজ্ঞানতা এবং অবহেলার সুযোগ নিয়ে, ধীরে ধীরে ইউরোপীয় এই বণিকরা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, প্রচুর বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করে। এই প্রসাদগুলিকে কামান, গাদা বন্দুক আর অন্যান্য সমর সরঞ্জাম দিয়ে দুর্গের চেহারা দেওয়া হয়। দিনে দিনে, এইভাবে, হুগলি বন্দর নামে এক বিরাট অঞ্চলের পত্তন হয়।" ক্যামপোসের মতে, লাহোরির বিবরণী আজগুবি। ফ্রেয়ার হুস্টেনকে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "সেই সময় পর্যন্ত (যে সময় পোর্তুগিজরা ফরমান পেলেন—লেখক) নদীতীরে বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি গুদাম ছাড়া অন্য কিছু গড়বার অনুমতিই পায়নি। প্রতি বছর গোয়ার ফিরবার সময় এই গুদামগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হত.(ক্যাম্পোস, জে.জে.এ. ১৯১৯ : ৪৮-৪৯, হুস্টেন : ৪২-৪৩)। ক্যামপোসের মতে হুগলি শহরের শুরু ১৫৩৭

সালে। ১৬৩২ সালের সংঘর্ষের আগের সময়ও হুগলি পোর্তুগিজ দখলেই ছিল" (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯, ২৯৯)।

প্রথমদিকে পোর্তুগিজরা এই স্থানকে তাদের সাময়িক আবাস হিসেবেই তৈরি করেছিল। পরে, তাদের অনেকে বেশিদিন ধরে বাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় শিকদারদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক তৈরি হয় (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ২৮এন)। ধীরে ধীরে স্থানীয় শাসকরা পোর্তুগিজ যাজকদের আসার অনুমতি দেয়। বহু দেশ থেকে নানা রকম বাণিজ্য সামগ্রী আসতে শুরু করল। মালদ্বীপের কড়ি, তুতিকোরিনের শাঁখ, রেশম, জরি, দক্ষিণ ভারতে সার্টিন, মালাবারের গোলমরিচ, সিংহলের এলাচ, মালাক্কার জয়িত্রী আর জায়ফল, বোর্নিও-র কর্পূর, চীন থেকে পোর্সেলিনের জিনিস, লেখার টেবিল, পালঙ্ক—কত জিনিস। অবশেষে ভারত সম্রাটের কানেও এই সংবাদ পৌঁছল। একটা সময়, প্রায় ৫০০০ পোর্তুগিজ নাগরিক হুগলিতে বাস করত (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ২৮, ২৯, ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৫৯)।

হুগলির নাম যত ছড়িয়ে পড়ল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পোর্তুগিজ নাগরিক এ শহরে জড়ো হতে শুরু করল। এদের সবাই ভালোমানুষ ছিল না। সেবাস্টিয়ানের মতে, "এদের অধিকাংশই অভাবী, ছিনতাইবাজ, সমাজ থেকে বিতাড়িত।" কিন্তু এরাই "পূর্ব গোলার্ধের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী" হুগলিকে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু "এখানকার পোর্তুগিজরা কারও অধীনে ছিল না, গোয়া প্রশাসনেরও নয়, নিজেদের অধিনায়ক তারা নিজেরাই ঠিক করত" (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ৪১)।

আস্তে আস্তে পোর্তুগিজরাই এই শহরের হর্তাকর্তা হয়ে উঠল। মোগলরাও তা মেনে নিল। কারণ, এই বন্দর থেকে যে বিশাল বাণিজ্য চলত, তার শুল্ক বাবদ তারা মোটা টাকা পেত। পাথর বা ইঁটের তৈরি বাড়ি বিশেষ ছিল না। বেশিরভাগ বাড়িই ছিল খড়ের চালের, মাটি, কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরি। স্থাপত্যের দিক দিয়ে অধিকাংশ নির্মাণ ছিল চৌচালা, বাংলো বা জলটুঙ্গী ধরনের। পুকুরের মাঝখানে মাচা তৈরি করে জলটুঙ্গী তৈরি হত (রায়চৌধুরী, তপন, ১৯৫৩)।

১৬৩২ সালের সংঘর্ষের পর হুগলিকে রাজকীয় নগরী বলে ঘোষণা করা হল। সরকারি ফরমান পেলো ব্রিটিশ আর ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। হুগলিকে কেন্দ্র করে চারপাশে, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক রাষ্ট্রগুলি নিজস্ব ঘাঁটি গড়ে তুলল। ১৬৫০-৫১ সালে ব্রিটিশ কারখানা গড়ে উঠলো। ইংরেজরা বহু সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য আর বাগানও তৈরি করল (বাউরি, টমাস, ১৯০৫ : ১৬৬-১৬৯)। উইলিয়াম ফিনচ্ ১৬০৮ থেকে ১৬১১ সালের মধ্যে কোনও এক সময় বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী অনুসারে, "বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে দুটি রাজকীয় বন্দর আছে। একটি হুগলি (পোর্তুগিজরা যেখানে মাৎস্যন্যায় চালিয়েছে) আর অন্যটি পিপলি" (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২৯ : ১৮২)। ১৬৯০ সালে জব চার্নক প্রতিষ্ঠিত কলকাতা নগরীর বিকাশের আগে হুগলিই ছিল বাংলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

এই নগরীর চুঁচুড়া অংশটি তৈরি করেছিল ডাচরা। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত এই এলাকা তাদের দখলেই ছিল। জাভার বদলে এই অঞ্চলটি তারা ইংরেজদের ছেড়ে দেয়। হুগলির

কাছে ব্যান্ডেল শহরের প্রতিষ্ঠা হয় ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে, মোগল বাহিনীর হুগলি দখলের এক বছর পরে। ১৫৯৯ সালে আগাস্টিনিয়ানদের তৈরি করা (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯৯৯ : ৪৪, ৫৬) প্রাচীন চার্চ, এখনও, বিশাল পোর্তুগিজ বসতির সাক্ষ্য বহন করছে। 'ব্যান্ডেল' শব্দটির ইংরেজি মানে 'বসতি' (ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯: ৪৬; রায় নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৬৭৩-৬৯০)। আজকের হুগলি জেলার অন্যতম প্রধান শহর শ্রীরামপুর ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ড্যানিশ বসতি ছিল। এক চুক্তিতে এই শহর ব্রিটিশ অধিকারে আসে। বৈদ্যবাটি, বাঁশবেড়িয়া, ভদ্রেশ্বর, কোতরং, উলুবেড়িয়া, বালি, উত্তরপাড়া, চাঁপদানি, কোন্নগর, মহেশ আর তারকেশ্বর—ওই সব শহরগুলির উৎপত্তির পেছনে ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভূমিকা রয়েছে। চন্দননগর তৈরি করেছিল ফরাসিরা, পলাশি যুদ্ধের প্রাকমুহূর্তে ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা তা কেড়ে নেয়। ১৭৬৩-তে ফিরিয়ে দিয়ে ১৭৯৪-এ আবার দখল করে। শেষ পর্যন্ত ১৮১৬ সালে শহরের অধিকার আবার ফরাসিদের ফিরিয়ে দেয় তারা (ক্যাম্পোস, জে.জে এ., ১৯১৯ : ৩০১-৩০৭)।

১৬৮৭ সালে হুগলিতে আবার বিরোধ বাঁধে, এবার ইংরেজদের সঙ্গে মোগলদের। ফলে ইংরেজদেরও হুগলি ছাড়তে হল (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ২৯৯-৩০০)। এই যুদ্ধে, বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে হুগলি বন্দরের দুর্বলতা ইংরেজদের কাছে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ল। অন্য সমস্যা ছাড়াও এই বন্দর অবস্থিত ছিল সমুদ্র থেকে অনেক দূরে। অজানা বিপদসংকুল নদীপথ ধরে এখানে পৌঁছতে হতো। এছাড়া, এই বন্দর ছিল নদীর পশ্চিমতীরে, স্থলপথে মোগল সৈন্যরা সহজেই হানা দিতে পারে। বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাচ আর ফরাসি ঘাঁটিও ঢিল ছোড়া দূরত্বে।

ব্যাঁটরা, হাওড়া আর অন্যান্য ছোটখাটো বসতি

ফ্রেডারিকের গ্রন্থে ব্যাঁটরা শহরের উল্লেখ রয়েছে। ব্যাঁটরা এখন হাওড়া শহরের অংশ। ব্যাঁটরা ছিল একটা অস্থায়ী বন্দর। জাহাজ ভিড়লে প্রাণ পেত, জাহাজ চলে গেলেই বসতি গুটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। "রাতারাতি গ্রাম তৈরি হয়, গ্রাম ভেঙে যায়। খড় আর অন্য দরকারি উপকরণ দিয়ে বাড়িঘর,. দোকানপাট গড়ে ওঠে। জাহাজ যতদিন থাকে গ্রাম থাকে, জাহাজ বন্দর ছেড়ে পাড়ি দিলেই সবাই নিজে নিজের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়" (ফ্রেডারিক, সিজার, ১৫৮৮ : ২৩)। এর ফলে দুটি বিষয় আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। এক, হুগলি বন্দরের প্রভাব নিকটবর্তী বাণিজ্যনির্ভর এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দুই, স্থানীয় প্রশাসন প্রথম দিকে পোর্তুগিজদের পাকাবাড়ি বানাবার অনুমতি দেয়নি।

হুগলি ছাড়াও, পোর্তুগিজদের প্রভাবে আরও কিছু বসতি গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ছিল মেদিনীপুরের হিজলি বা শ্রীপুরের কাছে চন্দেখান-এর মতো অঞ্চল (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ২৫)।

মোগলদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খুররম যখন বাদশাহী সৈন্যের তাড়ায় পালিয়ে বাংলায় আসেন, প্রাণে বাঁচতে, তিনি পোর্তুগিজদের সাহায্য চান। পোর্তুগিজরা ধারণাই করতে পারেনি যে, খুররম একদিন ভারত সম্রাট হবেন, আর তাদের তার ফল ভোগ করতে হবে। ফলে তারা তাঁকে সাহায্য তো করেইনি, উল্টে ব্যঙ্গ করে বসল (হান্টার, ডব্লু.ডব্লু, ৩য় খণ্ড : ২৯৯; রায়চৌধুরী, তপন কুমার, ১৯৫৩ : ৫২)। স্থানীয় মোগল প্রশাসকরা, নবাব ইব্রাহিম খানের নৌবহরে কামান দাগার কাজ করে। তারা ব্যঙ্গ করে বাদশাজাদাকে চটিয়ে রাখে (হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু., ১৯৭৬, ৫ম খণ্ড : ৪৪)।[৬]

আট বছর পর পাশা উল্টে যায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর খুররম-ই শাহজাহান নাম নিয়ে মসনদে বসলেন। মসনদে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, নবনিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসকের নালিশ পেয়ে তিনি নড়েচড়ে বসলেন। প্রশাসকের নালিশ ছিল, পোর্তুগিজরা হুগলিতে দুর্গ বানাচ্ছে আর ক্রমশই দুর্বিনীত এবং অত্যাচারী হয়ে উঠছে, তাই শুনে বাদশাহ বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। তারা সাড়ে তিন মাস ধরে হুগলি বন্দর অবরোধ করে রেখে অবশেষে ১৬৩২ সালে পোর্তুগিজদের শহর ছাড়তে বাধ্য করল।

শাহজাহানের এই ধরনের কাজের পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। কিছু কারণ ছিল একেবারে ব্যক্তিগত, কিছু ছিল পোর্তুগিজরা উপকূল এলাকায় যেসব কাণ্ড ঘটাচ্ছিল—তার ভিত্তিতে। এছাড়া ছিল, পোর্তুগিজদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ, সেটা ব্যবসা হোক বা উপনিবেশ গঠন হোক, পিতার বিরুদ্ধে শাহজাহানের বিদ্রোহের সময় পোর্তুগিজরা সাহায্য করেনি—এ কথা তাঁর স্মরণে ছিল। তদুপরি, শাহজাহান মসনদে আসীন হওয়ার পর, প্রথাসম্মতভাবে কোনও উপহারও পাঠায়নি পোর্তুগিজরা। ইতিমধ্যে, ভারত সরকারের চোখে পোর্তুগিজ সমাজের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছিল। জলদস্যুতা আর আরাকানিদের সঙ্গে মিলে চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে আশেপাশের উপকূল অঞ্চলে দাসব্যবসা চালানোর খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ ছিল, হুগলির পোর্তুগিজরা মগ রাজাকে ছিপ নৌকো আর অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে। ধর্মান্তরকরণের চেষ্টাও সন্দেহের উদ্রেক করেছিল (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩; ৩২২-৩২৩)।

বাদশাহের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছাড়াও, হুগলি দখলের জন্য মোগল বাহিনীর আক্রমণের পিছনে, পোর্তুগিজদের দাসব্যবসা, বিশেষ করে নারীদের দাস হিসেবে চালান করার অভিযোগ অন্যতম কারণ ছিল। রোহতাসে প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের দুজন দাসীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করেছিল। যুদ্ধ বাধার আগে, মোগল বাহিনী প্রতিটি পোর্তুগিজ নাগরিকের বাড়ি খানাতল্লাশ করে দেখতে চেয়েছিল কোনও বাঙালি দাস বা দাসীকে আটকে রাখা আছে কি না। যুদ্ধের শেষে, পরাজিত পোর্তুগিজরা সকল দাসদাসীকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়—এমনকি যাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল তাদেরকেও (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড-২, ৪০০-৪০৪)।

এই সংঘর্ষের যতটুকু তথ্য মেলে, তাতে, দুপক্ষের সংঘাতের তীব্রতা টের পাওয়া যায়। ২২শে জুন মোগলবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। বিপক্ষে ছিল শ তিনেক পোর্তুগিজ, কয়েক হাজার খ্রিস্টধর্মান্তরিত স্থানীয় মানুষ, বর্ণশংকর এবং অন্যান্যরা। পোর্তুগিজরা

সংখ্যায় ছিল অনেক কম। কোনও দুর্গ বা প্রাচীর-পরিখার সাহায্যও পায়নি তারা। পোর্তুগিজ নিযুক্ত ২০০০ বাঙালি নাবিক প্রথম আত্মসমর্পণ করে। অবস্থা আরও জটিল হল যখন মার্টিন আলফানসো ডি মেলো বিশ্বাসঘাতকতা করে ঢাকা থেকে এসে মোগলদেব পাশে দাঁড়াল। বহু ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অবরোধ জারি রইল। অবশেষে, পোর্তুগিজরা এবং বাছাই করা কিছু ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান নদীপথে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু নানা বিশৃঙ্খলায় সামান্য কয়েকটা নৌকাই, ব্যাটরায় ডা মেলোর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধের শেষে; সাগরদ্বীপে গিয়ে ডিয়াঙ্গা আর গোয়া থেকে আসা সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারল। লড়াই-এর শেষে শখানেক পোর্তুগিজ পুরুষ, ৬০-৭০ জন পোর্তুগিজ নারী আর তিন হাজারের কম বর্ণশংকর, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, পোর্তুগিজ সহযোগী পালাতে সক্ষম হল। মোগলদের দাবি অনুসারে পোর্তুগিজ পক্ষের প্রায় দশ হাজার জন প্রাণ হারিয়েছিল। পোর্তুগিজদের দাবি তারা প্রায় ৪৩০০জন মোগল সৈন্যকে হত্যা করেছিল। মোগল সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৪০০ "ফিরিঙ্গি"-কে আগ্রায় বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ অথবা আজীবন বন্দিদশা—দুটির মধ্যে একটা বেছে নিতে বলা হয়েছিল তাদের (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩২৩-৩২৭; হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৩ : ২৯৯-৩০০; ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ৪২৩)।

১৬৩৩ সালে, পোর্তুগিজদের হুগলিতে ফিরতে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই আঘাত তারা সামলে উঠতে পারেনি (চৌধুরী, সুশীল : ৫-১০)। এর পর থেকে, আরাকানের দখলে থাকা চট্টগ্রামেই পোর্তুগিজরা আরাকান রাজ্যের সংসর্গ ত্যাগ করে। রাজা সুধর্মা রাজের মৃত্যুর পর, রানির প্রেমিক যুবরাজকে হত্যা করে সিংহাসনে আসীন হয়। নিহত রাজার মামা মঙ্গত রাই সে সময় ছিলেন চট্টগ্রামের শাসক। আরাকান রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতার সংবাদ পেয়ে মঙ্গত রাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। আরাকানের নতুন রাজা তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করলেন। আরাকান রাজের তাড়া খেয়ে, মঙ্গত রাই, তৎকালীন বাংলার নবাব আসলাম খানের আশ্রয় নিলেন। পোর্তুগিজরা এবং তাদের ধর্মান্তরিত সহযোগীরাও আরাকান রাজের ভয়ে মঙ্গত রাই-এর সঙ্গে চট্টগ্রাম ত্যাগ করল। ১৬৩৮ সালে, নতুন মগ রাজ যখন ঢাকা শহরে নৌ আক্রমণ করেন, পোর্তুগিজরা নবাব আসলাম খানের পাশেই ছিল (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৩৭ : ৩৩১-৩৩২)।

চট্টগ্রাম : ১৬৭০-এর দশকে আরাকান রাজের সঙ্গে বিরোধ

শায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয় দফায় বাংলার নবাব হয়ে আসার পর, আরাকানি শাসকদের হটিয়ে চট্টগ্রাম দখলের সিদ্ধান্ত নিলেন। পোর্তুগিজদের তিনি মোটা বেতনের বিনিময়ে, নিজের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলেন। আরাকান রাজের কাছে পোর্তুগিজরা যে বেতন পেত, তার দ্বিগুণ বেতন দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন তিনি। এছাড়া ঢাকাতে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল। বাংলার কয়েকজন পোর্তুগিজ বণিককে তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, তারা যেন মোগলদের পক্ষে থাকার জন্য অন্য খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদেরও চিঠি পাঠান। এই ধরনের কিছু চিঠি, চক্রান্তে অথবা ঘটনাচক্রে মগদের হাতে পৌঁছল। তারা আরাকান রাজকে বোঝাল, পোর্তুগিজদের আর বিশ্বাস করা উচিত নয়। এর ফলে,

আরাকানবাজ পোর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ছাড়ার আদেশ দিলেন। পোর্তুগিজরা আসন্ন যুদ্ধে মোগলদেব সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিল (ট্যাভারনিয়র, জন ব্যাপটিস্ট, ১৯৮৪: ৫৬; হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৫ : ৪৪; হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৬ : ২৪৪) আরাকান রাজের সঙ্গে নবাব শায়েস্তা খাঁর যুদ্ধে, নবাবের কুড়িটি ছিপ[৭] নৌকাবাহিনীর অধিনায়কত্ব নেয় পোর্তুগিজরা। এই নৌকাগুলির বেশ কয়েকটি ছিল ১০০ দাঁড়ির। ৫০টি দাঁড়ের এই নৌকাগুলিতে, প্রতি দাঁড়ে দুজন দাঁড়ি লাগত। এই ছিপ নৌকাগুলি দ্রুত জল কেটে যেতে পারত (ফ্রেডারিক, সিজার, ১৫৮৮ : ৫৬; হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৬ : ১১১)।

জমি আর সমুদ্র—দুই পথেই এই লড়াই চলেছিল। পোর্তুগিজবা সহযোগিতা করলেও, মোগলবা তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করত না। সেজন্য বাটাভিয়া থেকে সাহায্যের জন্য ডাচদের ডেকে পাঠানো হয়। অবশ্য তারা পৌঁছবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। শায়েস্তা খাঁ, নিজেও, সেনা পরিবহনের জন্য বহু ছিপ নৌকা আর বড় জাহাজ তৈরি করান।

নবাব দুটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। একটি স্থলপথে, অন্যটি সমুদ্র পথে। সমুদ্র পথে আসা বাহিনী সন্দীপ দখল করে, ঢাকায় জমি এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পোর্তুগিজদের মোগলদের সঙ্গে যোগ দিতে বলে। এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে হুমকিও ছিল: মোগলদেব সাহায্য না কবলে যুদ্ধ শেষে তাদের কোতল করা হবে। পোর্তুগিজবা মোগলদের প্রতিশ্রুতি এবং হুমকির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। তারা ৩০০টি আরাকানি জাহাজ বাজেয়াপ্ত করতে মোগলদের সাহায্য করে। যুদ্ধ শেষে, চট্টগ্রাম ছেড়ে বসতি তৈরি করে ঢাকায়। ঢাকার সেই অঞ্চল আজও ফিরিঙ্গ বাজার নামে খ্যাত (ট্যাভারনিয়ার, জন ব্যাপটিস্টা ১৯৮৪ : ৫৬ ; হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., খণ্ড ৫ : ৪৪-৪৫)

যাই হোক, বিজয়ের পরে, নবাব পোর্তুগিজদের দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। যদিও তাদের ঢাকায় আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৬ : ২৪৪)। হুগলির মতোই, পোর্তুগিজরা চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসাব ফলে, ১৬৮৫ সালের পর ইংরেজদের চট্টগ্রাম আসার পথ সুগম হল (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৬ : ১১১-১১২)। লক্ষনীয় যে, চট্টগ্রাম দখলের যুদ্ধে মোগলবা ডাচদের নৌ সহায়তা চেয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে ভাবতেব সাগরপথে, সে সময় ডাচরা পোর্তুগিজদের থেকে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

ভাড়াটে সৈন্য, জলদস্যু এবং দাসব্যবসায়ী হিসেবে পোর্তুগিজরা

ভাড়াটে সৈন্য

১৬৩২ সালে মোগলবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হওয়ার পর পোর্তুগিজদের "অবস্থা খুবই করুণ হয়ে পড়েছিল। তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে উঠল বিভিন্ন স্থানীয় শাসকদের সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্যের কাজ" (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৬১)। ১৬৮৭ সালের জানুয়াবি মাসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রাম দখল করে দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬৮০ সালে পোর্তুগিজরা, ওই অঞ্চলে তাদের প্রভাব হারিয়ে, ইংরেজদের প্রয়াসে তাদের অবদান রাখে।

সেই ছোট ইংরেজ বাহিনীর ১১৫ জন ছিল অ-পোর্তুগিজ ইউরোপীয়, ১৬৯ জন ছিল পোর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্য (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯)।

যাইহোক, পোর্তুগিজ সৈন্যদের দক্ষতা সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণা ভালো ছিল না। কোম্পানির একজনের মতে, "এই পোর্তুগিজরা একেবারেই অপদার্থ" (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯)। ১৭৫০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ৫০০ থেকে ৬০০ সৈন্য ছিল। এর মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ ইংরেজ, প্রায় অর্ধেক ছিল ইউরো-এশীয় বা ভারতীয় খ্রিস্টান। বেশিরভাগই পোর্তুগিজ নামধারী ক্যাথলিক (মার্শাল, পি.জে., ১৯৭৫ : ১৫-১৬)।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের সময়, ইউরেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ১০০ জন ছিল পোর্তুগিজ বংশোদ্ভূত। ক্লাইভের বাহিনীর ৬১৩ জন ইউরোপীয় গোলন্দাজের মধ্যেও বেশ কয়েকজন পোর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ছিল (এডওয়ার্ড, মাইকেল, ১৯৬৩ : ১৩৫-১৩৮)। নবাব পক্ষেও বেশ কিছু পোর্তুগিজ ছিল—যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, নবাবের দুর্গ রক্ষা করেছে।

পোর্তুগিজদের মতো, অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রও, প্রাক-পলাশি যুগে, সামরিক বাজারে তাদের নাগরিকদের দক্ষতা বিক্রির অনুমতি দিত।[৮] বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এটা চালু ছিল। মোগল বাহিনীতে পোর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্যের অস্তিত্ব থেকে এবং বিদ্রোহী যুবরাজ খুররমের পোর্তুগিজদের সাহায্য চাওয়া থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। খুররমই পরে ভারত সম্রাট শাহজাহান হয়েছিলেন (নাথান, মির্জা, ১৯৩৬, খণ্ড ২, অংশ ৪ : ৬৫৬, ৬৯৩-৬৯৪, ৬৯৬, ৭৩৪, ৭৩৬, ৭৪৬, ৭৪৮)।

জলদস্যুতা

স্থলযুদ্ধ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামায় পোর্তুগিজদের লড়াকু মানসিকতার স্বীকৃতি মিলেছিল। কিন্তু সমুদ্রে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মোগলরা এবং তাদের আগে আফগানরা ভারত নামক এক বিশাল ভূখণ্ড শাসন করেছিল। পোর্তুগিজরা, তাদের পর ডাচ এবং ইংরেজরা আরও বিশাল অঞ্চলে অপ্রতিহত ছিল। ভারতের চারদিকের সাগর, মহাসাগর, উপকূলভাগ ছিল তাদের দখলে। মালদ্বীপের রাজা ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে ইউরোপীয়ানদের দমন করার আবেদন জানান। বালেশ্বরের ফৌজদার, শোনা যায়, এ বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, "যদি রাজাকে অনুগৃহীত করার জন্য সম্রাট এ দায়িত্ব নেনও, কিছুই করা যাবে না, কারণ সম্রাট কেবল স্থলভূমির প্রভু—সাগরের নয়" (প্রকাশ ওম, ১৯৯৮ : ১৩৯-১৪০)।

আমরা আগেই দেখেছি যে, পোর্তুগিজরা "কারতাজ" নামে এক ধরনের অনুমতি পত্র চালু করেছিল। উপকূলের কোনও পোর্তুগিজ ঘাঁটি থেকে সেই অনুমতিপত্র কিনতে হত। এই অনুমতিপত্র ছাড়া, কোনও দেশি-বিদেশি জাহাজ বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর বা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিতে পারত না। এই পত্রে যাত্রাপথ এবং যাত্রাকাল উল্লেখ থাকত। এই অনুমতিপত্র থাকলে জলদস্যুদের কবল থেকে নিস্তার পাওয়ার গ্যারান্টি মিলত। অনুমতিপত্রহীন জাহাজ দখল করা হত, নাবিকদের ঠাঁই হত কারাগারে (স্টিনগার্ড, নীলস, ১৯৭৩ : ৮৯; প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৪৪)। পারস্য উপসাগর হয়ে

ইউরোপ যাওয়ার এই পথে, এই ধরনের জবরদস্তি চলত (চৌধুরী, কে. এন., ১০; ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ১)।

সাগর পথে পোর্তুগিজ একাধিপত্যের নমুনা মেলে রাল্ফ ফিচের অভিজ্ঞতা বর্ণনায়। রাল্ফ ফিচ প্রথম ইংরেজদের একজন, ১৫৮৩ সালে যারা পোর্তুগিজদের এড়িয়ে স্থলপথে ভারত পৌছবার রাস্তা খুঁজে ভারতে আসে। আমরা তাদের ভাগ্যপরীক্ষার বিবরণী জেনেছি। ওরমুজে অবস্থানকালে তাদের পোর্তুগালের সিংহাসনের কোনও এক দাবিদারের চর সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতালিয়ানরা তাদের পোর্তুগিজদের হাতে তুলে দেয়। বন্দিদের সবচেয়ে আশঙ্কার ছিল এটাই। পোর্তুগিজরা তাদের গোয়া নিয়ে এসে কারাবন্দি করে। এক মাস বন্দি থাকার পর, বহু অনুনয়ের পর দুজন জেসুইট পাদরিকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। পাদরিদের একজন ডাচ, অন্যজন ইংরেজ। ইংরেজ পাদরি ফাদার টমাস স্টিভেন্স ছিলেন ভারতে আসা প্রথম ইংরেজ। তাদের হস্তক্ষেপে ফিচ এবং তার সঙ্গীরা জামিনে মুক্ত হন। জেলারের কাছে জমা রাখা অর্থ ফেরত চেয়ে ফিচ আবার বিপদে পরেন। তিনি খবর পান যে তাঁকে লিসবন পাঠানো হবে। তা এড়াতে, ফিচ গোয়া থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফতেপুর সিক্রিতে পৌছন এবং সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেন (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ১-৩)।

চট্টগ্রামে ঘাঁটি বানিয়ে এবং নদীর পারে হুগলিতে মূল নদী বন্দর তৈরি করে, পোর্তুগিজরা আরাকানের মগ অধিবাসীদের সাহায্যে প্রায়শই গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের নদীমুখ অবরোধ করত এবং, জাহাজ থেকে রক্ষাকর আদায় করত। মোগল এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ প্রশাসন এ কাজকে জলদস্যুতাই মনে করত (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৩ : ২৯৯)। বাদশাহ এক সময়, হুগলিতে বণিকদের উত্যক্ত করার জন্য পোর্তুগিজদের তাড়িয়ে দিতে শাহী ফরমান জারি করেছিলেন (গোপাল, রাম, ১৯৬৩ ২৪)।

বাণিজ্য করার সময়েও, পোর্তুগিজরা তাদের স্থাপন করা শহর বা ঘাঁটিতে স্বশাসন চাইত। হুগলি মোটামুটি তাদের দখলেই ছিল। শক্তিশালী মোগল প্রশাসন সেখানে নাক গলাত না (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৩ : ২৯৯; ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯৯৫ : ৫৭)। মোগল প্রশাসন আমদানি শুল্ক বাজারের ভাগ পেয়েই সন্তুষ্ট ছিল। এমনকী, বাদশাহী নৌকা, তা সে স্বয়ং নবাবের হলেও, হুগলি বন্দরে পোর্তুগিজ নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য ছিল। তা না হলে প্রবেশ অধিকার মিলত না (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯৯৯ : ৬০-৬২; রায়চৌধুরী, তপনকুমার : ৭২-৭৩)। পোর্তুগিজ অনুমতি ছাড়া যে কোনও নৌকাকেই শত্রু জাহাজ হিসেবে গণ্য করা হত। মোগল জাহাজগুলিও এই নিয়ম মেনে চলত (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৭৫ : ৯)।

পোর্তুগিজদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গার বুকে যে কোনও সংঘর্ষে তারা মোগলদের হারিয়ে দিতে পারবে (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৩৯-১৪০)। কালে কালে, হুগলির পোর্তুগিজরা মোগল সম্রাটের অধীনে রইল না। এমনকি ন্যূনতম শ্রদ্ধা জানানোর প্রথাও তারা বন্ধ করে দিল। হুগলি নদী, দুদিকেই স্থলভূমি, তাদের দখলে ছিল। শাহজাহানামায় উল্লেখ আছে, সেই সব স্থান থেকে পোর্তুগিজরা রাজস্ব আদায় করত (লং, ক্যাম্পোস, জে.জে.এ. দ্বারা উদ্ধৃত, ১৯১৯ : ৫৭)। সমকালীন একটি উদ্ধৃতি,

"বাস্তবপক্ষে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। এতটাই যে, নবাবের প্রতিনিধিরাও হুগলি শহরে ঢুকতেন না। পোর্তুগিজদের আমন্ত্রণ বা আতিথ্য ছাড়া তাঁরা হুগলিতে আসতেনই না। বাংলার নবাবের নৌবহরও কোনও কারণে হুগলি বন্দরে নোঙ্গর ফেললে, পোর্তুগিজ নিয়মকানুন মান্য করত' (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ৩৯৩)।

দাস ব্যবসা

চট্টগ্রাম বন্দরকে ঘাঁটি করে, আরাকানি মগদের সহযোগিতায়, পোর্তুগিজরা বাংলার উপকূল অঞ্চলে দাস ব্যবসা চালাত। ব্রাজিল এবং পশ্চিম আফ্রিকায় অতীতে যে কাজ তারা করেছে, এখানেও তাই করত। দ্রুতগামী নৌকা করে নদী বেয়ে গিয়ে, সাগরের কাছাকাছি মোহনা অঞ্চলে কোনও গ্রাম দখল করে, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ধরে আনত। এই অমানবিক কাজের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে, এরা খ্রিস্টান নয় (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ . ২৮৫; হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৫, ১৮৮)। ১৭৯৪ সালে সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জে. রেনেল লক্ষ করেন যে, বরিশাল (বাখরগঞ্জ) শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের জনসংখ্যা উল্লেখ করার মতো কম। তাঁর মত ছিল, "মগদের দৌরাত্ম্যেই এই অঞ্চল জনবিরল হয়ে পড়েছে"। তিনি উল্লেখ না করলেও মগদের সহযোগী ছিল পোর্তুগিজরা (হান্টার. ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৪ : ১১২)। ম্যানরিকও ফিরিঙ্গি আর মগদের এই লুণ্ঠন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, এই দাসদের পিপলি, চট্টগ্রাম আর সুমাত্রায় নিয়ে বেচে দেওয়া হত (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২, ৭২এন)। ক্যামপোস অবশ্য সুন্দরবন অঞ্চলের এই জনবিরলতার জন্য ঔপনিবেশিকতা আর নদীর গতিপথ পরিবর্তনকেই দায়ী করেছেন (ক্যামপোস, জে.জে.এ. ১৯১৯ : ২৫)। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের, ১৯৬৯ সালে, লিখেছেন, "গঙ্গার সুন্দরবন অঞ্চলের বহু সুন্দর বনসমৃদ্ধ দ্বীপ, আরাকান জলদস্যুদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত হয়েছিল" (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯ : ৪৪২)।

এই দৌরাত্ম্যের ঠেলায়, বাংলার নবাব খানাজাদ খাঁ ভয়পেয়ে, পোর্তুগিজ-মগ দস্যুদের মোকাবিলার দায়িত্ব অধস্তনদের হাতে ছেড়ে রাজমহলে আশ্রয় নিলেন। "বাকলা (বাখরগঞ্জ)-র মতো সমৃদ্ধ অঞ্চলে, লুঠেরা আর অপহারকদের দাপাদাপিতে এমন হল যে, বাতি জ্বালানোর জন্যও কেউ রইল না" (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩৭৮)। এই জলদস্যুরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত আসত। পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গম থেকে নৌকা করে তারা যশোর, বিক্রমপুর, আর হুগলি পর্যন্ত লুঠপাট চালাত। হিন্দু বা মুসলমান, যাদেরই তারা ধরত, হাতের পাতায় ফুটো করে, সেই সরু ফুটোর মধ্যে বাঁশের পাতলা কঞ্চি ঢুকিয়ে, নৌকার খোলে তাদের বন্দি করে রাখতো। প্রতিদিন, লোকে মুরগিকে যেভাবে দানা দেয়, সেইভাবে কাঁচা চাল ছড়িয়ে দেওয়া হত খাদ্য হিসেবে। ফিরিঙ্গিরা তাম্রলিপ্ত, বালেশ্বর আর দক্ষিণ ভারতের বন্দরে দাস বিক্রি করত। মগেরা দাসেদের কৃষি, গৃহস্থালী অথবা দেহব্যবসার কাজে লাগাত (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩৭৮-৩৭৯)। দাসদের ভিয়াঙ্গা বা পিপলিতে বিক্রি করে জাহাজ ফিরে আসতো। ১৫৯৯ সালে পোর্তুগিজরা, আরাকানেরা নিজেদের 'নিয়ে আসা বন্দিদের রাখবার জন্য একটি কেল্লা বানিয়েছিল।

ক্যামপোসের ভাবনায়, দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ পোর্তুগিজদের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্বাভাবিক দুঃসাহসিক প্রবণতার সঙ্গেও এই অঞ্চল খাপ খেয়েছিল। "জলের মতো ছড়ানো নদী উপনদীর এরকম সমাহার ভারতের আর কোথাও ছিল না। পোর্তুগিজদের মতো সাগরপ্রেমী সম্প্রদায়ের কাছে এই ভূগোল সবচেয়ে অভিপ্রেত। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত নৌচালনা দক্ষতা বা অভিযানপ্রিয়তা এখানে এসে স্বাভাবিক স্ফূর্তি পেয়েছিল।" "জলদস্যুত আর লুঠপাটের লোভ আর সন্ত্রাস প্রশ্রয় পেয়েছিল। সেই ভয়াবহ সন্ত্রাস এখনও লোককথায় রয়ে গেছে। গোলকধাঁধার মতো সর্পিল নদী পথে এই অভিযাত্রীরা ঝাঁপ দিত, আঘাত করত, আবির্ভূত হত আবার মিলিয়ে যেত, গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে শাস্তি এড়িয়ে উধাও হয়ে যেত' (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ২২)।

১৬২১ থেকে ১৬২৪ সালের মধ্যে পোর্তুগিজরা বাংলার নানা অংশ থেকে প্রায় ৪২০০০ দাস ধরে চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। তাদের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করা হয়। ম্যানরিককে পোর্তুগাল পৌঁছে দিয়েছিল যে জাহাজ, দিয়ে শুধু সেই একটি জাহাজের ডেকেই ৮০ জন দাস চালান হয়েছিল। বাণিজ্যের অন্যান্য উপকরণের মতোই, ভারত বা বিদেশের বাজারে দাস বেচাকেনা চলত। কাজির খাতায় এই বেচাকেনা লেখাও হত। এই দাসদের অনেককে খোজা করে দেওয়া হত—এদের মধ্যে কেউ কেউ পরের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উৎপাদনের কাজেও কারও কারও ব্যবহার হত। মালিকরা দাসেদের শ্রমের ফল ভোগ করতেন। কিন্তু এরকম ব্যবহারের সংখ্যা ছিল কম (রায়চৌধুরী, তপনকুমার, ১৯৫৩ : ১৬৪-১৭০; চৌধুরী, সুশীল, ২১)। পারস্যের একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ১৬৩৮ সালে মোগল নবাব, আরাকানের রাজাকে, পোর্তুগিজ হামলায় মুসলমান জনসাধারণের ভোগান্তি নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন (ইটন, রিচার্ড এম, ১৯৯৩ : ১৩৩-১৩৭)।

পাদরি লং-এর বিবরণী মত, ১৮২৪ সাল পর্যন্ত পোর্তুগিজ আর মগ জলদস্যু এবং দাস ব্যবসায়ীদের ভয় ছিল। ১৭৬০ সালেও, পলাশি যুদ্ধের তিন বছর পর, ইংরেজরা বর্তমান বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে হুগলি নদীর উপর, হার্মাদদের ঠেকাতে, ব্যবস্থা নিয়েছিল (সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, খণ্ড ২ : ৮১৫; ঘোষ, যামিনীমোহন, ১৯৬০ : ২-৩)।

ঔপনিবেশিক উচ্চাশা

১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামার অভিযানের সেই সুদূর অতীত থেকেই, ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের মনের কোণে ভারত জয়ের স্বপ্ন ছিল। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা অথবা পশ্চিম আফ্রিকায় যেভাবে বিশাল স্থানীয় বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে এক ছোট অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সামরিকভাবে আধুনিক সৈন্যদল বিরাট উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল-সেই সাফল্যের মধ্যে নিহিত ছিল এই উচ্চাশার বীজ। কালো চামড়ার মানুষকে তারা ঘৃণা করত। নিজেদের থেকে দুর্বল ভাবত তাদের। ব্রাজিলে, পোর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদীরা, স্যাও পাওলোতে বসতি করেছিল। প্রায়ই তারা শিকার পার্টির আয়োজন করত। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে স্থানীয় জনজাতিকে ধরে দাস বানিয়ে সারা দুনিয়ার নানা হাটে বেচে

দিত। পোর্তুগিজরা পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু নানা সংঘাতে জড়িয়ে পরে সফল হয়নি। কেবলমাত্র গোয়া আর কয়েকটা ছোটখাটো এলাকায় তারা উপনিবেশ গড়তে পেরেছিল (গ্রে, এডওয়ার্ড, ১৮৯২ : ১০-১২)। সেই সময়, সমসাময়িক এক পোর্তুগিজ ঐতিহাসিক বই লিখেছিলেন। বইটির নাম, "পোর্তুগিজদের ভারত আবিষ্কার এবং বিজয়ের ইতিহাস" (সৌফা, ম্যানুয়েল ডা ফরিয়া, ১৬৯৪)।

ভারতে বেশ কিছুদিন কাটাবার পর তাদের বোধোদয় হল যে, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার সামাজিক অবস্থার তুলনায় ভারতের সমাজ এত বড় যে এক কামড়ে তাকে হজম করা শক্ত। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা সমাজব্যবস্থা ওই দেশগুলির তুলনায় এতটাই উন্নত যে, ঝট করে তাকে কব্জা করা কঠিন। সেই জন্য, পূর্ব ভারতে তারা দুর্গম, জনবিরল, উপকূলে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। এই এলাকায় বাস্তবে কোনও কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। বাংলার নবাব অথবা আরাকানরাজ—কারও সার্বভৌম ক্ষমতা এখানে খাটত না। বিশেষ করে, পোর্তুগিজরা আগ্রহী ছিল চট্টগ্রাম বন্দরের উপর তাদের দখল বজায় রাখতে। ১৫৩৮ সালে পোর্তুগিজরা চট্টগ্রাম শহর অধিকারের একটা সুযোগ পেয়েছিল। সে সময় বাংলার নবাব, শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ক্যামপোসের মতে পোর্তুগিজ দলপতি সামপায়োর দ্বিধার জন্য তারা এই সুযোগ নষ্ট করল (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৪২)।

চট্টগ্রাম থেকে ১২০ মাইল দূরের সন্দীপ ছিল তাদের পরবর্তী লক্ষ্য। ফ্রেডারিক, সন্দীপের রাজাকে "মুর রাজাদের মধ্যে ভালো" আখ্যা দিয়েছিলেন। ম্যানরিকের মতো ফ্রেডারিক মুসলমানদের পছন্দ করতেন না (ফ্রেডারিক, সিজার, ১৫৮৮ : ৩৫-৩৬, ২৪১; ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২, ১১০)। যখন রাজা সিংহাসনচ্যুত হলেন। ১৬০৯ সালে পোর্তুগিজরা তাদের সেনাধ্যক্ষ সেবাস্টিয়ানের নেতৃত্বে সন্দীপের কেল্লা দখল করে নিল। একটি স্বাধীন ঘাঁটি গড়ে উঠল। গঞ্জালভেস ১০০০ পোর্তুগিজ, ২০০০ ভারতীয়, ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য আর ৮০টি কামান সজ্জিত জাহাজ নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন। কাছাকাছি আরও কিছু দ্বীপ তার দখলে এল। বাকলার রাজা তাকে সামরিক এবং বাণিজ্যিক উপকরণ জোগালেন। ১৬১০ সালে গঞ্জালভেস আরাকানরাজের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলা আক্রমণ করলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে গঞ্জালভেসের পরাজয় হল। এরপর আরাকান রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পোর্তুগিজরা আরাকানের একটি নৌবহর দখল করে। গোয়ার প্রশাসনের সমর্থন চেয়ে আরাকান আক্রমণ করলেন। আরাকানরাজ, ডাচ সাহায্যে পোর্তুগিজদের পরাস্ত করলেন (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২; হান্টার ডব্লু.ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৬ : ২৪১-২৪২)। ১৬০৭ সালে আরাকান রাজ পোর্তুগিজ মূল ঘাঁটি ডিয়াঙ্গায় গণহত্যা চালান, ১৬১৬ সালে গঞ্জালভেসকে পরাজিত এবং নিহত করে সন্দীপে পোর্তুগিজদের সন্ত্রাস স্তব্ধ করেন (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩, ৩৬১-৩৬৩)।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়

পশ্চিম উপকূলের পোর্তুগিজ জীবন ছিল সুস্থির, প্রশাসন ছিল সক্রিয়। তুলনায়, পূর্ব উপকূলে যে সব পোর্তুগিজরা এলেন তাদের চরিত্র অন্যরকম। এরা অভিযানপ্রিয়,

কোথাও স্থায়ী বাসা বাঁধতে অনিচ্ছুক। এদের কেউ গোয়া থেকে পলাতক, কেউ সেনাবাহিনী ছেড়ে আসা, কেউ বা ভাগ্যসন্ধানী। ভারতের এই অংশেই, তারা দেখেছিল, গোয়ার তুলনায় শাসনের কড়াকড়ি কম, সুযোগও প্রচুর। একটি মতে, এই পোর্তুগিজরা এক অর্থে "বন্য"। এরা অভাবী, অনেকেই পথ দস্যু, জীবনের মূলস্রোত থেকে বিতাড়িত (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ৪১এন)।

ভন সার্টিটেন নামে ডাচ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা ১৫৮৩ থেকে ১৫৮৯ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছিলেন। তার লেখায় কোনও কেল্লার উল্লেখ নেই (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ৪১এন)। তার বক্তব্যে আরও জানা যায় যে, হুগলির পোর্তুগিজদের অধিকাংশই গোয়াতে কোনও না কোনও অপরাধ করে পালিয়েছে (গোয়া তার ভাষ্যে হয়েছে ভারত), যে কারণে তাদের ফেরার উপায় নেই। তাদের বসবাস যত্রতত্র, বন্যদের মতো হাবভাব, বুনো ঘোড়ার মতো আচরণ। সার্টিটেন আরও লক্ষ করেছিলেন যে, বহু জাহাজ ওই বন্দরে ভেড়ে আবার পুবের নানা বন্দরে পাড়ি দেয়। ডাচ এবং পোর্তুগিজদের মধ্যে তৎকালীন ঘৃণা এবং শত্রুতা সার্টিটেন-এর মতামতকে প্রভাবিত করতেও পারে।

পাইরার্ড ডা লাভাল ১৬০৭ সালে চট্টগ্রাম ছিলেন। তিনি হুগলি আসেননি। তাঁর কানে এসেছিল হুগলিতে "তারা (পোর্তুগিজরা—লেখক) দেশীয় মানুষদের মতো জীবন কাটায়। শাসনহীন, কেল্লাহীন, যাজকহীন—কিন্তু অপরাধের জন্য ভারতে ফিরবার কোনও উপায় নেই তাদের"। এইখানেও ভারত অর্থে পশ্চিমভারতের পোর্তুগিজ অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। বাংলার পরিচিতি ছিল ভারতের বাইরের ভূভাগ হিসেবে। পাইরার্ডের ধারণায়, এখানকার পোর্তুগিজরা নিয়ন্ত্রণহীন জীবন কাটাত। সবার চোখেই, বাংলার সমৃদ্ধ বদ্বীপে আকৃষ্ট পোর্তুগিজরা ছিল হিংস্র, স্বেচ্ছাচারী। সুস্থির জীবনে তাদের কোনও আগ্রহই ছিল না।

এই বিশ্লেষণ সঠিক কিনা বলা শক্ত। এই ধারণার সপক্ষে আরেকটি যুক্তিও ছিল। সেই যুক্তি হল, পশ্চিম উপকূলের পোর্তুগিজরা যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করতেন তা এখানে অনুপস্থিত ছিল। বাংলার পোর্তুগিজরা কোনও সরকারি প্রশাসনের অধীন ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, হুগলির পোর্তুগিজরা সিংহলের পোর্তুগিজ প্রশাসনের আওতায় ছিল। সে অর্থে গোয়ার ঔপনিবেশিক সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের উপর। কিন্তু বাস্তবে, এই উপমহাদেশের মধ্যে হুগলির পোর্তুগিজরাই সবচেয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করত (ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৬৩)। লিন্সকোটেনও বলেছেন, পোর্তুগিজদের এখানে "কোনও কেল্লা ছিল না, প্রশাসনও ছিল না, ভারতের মতো কোনও নির্দিষ্ট নীতিও ছিল না"। কারও কর্তৃত্ব চলতো না এখানে, এমনকি গোয়ার প্রশাসনেরও নয়। নিজেদের নেতা তারা নিজেরাই বাছত (ম্যানরিক, ফ্রে, সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২ : ৪১এন)।

ক্যাম্পোস এই ধারণার সঙ্গে সহমত হননি। তাঁর মতে, এই পোর্তুগিজ সম্প্রদায়ের নিজস্ব যাজক ছিল না—একথা সত্য নয়। ক্যামপোসের জিজ্ঞাসা যে, ফ্রে ম্যানরিকের গ্রন্থ থেকে আমরা বহু তথ্য পেয়েছি—তিনি কি ছিলেন? তার ধারণা, নিজেদের সম্প্রদায়ের সমস্যা সামলানোর জন্য এখানকার পোর্তুগিজদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল। হুগলির প্রশাসন চালাতে, প্রতি বছর সেখানকার পোর্তুগীজ নাগরিকরা একজন নায়ক আর তার চারজন সহায়ককে নির্বাচিত করত। এরাই অন্যদের পক্ষে হুগলিতে পোর্তুগিজ রাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৬০-৬২)।

হুগলিতে, পোর্তুগিজ সমাজ বহুস্তরীয় ছিল। সবার উপরে স্থান ছিল খাঁটি ইউরোপিয়ানদের। তাদের নীচে ছিল বর্ণসংকর আর ধর্মান্তরিত ভারতীয় সমাজ। সবার নীচে ছিল বাঙালি আর দাসদের স্থান। এরা গায়ে গতরে খাটত, বন্দর আর পোর্তুগিজদের সম্পত্তি রক্ষা করত। থাকত মূল শহরের বাইরে—ফলে শত্রু আক্রমণের প্রথম চোট এসে পড়ত এদের উপরেই। ইউরোপীয় সমাজ আবার নানা পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত ছিল। তাদের একদল ছিল যাজক, যারা সংখ্যায় দক্ষ ইউরোপিয়ানদের থেকেও বেশি ছিল (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩২১)।

খাঁটি কথাটা হল, এই বন্য লোকগুলিই একজোট-হয়ে হুগলি শহর গড়েছিল। যে হুগলি পূর্বভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ শহর (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, খণ্ড ২: ৪১এন) অনেক নতুন জিনিস, এদের হাত ধরেই ভারতে এসেছিল। তার মধ্যে আছে বাজরা, আনারস, কাজুবাদাম। নতুন প্রতিষ্ঠান, যথা, অনাথ আশ্রম, হাসপাতাল, মিশনারি স্কুল গড়ে উঠেছিল। বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিল এই দেশের নাম (রায়চৌধুরী, তপনকুমার, ১৯৫৩; পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য)। বাংলা ভাষাও সমৃদ্ধ হয়েছিল তাদের শব্দভাণ্ডারে (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)।

ভারতীয় শব্দভাণ্ডারে 'জাতি' বা 'কাণ্ড' শব্দটি পোর্তুগিজদের দান। পরের যুগের সমাজ বিজ্ঞানীরা এই শব্দটি সামাজিক ব্যবস্থার উল্লেখ করার সময় ব্যবহার করেন। মজার কথা এটাই যে, সেই সামাজিক ব্যবস্থা, সবরকম নেতিবাচক চরিত্রসহ, সবরকমভাবেই ভারতীয় (মজুমদার, ডি.এন., ১৯৬১ : ৩০১)। একটা সময়, পোর্তুগিজরা যখন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির শীর্ষে, ভারত ভূখণ্ডের চারপাশের জলপথে যখন তাদের অপ্রতিহত প্রতাপ, পোর্তুগিজ ভাষাই ছিল সে সময় সব ইউরোপীয় বাণিজ্য ঘাঁটির সরকারি ভাষা। বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে তো বটেই। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পোর্তুগালের পতনের পরও বেশ কিছুদিন পোর্তুগিজ ভাষারই আধিপত্য ছিল। ক্লাইভ পোর্তুগিজ ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘোষণাপত্রে উল্লেখ ছিল যে, প্রতিটি গ্যারিসনে একজন উপদেষ্টা থাকবেন, এই উপদেষ্টাকে বাহিনীতে যোগ দেওয়ার এক বছরের মধ্যে পোর্তুগিজ ভাষা শিখে নিতে হবে। প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অন্য মিশনারিরা গির্জায় পোর্তুগিজ ভাষা ব্যবহার করতেন। ১৮১১ সাল পর্যন্ত কলকাতাতেও এ ব্যবস্থা চালু ছিল। রোমান হরফে ছাপা প্রথম তিনটি বাংলা ভাষায় লেখা ধর্মপুস্তক, ১৭৪৩ সালে লিসবনে ছাপা হয়েছিল (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯৬০ : ৩৯)।

সাধারণভাবে পোর্তুগিজরা বর্ণবিদ্বেষী ছিল না। দেশীয় লোকেদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে তারা আগ্রহী ছিল। বহু মিশ্র বিবাহের দৃষ্টান্ত আছে (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩৬৮)। জলদস্যু অধ্যুষিত অঞ্চল বাদে, যে অঞ্চলের মধ্যে বাংলার বিশাল পোর্তুগিজ বসতিও ছিল, অন্যত্র বিশেষ করে গোয়ায়, পোর্তুগিজ প্রশাসন এ ধরনের

অবৈধ বিবাহ বা বাছবিচারহীন যৌনসম্পর্কের পক্ষপাতী ছিল না (ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ১৭০-১৭১)। ইউরোপের অন্য কোনও দেশের মানুষ পোর্তুগিজদের মতো বর্ণবিষয়ে এত উদার নয়। তাদের স্বাভাবিক ঝোঁক স্থানীয় জনজাতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার। পোর্তুগিজ ঐতিহাসিক ক্যামপোস খুব গর্বিতভাবেই এই দাবি করেছিলেন। আফ্রিকার উপনিবেশ বা ব্রাজিলের ইতিহাস ঘাঁটলে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয় (ক্যাম্পোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ১৭৭)।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলনের ফলে একটা নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। কেউ তাদের বলেছেন "ইউরেশিয়ান", কেউ "অ্যাংলো ইন্ডিয়ান"। কলকাতার বস্তি অঞ্চলে এরা পরিচিত "কিনতালি" নামে। বাংলার পূর্ব অংশে এরা পরিচিত "ফিরিঙ্গি" অথবা টুপির জন্য "টোপাসেস" নামে। ঢাকা শহর থেকে সিকি মাইলটাক দূরে, বার্নিয়ের একদল বর্ণসংকর পোর্তুগিজদের বাস করতে দেখেছিলেন। এরা বাংলার নবাবের কাছে গোলন্দাজ, অশ্বারোহী সৈন্য বা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করত (বার্নিয়ার, ফ্রঁ্যাসোয়া, ১৯৬৯, খণ্ড ২ : ৪৯)। ১৬৬৬ সালের চুক্তির ভিত্তিতে, বাংলার নবাব এদের ঢাকায় কিছু জমি দিয়েছিলেন আমরা দেখেছি, এই স্থান পরবর্তীকালে মুন্সীগঞ্জের কাছে ফিরিঙ্গিবাজার বলে পরিচিত হয়। পরে, তারা রায়পুরা এবং রূপগঞ্জেও বসতি স্থাপন করে—নানা স্থানে গির্জাও তৈরি করে। কালক্রমে চট্টগ্রামে, ওড়িশার পয়েন্ট পালমিরাতে, হুগলির কাছে ব্যান্ডেলে ফিরিঙ্গি বন্দর গড়ে ওঠে। চুঁচুড়া আর হুগলির কাছে ব্যান্ডেলে, ১৫৯৯ সালে পোর্তুগিজদের তৈরি রোমান ক্যাথলিক গির্জা, আজও ওই অঞ্চলে প্রায় ১০,০০০ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষের বসতির সাক্ষ্য দেয় (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৩ : ৩০৭; হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৫ : ৪৫; বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯ : ৪৩৯; প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৬২)। পলাশি যুদ্ধের অন্যতম চরিত্র রাজা রাজবল্লভ, বরিশালের পাদ্রী শিবপুরের ছোট্ট পোর্তুগিজ বসতিতে জীবন নির্বাহ করেন (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩: ৩৬৭)।

আজকের বাংলাতেও পোর্তুগিজদের নানা চিহ্ন মেলে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক এবং স্থানীয় লোকাচারকে আত্মস্থ করায় তাদের আগ্রহই এর কারণ। কালক্রমে তাদের রং বা চেহারাও আর আলাদা নেই। হান্টারের মতে, "বিবাহ—পুনর্বিবাহের ফলে স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে তাদের চেহারায় কোনও তফাত নেই, যদিও ধর্মে তারা খ্রিস্টান" (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., খণ্ড ৫ : ৪৫)। তাদের নাম থেকে আর আলাদা করে তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। গোমেজ, কারভালহো, আলভারেজ, ডি সিলভা, ডি কোস্টা, গঞ্জালভেস প্রভৃতি এমন কিছু নাম আছে, যা থেকে বুঝি এক সময় তাদের শরীরে পোর্তুগিজ রক্ত ধাবমান ছিল। পরবর্তীকালে এই নামগুলিরও ভারতীয়করণ হয়েছে। যেমন, হ্যারি হয়েছে হরি, ম্যানুয়েল হয়েছে মুনু (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, খণ্ড ৫ : ৪৪-৪৫)। ১৯৪০ সালের এক নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়। "লম্বা, ফর্সা আর উন্নত নাসার যে সব মুসলমান এই বদ্বীপ অঞ্চলে আছেন, তাদের মধ্যে পোর্তুগিজ প্রভাব লক্ষ করা যায়" (মজুমদার, ডি.এন. এবং সি.আর. রাও, ১৯৬০: ১০১)।

কিনতালি বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা পোর্তুগিজ, ইংরেজ, ভারতীয়, পূর্বভারতীয়, পশ্চিমভারতীয় এমনকি চীনাদের বাছবিচারহীন যৌনসম্ভোগের ফলে উদ্ভূত সম্প্রদায়

হলেও এদের একটা বড় অংশ ছিল খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত নিম্ন জাতির হিন্দু। এরা বিলিতি পোশাক পরত, পোর্তুগিজ নাম নিত। এদের বংশধররাও পোর্তুগিজ পদবি বহন করত, অন্তত পক্ষে খ্রিস্টান নাম রাখত। ইংরেজদের সঙ্গে অন্তর্বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তানরা ইংরেজ নাম ব্যবহার করত। অনেকেই ছিল দাসদের বংশধর। মিশনারিরা এদের কিনে নিয়ে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করে পোর্তুগিজ নাম দিত। তারপর খ্রিস্টান প্রভুদের কাছে তাদের বেচে দিত। তুলনামূলক সাম্প্রতিক অতীতে, এদের অনেকেই অনুভব করল যে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিচিতিটি কর্তৃপক্ষের কাছে বেশি গ্রহণীয়। সেই কারণে তারা ইংরেজ পদবি নিতে শুরু করল। কোরিয়া হল কারি, লিল হল লী, সিলভা হয়ে গেল সলভার, সুজা পান্টে হল সুসম্যান, গোভিয়া হল গোভে (ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ১৮২-১৮৭)। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্য কিছু কারিগরি অথবা অল্প সম্মানজনক পদের চাকুরি, যথা, ট্রেনের গার্ড বা পুলিশ সার্জেন্ট, সংরক্ষিত রাখল।

ইংরেজ আমলের বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের দুজন উজ্জ্বল নক্ষত্র পোর্তুগিজ বংশোদ্ভূত। এদের একজন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ; পোর্তুগিজ পিতা এবং ইংরেজ মাতার সন্তান। আর একজন লোক কবি এবং গায়ক অ্যান্টনি কবিয়াল। অ্যান্টনি কবিয়াল হিন্দু লোককথাকে ভিত্তি করে গান বাঁধতেন এবং নানা স্থানে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন।

উপসংহার

১৪৯৮-এ ভাস্কো-ডা-গামার অমর সাগরযাত্রার পর ইতিহাসের পথ বেয়ে বাংলায় পৌছনো পোর্তুগিজদের নানা ভূমিকায় বিচিত্র উপাখ্যান নিয়ে আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। বণিক হিসেবে, ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে, দাস ব্যবসায়ী হিসেবে, জলদস্যু হিসেবে আবার বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সমাজের বিকাশে তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে নানা দিক থেকে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছি আমরা। পোর্তুগিজরা যে সময় ভারতে এসেছিল, আন্তর্জাতিক গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে সে সময়টি ছিল পোর্তুগালের স্বর্ণযুগ। গোয়া এবং পশ্চিমভারতের পোর্তুগিজ জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। পূর্বভারতে তাদের জীবনধারা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কারণ পূর্বভারতে উপনিবেশ গড়তে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। যেটুকু সাফল্য মিলেছিল তাও কালে কালে প্রথমে ডাচ, পরে ইংরেজরা দখল করে নেয়।

এ সত্ত্বেও, আমরা দেখেছি যে, পোর্তুগিজরাই বাংলার সঙ্গে ইউরোপের সরাসরি বাণিজ্যের পথ খুলে দিয়েছিল, অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি এনেছিল। পোর্তুগিজদের দেখানো পথ ধরেই ডাচ আর ইংরেজ বণিকরা এদেশে এল। ভারতের বাজারে প্রথম ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে অনুপ্রবেশের ফলে যে অপার সম্ভাবনা তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল তা তারা হেলায় নষ্ট করেছিল। অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করার বদলে তারা জলদস্যুতা বা দাস ব্যবসায়ের মতো অবাণিজ্যিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ল। এর ফলে, মোগল সম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে তারা মোগল প্রশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেল। এই

সংঘাতে তাদের পরাজয় আখেরে তাদের ভারতীয় বাজার থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল। ভারত সম্রাট পোর্তুগিজদের বিকল্প ইউরোপীয় বাণিজ্যিক দোসর খুঁজতে গিয়ে অন্যান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানালেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল তাদেরই একটি।

দ্বিতীয় অংশে আমরা ১৪৯৮ সালের সাগরপাড়ির ফলে বিশ্ব বাণিজ্যচিত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এর ফলে ভারবাহী পশু বা দেশি নৌকার যুগ চলে গেল না বটে, কিন্তু গোটা বাণিজ্য ব্যবস্থার চরিত্র পাল্টে গেল। বাণিজ্য আর ছোট, স্থানীয় ভিত্তিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক রইল না। গোটা বিশ্বে সক্রিয়, যৌথ মালিকানাভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান ঘটল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কূটনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে নিজের নিজের রাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতা পেত। বিশ্ব বাজার দখলের এই প্রতিযোগিতা প্রায়শই সামরিক সংঘাতের সূত্রপাত ঘটাত। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলেই, এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও সংঘর্ষ বাধত। অনেক সময় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের সিংহাসন দখলের লড়াই-এ কোনও-না-কোনও পক্ষকে সামরিক সাহায্য দিত। এরফলে, বিজয়ী পক্ষের আনুকূল্যে বাজার বিস্তারে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যেত, উপনিবেশ বিস্তারের স্বপ্ন এর ফলে প্রশ্রয় পেত। পোর্তুগিজরা পূর্বভারতে উপনিবেশ গড়তে সমর্থ হয়নি। কিন্তু গঞ্জালভেসের নেতৃত্বে তারা যে সামান্য কয়েক বছর সন্দীপ দখল করেছিল, সেই কয়েক বছরই তারা ভারতীয় উপকূল ভাগের জলপথে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল— তারা গঙ্গা মোহনা নিজেদের ইচ্ছেমতো অবরোধ করত। এছাড়াও, আরও নানা ভূমিকা থেকে প্রমাণ মেলে উপনিবেশ বিস্তারের লক্ষ তারা কখনওই বিস্মৃত হয়নি। পেরু এবং মেক্সিকোর অভিজ্ঞতায় তারা জানত সুশিক্ষিত, মরিয়া কিছু সৈন্য দিয়ে অনেক বিশাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা যায়। সেইজন্য তাদের বাণিজ্যের নিত্যসঙ্গী ছিল হিংসা। কারতাজ বা অনুমতিপত্রহীন জাহাজ বাজেয়াপ্ত করত তারা। গ্রামের দিকে ছিপ নৌকো চড়ে তারা ঝটিতি যাতায়াত করতে পারত। সেখানে গিয়ে গ্রাম দখল করে দাস সংগ্রহ করত তারা। গোটা দুনিয়ায় কোনও শক্তির পরোয়া না করে সেই দাস বিক্রি হত। এই সহজ এবং তাড়াতাড়ি লাভ মেলার ব্যবসা, প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্য সম্পর্কে তাদের নিরুৎসাহী করে। অনুৎপাদনশীল বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারা। সম্পদকে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে চালু রাখার বদলে অর্জিত সম্পদকে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করাই তাদের লক্ষ ছিল। মোগলদের সঙ্গে তাদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেই অনিবার্যতার ফলশ্রুতিই ১৬৩২-এ হুগলিতে সংঘর্ষ বাধাল এবং পোর্তুগিজরা ধ্বংস হল।

এই বাস্তবতার পাশাপাশি, দ্বিতীয় অংশে আমরা লক্ষ করেছি যে, বাংলার বাণিজ্যিক বিকাশে পোর্তুগিজদের অসামান্য অবদান ছিল। পোর্তুগিজরা বাংলার তাঁতবস্ত্রের মতো বহু উন্নত মানের হস্তশিল্পকে বিশ্বের বাজারে নিয়ে গিয়েছিল। এশিয়ার নিজস্ব বাজারে এগুলির বিশেষ চাহিদা ছিল না। ইউরোপের সম্পন্ন ক্রেতাদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে এই জিনিসগুলি খাপ খেয়েছিল। বদলে, পোর্তুগিজদের হাত ধরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ, আফ্রিকার উপকূল, এমনকী, ব্রাজিল থেকেও বহু সামগ্রী, বহু ফল, ফুল, চারা

এদেশে এসেছিল। এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ ভাগে আমরা দেখেছি, প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম আর ছোট বন্দর সপ্তগ্রামকে তারা কীভাবে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করেছিল। সপ্তগ্রামের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় হুগলিতে তারা গড়ে তুলেছিল নতুন বন্দর। একদা তাদের গুদাম বা গোলা ছিল যেখানে, সেই অঞ্চলই হয়ে উঠল বাংলার সবচেয়ে বড় শহর, পোর্তুগিজদের ছোট বন্দর বা পোর্তো পিকোনো। অবশ্যই তাদের সবচেয়ে পছন্দ ছিল চট্টগ্রামই। জলাভূমি ঘেরা সমুদ্র বিধৌত চট্টগ্রাম—যে অঞ্চলে কোনও কেন্দ্রীয় শাসন অনুপস্থিত। পোর্তুগিজদের মিত্র আরাকানের রাজা আর মগ আদিবাসীরাই বেশির-ভাগ সময় চট্টগ্রামেব উপর নিজেদের দখলদারি বজায় রেখেছিল। দাস ব্যবসায় মগরাই ছিল পোর্তুগিজদের সঙ্গী। ১৬৭০ সালে চট্টগ্রামের উপর মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পোর্তুগিজরা এই অঞ্চল ছাড়তে বাধ্য হয়। বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকার কাছে তাদের আশ্রয় জোটে।

তৃতীয় ভাগে, পোর্তুগিজদের সঙ্গে মোগল সম্রাটের বিভিন্ন সংঘাত, বিশেষ করে ১৬৩২ সালে হুগলিতে এবং ১৬৭০ সালে চট্টগ্রামে যে নির্ণায়ক সংঘর্ষ ঘটেছিল, তা বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ ভাগে, অবাণিজ্যিক কাজকর্ম যথা, ভাড়াটে সৈন্য, জলদস্যু বা দাস ব্যবসায়ী হিসেবে পোর্তুগিজদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম ভাগে, পোর্তুগিজ প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অংশে আমরা দেখেছি, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের তুলনায় পোর্তুগিজরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনেক বেশি মাত্রায় মেলামেশা করেছিল, স্থানীয় নারীদের সঙ্গে বৈবাহিক ও অন্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কয়েক পুরুষ ধরে এই ধরনের আন্তর্সামাজিক বিবাহের ফলে ওরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়েছিল। ইউরোপীয়ান পদবি আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা ইঙ্গ-ভারতীয় পরিচিতির আড়ালে সে চিহ্ন এখনও মেলে।

বাংলার বাণিজ্যে এবং উপকূল অঞ্চলে পোর্তুগিজদের স্বল্পকালীন আধিপত্যের স্থায়ী ছাপ পড়েছে বাংলা ভাষা এবং বাংলার গাছগাছালির উপর। কিন্তু বাংলায় আন্তর্জাতিক, পুঁজিনির্ভর বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটানোর জন্যই পোর্তুগিজদের আমরা মনে রাখব। তাদের দেখানো পথ ধরেই বাংলার সামনে বিশ্বের দরজা খুলে গিয়েছিল। সেই পথ বেয়েই ইংরেজরা বাংলার কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল।

বাংলা ভাষায় পোর্তুগিজ প্রভাব

পোর্তুগিজ সূত্রের ইঙ্গভারতীয় শব্দ

আচার, আনারস, অনীল (নীল), আরেকা বা আরক;

বালডে (বালটি), বাম্বু, ভাং, বাসতা (ব্যস), বাটা, বেইট (বাট্টি, ধান), বেরিনাজল (ব্রিঞ্জল), বয় (চাকর);

কাফ্রি, কায়রো (কয়ার), কামরা, কামিজা (কামিজ), কারিল (কারি), কাস্টা (কাস্ট), চা, ছাপা, চাবি,

চুনাম (চুন), সিপাই, কমপ্রাডর,

এইটোরিয়া (ফ্যাকট্রি, কারখানা), জেনটিও (জেনটাইল), গার্ডা (গার্ড), গুদাম্ভ (গুদাম), ইংগরেজা (গীর্জা),

লাসকারিম (লস্কর), লেইলাও (নিলাম), ম্যান্যারিম (ম্যানডারিন), মাংগা (ম্যাংগো), মেসত্রে (মিস্ত্রি), নাইক,

কর্পোরাল, পাগোডে (প্যাগোডা), পালানকুইম (পালানকুইন), পাপাইয়া (পাপায়া), পিয়াও (পিয়ন),

পোর্তুগিজ সূত্রে বাংলা শব্দ

আলকাতরা, আলপিন, অম্বর, আনারস, আলমারি, আতা,

বালটি, বারান্দা, বাসন, ভাপ, বেহালা, বিস্কুট, বোতাম, বোতল, বয়াম,

চা, ছাপা বা ছাপ, চাবি,

দেউস্ (দেবতা), ফিতা, গারদ, গুদাম, গির্জা, ইংরেজ, ইস্পাত, ইস্ত্রি, জানালা, কাবার, কেদারা, কফি, কাজু, কাকাতুয়া, কামিজ, কামান, কম্পাস, কপি, মনু (ভাই), মাস্তুল, নেবু (লেবু), নিলাম, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, সায়া, স্পঞ্জ, তামাক, টোকা (লিপিবদ্ধ করা), তোয়ালে, তুফান।

বাংলাভাষায় ব্যবহৃত শুদ্ধ পোর্তুগিজ শব্দ

আবমারিও (আলমিরা), আয়া, কাস্ট, কামিজ, কোবরা, গ্রাম, মিস্ত্রি, মশা, পাদরি, পিওন, পমফ্রেট।

(সূত্র : ক্যামপোস, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ২০৭-২২১)।

সংযোজনী 'খ'

পোর্তুগিজদের আনা ফল আর গাছ

আনারস, আতা, ভেরেন্ডা, বাঁশকেওড়া, ভুট্টা, ক্যাকটাস, কাজুবাদাম, চীনাবাদাম, জামরুল, জুঁই, গরুর চম্পা, কামরাঙ্গা, কৃষ্ণকলি, লাল লঙ্কা, নীল, নোনা, পেঁপে, পেয়ারা, আলু, রাঙ্গাআলু, তামাক, সফেদা, শেয়ালকাঁটা।

(সূত্র : ক্যামপোস, জে.জে. এ., ১৯১৯ : ২৫৩)

উল্লেখ : অধিকাংশই এসেছিল লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আর আফ্রিকা থেকে।

মন্তব্য

১. "মগের মুলুক" কথাটার অভিধানিক অর্থ মগ তথা আরাকানি রাজত্ব। বাস্তবে এর অর্থ বিশৃঙ্খল জলদস্যু আর লুঠেরাদের রাজ।

২. "ভাড়ের মেয়ে" বলতে কোনও অনূঢ়া ব্রাহ্মণকন্যাকে বোঝাত, যাকে হরণ করে জলপথে নিয়ে এসে তমলুক অথবা পিপলিতে বিক্রি করা হত। ক্রেতা বিক্রির পরই সংক্ষিপ্ত আচার মেনে মেয়েটিকে বিবাহ করত। পিপলি ছিল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অংশে সুবর্ণরেখা নদীর মোহনায় (ঘোষ, যামিনীমোহন, ১৯৬০, ৩৩)।

৩. খ্রিস্টান ধর্ম প্রসারের জন্য পোর্তুগিজরা বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বই লিখেছিল। ১৫৯৮ সালে শ্রীপুরে ফ্রান্সিসকো ফার্নান্ডেজ একটি পুস্তক রচনা করেন, পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ করেন ডামিঙ্গো ডি সুজা। আরেকটি পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন ডম অ্যান্টনিও। তার পুস্তকটিতে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন পাদরির মধ্যে সংলাপের ঢং-এ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা হয়েছিল। ডম অ্যান্টনিও ছিলেন বাঙালি, পূব বাংলার ভূষণার জমিদারপুত্র। পোর্তুগিজরা তাঁকে দাস হিসেবে অপহরণ করে। পরবর্তীকালে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, খণ্ড ২, ৪১৫-৪১৯)।

৪. "জগৎ শেঠ" কোনও একজন ব্যক্তি নন। মোগল সম্রাটের দেওয়া এই উপাধি তেজারতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একটি পরিবারের বংশানুক্রমিক পরিচয়। মারওয়ারের নাগর থেকে এদেশে স্থায়ী হওয়া এই পরিবারের প্রধান এই উপাধিতে পরিচিত হতেন। বাংলার নবাবের কোষাধ্যক্ষ এবং নবাবি টাঁকশালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই পরিবারই বাংলার সবচেয়ে ধনী পরিবার। ১৭৪২ সালে মারাঠারা ঝটিকা আক্রমণে জগৎ শেঠদেব প্রাসাদ লুঠ করে কুড়ি কোটি টাকা নিয়ে যায়। এই ক্ষতি তাদের বিপর্যস্ত কবতে পারেনি। ১৭৫৭ সালে তাদের আয় ছিল ৪৯.৬ লক্ষ টাকা। আগ্রা থেকে আসা উমিচাঁদ, সে কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বণিক। অর্থ দাদন আর বারুদ ব্যবসায় তার দক্ষতা ছিল। ১৭৫০ সালে তার কাছে ইংরেজ কোম্পানির ধার ছিল ১.৬ মিলিয়ন টাকা। খাজা ওয়াজিদ এদের মধ্যে তৃতীয়। আর্মেনিয়ান এই বনিকের নৌবহর ছিল। বারুদ ব্যবসায় প্রচুর লাভ করেছিলেন তিনি। পলাশির চক্রান্তকারীদের দলে ওয়াজিদ-ই সবশেষে যোগ দেন (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ১১০; লিটল)।

৫. "কারতাজ" শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবত আরবি 'কুইরটাস' থেকে। এব থেকে মনে হয এই প্রথার সূত্রপাত আরবদের হাতে। পোর্তুগিজদের আগে আরবরাই ছিল সাগর পথেব নিয়ন্ত্রক।

৬. মির্জা নাথানের বিববণীতে বারবার ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ বযেছে (নাথাল, মির্জা, ১৯৩৬, খণ্ড ১, অংশ ১ : ৮৫, ৮৬, ১২৯, খণ্ড ২, অংশ ৪, ৭৪৯-৭৫০, ৭৫২)।

৭. শায়েস্তা খাঁ পোর্তুগিজ প্রধানকে ২০০০ টাকা দেন এবং ৫০০ টাকা মাসোহারার প্রস্তাব দেন। অন্যদের মোটা বেতনের প্রতিশ্রুতি দেন। আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাফল্যেব কারণ ছিল পোর্তুগিজদের বশ করতে পারা (সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩ : ৩৭৯)।

৮. "কোম্পানি, এক রাজ্যকে অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখতে সফল হল। গোটা ভারতের সামরিক বাজারে নিজেদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করতে সমর্থ হ (বেইলি : ৪৮)।

৪.৪

বস্ত্রশিল্প, শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

ভূমিকা

বহির্বাণিজ্য কখনওই ভারত বা বাংলাদেশের সমাজ বা অর্থনীতির বড় কথা ছিল না। এখানে আমরা "ভারত" বলতে যোগ করছি এখনকার পাকিস্তান ও বাংলাদেশকেও এবং বহির্বাণিজ্য বলতে বুঝছি ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা। স্বভাবতই এই সরলীকরণ নানা প্রশ্ন তুলবে—সংজ্ঞাগত এবং পরিসংখ্যানগত—যেগুলো আমরা এখানে ধরছি না।

এই বক্তব্য খুব সহজেই পরিসংখ্যানগত ভাবে আমরা যাচাই করতে পারি। যদি আমরা তিনটি দেশকে আলাদাও ধরি তাহলেও জাতীয় আয়ে বহির্বাণিজ্যের অংশ খুব ছোট মনে হবে এবং যখনকার কথা বলছি তখন নিশ্চয়ই আরো ছোট ছিল, আজকের তুলনায়।

প্রত্যেক ঐতিহাসিক তথ্যেই বহির্বাণিজ্যের কথা রয়েছে, কিন্তু সমস্ত তথ্যকেই ইতিহাস হিসাবে যাচাই করা যাবে না (ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ, ২০০০ : ১২৯)। মিনহাজ, কারামবাটান বলে হিমালয়ের পাদদেশে একটা জায়গার কথা বলছেন, যেখানে রোজ ১৫০০ ঘোড়া বিক্রি হত। এই পরিসংখ্যান সত্য হতে পারে না।[১] (মিনহাজ-এস সিরাজ, ১৯৩৯) ঘোড়া কখন ভারতের বহির্বাণিজ্যের এক বড় জিনিস হতে পারে না। ভারতে ঘোড়া প্রজননের কোনও ঐতিহ্য নেই এবং ভারতীয় ঘোড়ার মানও ভালো নয়। বড় জোর মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ঘোড়া আমদানি করে সেগুলি রপ্তানি করা হত। আমদানির ওপরে উদ্বৃত্ত ঘোড়ার রপ্তানি খুব বড় হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক এটাই বড় করে দেখান। এমনকী ষোড়শ শতাব্দীতেও প্রতি বছর বাংলার বন্দর থেকে মালাক্কায় ছয়টার বেশি জাহাজ যেত না। বাংলায় আমদানি হত বোর্নিওর কর্পূর, গোলমরিচ এবং অন্য মশলা, মালাক্কার মশলা এবং চন্দন কাঠ, চীনের পোর্সিলিন, সিল্ক এবং নানা ধাতু। রপ্তানি হত মূলত কৃষিগত এবং বস্ত্রগত নানা জিনিস। করমণ্ডল উপকূলের শ্রীলঙ্কা, মালাবার ও মালদ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য বাংলার থেকে এইসব দেশে বেশি ছিল। মালদ্বীপ থেকে আসত কড়ি, মালাবার থেকে আসত গোলমরিচ এবং শ্রীলঙ্কা থেকে দারচিনি ও সুপারি। লোহিত সাগরের নানা বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য হত মালদ্বীপ বা গুজরাটের বন্দরগুলোর মাধ্যমে। বণিকদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু, মুসলমান, আর্মেনিয়ান এইরকম নানা জাতি। তার মধ্যে হিন্দু, বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানরা এবং গুজরাটের শাহরা সংখ্যায় বেশি ছিল। (সুব্রহ্মনিয়াম, সঞ্জয়, ১৯৮৭ : ২৭০-২৭১, প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৬-৩০)।

অনেক কারণে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য এত কম ছিল। ইউরোপীয় বহু দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের উপকূলের দৈর্ঘ্য মোট জমির তুলনায় খুবই কম। ভারতবর্ষ বড় দেশ বলে প্রায় সবই পাওয়া যেত দেশের মধ্যেই, বাইরে হাত পাততে হত না। গ্রামগুলো

বহু ক্ষেত্রেই স্বাবলম্বী হতে বাধ্য হত, যেহেতু রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো ছিল না। যা গ্রামে পাওয়া যেত না তা ভ্রাম্যমাণ বণিকরা অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করে দিত। প্রায় সমস্ত বড় শহরই এই সেদিনও পর্যন্ত উপকূল থেকে অনেক দূরে ছিল অর্থাৎ উপকূল দেশের জনজীবনে সেইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বহির্বাণিজ্যের এক বড় অংশ স্থলপথে হত, এবং বহু হাত ঘুরে শেষ জায়গায় পৌছত। প্রত্যেক বণিকের একটা ছোট, স্থানীয় বাজার ছিল। বণিকেরা ব্যক্তিগত ভাবেই ব্যবসা চালাতেন, মধ্যবর্তীদের ওপর না নির্ভর করে।

যদিও বস্ত্র ছিল বহির্বাণিজ্যের এক বড় উপাদান, তবুও বস্ত্র ছাড়াও অনেক জিনিস যেমন, চাল, চিনি, মাখন এবং তেল, কাঁচা রেশম, আফিং ও সোরা প্রায়ই বাণিজ্যিক কাগজপত্রে উল্লিখিত হত। সাধারণত, উপকূল ধরে বাণিজ্য হত, এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও একটা বড় বাজার ছিল। এক এক বন্দর এক এক জায়গায় জিনিস পাঠাত। যেমন হুগলি বন্দর দিয়ে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সঙ্গে বাণিজ্য হত। বালেশ্বরের বাণিজ্যের এক বড় অংশ যেত শ্রীলঙ্কায়। কবমণ্ডল উপকূলে, মালাবার ও গুজরাটের সঙ্গে বাণিজ্য হত সেখানকার বণিকদের মাধ্যমেই। বণিকদের এক তৃতীয়াংশ ছিলেন আবার মোগল অফিসার, যারা সস্তায় কিনতেন এবং বেশি দামে বেচতেন (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৬-৩৩)। এমনকী, মীরজুমলা বা শায়েস্তা খাঁয়ের মতো রাজ্যপালও ব্যবসা করতেন। এ ছাড়া অনেক সময় নানা রকম দান ও উপঢৌকন দিতে হত ওদের। এমনও শোনা যায় যে, বহু বণিক, ওদের পয়সা দিতে হবে ভেবে, নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করতেন। (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৪৭)

সুতিবস্ত্রের ঔৎকর্ষ স্বীকৃত হলেও বাজার ছিল না

কোনও সন্দেহ নেই যে বাংলার উৎপাদন ও বাণিজ্যে সুতিবস্ত্রের একটা বড় অংশ ছিল। কিন্তু সুতিবস্ত্র ছাড়াও অন্য অনেক কিছুই বিক্রি হত। বাংলার বস্ত্রশিল্পের ঔৎকর্ষ ষোড়শ শতাব্দী থেকে সমস্ত পৃথিবীতেই জানা হয়ে যায়। এই ঔৎকর্ষ একদিনের ব্যাপার নয়, এর পিছনে অনেক খাটুনি এবং দক্ষতা কাজ করেছে। আমরা আগে দেখেছি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কীভাবে বাংলার সুতিবস্ত্রের সুখ্যাতি করা হয়েছে। টেক্সটাইলের ঐতিহাসিক, ই বেইনসের লেখা থেকে জানি যে, এমনকী, আলেকজান্ডারের সময়েও বঙ্গের গঙ্গারি খুব নাম ছিল (বেইনস্, ই.ই., ১৯৬৬ : ১৩) প্লিনি এবং পেরিপ্লাসের লেখা থেকেও জানি যে, বঙ্গের মসলিনের বিদেশে খুব নাম ছিল।

খটকা লাগে দেখে যে, বাণিজ্য সংক্রান্ত যা কিছু আমরা জানতে পারি তার অনেকটা অংশ পাই বিদেশি পর্যটকদের লেখায়। বিশেষ করে, ১২০৪ সালের মুসলমান দখলের পর, এই বিদেশি পর্যটকদের ভিড় বাড়ে। এই পর্যটকদের মধ্যে যারা ভালো তারা নিজেদের ধ্যান-ধারণার কথা বলে গিয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে তাদের কাহিনি একপেশে এবং একমাত্রিক, যেন তাদের দেশের পাঠকদের জন্য লেখা। তা সত্ত্বেও এই পর্যটকরা বহু দেশ ঘুরেছেন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা করে বাংলার অবস্থা বলতে পেরেছেন। এর মধ্যে তিনজন হয় পোর্তুগিজদের আগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বা ঠিক তার পরে যখনও ভারতে ইউরোপীয় প্রভাব সেইভাবে পড়েনি। এই তিনজন হচ্ছেন মা-হুয়ান,

ডুয়ার্টে বারবোসা এবং টোম পিরেস।

সুতিবস্ত্র বাণিজ্য অন্য যে কোনও রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি বিতর্কমূলক প্রশ্ন তুলেছে। যেমন, প্রশ্ন উঠেছে, যদি ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের করায়ত্ত না হত, তাহলে কি পারত পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর মতো, সুতিবস্ত্রের পথ ধরে, শিল্পোন্নত হতে। এই সম্ভাবনা কি ছিল যে, বস্ত্র বাণিজ্য শেষ পর্যন্ত এত চাহিদা সৃষ্টি করত যে শ্রমশক্তি যত হাতে ছিল সমস্ত ব্যয় হয়ে যেত, এবং ভারতীয়রা বাধ্য হত যন্ত্র দিয়ে শ্রমের ঘাটতি পূরণ করতে, এবং যন্ত্রের মাধ্যমে শিল্পায়নের পথে যেতে? ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলে আমরা কি পারতাম ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়ার সুযোগ নিতে?

কে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে? ইতিহাস নতুন করে তৈরি করা যায় না। আমরা শুধু পলাশির যুদ্ধের ২৫০ বছর পর ভাবতে পারি ভারতবর্ষ পরাধীন না হলে কী হতে পারত। আমরা কখনই বলতে পারব না যে, এইটা হত অমুকটা হত না। এমনকী, এমনও যুক্তি দেওয়া যায় যে, ইংরেজরা না হলেও ফরাসি বা ডাচ বা আর কেউ ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করত। তবে এইটা বলা যায় যে, ভারত উপনিবেশ হবার ফলে আর স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে উন্নয়নের পথে যাবার সুযোগ থাকল না। সেই সুযোগ ভারত স্বাধীন থাকলে নিত কি নিত না, বলা যাবে না। এই স্বাধীন বিকল্প থাকলে ভারত কী রকম ভাবে ব্যবহার করত তা বলা যাবে না।

এছাড়া এই কোম্পানিগুলো, এশিয়ান উৎপাদনের ও রপ্তানির মাধ্যমে ইউরোপে যাঁরা কিনবেন তাঁদের সঙ্গে যারা এশিয়ায় উৎপাদন করছেন তাঁদের প্রত্যহ যোগাযোগ গড়ে তুলল, মাঝে বিশেষ কেউ থাকল না। ভারতীয় কোম্পানিগুলো সঙ্গে ওরা বাণিজ্য করল, যথেষ্ট দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখিয়ে। অবশ্য অন্য অনেক কিছু ঠিক বললেও লিয়ার একথা ঠিক বলেননি যে, শুধু ভালো মানের জিনিসই ওঁরা বিক্রি করেন। বরং মসলিন এবং কিছু সুতির কাজ বাদ দিলে বাণিজ্য মূলত গরিব লোকজনের জন্যই হত। (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৩-৫)

ইউরোপীয়ানরা কারতাজ চালু করেন।[২] যে নামেই বলি না কেন, পোর্তুগিজরা শুরু করলেও প্রত্যেকটি ইউরোপীয় শক্তিই, সে ডাচ, ইংরেজ ফরাসি বা খুদে ড্যানিস হোক, সুযোগ পেলেই পাশ দিয়ে যাওয়া অন্য জাহাজ আটক করত বা দখল করত।[২] এই ইউরোপীয় শক্তিগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেককে দোষারোপ করত বোম্বেটে বলে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকলেই বোম্বেটেদের মতোই কাজ করত। অবশ্য এটা ঠিক যে, পোর্তুগিজদের পর যেসব ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো ভারতে এল তাদের মাথা তুলনায় বেশি ঠান্ডা ছিল, এবং নানাভাবে টাকা অর্জনের কথাই ভাবত এবং বাণিজ্যমুখী ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, সুযোগ পেলেই ওরা ওদের নৌযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। অবশ্য এটাও বলা ভালো যে, ভারতীয় জাহাজ দখল করতে বা পারমিট চাপিয়ে দিতে খুব বেশি কষ্ট তাদের করতে হয়নি, কখনও কখনও আক্রমণের ভয় দেখালেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। প্রায়ই ভারতীয় যুবরাজদের মধ্যে গণ্ডগোল হলে ওদের ডাকা হত মিটিয়ে দেবার জন্য। এটা যেমন পোর্তুগিজদের ক্ষেত্রে সত্য ছিল তেমনই ছিল ডাচেদের ক্ষেত্রে। যেমন, মোগলরা ১৬৭০ দশকে মগদের দখলীকৃত

চট্টগ্রাম আক্রমণের সময় ডাচদের সাহায্য চায়, বা ১৬৯০-এর দশকে ইংরেজদের সাহায্য কামনা করে বিদ্রোহী শোভা সিংহের বিরুদ্ধে। (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৪৮-৪৯)।

ইউরোপীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ করত ইউরোপীয় কোম্পানিরাই

ইউরোপীয় বাণিজ্যের এই বিশেষত্বগুলো—তাদের জায়গা দখল করবার ঝোঁক, তাদের গায়ের জোর দেখাবার মনোবৃত্তি এবং নৌযুদ্ধের দক্ষতা—ভারতীয় সাহিত্যে তেমন নজর পায়নি। ওমপ্রকাশের ডাচ বাণিজ্য নিয়ে লেখা একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ইউরোপীয় বাণিজ্য বোঝা সম্ভব নয়, যখন বস্ত্র বাণিজ্যের খুব রমরমা বাংলায় চলছে, তখনও ওই বাণিজ্য ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে চলত। ভারতীয়দের ইউরোপীয় বাজারে কোনও প্রত্যক্ষ কারবার করবার সঙ্গতি ছিল না, ইউরোপিয়ানদের মাধ্যমে করতে হত। এবং ওদের নিজেদের হিম্মতে, আধুনিক নৌবিদ্যা অনুযায়ী, ইউরোপে কোনও জাহাজ নিয়ে যেতে ওরা পারত না। আরব্য উপসাগরে বোম্বেটেদের মোকাবিলা করবার মতো শক্তিও ভারতীয়দের ছিল না। ইউরোপিয়ানদেরই সঠিক, ভালো, জাহাজ ছিল, এবং ওরা আধুনিক নৌবিদ্যা জানত, এবং বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো শক্তি ও সাহস ছিল।

এর ফলে, শুধু বহির্বাণিজ্যে নয়, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যেও ওদের নিয়ন্ত্রণ বলবত হল। ওরা ওদের পছন্দের ভারতীয় দালাল খুঁজে বের করল। এমন নয় যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যে যে যুদ্ধ হত তার অনেকগুলো হত ইউরোপেও ওই দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ হত বলে। অন্য সময় ওরা বিবদমান দুই রাজার বা যুবরাজের একজনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে সেই দেশের বাজার দখল করবার চেষ্টা করত। অনেক সময়, যুদ্ধে জয়ী রাজা কৃতজ্ঞতা জানাত সেই কোম্পানিকে তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে দেশের মধ্যে বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে। ডাচ, ফ্রেঞ্চ, ড্যানিস বা ইংরেজ এদের কারোরই সম্রাটের কাছ থেকে ফরমান পেতে খুব ঝামেলা হয়নি। সাধারণত তারা সহজেই বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছেন কিছু থোক টাকার বিনিময়ে, শুল্ক না দিয়ে। মোগলরা ওদের আনা বাণিজ্যে এবং বুলিয়ানে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে ওরা যে মাঝে মাঝে খারাপ ব্যবহার করত সেটা তারা ধরতই না।

ব্রিটিশ এবং ডাচেরা মোগলদের সহ্য শক্তি দেখে এমন সাহস পায় যে তারা একাধিক বার ভাগীরথী নদীর মুখ আটকায়, নবাবের নৌকো দখল করে, এমনকী, ১৬৮৭ সালে ইংল্যান্ড থেকে একটা নৌবাহিনী পর্যন্ত আনে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বার বার ওদের ক্ষমা করেন মোগলরা, ভাব করেন যেন কিছুই হয়নি। কারণটা পরিষ্কার—ওদের আনা রাজস্বের ওপর নির্ভরতা (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১২৪-১২৫)। ১৭০৬ সালে, কাশিমবাজারে ডাচেদের কারখানা দুবছর বন্ধ থাকার পর, মুর্শিদকুলি খান সম্রাটকে লেখেন যে, ডাচ কারখানা বন্ধ থাকার ফলে মানুষ তুঁত চাষ বন্ধ করে ধান বা ডাল তৈরি করছেন। এর ফলে রাজস্বও দারুণভাবে কমছে। যেখানে তুঁত চাষের জমিতে প্রতি বিঘায় রাজস্ব হচ্ছে তিন টাকা সেখানে ধানের ক্ষেত্রে রাজস্ব মাত্র ০.৭৫ টাকা এবং ডালের ক্ষেত্রে ০.৩৭ টাকা (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৫)। ভারতের পশ্চিম উপকূল

রাজপুত্র খুররমের বিদ্রোহের ফলে (যিনি গুজরাটের রাজ্যপাল ছিলেন এবং পরে শাহজাহান নাম নিয়ে সম্রাট হন) ভারতীয় জাহাজের উপকূলে বা লোহিত সাগরে সেই সময় কোনও প্রতিরক্ষা থাকে না। সেই সময় ডাচ এবং ইংরেজ জাহাজগুলো নির্বিচারে ভারতীয় জাহাজে আক্রমণ করে, এই যুক্তিতে যে, ভারতীয়রা ডাভোলে পোর্তুগিজদের সঙ্গে বাণিজ্য চালাচ্ছিল। ১৬২৩ সালে ওরা লোহিত সাগরে বাণিজ্যরত ভারতীয় নৌবাহিনীর পুরোটাই দখল করে। ওরা ভারতীয় জাহাজ ছেড়ে দেয় ভারতীয়রা আর ডাভোলে পোর্তুগিজদের সঙ্গে কারবার করবে না বলে অঙ্গীকার করলে (দাশগুপ্ত অশীন, ১৯৯৪ : ৪৯৫-৪৯৮)।

সুতিবস্ত্র : মূল রপ্তানি উপাদান

যেটা জানা নেই, ইউরোপীয় বণিকরা প্রাচ্যে আসেনি বাংলাদেশের সঙ্গে সুতিবস্ত্র নিয়ে বাণিজ্য করবার জন্য। তারা "পূর্ব ভারত" তাদের কোম্পানির নামে বললেও তখনকার দিনে "পূর্ব ভারত" বলতে বোঝাত আজকের ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো, যেমন পশ্চিমে "পশ্চিম ভারত" বলতে বোঝাত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলো। কোম্পানিগুলো ইউরোপ থেকে এসে ওই দ্বীপগুলিতেও পৌঁছতে চেয়েছিলেন মশলার কারবার করতে। তখনকার যুগে আজকের তুলনায় ছোট ছোট জাহাজ ছিল। মশলা হালকা এবং মূল্যবান বলে তাতে ভরে বাণিজ্য করা সহজ ছিল (চৌধুরি, কে. এন, ১৯৬৫ : ১০)। কিন্তু, মালয়ে পৌঁছে এবং ইন্দোনেশিয়ায় কিছু দ্বীপে গিয়ে ওরা বুঝল যে, ইউরোপের জিনিসে ওদের বেশি আগ্রহ নেই এমনকি বুলিয়নেও নয়। কিন্তু ভারতীয় টেক্সটাইলের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। সেই থেকে সুতিবস্ত্রে অনুসন্ধান শুরু হল মশলার বিনিময় হিসেবে, এবং মশলা কেনবার জন্য শেষ পর্যন্ত কোম্পানিগুলো ভারতে পৌঁছলেন। (চৌধুরি, কে. এন, ১৯৬৫ : ১৪)।

ইউরোপীয় বাজারে ভালো সুতিবস্ত্রের চাহিদা

ইউরোপিয়ান বাণিজ্যের একটা বিশেষত্ব ছিল যা এশিয়ার থেকে আলাদা, ওখানে ভালো মানের সুতিবস্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। যখন এশিয়ার বাজারে খারাপ এবং নিম্নমানের কাপড়ের চাহিদা ছিল বেশি। ইউরোপিয়ানরা বিশেষ করে ঢাকা এবং সোনারগাঁওর মসলিন এবং মালদহ ও শান্তিপুরের মলমল পছন্দ করতেন। যদি সোনা রুপো বা রেশম দিয়ে ব্রকেডের কাজ করা হত অথবা রঙিন সিল্ক ব্যবহার হত তাহলে চাহিদা আরো বাড়ত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৬৫; প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৬; দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৮২ : ৪১৩; দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৬)।

ধীরে ধীরে ইউরোপে বাংলার টেক্সটাইলের চাহিদা বাড়ল, কেন না উৎকর্ষের বিচারে বাংলার মসলিনের ধারে কাছে কেউ আসতে পারত না (বেইনস, ই., ১৯৬৬ : ১৯)। যখন প্রথম ইউরোপীয় বাণিজ্য শুরু হয় তখন করমণ্ডল বা সুরাট যতখানি বিক্রি করতে, তত বাংলা করত, কিন্তু যত দিন গেল বাংলার বাজার তত বাড়ল। ১৭২০ সালে ভারত থেকে ১৫ লক্ষ পিস আমদানি হল ইউরোপে। এর মধ্যে শুধু ডাচেরাই নিল ১৯৬ লক্ষ বর্গ গজ রেশম। (মুখার্জি, রাধাকমল, ১৯৬৭)। ইউরোপীয়ানরা বুলিয়ান

খরচ করে কিছু কিনতে চাইত না, কিন্তু বাংলার টেক্সটাইল কিনতে আর কোনও উপায় ছিল না। ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দূরে সোনারগাঁওয়ে সবচেয়ে ভালো মসলিন তৈরি হত। ওই অঞ্চলের চারপাশে ভালো সুতো তৈরি হত। (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৬৫)।

এই বাণিজ্য করতে করতে বাংলার বস্ত্রশিল্প ইউরোপে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক নতুন ধরনের চাহিদা তৈরি হল ভালো টেক্সটাইলের জন্য, বিশেষ করে উন্নতমানের ক্যালিকো, সিল্ক, ও মিশ্র অংশের জন্য। এই টেক্সটাইল ইউরোপে, এত পথ অতিক্রম করে গেলেও, যাতায়াত ভাড়া কমিশন এসব দিয়েও ভালো লাভ থাকত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৬৫; প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৪৩)।

ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই টেক্সটাইল যেন সিল্ক উৎপাদকদের খেপিয়ে দিল। তাদের প্ররোচনায় সরকার একটা আইন করলেন। ১৭০০ সালের সেই আইনে ছিল যে কেউ ভারতীয় সিল্ক বা ছাপা ক্যালিকো ইংল্যান্ডে আমদানি করতে পারবে না। সেই আইন লঙ্ঘন করলে ২০০ পাউন্ড শাস্তি হতে পারে। এরপর ১৭০১ সালে আর একটা আইন হল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও ভারতীয় টেক্সটাইলকে ঠেকানো গেল না, যেহেতু ওখানকার মহিলাদের মধ্যে এই টেক্সটাইল খুব জনপ্রিয় ছিল (বেইনস, ই., ১৯৬৬ : ৭৮-৮০, ১০৬; বুচানন, ডি.এইচ., ১৯৬৬ : ৪৬৫)। এইটা মজার যে, ভারতীয় টেক্সটাইলের প্রতিযোগী হল ব্রিটিশ সিল্ক উৎপাদকরা, যার মানে ব্রিটিশ টেক্সটাইল ভারতীয় প্রতিযোগীদের ধারে কাছে যাওয়ার মতো ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাঁচা সিল্কের ক্ষেত্রেও বাংলা থেকে আসা জিনিস ভালো বিক্রি হতে শুরু করল—শতকরা ৮৮ ভাগ, যার মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগ আসত কাশিমবাজারের মাত্র একটা রিলের কারখানা থেকেই। (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২২০, ২২১)।

সুশীল চৌধুরির ধারণা হচ্ছে যে, এশিয়ার বাণিজ্য ইউরোপের থেকে বেশি ছিল (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৭৫ : ৪)। তিনি এশিয়ান বাণিজ্য বলতে বুঝেছেন বাংলাদেশের বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্যও। যদি আমরা ধরেও নিই যে, ডঃ চৌধুরির পরিসংখ্যানে কোনও ভুল নেই, তাহলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ইউরোপীয় বাণিজ্য ছিল অতিরিক্ত, বর্ধমান অংশ। ইউরোপীয় বাণিজ্য ভালো মানের বাংলা টেক্সটাইলের একটা নতুন বাজার খুলে দিল, যা ডঃ চৌধুরি তার হিসেবের মধ্যে আনেননি।

অশীন দাশগুপ্ত অবশ্য বলেন যে, সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বড় অংশকে 'ফেরিওয়ালার কারবার' হিসেবে বলা যায়। তিনি বলেন, যারা কাজ করতেন তাদের এক বড় অংশ ছিল ছোট বণিক (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৭)। দাশগুপ্ত তার সামগ্রিক আলোচনার আর এক অংশে বলেন, "আমরা স্বীকার করি যে, অধিকাংশ বণিককে ফেরিওয়ালা আখ্যা দেওয়া যায়। এর একটা কারণ হতে পারে যে, ভারতের এত যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে বলে, ভারতীয় বাজার অস্থায়ী ছিল এবং বড় বাণিজ্য করবার ঝুঁকি ছিল বেশি। অবশ্য বড় বণিকও ছিলেন, যেমন, জগৎ শেঠ, তারাজী ভোরা এবং আবদুল গফুর, যারা লাভ করবার জন্য কাজ করতেন। কিন্তু এঁরা ছিলেন মস্ত বড় সমুদ্রে

ভাসমান কিছু বস্তু। এঁরা অন্যদের প্রভাবিত করতে পারতেন না। ওঁরা নিজের জগতে বাস করতেন এবং জানতেন না ভালো করে যে, তাঁদের সত্তা কী। তারা একটা অনিশ্চয়তা থেকে আর একটা অনিশ্চয়তার দিকে যেতেন। যদি কাজের মাত্রা বিচার করি, তাহলে এদের ফেরিওয়ালা বলা যাবে না। কিন্তু ওদের মনের ভেতরে কোথাও ফেরিওয়ালা কাজ করছে। প্রত্যেক বড় বণিকই ছোট ছোট অনেক ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ওদের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওই বণিকদের ওপর। এ যেন প্রত্যেক বণিক একটি ছোট মধুচক্রে কাজ করছে কিন্তু সব মিলিয়ে যোগ করে ভারতীয় সত্য বুঝছে না। সমগ্রের তুলনায় যে কোনও একটি মধুচক্র খুবই ছোট ছিল। ওদের সঙ্গে বড় বড় দৈত্যাকার যে সমস্ত কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল, তাদের সঙ্গে ওদের তুলনাই হতে পারে না। পোর্তুগিজরা যেভাবে কারতাজ চালাত তার ফলেও ভারতীয় বাণিজ্য ছোট না হয়ে উপায় ছিল না। সাধারণত পর্তুগিজরা ছোট নৌকো হলে ছেড়ে দিত, কারতাজ চাপাত না, তাই ছোট জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিল ভারতীয়দের মধ্যে। খালিদ ওয়াজিদ বোধহয় এই ফেরিওয়ালা তত্ত্বের ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন আর্মেনিয়ান একজন বণিক এবং পরবর্তীকালে পর্দার পেছনের নানা রাজনৈতিক কাজকর্মের কলকাঠি নাড়তেন। "ওয়াজিদের উদাহরণ থেকেই আমরা বুঝি যে, হুগলির জাহাজের বণিকরা কত তুচ্ছ ছিল", দাশগুপ্ত বলেন (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ১০-১১, ১৩-১৪, ৩৫৫, ৩৬০)।

রয়্যালটি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করত। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, প্রথমদিকে মুসলমান শাসকরা কৃষি বা বাণিজ্য নিয়ে বেশি মাথা ঘামাত না। এই দুটো বড় দায়িত্ব রাজাদের ওপর রেখেই ওরা নিশ্চিন্ত ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল চিনের বাণিজ্য, যখন ইউয়ান বংশের সময় (১২৭৯-১৩৬৮) ৭০ : ৩০ ভাগে লাভ বাটোয়ারা করে ওরা বাণিজ্য চালাত। এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন হল যখন শেষ পর্যন্ত নবাবরা প্রায় সবাই, যেমন শায়েস্তা খান থেকে মীরজুমলা, জাহাজের মালিকানা নিলেন এবং নিজেদের নামে বাণিজ্য শুরু করলেন। এইভাবে বড় মহাসমুদ্রের বাণিজ্যের এক বড় অংশ রাজকীয় হাতেই গেল এবং ছোট মালিকরা বাধ্য হল উপকূলের ধারে ছোট বাণিজ্য করতে। (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ১০-১১, ১৩-১৪, ৩৫৫,৩৬০)।

বড় অভিজাত বণিকদের একটা অভ্যাস ছিল যে, কতগুলো জিনিসের ওপর ওদের একচেটিয়া বাণিজ্য চাপিয়ে দেবার, যেমন, সোরার ক্ষেত্রে। যারা উৎপাদন করত তাদের কাছ থেকে অল্প দামে ওরা জিনিস কিনে বেশি দামে ইউরোপীয় বণিকদের কাছে বিক্রি করত। যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন তাঁরা ওই ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় প্রচুর আগ্রহ দেখাতেন, প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করতে দ্বিধা করতেন না। এর ফলে মাঝে মাঝে শাসকদের সঙ্গে অনেকেরই এমনকী ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলির বিবাদ হত, কিন্তু ধীরে ধীরে কীভাবে রাষ্ট্রশক্তি ইউরোপীয় ব্যবস্থায় নিমজ্জিত হত তার প্রমাণ আমরা পাই। আমরা পরে দেখব যে, কীভাবে ইউরোপীয় শক্তির ওপর বাণিজ্যিক নির্ভরতা শাসক শ্রেণির ব্যবহারকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে দেশের সামগ্রিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

এই যে একটা ধারণা চালু আছে যে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে এই

ভয়ে অনেক বণিক তাদের সম্পত্তি গোপন করত এবং একটা সাধারণ বেশ রাখত, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সহজ-সরলভাবে থাকা ছিল সংস্কৃতির অংশ। যদিও কিছু লোক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবহারের শিকার ছিলেন, সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাণিজ্যে ভালোই টাকা আসত। সমস্যা তুঙ্গে ওঠে পলাশির ঠিক আগে, যেহেতু মোগল ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ব্যক্তিগত বণিকের সংখ্যা কমে হয়েছিল ১৭০৫-৬ সালে ১৯ থেকে ১৭৩৪ সালে ১১ অবধি। দেশের ভেতরের শ্রেণিগুলোর খুব ক্ষতি হয় আরো একটা কারণে, যেহেতু পুরনো বন্দরগুলো ভালো কাজ করতে পারছিল না, যেমন সুরাট, কালিকট, হুগলি এবং মুসলিপত্তম, এবং নতুন বন্দরগুলোর বৃদ্ধি তেমন হচ্ছিল না, যেমন বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ। (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৯, ১৮১, ১৯৯-২০০)।

পোর্তুগিজদের বাণিজ্য

পোর্তুগিজদের সম্পর্কে বাংলায় ধারণা হল যে, ওরা বোম্বেটে, দাস ব্যবসায়ী ও যোদ্ধা। এই ধারণা একেবারে ভুল নয়। কিন্তু ভারতে মশলার বাণিজ্য যখন ওরা করল, তখন ওদের মূল চিন্তা ছিল কেরালাকে নিয়ে, বাংলা তখনও ওদের কর্মোদ্যোগের একটা বড় অংশ ছিল না। তবু এটা বলা যায় যে, ওরাই প্রথম ইউরোপে বাংলার বস্ত্র বিক্রি করে। এবং পরবর্তীকালে যে বাংলার টেক্সটাইলের খুব জনপ্রিয়তা বাড়ল তার একটা কারণ নিশ্চয়ই ওদের বাণিজ্য। ওরা চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ওদের বাণিজ্য করত। সেই জন্য ওই বন্দরের ওরা নাম দিয়েছিল বড় বন্দর এবং সাতগাঁও পরবর্তীকালে শুকিয়ে গেলে হুগলির নামকরণ করেছিল ছোটবন্দর। যতক্ষণ না কলকাতা বড় হয়েছে ততদিন এই বন্দরগুলো ছিল পূর্বভারতের মূল বন্দর। পূর্বদিকে সবচেয়ে বড় বন্দর ছিল সোনারগাঁও, ঢাকার কাছাকাছি।

ভাস্কো-ডা-গামার ঐতিহাসিক সফরের পর পোর্তুগিজ সরকার এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য একটা সিন্ডিকেট বানায়। তবে এটা বলা দরকার যে, অধিকাংশ বাণিজ্য ব্যক্তিগত হত। এমনকি যারা আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারি বাণিজ্য করতেন তাদেরও একটা ব্যক্তিগত কারবার থাকত। ক্যাপ্টেন জাহাজের এক অংশে তার জিনিসপত্র মজুত করতেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সেটাই ছিল মাল রাখার পক্ষে জাহাজের সবচেয়ে ভালো অংশ (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৫৩-৫৪)। এক সময় রাষ্ট্রের একচেটিয়া কারবার দাবি করা হত না, কখনও কখনও কোম্পানিগুলো তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় কারবার করতে পারত। ১৬২৮ সালে পোর্তুগিজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হয় একচেটিয়া ব্যবসা করবে বলে, কিন্তু ১৬৩৩ সালেই এই কোম্পানি ভেঙে দেওয়া হয় (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ২৭-২৮)। সম্ভবত প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ এইভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানায় চলত। টেক্সটাইলের ভাগ ছিল শতকরা ৬২ ভাগ (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৫৫)। চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম এবং ওড়িশার পিপলি ছিল সবচেয়ে লাভজনক তিনটি বাণিজ্যের পথ। (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৫৮)। এই বন্দরগুলো চার্টিন বলে পোর্তুগিজরা চালাত, এবং ভারতের পোর্তুগিজ প্রশাসন ওদের ওপর খ্যাপা ছিল। ডাচদের কোম্পানি ভিওসি-ও ওদের সমর্থক ছিল না, কেন না ওরা একচেটিয়া অধিকার মানত না। তাই ভিওসি ১৬২৯ থেকে ১৬৩৬ সালের মধ্যে চার্টিনদের ১৫৫টি জাহাজ দখল করে বা ধ্বংস করে (প্রকাশ,

ওম, ১৯৯৮ : ৬০-৬২)।

এই সময়ে, যখন পোর্তুগিজরা ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী, তখন বাংলায় ও ভারতবর্ষে প্রচুর বিদেশি ভূপর্যটক আসেন। এর মধ্যে ছিলেন বিশ্বখ্যাত ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের এবং ট্যাভারনিয়ের, ফ্রেডারিক এবং ভার্থেমার মতো নামকরা ইতালীয়, ম্যানরিকের মতো পোর্তুগিজ পাদ্রি এবং ফিচের মতো ইংরেজ পর্যটক। ফিচকে কিছু কোম্পানি সাহায্য করে যাতে তিনি স্থলপথে ভারতে আসেন। এঁরা সকলেই বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চেয়েছিলেন, এবং বাংলা তাদের পথে পড়েছিল। কিন্তু এঁরা সবাই বাংলার বাণিজ্য দেখে খুশি হন।

র‍্যাফ ফিচ বলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে সোনারগাঁও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। তিনি পাটনাতেও লক্ষ করেন যে, ওখানে বহু মূল্যবান এবং সুন্দর কাপড় বিক্রি হত (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ২৮)। বাংলার টাণ্ডায়, গৌড়ের খুব কাছে, তিনি লক্ষ করেন যে, জামাকাপড়ের প্রচুর বাণিজ্য হচ্ছে (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১:২৪)।

ভার্তেমা বাংলার শহরে সবচেয়ে ধনী বণিকদের সন্ধান পান। তিনি জানান যে, প্রতি বছর ৫০টা জাহাজ সুতি ও সিল্কের নানা জামাকাপড়ে ভর্তি করে ভারতের মধ্যে দিয়ে তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব, এবং ইথিওপিয়া যেত। সুতি ও সিল্ক বস্ত্রগুলো ছেলেরাই তৈরি করত মেয়েরা নয়। এছাড়া নানারকম শস্য, চিনি এবং আদা বিক্রি হত (ভার্তেমা, লুডোভিকো ডি, ১৮৬৩ : ২১২, ২১৪, ভূমিকা ৮২)।

ম্যানরিক বাংলা টেক্সটাইলের মাধুর্য দেখে মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, "এই দেশের সবচেয়ে মূল্যবান এবং ভালো মসলিন তৈরি হয়, যা ৫০ থেকে ৬০ গজ লম্বা এবং ৭ থেকে ৮ হাত চওড়া, এবং যার প্রান্ত সোনা, রূপো এবং রঙিন রেশমে মোড়া। এই মসলিন এত পাতলা যে, দুহাত লম্বা ফাঁপা বাঁশে নিয়ে পারস্য, তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশে বিক্রি করা যায়" (ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭ : ৫৬-৫৮)।

১৬৬০-এর দশকে, যখন বার্নিয়ার এবং ট্যাভেরনিয়ার ভারতে পৌঁছন, ব্রিটিশরা ও ডাচেরা সদ্য কাজ শুরু করেছে, তখনই, বাংলার টেক্সটাইলের খুব নাম। বার্নিয়ার মন্তব্য করেন, "বাংলায় বস্ত্রজাত দ্রব্য ও সিল্ক এত তৈরি হয় যে ওই অঞ্চলকে শুধুমাত্র হিন্দুস্থানের বা মোগল অঞ্চলের নয়, অথবা প্রতিবেশী দেশেরও নয়, এমনকী, ইউরোপেরও নয়, সমস্ত পৃথিবীর মূল গুদাম বলে ধরা হতো।" তিনি আরো বলেন যে, "ব্রিটিশ, ডাচ, পোর্তুগিজ, কাবুল এবং লাহোর হয়ে জাপান ও ইউরোপে এই মাল যায়।" যদিও পারস্য দেশ, সিরিয়া, সৈদা এবং বেইরুটে এই ধরনেরই কাপড় পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলায় একই জিনিস অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। বার্নিয়ার আরও বলেন যে বাঙালিরা আর একটু যত্ন করে শোধন করলে অন্যদের সঙ্গে তফাত করতে পারবে। তিনি আরো বলেন যে, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের কাশিমবাজার কারখানায় ৭০০-৮০০ স্থানীয় লোককে কাজ দিয়েছে। (বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯ : ৪৩৯-৪৪০)।

ট্যাভারনিয়ার লক্ষ করেন যে, প্রতি বছর কাশিমবাজার থেকে ২২ হাজার বেল সিল্ক বিক্রি হয় এবং প্রতি বেলে ১০০ পাউন্ড থাকে। ৭০০০ বেল নেয় ডাচেরা এবং ৭০০০ বেল নেয় মোগল সম্রাট, এবং বাকিটা যায় সুরাটে এবং আমেদাবাদে। তাঁর লেখায় তিনি

বাংলার বাণিজ্যিক দ্রব্য হিসেবে সাদা ক্যালিকো, টুইসটেড কটন এবং নীলের উল্লেখ করেন (ট্যাভারনিয়ার, জন ব্যাপটিস্টা দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৮৬ : ১২৭-১২৮)।

অন্যান্য কোম্পানিগুলির অবস্থা

আমরা দেখেছি যে, ১৬৩২ সালের যুদ্ধ এবং পোর্তুগিজদের সেই যুদ্ধে হার, অন্য ইউরোপীয়ান দেশগুলোর সামনে ভারতে এবং বাংলায় বাণিজ্যের দরজা খুলে দিল। এই কোম্পানিগুলোর প্রায় সকলেরই নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং নিজের দেশের রয়্যাল চার্টার মারফত গঠিত হয়েছিল। এই চার্টারে এশিয়ার বাজারে, ভারত শুদ্ধ, ওদের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত ছিল। অবশ্যই শুধু চার্টার করে মনোপলি অধিকার চাপানো যায় না। প্রায় সব দেশেই ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা তৈরি হল। কিন্তু রাজনৈতিক চাপের ফলে এরা শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দি সংগঠনগুলো পুরনো কোম্পানির সঙ্গে মিশে গেল। একই জিনিস ঘটেছে ইংল্যান্ডে, হল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে।

আর একভাবে ওই মনোপলি ক্ষুণ্ণ হত, যখন প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলি অন্য কোনও দেশে ওদের কোম্পানি রেজিস্ট্রি করতেন। অস্টেন্ড কোম্পানি, ড্যানিস এশিয়াটিক কোম্পানি এবং সুইডিশ এশিয়াটিক কোম্পানির এইরকম গোলমেলে মালিকানা ছিল। অবশ্য এই সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত ডাচ বা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো তাদের নিজের দেশের সরকারকে ব্যবহার করে এই কোম্পানিগুলোকে উঠিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। যেমন করা হয়েছিল ডাচ অস্টেন্ড কোম্পানির ক্ষেত্রে।

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৪ সালে পত্তন হয় এবং নানা পরিবর্তনের পর, ১৭১৯ সালে এই কোম্পানি ঠিক ঠিক কাজে নামে। ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬১৬ সালে তৈরি হয়, ১৬৫০ সালে উঠে যায়, ১৬৭০ সালে আবার তৈরি হয়, এবং ১৭২৯ সালে আবার উঠে যায়। ড্যানিশ এশিয়াটিক কোম্পানি ১৭৩২ সালে শুরু হয়, কিন্তু এর ভূমিকা এশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব বড় ছিল না (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৭৮-৮০)।

অস্টেন্ড কোম্পানি ১৭২২ সালে ভিয়েনায় তৈরি হয়। এই কোম্পানিতে ডাচ, ফ্লেমিস, আইরিশ, এবং ড্যানিশ, এই রকম সব ধরনেরই মূলধন ছিল এবং এর প্রধান ছিলেন একজন ইংরেজ। ব্রিটিশ এবং ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সরকারের মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে অস্টেন্ড কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। ওরা হুগলির মোগল ফৌজদারকেও দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দেয় যাতে ভারতীয় বাজারে ওরা না ঢুকতে পারে; এমনকি কিছু গ্রামে ওরা আগুন দিয়ে দিয়ে অস্টেন্ড কোম্পানির ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত ওদের বাধ্য করে ১৭২৭ সালে কাজ বন্ধ করে দিতে এবং ১৭৩১ সালে ওই কোম্পানির কাজ পুরোপরি বন্ধ হয়ে যায়।

যাইহোক অস্টেন্ড কোম্পানির কিছু টাকা ড্যানিশ সিটি কোম্পানিতে আসে, এবং কিছু পায় সুইডিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৩৩ এবং ১৭৬৭ সালের মধ্যে এই সুইডিস কোম্পানি সক্রিয় ছিল এবং টেক্সটাইল পাওয়ার জন্য কয়েকবার জাহাজে করে বের

হয়, এর মধ্যে তিন বার বঙ্গে। অন্য ইউরোপীয়ান কোম্পানিগুলোর মধ্যে, প্রাসিয়ান বেঙ্গল কোম্পানি অগ্রগণ্য। এই কোম্পানি ১৭৫৪ সালে জন্ম নেয়। এই কোম্পানির পেছনে ছিল বেশ কিছু ইংরেজ, যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য পছন্দ করত না। এই কোম্পানিকে বহু ব্রিটিশ ব্যবহার করেন দেশে টাকা বাড়বার জন্য। এছাড়া ছিল, ইম্পিরিয়াল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যার রেজিস্ট্রি হয় ত্রিয়েস্তে, স্বভাবতই এই কোম্পানিতে ইতালির মূলধনই ছিল প্রধান। তার সঙ্গে স্প্যানিস মূলধনে সমৃদ্ধ ফিলিপিন কোম্পানিও এই সময় একটা ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এত অল্প সময়ের জন্য যে, এদের কাজের কোন রেখাপাত বাণিজ্যের ওপর হয় না। আর একটা কোম্পানির কথা প্রায়ই দেখি, জেনোয়া কোম্পানি, যারা ১৬৪৭ সালে ডাচ মূলধন নিয়ে বাণিজ্যে ঢোকে কিন্তু আগে কখনও ভারতে জাহাজ পাঠায়নি। (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৭৯-৮০, ২৬৩-২৬৫)।

এই বড় ইউরোপীয়ান কোম্পানিগুলো ছাড়াও ওদের চারপাশে কিলবিল করত নানা সংস্থা যাদের ব্রিটিশরা বলত "অনুপ্রবেশকারী"। কোম্পানিগুলোর বাণিজ্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বাণিজ্যও বাড়ত; ১৭১৫ সালে কুড়িটি জাহাজ কলকাতা থেকে কাজ করত, কিন্তু এই সংখ্যা বেড়ে ১৭৩০ সালে হয় ৪০। এদের পেছনে ছিল বেশ বড় বড় কয়েকজন লোক, যেমন, টমাস পিট, যিনি ভবিষ্যৎ ইংরাজ প্রধানমন্ত্রীর কাকা ছিলেন (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৩, ২৪২-২৫৬)।[৩]

এই সমস্ত কোম্পানিগুলিরই একটা আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল কোম্পানিগুলোর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য। প্রথমে এই ব্যক্তিগত বাণিজ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমার চোখে দেখেছে, যেহেতু এর ফলে কিছু বেশি পয়সা ওরা পেত এবং কর্মচারি পেতে কম অসুবিধা হত। কিন্তু এর ফলে দুর্নীতির একটা বড় দরজা খুলে গেল। এটা ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমন সত্য ডাচ ও পোর্তুগিজদের ক্ষেত্রে। ফরাসিদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, ওদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ছিলেন কোম্পানির প্রধান ডুপ্লে, যিনি ওই সময় ক্লাইভের সঙ্গে অনেকগুলো যুদ্ধ করেন। অনেক সময় কোম্পানির কর্মচারীরা কোনো অস্তিত্বহীন ভারতীয় বণিকের নামে মাল পাঠাত, এবং বন্দরে পৌঁছবার আগেই ওই বে-আইনি জিনিস পার করে দিত। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রশ্ন নিয়ে বাংলার নবাবের সঙ্গে অনেকবারই মনোমালিন্য হয়, যা আমরা আগে বিবেচনা করেছি। (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ২৫১, ২৫৮)।[৪]

কখনও কখনও কোম্পানির কর্মচারীরা তাঁদের টাকা থেকে ভারতীয় তাঁতীদের ধার দিতেন। কখনও কখনও সস্তায় ধার নিয়ে বেশি সুদে তাঁতিদের ধার দিতেন। ডাচ এবং ব্রিটিশরা ছিলেন বিদেশি কোম্পানিগুলির নেতা; কিন্তু মাঝে মাঝে ওদের মধ্যেও ঝগড়া হত। যেমন ১৬১৯ থেকে ১৬২৩ পর্যন্ত মশলার বাণিজ্য নিয়ে ওদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ১৬৮২ সালে ডাচেরা ব্রিটিশদের মশলার দ্বীপ থেকে তাড়িয়ে দেয় (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৭০, ২৩০-২৩১)।[৫]

আমরা বিদেশি পর্যটকদের লেখা থেকে বুঝি যে, ইউরোপীয়ানদের মধ্যে বেশ সদভাব ছিল। ইউরোপ থেকে নতুন কেউ এলে, যে দেশ থেকেই আসুক, বাকিরা সাহায্য করত। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। ১৬৮৭ সালে হুগলিতে ইংরেজদের

সঙ্গে যখন মোগলদের যুদ্ধ হল, ডাচেরা মোগলদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে, এই ব্যাপারে ইংরেজদের ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবার কথা। কিন্তু পরে ওদের সন্দেহ হল যে, এই আলোচনার ফলে ডাচেদেরই সুবিধে হল বেশি, ইংরেজদের খরচায়। পলাশির ঠিক পরেই ডাচেরা হুগলি নদীর ওপর এক যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে হেরে যায় এবং বাংলায় আর বাণিজ্য করে না, যেমন, এই যুদ্ধের ১০০ বছর আগে অ্যামবয়নায় ওরা ইংরেজদের হারিয়ে দিয়েছিল (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : LV-LVI; প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ২৭২)।

১৬০২ সালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হয়। কিন্তু বাণিজ্য এই অঞ্চলে তখনই সম্ভব হল যখন পোর্তুগিজরা ওদের কাছে হেরে গেল—গোয়ার পাশ্চিমে। ১৫১৫ সালে ডাচেরা শ্রীলঙ্কা দখল করল এবং ১৫৩৪ সালে দমন ও দিউ আক্রমণ করল। ওদের বাণিজ্যের মূল ভিত্তি ছিল ইন্দোনেশিয়ার মশলার দ্বীপগুলো। প্রথমে তারা মশলার বিনিময়ে ভারতীয় টেক্সটাইলের কারবার করত। কিন্তু পরবর্তীকালে কাঁচা রেশম এবং আফিং, ডাচ বাণিজ্যে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুটো কোম্পানি এক হয়ে যায় (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৩, ৭৭)।

পূর্ব ভারতে ওড়িশায় ডাচেরা প্রথম হরিহরপাড়ায় এবং পিপলিতে এবং পরবর্তীকালে বালেশ্বরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ১৬২৯ সাল থেকেই, কিন্তু সবচেয়ে ভালো জায়গা হুগলিতে ঢুকতে পারে না, কেননা, ওই বন্দর তখন পোর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে। ১৬৩২ সালে মোগলদের কাছে পোর্তুগিজরা পরাজিত হওয়ায় একটা সুযোগ সৃষ্টি হয় পূর্বভারতে ভালো করে ঢুকবার এবং সেই সুযোগ নিয়ে, এবং গভর্নর আজাম খানের অনুমতি নিয়ে ডাচেরা ১৬৩৪ সালে হুগলিতে ঢোকে। তার পরে, ১৬৪৫ এবং ১৬৫১-র মধ্যে ওরা কাশিমবাজার এবং পাটনায় কারখানা খোলে। তার কিছু পরেই চুঁচুড়ায় ওদের কারখানা খোলে এবং ১৬৭৬ সালে মালদায়। সরকারি ফরমান অনুযায়ী ওরা ২.৫% কর দিত এবং ১৬৮০-র পর থেকে কর দিতে হত না (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৩২-১৩৩; প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৩৬-৩৭, ৩৯-৪০)।[৮]

ডাচেরা ব্রিটিশদের মতোই উদ্ধত ছিল এবং পাশ না দেখালে কোনও জাহাজ যেতে দিত না, এমনকি নবাব মীরজুমলার জাহাজকেও ওরা আটকায় ১৬৫১ এবং ১৬৫৫ সালে। প্রত্যুত্তরে নবাব হুমকি দেন যে, ওদের কারখানা লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুড়বেন। পোর্তুগিজদের মতোই ডাচেদেরও মোগলরা বিভিন্ন ব্যাপারে ডাকত। যেমন, ১৬৭০-এর দশকে চট্টগ্রাম আক্রমণের সময়। ওদের ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও পোর্তুগিজদের থেকে ওরা ভালো ব্যবসা বুঝত। ১৬৪০-এর মধ্যেই ওদের বাংলায় বাণিজ্যের মূল্য হল দশ লক্ষ ফ্লোরিন, যার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ছিল কাঁচা রেশম যা ওরা পেত জাপানের বাজারে বিক্রি করে, এবং শতকরা ২২ ভাগ ছিল টেক্সটাইল, ইউরোপের বাজারের জন্য। ১৬৯৩-৯৪ সালের মধ্যেই টেক্সটাইল মোট ডাচ বাণিজ্যের শতকরা ৭৩ ভাগ হয়ে দাঁড়াল (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৪২-১৪৪)।

১৭২৫ সাল পর্যন্ত ডাচেরা বাংলার বাণিজ্যে ব্রিটিশদের থেকে এগিয়ে ছিল। তার পর একটু একটু করে, ১৭৪০ সালের পর থেকে ব্রিটিশরা ডাচদের থেকে বেশি বিক্রি

করতে লাগল। কিন্তু তখনও দুই পক্ষই ছিল প্রায় সমান সমান। ব্রিটিশদের বিক্রি হত ৭৬.৬ লক্ষ ফ্লোরিন এবং ডাচেদের ৬৪ লক্ষ ১০ হাজার ফ্লোরিন। এরা ছাড়াও অনেক ব্যবসায়ী ছিলেন যাদের "অনুপ্রবেশকারী" বলা হত (মার্শাল, পি. জে., ১৯৭৬ : ১১)।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোম্পানি ভারতে ক্ষমতা দখল করল তারা কেমন ছিল। আমরা শুরু করতে পারি এই বলে যে, আজকের দৈত্যাকৃতি বহুদেশীয় প্রতিষ্ঠানের ওরা অগ্রজ ছিল। ওরা একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি বানিয়েছিল যার টাকা বহু দেশ থেকে আসত। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় রাজকীয় সনদের ভিত্তিতে, ডাচ কোম্পানির দুই বছর আগে। ওরা প্রথমে টেক্সটাইল কিনত মশলার বিনিময়ে, ডাচেদের মতো। কিন্তু চারপাশের জলে তখন পোর্তুগিজ আধিপত্য, ওরা চাইত না যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে ঢুকুক; ব্রিটিশরা চেয়েছিল ওদের এড়িয়ে, স্থলপথে ঢুকতে, কিন্তু পারল না। (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ১)।

সাম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথ সম্রাট আকবরকে যে প্রথম চিঠি লেখেন তাতে তাকে "ক্যাম্বের রাজা" বলে সম্বোধন করেছিলেন (ফস্টার, উইলিয়াম, ১৯২১ : ২)। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৬১৩ সালে, সুরাটে ব্রিটিশরা প্রথম অস্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করেন (হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৯০৩ : ১৭০)। এর কিছু পরেই, ১৬২৪ সালে আমবয়নায় ব্রিটিশরা ডাচদের কাছে হেরে যায়, যার ফলে ইন্দোনেশিয়ার বাজার ওদের হাতছাড়া হয়, ওরা বদ্ধপরিকর হয় যে, ভারতবর্ষে ঢুকবেই (চৌধুরি, কে.এন., ১৬৯৫ : ৬১-৬৫; হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., ১৯০৩ : ১৬৭)। ১৬৩২ সালে শায়েস্তা খানের হাতে পোর্তুগিজদের পরাজয় ওদের সুযোগ করে দেয়। ১৬৩৪ সালে বালেশ্বরের পিপলাইতে ওরা কারখানা তৈরি করে, কিন্তু ১৬৫১ সাল অবধি হুগলিতে ঢুকতে পারে না। এছাড়া কাশিমবাজারে সিল্ক বাণিজ্যের একটা কারখানা ওদের ছিল, যেমন সোরার বাণিজ্য ওরা করত পাটনাকে ভিত্তি করে এবং আগেই দেখেছি যে, ১৬৯০ সালে ওরা কলকাতায় শহর স্থাপন করল।

প্রথম থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক বড় সমস্যা ছিল ঠিক কর্মী পাওয়া। কর্মীদের সবচেয়ে ওপরে ছিল কভেনান্ট পাওয়া কর্মচারীরা, যাদের কোম্পানির কোনও ডাইরেক্টর মনোনীত করতেন এবং সিকিউরিটি হিসেবে কিছু অর্থ দিতে হত। কিন্তু অধিকাংশ কর্মচারী, যাদের রাইটার বলা হত, কিছু অঙ্ক জ্ঞান, হিসেব বিষয়ে ধারণা এবং ১৬ বছর বয়স হলেই চাকরি পেত। ৫ বছর রাইটার হিসেবে কাজ করার পর একজন ফ্যাক্টর হতে পারত। তার তিন বছর পরে তাদের করা হত জুনিয়ার বণিক এবং আরো তিন বছর পর সিনিয়ার বণিক। কোম্পানির মাথায় ছিল লন্ডনের অফিস এবং দশ জনের একটা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস (মার্শাল, পি. জে., ১৯৭৬ : ১১)

যারা ভারতে কাজ করতে আসত তারা সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্রিটিশ ছাত্র ছিল না। মার্শালের ভাষায় "যারা ভালো করত তারা ব্রিটেনেই অনেক সুযোগ পেত। শুধুমাত্র যারা প্রমোশন বা সম্পদ চাইত তারাই ভারতে আসত। ভারতবর্ষ অনেক দূরে ছিল

বলে ওখানে কাজের আকর্ষণ কম ছিল এবং বেতন ভালো ছিল না।[৭] এই অবস্থায় কাজকে আকর্ষণীয় করতে ব্রিটিশরা কর্মচারীদের অনুমতি দিত নিজেদের বাণিজ্য করার। মনে করা হত যে, এই ব্যক্তিগত বাণিজ্য কোম্পানির কোনও ক্ষতি করবে না বরং আয় বাড়াবে এবং ট্যাক্স ও কাস্টমস বাড়বে। ভারতীয়দের তুলনায় ওদের বেতন, বছরে ১৫০ পাউন্ড, খুব কম ছিল না, কিন্তু কোম্পানি চাইত যে, ওদের কর্মচারীরা ভালো জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হোক। সেই ধারণা থেকে কোম্পানি তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য করতে দিল, কিন্তু এর ফলে, আমরা দেখেছি, নবাবের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হল (মার্শাল, পি. জে., ১৯৭৬ : ১৭-২০, ১৮০)।

কোম্পানি খুব ভালোভাবে ভারতের বাজারে তাদের একচেটিয়া কারবার বজায় রেখেছে।[৮] অনুপ্রবেশকারীরা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোম্পানির বাণিজ্য কমাতে পারেনি। অন্যদিকে কোম্পানি ব্যক্তিগত বাণিজ্য পুরোপুরি তুলে দিতে পারেনি। বহু উদ্যোগী ব্যক্তির কোনও লাইসেন্স ছিল না। ১৭৫৬ সালে ৭৫১ জন কোম্পানির তালিকায় ছিলেন, তার মধ্যে ৬৪ জনই ব্রিটিশ ছিলেন। হিসেব করে দেখা গেছে ওরা ইংল্যান্ডের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি লাভ করত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে মাত্র ২৮ জন কোম্পানির কর্মচারী ছিল এবং পলাশির আগে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৫০। সৈন্যবাহিনী তুলনায় বড় ছিল, ২০০ জন লোক এবং ৫-৬ জন অফিসার। এই সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক ছিল ইউরেশিয়ান বা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, এক চতুর্থাংশ ব্রিটিশ এবং আর এক চতুর্থাংশ ভারতীয়। কিছু ডাচ এবং ফ্রেঞ্চও ছিল (মার্শাল, পি. জে., ১৯৭৬ : ২১-২৪, ৪৯)।

ওরা বাংলায় বিক্রির মতো কোনও কিছু তৈরি করত না। তাই ওদের টেক্সটাইল কিনতে হত বুলিয়ন বিক্রি করে। ওরা জাহাজের জন্য অপেক্ষা করত এবং সেই সময়েই টেক্সটাইল জমাত এবং জাহাজ এলে পাঠিয়ে দিত (মার্শাল, পি.জে., ১৯৭৬ : ১৫-১৬)।[৯] ১৬৯০ সালে কলকাতাকে তৈরি করবার একটা কারণ ছিল নদীর পূর্ব দিকে তার "ভুল অবস্থান"। এর ফলে পশ্চিম দিক থেকে মোগলদের আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ওদের বিশ্বাস ছিল যে, মোগল ও ওদের মধ্যে কিছু জল থাকলেই ওরা মোগলদের হারিয়ে শহর রক্ষা করতে পারবে। আর একটা কারণ, সুতানটি সুতোর কারবারের জন্য পরিচিত ছিল।[১০] সুতানটির দুই তাঁতি পরিবার, শেঠেরা এবং বসাকেরা ওদের যোগানদার বা বানিয়া হিসেবে কাজ করত।[১১]

ভাষাগত এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য ব্রিটিশরা চাইত দালাল এবং এজেন্টের মাধ্যমে কেনাবেচা করতে। এর ফলে এক বড় সংখ্যক লোক গোমস্তা বা বানিয়া হিসেবে ওদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বোল্টসের ভাষায়, বানিয়ারা নানা রকম কাজ করত ইংরেজদের হয়ে, যেমন, ভাষান্তর করত, হিসেব রাখত, গুপ্ত জিনিস গোপন রাখত, হেড সেক্রেটারি হিসেবে, এবং হেড দালাল হিসেবে। এদের অনেকেই দাসের মতো ব্যবহার করত। কান্তবাবু, গোকুল ঘোষাল বা শেঠ—বসাকরা ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে। এদের কেউ কেউ এত বুদ্ধিমান ছিল যে, ইংরেজ প্রভুদের শতকরা ২০ বা ৩০ ভাগ কমিশন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখত এবং বাকি ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেরাই চালাত। ব্রিটিশরাও খুশি ছিল ইংল্যান্ডের তুলনায় দুই বা তিন গুণ বেশি পেয়ে (মার্শাল, পি. জে., ১৯৭৬ : ৪৫)।

টেক্সটাইলের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

পৃথিবীতে বাংলার টেক্সটাইলের চাহিদা বেড়েই চলল, যার ফল শহর বা গ্রামের ওপর না পড়ে পারল না। ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলি সম্পূর্ণভাবে এবং একপেশেভাবে এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। শহরে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যাঙ্কার এবং মহাজনদের যথেষ্ট সাহায্য পেতেন। ইউরোপিয়দের মূল প্রয়োজন ছিল একটা জাহাজ আসা, চলে যাওয়া এবং পরের জাহাজ আসার মধ্যেকার সময়ের জন্য সাময়িক পুঁজি। যাতে জাহাজ আসবার আগেই মালপত্র নিয়ে গুদাম বোঝাই করে ওরা অপেক্ষা করতে পারে এবং জাহাজের অল্প সময় থাকলেই চলে। ওরা মুখ্য এজেন্ট বা গোমস্তাদের পয়সা দিত, এবং তারা আবার পরের স্তরের মধ্যবর্তীদের আগাম দিত এবং এইভাবে সত্যি সত্যি উৎপাদকের হাতে অর্থ পৌছত। কোম্পানিদের সবসময়ই টাকা নিয়ে সমস্যা হত এবং সরফরা টাকার জোগান দিত। সরফদের হাতে ছিল স্থানীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার চাবিকাঠি (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৯৫ : ৬৫-৬৭)। মোগলরা একটি ভালো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চালাত এবং প্রতিটি ওজনের নির্দিষ্ট পরিমাপ দিয়ে টাঁকশাল চালাত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৪)। ডাচেরা কাজটা ভালো করবার জন্য টাঁকশালের ক্ষেত্রে একটা যৌথ মূলধনী সংস্থার প্রস্তাব দেন, কিন্তু সেই প্রস্তাবের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় না (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৫, ২৭৭)। মুখ্য এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময় ভালো ছিল না, এবং ব্রিটিশ ও ডাচ দুই পক্ষই মুখ্য এজেন্টকে সরিয়ে গোমস্তাদের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। মধ্যবর্তীদের পাইকার, দালাল, ফড়ে এইসব বলা হত এবং সাধারণত শতকরা দুই ভাগ কমিশন দেওয়া হত (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৯৫ : ১০৩, ১০৭; প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ২৭৮)।[১২]

গ্রামে, অন্য কারিগরদের মতো, ব্রিটিশরা আসার আগে, তাঁতিরা ছিল আংশিক সময়ের কর্মজীবী; ওরা মূলত গ্রামবাসীর জন্য বস্ত্র তৈরি করত, সময়ে সময়ে উদ্বৃত্ত বিনিময় করত অন্য গ্রামের মানুষের সঙ্গে। ভালো টেক্সটাইলের আন্তর্জাতিক চাহিদা হওয়া পর্যন্ত, মূলত ঢাকা অঞ্চলে ভালো বস্ত্র তৈরি হত, এবং তা সিংহভাগ কিনত রাজার সঙ্গে জড়িত নানা মানুষ। অন্যত্র, গ্রামের উৎপাদন মানের বিচারে ভালো ছিল না এবং শহরে ভালো জিনিস উৎপাদন হত (আলাভি, হামজা, ১৯৮২ : ৪৭; গ্যাডগিল, ডি.আর', ১৯৭১ : ৯৭)। এবার গ্রামের সঙ্গে বাইরে জগতের একটা সম্পর্ক তৈরি হল বাণিজ্যের মাধ্যমে (বেইনস, ই., ১৯৬৬ : ৬৫; বুচানন-হ্যামিলটন, ফ্রান্সিস, ১৮৩৩ : ২৮৮)।

যদিও আগে গ্রামের উৎপাদনের মান উঁচু ছিল না, মানুষ আকৃষ্ট হত শহরের উৎপাদন দেখে, উৎপাদন যখন বাড়ল তখন গ্রামেই বেশি উৎপাদন হত। ঢাকা, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদাহ, এইসব অঞ্চলের নাম বেশি হলেও, উৎপাদন গ্রামে বেশি হত। উনবিংশ শতকে বাংলায় তাঁত যখন নিম্নগামী, তখনও ফ্রান্সিস বুচানন-হ্যামিল্টন লক্ষ্য করেন যে, প্রদেশের সর্বত্র কাপড় তৈরি হচ্ছে। সুতো তৈরি এবং পাকানো যেন পারিবারিক উদ্যোগ, যাতে মেয়েরা, এমনকি ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েরাও, অংশ নিচ্ছেন। আলাভির যুক্তি যে, গ্রামে তাঁত শিল্প তৈরি করে বিশেষ কোনও অর্থনৈতিক সুবিধা

পাওয়া যায় না। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল গ্রাম কোথায়, এবং গ্রামের অবস্থার সঙ্গে শহরের ভোগ্যকেন্দ্র বা রপ্তানির সম্পর্ক কী? অন্যপক্ষে গ্রামের মানুষ এমন সব জিনিস তৈরি করত যার চাহিদা শহরে বেশি যেমন, টেক্সটাইলের উৎপাদন, পরিবহণ এবং রপ্তানি, যার ফলে শহরেও লোকসংখ্যা বাড়ল—যেমন, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে, এবং ১৬৯০-এর পর, কলকাতায় (আলভি, হামজা, ১৯৮২ : ৪৯)।

বাংলায় উৎপাদন অনেকখানি বিকেন্দ্রীকৃত হতে পেরেছে, কেন না, জল পরিবহণের সস্তা বিকল্প ছিল। কারিগররা গ্রামে এবং পরিবারের মধ্যেই সুতো তৈরি করত, এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা ঝুকি নিত। উৎপাদনের একটা বড় অংশ কারিগররা মধ্যবর্তী বণিককে দিত এবং যে দাম আগে ঠিক হয়েছে সেই অনুযায়ী পয়সা পেত। (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৮ : ১৬৪-১৬৬)।

বাংলায় উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন চলত

যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন কম ছিল ততদিন পর্যন্ত কারিগর নিজেই নিজের মালিক ছিল এবং নিজেই কাঁচা মালের পয়সা দিত, যন্ত্র সারাত এবং কিনত এবং সিদ্ধান্ত নিত। কিন্তু যত উৎপাদন পাড়তে লাগল ততই তাঁতি নয় এমন বহু পরিবার উৎপাদনে অংশ নিল এবং কারিগর প্রায় পুরোপুরি বস্ত্র উৎপাদনে আত্মনিয়োগ কবল। যত দিন গেল ততই গ্রামের তাঁতি শহরের বণিকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, সিদ্ধান্ত নেওযার ক্ষমতা ক্রমশ তার হাত থেকে বেড়িয়ে গেল (বেইনস, ই, ১৯৬৬ : ৭৩)।

এটা অনেকগুলো কারণে হল। প্রথমত, যদি উৎপাদন বাড়াতে হয়, তাহলে এই প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে যে, এই উৎপাদন গ্রামের বাইরে বণিক বিক্রি করবে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত কাঁচা মাল, অল্প উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হলেও, বর্ধিত উৎপাদনেব ক্ষেত্রে নয়। অতএব দরকার হল অন্য জায়গা থেকে কাঁচামাল বণিক মারফত নিয়ে আসবার, বিশেষ করে গুজরাটের সুরাট থেকে। বুচাননের মতে ১৮৩০ সাল নাগাদ প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দুই-তৃতীয়াংশ (এবং মূল্যের তিন-পঞ্চমাংশ) বাইরে থেকে আনতে হত। অবশ্য এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ওমপ্রকাশের ধারণায় কাঁচামাল বেশি আমদানি হত না। অবশ্য এটা পরিষ্কার নয় যে ওমপ্রকাশ চাহিদা বাড়বার আগের অবস্থার কথা বলছেন কিনা (ঘোষাল, এইচ. আব, ১৯৬৬ : ২)। তৃতীয়ত, উৎপাদন যত বাড়ল ততই তাঁতের মাকু কিনবার এবং চালু রাখবার জন্য তাকে বণিকের ওপর নির্ভরশীল হতে হল। এইভাবে একটা putting out ব্যবস্থা বঙ্গে চালু হল। আলাভির মতে, মহাজনের ঋণকে putting out ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। অবশ্য আলাভির এই যুক্তি গ্রহণ করা কঠিন, যখন কাঁচামালের এক বড় অংশ বাইরে থেকে আসত বরং রাধাকমল মুখার্জীর মতোই যুক্তিসংগত মনে হয় যে, বণিকরাই কাঁচামাল জোগাত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৪)।

নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা নতুন সম্পর্ক তৈরি করল। তাঁতি এখন জমিদারের আঙুলের তলায় রইল, কিন্তু তার সম্পর্ক তৈরি হল জমিদারের বাইরের বণিকের সঙ্গেও এবং তার উৎপাদন হল গ্রামের বাইরের কোনও বাজারের জন্য, বিনিময়ের মাধ্যমে।

যতক্ষণ জমিদারের শাসন রইল তার ওপরে, জমিদারের বিশেষ আপত্তি রইল না, কারিগর শহরে বণিকের ওপরেও অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল হল। কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না, কেননা, দুই উৎপাদন সম্পর্ক পরস্পরের বিকল্প এবং একসঙ্গে চলতে পারে না। বণিকের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন বশ্যতা তৈরি করল এবং জমিদারের ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা কমাল।

তাঁতের পথ ধরে শিল্পায়ন

এই অবস্থা থেকে অনেক কিছুই হতে পারত। প্রথমত বিদেশি কোম্পানিগুলো শহরে কারখানা তৈরি করতে পাবত গ্রাম থেকে মজুর এনে। এইভাবে ইউরোপে শিল্পায়ন হয়েছে, যখন দেখা গেল একটা বড় জায়গা থেকে উৎপাদন করে সেখান থেকে মাল আনা ব্যয়সাধ্য এবং অদক্ষ, ও শৃঙ্খলাহীন। অন্যদিকে putting out ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে কারখানায় শ্রমিক সংগঠিত করা অনেক বেশি সহজ। এইভাবে বণিকের মূলধন ইউরোপে শিল্পের মূলধনে পরিণত হয়েছে। হয়তো বাংলার উৎপাদন ওইদিকেই যাচ্ছিল, যদি না পলাশির যুদ্ধে নবাব হারত।

সাহিত্যে "মুখ্য তাঁতি"র কথা অনেক সময় পাই। এরা তাঁতিদের সংগঠিত করত এবং তাদের কাজ দেখত। ১৭৩৬ সালে ঢাকায় প্রচুর দোকান ছিল মুখ্য তাঁতিদের, যারা তাঁতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগাড় করত এবং বণিক ও তাঁতির মাঝখানে একটা স্তর হিসেবে কাজ করত। এছাড়াও মাস্টার তাঁতি ছিল, যাদের দুই বা তিনটে তাঁত ছিল এবং তাদের সঙ্গে নিকারি এবং কারিগররা কাজ করত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৬৮-১৬৯; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : '১৫১)।

দ্বিতীয়ত, এটা হতে পারত যে, ভারতীয় বণিকরাই উৎপাদন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতেন। তার একটা কারণ ছিল মান নিয়ন্ত্রণ।[১৩] উৎপাদন যত বাড়ল তত গ্রামের তাঁতী আর সরল রইল না এবং বণিকদের নানাভাবে ঠকাল। তাঁতিরা এমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল যে, এই ঠকানো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যেত না। মনে হয় সেই দিকেই বাংলা যাচ্ছিল (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৭১-১৭৩, ২১৯-২২০; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ১৭০)।

তৃতীয়ত, এটাও সম্ভব ছিল যে, গ্রামের কারিগররা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে শহরে উৎপাদনের বন্দোবস্ত করবেন। এই তিন পথেই সম্ভব ছিল শিল্পায়নের দিকে যাওয়ার।[১৪] ঢাকায় ওই সময় সত্যি সত্যি একটি কারখানার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে লোক নিয়োগ হয় এবং বহু জিনিসও তৈরি হয়। কিন্তু ইউরোপের কারখানার সঙ্গে যেখানে পার্থক্য, ঢাকার এই কারখানাগুলো ছিল মূলত রাজাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, সরকারের মালিকানায়, এবং দারোগার নিয়ন্ত্রণে (করিম, কে.এম, ১৯৬৪ : ৮৩-৮৫; মুখার্জি, রাধাকমল, ১৯৪১ : ৮৭-৯০)। সবচেয়ে ভালো তাঁতিদের ওই কারখানায় আনা হত, মাকু দেওয়া হত কিন্তু তাঁতিরা নিজেদের কাঁচামাল নিজেরা আনতেন। তারা নিজেদের শ্রম দিতেন, কারখানার মজুরের মতো মজুরি পেতেন না (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ১৪৫)। এর ফলে এদের কারখানার শ্রমিক বলে চালানো যায় না।

কাশিমবাজারের ডাচেরা ১৬৫৩ সালে একজন মাস্টার রিলারের সঙ্গে চুক্তি করেন, যাকে কিছু অগ্রিম এবং যন্ত্র দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত যিনি বেতন নিয়ে ডাচদের কাজ কবতেন। আমরা জানি যে, এই রিলার ৭০০ থেকে ৪০০০ কর্মী নিয়ে কাজ করতেন। বার্নিয়াবের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখি যে ওই কারখানায় ৭০০-৮০০ লোক কাজ করতেন। যদি ছোট সংখ্যাটাও ধরি তাহলেও তখনকার যুগের মান অনুযায়ী সংখ্যাটা কম ছিল না (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১৭৪)।

রপ্তানি বাণিজ্যের প্রভাবে এই কোম্পানিগুলোর দ্রুত উন্নতির সুযোগ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানায় যেতে পারত। মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রি শুরু হয়েছিল এবং একই ছাদের তলায় এত লোক কাজ করছে তার প্রভাব গ্রামে না পড়ে পারত না। এর ফলে বণিকরা, ব্যবসায়ীরা এবং মহাজনরা বহু টাকা করতে পারত। দুঃখের বিষয়, এর প্রভাব গ্রামের যন্ত্র বা প্রযুক্তির ওপর পড়ল না, বরং চেষ্টা হল মেয়ে, শিশু এবং বৃদ্ধদের বেশি বেশি কাজ করিয়ে উৎপাদন বাড়াবার (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৯৫ : ১৭৪)। চাহিদা বেড়েই চলল এবং এইভাবে চললে শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি না পাল্টে উপায় থাকত না। ১৭৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে টেক্সটাইল উৎপাদনে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার মান বাংলার থেকে খুব উন্নত ছিল না (বেইনস, ই, ১৯৬৬ : ১১৫)।[১৫] কৃষিবও প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নয়নের একটা বড় সম্ভাবনা ছিল, যেহেতু লোক কৃষি ছেড়ে টেক্সটাইলে যাচ্ছিল।[১৬] দুর্ভাগ্যবশত, ইউরোপে যেভাবে বৈজ্ঞানিক, কৃষিগত এবং ভৌগোলিক বিপ্লব ঘটেছে, তেমন কিছু ভাবতে ঘটেনি (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৮২ : ৩৩)। বলা চলে, যে ঘটনা ঘটবার আগেই ভারত উপনিবেশ হয়ে গেল এবং প্রবণতা নিছক প্রবণতাই থেকে গেল।

শিল্পায়ন নিয়ে বিতর্ক

অবশ্য মরিসের মতে উপনিবেশ হওয়া কোনও পার্থক্য তৈরি করেনি। দৈহিক কুশলতা কখন প্রযুক্তির বিকল্প হতে পারে না। উনি বলতে চেয়েছিলেন, ভারতীয়রা খুব দক্ষ নয় এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আরো উন্নত করবার দিকে যেত না। এই মতামত স্বীকার করে না যে, প্রয়োজনে অনেক কিছুই অবেষ্টিত হতে প্যারে। আমরা বরং দেখি যে, প্রয়োজন হলেই কোনও না কোনও কিছু আবিষ্কার হয়। (মরিস, মরিস, ডেভিড,১৯৬৯:৬)।

মরিসের অন্য অনেক মতামতই ভুল। এটা সত্যি নয় যে, বহু অনাবাদি জমি চাষ করা হয়নি, অবশ্য তিনি ঠিকই বলেছেন যে, কৃষিতে ধাতুর ব্যবহার বেশি হয়নি। সাম্প্রতিক লেখা থেকে আমরা জানি যে, পলাশির আগেই অরণ্য সমাজ পাল্টাচ্ছিল। এটাও ঠিক নয় যে, ব্রিটিশ আমলে কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে, অবশ্য যদি শুধু বাণিজ্যিক শস্য এবং বাগিচার কথা ধরি তাহলে কথাটা ঠিক (ব্লিন, জর্জ, ১৯৬৬ : ২৫৩; চন্দ্র, বিপন, ১৯৬৯ : ৪৯; মরিস, মরিস, ডেভিড ১৯৬৯ : ৮)।

মরিসের তৎকালীন রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্যও সঠিক নয়। ১৭৪০-এর দশকের মারাঠা আক্রমণ এবং পরের দশকের দু বছর বাদ দিলে মোটামুটি বলা যায় যে, ওই সময় রাজনৈতিক স্থায়িত্বের বিচারে বাংলার অবস্থা ভালো ছিল। এই সময়

শাহ্ সুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ পর্যন্ত, শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৮ পর্যন্ত এবং প্রিন্স মহম্মদ আজিম ১৬৯৮ থেকে ১৭০৭ বাংলার নবাব ছিলেন। অর্থাৎ তিনটে বড় নবাবি কাল ওই সময়েই আমরা পেয়েছি (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৭৫ : ২)।

অবশ্য দুটো বাধা ছিল। এক, রপ্তানি বাণিজ্য, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর বিদেশিদের হাতেই ছিল এবং ভারতীয় বণিকরা ওদের ওপব নির্ভরশীল ছিল। দুই, দেশের অভ্যন্তরেও বাণিজ্য ওদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ওরা বাণিজ্যের জন্য প্রচুর দোকান খুলেছিল, এবং ভারতীয় এজেন্ট এবং ডিলারদের এক বড় বাহিনী ওদের ছিল। এছাড়া যারা উৎপাদন করত তাদের প্রচুর ধার এবং অগ্রিম দেওয়া হত। এই শ্রেণি ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত আমরা এক বিদেশি শক্তির উপনিবেশ হয়ে যাই। এছাড়া ব্রিটিশরা নিশ্চয়ই এমন লোভ ছড়িয়ে ছিল, যে শুধু তাঁতি নয় সাধারণ চাষিও টেক্সটাইল উৎপাদনে অংশ নিয়েছে এবং সুযোগের সদব্যবহার করেছে (চৌধুরি, সুশীল, ১৯৯৫ : ৪)।

প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ব্যবসায়ীরা বাংলায় বা ভারতবর্ষে কোনও কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিল না কেন। ওদের মূলধন যথেষ্ট ছিল এবং ব্রিটিশদের ধারও দিত। এছাড়া টেক্সটাইল বাণিজ্যে প্রচুর বুলিয়ন আসত। (মার্শাল, পি. জে, ১৯৭৬ : ৪৪)।

ওমপ্রকাশ দেখিয়েছেন যে, এই বুলিয়ন কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। সোজাসুজি এর ফলে ২০ হাজার চাকরি তৈরি হয়েছে এবং আরো ৮০ হাজার তৈরি হয়েছে পরোক্ষ। এর ফলে টাকার লেনদেন বেড়েছে এবং উৎপাদন ও জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির কায়েমি স্বার্থও লাভবান হয়েছে। কেন শিল্প হল না, তার মূল ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। ইংরেজরা আসার আগেই ভারতে মহাজনী কারবার বেশ ভালোই চলত। হয়তো সময় পেলে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য আর একটু ভালো বুঝলে এবং পলাশি না ঘটলে হয়ত সেটাই হত। পলাশি না হলে কি হত এটা বলা মুশকিল, কিন্তু এটা বলা যায় যে, ভারতীয় মূলধনের স্বাভাবিক বিকাশ পলাশির ফলে রুদ্ধ হয়ে গেল। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৬০ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে টেক্সটাইল তৈরি হত তা ভারতের থেকে ভালো কিছু ছিল না (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ৩১৫-৩২২)।

প্রোটো—শিল্পায়ন

ভারত স্বাধীন থাকা হয়তো ছিল শিল্পায়িত হবার এক শর্ত, কিন্তু ভারত শুধু স্বাধীন থাকাই যথেষ্ট হত না। যদি বর্তমান উন্নত দেশগুলোর ইতিহাস দেখি তাহলে, আরো কয়েকটা শর্ত পূরণ করবার দরকার ছিল। পৃথিবীর, বর্তমানে উন্নত সমস্ত দেশেই, দেখি শহরে শিল্পায়ন হবার আগে গ্রামে প্রোটো শিল্পায়ন হয়েছে (ক্রাইডত, পিটার, এবং অন্যরা, ১৯৮১ : ১-২)। এই প্রোটো শিল্পায়নের সময় পরিবার ভিত্তিক উৎপাদন হয়েছে, ছোট ছোট কর্মশালায় কাজ হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর অনেকখানি এই রকমই চলেছে। এই যে গ্রামে পণ্য তৈরি সেটা ভারতে সেভাবে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রোটো শিল্পায়ন প্রথম দিকে একই রকম থাকলেও, পরবর্তীকালে যুক্তিযুক্তভাবে তার বিকাশ ঘটেনি, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে অথবা পলাশি বাধা সৃষ্টি করল বলে (ক্রাইডত, পিটার, এবং অন্যরা, ১৯৮১ : ১৪-১৫)।[১৭]

ইউরোপে প্রোটো শিল্পায়ন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সার্ফ প্রথা উঠে গিয়েছে, শ্রমের মূল্য দেওয়া হয়েছে টাকার অঙ্কে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বেড়েছে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে, অধিকারের ব্যক্তিকরণ হয়েছে এবং কৃষির মধ্যে বিভাজন বেড়েছে। এই সব জিনিস ভারতে ঘটেনি। জনসংখ্যার অগ্রগতি দুভাবে কাজ করেছে। বর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য এবং কাজে নিয়োজিত করার জন্য কৃষিকে আরো বেশি দক্ষ এবং উৎপাদনশীল হতে হয়েছে, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু জমি কমেছে এবং কিছু লোক জমি হারিয়ে পথে বসেছে। এই অবস্থায় কৃষির বাইরে আয়, বিশেষ করে কুটিরশিল্পে টেক্সটাইল উৎপাদন কাজে দিয়েছে। যা অনেক সময় অতিরিক্ত আয়ের সূত্র হিসেবে শুরু হয়েছে, পরবর্তীকালে সেটাই মূল আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ঘটেছে এমন সময় যখন পুঁজিবাদিরা শহরের গিল্ড এড়িয়ে একটা নতুন ধরনের মজুরি প্রথা তৈরি করতে উৎসুক ছিল। শ্রমের চাহিদা এবং জোগান, দুদিক দিয়েই প্রোটো শিল্পায়ন এই রকম অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। গ্রামে পণ্য উৎপাদন শহরের মূলধনের এক বড় অংশকে গ্রামে নিয়ে এল। এর ফলে গ্রামের তাঁতি আর বিচ্ছিন্ন রইল না, বরং বাইরের বাজারের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক তৈরি হল এবং নতুন উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি হল (ক্রাইডত, পিটার, এবং অন্যরা, ১৯৮১ : ১৮, ২৫)।

অন্তত প্রথম দিকে দরকার ছিল যে, এই প্রোটো শিল্পায়ন জমিদারদের সরাসরি বিরোধিতার কারণ হবে না। কিন্তু প্রোটো শিল্পায়নে যে অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশ হল তার ফলে বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক আর বজায় থাকা সহজ হল না। জমিদারদের সমর্থন পাবার জন্যে, খাজনার একটা অংশ প্রোটো শিল্পায়নের মাধ্যমে জমিদারদের হস্তান্তর করা হল, যাতে ওরা খুশি থাকে।

প্রোটো শিল্পায়নকে তার যুক্তিযুক্ত পথে হাঁটতে গেলে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ছিল অবশ্যম্ভাবী, যাতে বেশি আয় কৃষির বাইরে থেকে আসে এবং কৃষির সঙ্গে চাষির যোগাযোগ একটু একটু করে কমে আসে এবং এই প্রক্রিয়া যেন কাজ করে খাদ্যের উৎপাদন না কমিয়ে এবং উদ্বৃত্ত বাড়িয়ে। গ্রামকে খাদ্য ছাড়াও কাঁচামাল এবং জ্বালানি তৈরি করতে হত। কাজেই খাদ্যের সঙ্গে খাদ্য বহির্ভূত বস্তুর সম্পর্ক এক বড় জিনিস হল (ক্রাইডত, পিটার, এবং অন্যরা, ১৯৮১ : ২৪, ৩০, ৩১)।

যদিও প্রোটো শিল্পায়ন মূলত গ্রামেই হয়েছে, দরকার ছিল যে শহর খুব দূরে হবে না এবং শহরেরও বিকাশ ঘটবে। এর ফলে গ্রামের বাণিজ্যিক কৃষি বাধা পেত। এই অবস্থায় আজ হোক কাল হোক বাণিজ্যিক কৃষি এবং প্রোটো শিল্পায়নের মধ্যে শ্রম শক্তি নিয়ে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। বহু ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিল্পের চাহিদা আসত বাইরে থেকে, যার ফলে গ্রামের চারপাশের দেওয়াল ভেঙে পড়ল এবং গ্রাম আর আলাদা রইল না। অন্য দিকে প্রোটো শিল্পায়ন বণিকের মতো গ্রামকে বিশেষীকরণ করতে এবং ধনতন্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করল (ক্রাইডত, পিটার, এবং অন্যরা, ১৯৮১ : ১৪, ১৭)।

এই ভাবে, প্রোটো শিল্পায়নের বিভিন্ন দিক আমরা দেখতে পারি, এবং বুঝতে পারি কেন বাংলার প্রোটো শিল্পায়নের বিকাশ ঘটেনি। প্রথমত, প্রোটো শিল্পায়নে কৃষির উৎপাদন যেভাবে বাড়ে এবং উৎপাদন দক্ষতাও বাড়ে সেই ভাবে বাংলায় বাড়েনি। দ্বিতীয়, কৃষির বিভাজন এবং জমির অভাব দেখা গেলেও কখনও এই অবস্থায় যায়নি যে কিছু লোক গ্রামে থেকেও কৃষির থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, কখনও আমরা শ্রম শক্তির ব্যবহার এতটা করতে পারিনি যাকে শিশু শ্রমিক দিয়ে বা নারী বা বৃদ্ধ শ্রমশক্তি দিয়ে পূরণ করা যাবে না। সত্যিকারের শ্রমশক্তির অভাব কোথাও তেমন ভাবে অনুভূত হয়নি।[১৮]

শিল্পের সংস্কৃতি

সেই সময় বাংলা এবং ভারতবর্ষ শিল্পোন্নত দেশ হবার মতো অবস্থায় ছিল কি না, সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রের নিজস্ব মূল্যবোধ আছে এবং ধর্মীয় নানা মূল্যবোধ আছে। বাংলার মূল্যবোধ সেই সময় শিল্পোন্নত দেশের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কি না, সেই প্রশ্ন থাকছে। ইউরোপে এবং বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে, পলাশির আগে, যে আলোচনা হত তা থেকে অন্তত কিছুটা বুঝি কেন ধনতন্ত্রের শিল্পায়ন ইউরোপে দাগ কেটেছে, কিন্তু বাংলায় নয়। ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের মতোই তৎকালীন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন, চৈতন্যের বৈষ্ণববাদ নানা রকম প্রথা বা পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে। শ্রীচৈতন্যের ধারণা ছিল যে, কোনও সাধককে ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে ভক্তিই যথেষ্ট। এই মতামত সারা জীবন ধরে, ধারাবাহিকভাবে তিনি পোষণ করেছেন যে, বন্ধু হিসেবে, বাবা-মা হিসেবে অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে সোজাসুজি ভগবানকে পাওয়া যায়। তার জন্য ভগবান এবং সাধকের মধ্যে কোনও মধ্যবর্তীর দরকার নেই, যেমন প্রয়োজন নেই বিস্তারিত পূজা পার্বণের। কিন্তু, আমরা দেখেছি আগের অংশে, যে, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর আবার ভীষণভাবে গুরুবাদ ফিরে আসে।

যখন পাশ্চাত্যে চার্চের বিভিন্ন অংশ, নানা মহাদেশীয় আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে, এমনকী তারও আগে, বিতর্কে মগ্ন ছিল নানা বিষয়ে, যেমন, গরিবের আইন, মহাজনী কারবার, মূল্য বৃদ্ধি বা সার্ফ প্রথা নিয়ে, তৎকালীন পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় মুসলমান, বৈষ্ণব ইত্যাদি অংশের মধ্যে এই আলোচনা হতই না। তখন বাংলায় মূল বিতর্কিত বিষয় ছিল যে, কৃষ্ণ, ভগবান হিসেবে এবং কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও গোপিনী এবং রাধার স্বামীর সঙ্গে রাধার সম্পর্ক সবটাই কি মায়ার খেলা, না, সত্য (টনি, আর.এইচ, ১৯৮০)।[১৯]

ভক্তিবাদে, সে বৈষ্ণবদের মধ্যে হোক বা সুফিদের মধ্যে হোক, একটা সিদ্ধান্ত ছিল, বড়দের চিন্তা ভুল হতে পারে না এবং ভগবানের নামে যা করাই হোক তাই ভালো। এই যে যুক্তিবাদী ধারণার বাইরে বিশ্বাস, এর ফলে সুবিবেচক, স্বাধীন চিন্তা গড়ে উঠল না, গড়ে উঠল না প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে চেতনা। গীতার মূল বাণী ছিল; ভুল হোক বা ঠিক হোক, সত্য হোক কি মিথ্যা হোক, যা ঘটছে তা ঘটবেই, কেন না ভগবান

বলে দিয়েছেন। এই ধারণার আর একটা দিক হচ্ছে যে, একজন মানুষ তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয়।[২০]

মন্তব্য

১. ট্যাঙ্গোন ঘোড়া বিশেষ করে পাহাড়ি পথে এবং মাল টানবার জন্য উপযোগী ছিল। (মুখার্জি, রিলা, ২০০০ : ২৩১)। এমন ঘোড়ার শিল পাওয়া গেছে যাতে দেখা যাচ্ছে একটা ঘোড়াকে টেনে একটা জাহাজে ঢোকানো হচ্ছে। ট্যাঙ্গোন ঘোড়া সম্ভবত দেশের উত্তর ভাগ থেকে আসত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্রি হত (মুখার্জি, বি.এন., ১৯৯৪ : ১৬৬)।
২. কারতাজ মানে এক অধিকার পত্র, ওই সমুদ্রপথ ব্যবহার করবার এই কারতাজ সমুদ্রে পোর্তুগিজ জাহাজে বা উপকূলে পাওয়া যেত। এই অধিকার পত্রে যে সমুদ্রপথে এই জাহাজ যাবার অধিকার রয়েছে, তা লিপি বদ্ধ থাকতো কারতাজ না থাকলে ওই জাহাজ দখল করবার বা আটকাবার অধিকার পোর্তুগিজদের থাকতো।
৩. 'ইন্টারলোপার''দের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন টমাস পিট, যিনি পরবর্তীকালে সেন্ট জর্জের গভর্নর হন, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো হীরকের আবিষ্কার করেন, এবং ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের একজনের ছোটভাই হিসেবে পরিচিত ছিলেন, পারস্য ও বাংলার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্যের একটা বিবরণ প্রকাশ করেন (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৫৭)। হেজেস যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ছিলেন, তখন ইন্টাবলোপারদের নবাবকে দিয়ে গ্রেপ্তারেব ব্যর্থ চেষ্টা কবেন। তারাই একটা গুজব রটায় যে, তাবাই আসল কোম্পানি এবং বাংলার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য রেজিস্ট্রি করা হয়েছে (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৭৩-৭৫)।
৪. এইটা ছিল কোম্পানির সঙ্গে প্রশাসনের বিরোধের এক মূল প্রশ্ন। ডাচ কোম্পানিগুলো তাদের দস্তক ভারতীয় বণিকদের ধার দিত, যাতে ওদের শুল্ক না দিতে হয়। ডাচেরা হুগলিতে অল্প শুল্ক দিয়ে পার পেয়ে যেত, কারণ জিনিসপত্রের মূল্য কম ঘোষণা করত (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৪৫-৪৬)।
৫. এর আগে এবা করমণ্ডল উপকূলে ভারতীয় জিনিস কিনত হল্যান্ড এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করবার জন্য। হল্যান্ডের জন্য তারা কিনত টেক্সটাইল, চিনি, এবং সোরা, পারস্যের জন্য চিনি, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য টেক্সটাইল এবং দাস (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৩৫)।
৬. ১৬৪২ সালে বালেশ্বরের কারখানা তৈরি হয় এবং ১৬৩৪ সালে পিপলিতে। একথা আমরা জানি উইলসনের লেখা থেকে (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ১৩)।
৭. ওদের বেতন ভারতীয় বিচারে বেশ উঁচু ছিল। এত বছর আগে, যখন জিনিসপত্রের দাম বর্তমান মূল্যের এক ভগ্নাংশ ছিল, তখনও ওদের নাবিকরা পেত ২০০ পাউন্ড এবং একজন অল্প বয়স্ক রাইটারও পেত ১০ পাউন্ড। কোম্পানির ভৃত্যদের কারখানায় থাকা খাওয়া এবং সঙ্গী রাখবার ব্যবস্থা ছিল। প্রধানের নীচে ৩০-৪০ জন নেটিভ আর্দালির এবং ২০ জন সৈন্যের ব্যবস্থা ছিল, তার সঙ্গে ছিলেন একজন কর্পোরাল (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৬২-৬৩)।
৮. একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি ১৬৯৮ সালে তৈরি হয়, ওরা রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের কাছ থেকে সনদ পান। এই সনদে ওই কোম্পানিকে "সাধারণ সমাজ" হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার সঙ্গে বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হয়। পুরানো

কোম্পানির নাম হয় "লন্ডন কোম্পানি"। চার বছর এই রকম চলে, পরে দুপক্ষ আবার এক হয়ে যায়। (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ১৫৮)।

৯. ওই সময়কার লোকগাথায় আমরা জানি কীভাবে ওই অঞ্চলের অবস্থা ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে ভালো হয়ে যায়। একজন জৈন কবি, নাম নিহাল, ১৭২০-এর দশকে বাংলায় আসেন এবং তার গজলে তিনি বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর মন্দির, মসজিদ, প্রাসাদ ও ধর্মশালা নিয়ে লেখেন। সঙ্গে তিনি সব ধর্মেরই সাধু, পিতলের বাসনপত্রের বাজারের কথা, তাঁতির কথা লেখেন। তিনি কাশিমবাজারে বহু জাতি দেখেন, যারা টুপি বা অন্য কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে বসেছিল, যেমন, আরব, আরবানিয়ান, ইংরেজ, পারসী, হাবসী, সিন্ধী, ফরাসি, জার্মান, পাঠান, মোগল, এবং অন্যরা। কোম্পানি বিভিন্ন রকম জিনিস ওদের কাছে বিক্রি করত একটা বাড়ি থেকে। ওখানকার রেশম বাণিজ্য দেখে তিনি খুব খুশী হন (সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড, : ৩০৬)।

১০. বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা মনসামঙ্গলে পশ্চিমবঙ্গের শহরে একটা তালিকা দেন চাঁদসওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ বলতে গিয়ে : কাটোয়া, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মিরজাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহাট, হুগলি, ভাটপাড়া, বোরো, কাঁকিনাড়া, মুলাজোড়, গারুলিয়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানী, ইছাপুর, বানিবাজার, নিমাইতীর্থ (বৈদ্যবাটি), চান্যক, মহেশ, খড়দা, শ্রীপথ, রিষড়া, শুকচর, কোননগর, কোতরং, কামারহাটি, আড়িয়াদহ, ঘুসুরী, চিৎপুর, কলিকাতা, ব্যাতোর, কালিঘাট, চুড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, এবং সাগর। তার মঙ্গলকাব্যে প্রথম আমরা কলকাতা এবং হুগলীর উল্লেখ দেখি (রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩ : ৭৫-৭৬)। এই নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে যে, অনেকগুলো শহর পরবর্তী যুগের পক্ষে প্রযোজ্য। এই তালিকা থেকে আমরা বুঝি না, এই শহরগুলোর মধ্যে কতকগুলো ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে ছিল, এবং শহরগুলোর মধ্যে কতকগুলো এই তালিকায় পরে যোগ করা হয়েছে।

১১. বাংলায় সূতার একটা মানে আছে—ইংরাজিতে যাকে গ্রেড বা ইয়ার্ন বলে। এইসব নাম থেকে বুঝি যে, জব চার্নক আসার আগেই ওই বাজার ছিল। তার কলকাতা পত্তনের পেছনে সেইটা হয়তো এক বড় কারণ, যদিও লন্ডন অফিস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১২. ১৭৩৭ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কারখানার রেকর্ড দেখে করিম সাহেব সিদ্ধান্তে আসেন যে, এইভাবে বাণিজ্য করা হত। জানুয়ারি মাসে খস এবং মলমলের জন্য অগ্রিম দেওয়া হত। দালালরা সাধারণত চার মাস সময় নিতেন সেইমতো ডেলিভারি দিতে। ছয় মাস লাগত তাঁতিদের কাছ থেকে বাদামি বস্ত্র (না ব্লিচ করা) পেতে। তারপর সেই বাদামি বস্ত্র সর্বসম্মত দামে ডেলিভারি হত। কিছু কোম্পানির দালালের নাম পাই যা থেকে মনে হতে পারে যে, অধিকাংশ দালাল বাঙালি ছিলেন—রামনারায়ণ, নেতো, সোনামণি, মুক্তোগোলাপ, হাফিজুল্লা, বিষ্ণুদাস, জয়কৃষ্ণ, কুনাল্ল (করিম, এম.এ., ১৯৬৪ : ৭৭-৭৮)। দালালরা সাধারণত শতকরা তিন ভাগ কমিশন পেত (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৬৩)।

১৩. এই মান ঠিক করাটা যে সহজ ছিল না তা আমরা কিছু ফরাসি চিঠিপত্র থেকে বুঝি : কিছু বস্ত্র অন্যদের থেকে বেশি ভারী ছিল এবং বিভিন্ন মানের কাঁচামাল তাদের জন্য ব্যবহৃত হত। (রায়, ইন্দ্রাণী, ১৯৯২ : ১১৭-১১৮)।

১৪. পার্লিনের মতে, কোনও ভালো ঐতিহাসিক বলবেন না যে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হবার ঠিক আগে ভারত শিল্পায়নের কিনারায় ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সেই শিল্পায়ন ব্যাহত হয় (পার্লিন, ফ্রাঙ্ক, ১৯৮৩ : ৫৪)। কিন্তু তিনি বলেন যে, ভারতের

উন্নয়নের বিভিন্ন দিক—যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা নতুন কৃষি উপনিবেশের পত্তন—প্রায় চীন, রাশিয়া, এবং ইউরোপের মতোই ছিল। এই উন্নয়নের ফলে ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ সম্ভবপর হয় এবং "এর ফলে আন্তর্জাতিক বিনিময় এবং নির্ভরতা বাড়ে এবং ইউরোপীয় আধিপত্য বাড়ে।" ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সেই আধিপত্য আরো স্বীকৃত হয়। তিনি আরো বলেন, "ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ ঔপনিবেশিক দখলদারীর আগেই শুরু হয়। এর ফলে সেই হস্তক্ষেপের মূল্য বাড়ে, কেননা, এই হস্তক্ষেপ সরকারি নিয়ন্ত্রণের রূপ নেয় না" (পার্লিন, ফ্রাঙ্ক, ১৯৮৩ : ৬৯, ৮৯, ৯০)।

১৫. বেইনসের মতে, যদিও প্রযুক্তিবিদ্যা বা কর্ম বিভাজন খুব উঁচু মানের ছিল না "কিন্তু ভাবতবর্ষ তা সত্ত্বেও খুব চমৎকার ও উঁচু মানের টেক্সটাইল তৈরি করে, যা অন্য কোনও দেশ পারে না"। বেইনসের ধারণা যে, এটা সম্ভব ছিল কারণ, "ওই মেয়েলী লোকদের সুন্দর স্পর্শ অনুভূতি ছিল"। (বেইনস, ই, ১৯৬৩ : ৭৪)।

১৬. ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। তাঁতিরা এদের একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারতেন (চিচেরভ, এ.আই., ১৯৯৬ : ৫৩)।

১৭. আর একটা মত হচ্ছে যে, কারখানার উৎপাদনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রোটো-শিল্পায়ন বাড়ে (পার্লিন, ফ্রাঙ্ক, ১৯৮৩ : ৩৫)।

১৮ পার্লিনের ধারণায় প্রোটো-শিল্পায়নের বক্তব্যে কিছু গণ্ডগোল আছে। এই প্রোটো-শিল্পায়ন খুব সূক্ষ্ম সংজ্ঞায় সীমিত করা যায় না। মেডিকের পরিবার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা তিনি চ্যালেঞ্জ করেন, যেমন, চায়ানভের মডেল পরিবার ভিত্তিক উৎপাদনে কতটা কার্যকরী সেই ব্যাপারে তার সন্দেহ আছে (পার্লিন, ফ্রাঙ্ক, ১৯৮৩ : ৩৬-৪৪)।

১৯. জে. এম. কেইনস একবার বলেন, "আধুনিক ধনতন্ত্রের কোনও ধর্ম নেই, কোনও আভ্যন্তরীণ ঐক্যবোধ নেই, কোনও উদ্যমশীল ভূমিকা নেই, কারো আছে কারো নেই এবং এদের সংমিশ্রণ।" টনি যোগ করেন, "এটা একটা ভোগ ও মূল্যবোধের সংমিশ্রণ যেখানে লুণ্ঠনের জন্য জমানো হয় বা জমানোর জন্য লুণ্ঠন করাকেই বড় বলে ধরা হয়" (টনি, আর.এইচ., ১৯৮০ : ২৮০)।

২০. গীতা "পাঠকের সমস্ত কাজকেই ঠিক মনে করে, এবং কোনও কাজের ফল ভাবে না। বহুরূপী ভগবানও একই কারণে নানা যুক্তি নানা অবস্থায় দেন। তিনি যেন সকলের কাছে সব কিছু, মহিলাদের কাছে অনেক কিছু, স্বর্গীয়, ভালোবাসার পাত্র বালক, বদমাস রাখাল বালক, সমস্ত গোপিনীর হৃদয়, বহু দেবীর স্বামী, বহু সাধীর সঙ্গী, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাধার সঙ্গে এক মজার সম্পর্কে একাত্ম, তার নিজের মামা কংসকে নির্দয়ভাবে খুন করতে দ্বিধা করেন না অথবা অন্য কারোর সভায় গিয়ে শিশুপালের মতো অতিথিকে ছিন্নমস্তক করতে দ্বিধা করেন না, সমস্ত ন্যায়নীতির উৎস, যার উপদেশ ছাড়া একটা মুহূর্তও চলবে না সেই বড় যুদ্ধে (যে যুদ্ধে তিনি একই ষড়যন্ত্রকারী ও একজন সাধারণ কর্মীর ভূমিকা নেন) সমস্ত রকম সঠিক পন্থার বিরুদ্ধে চলেন।" সত্যিকারের বিশ্বাসী সব কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। (কোসাম্বী, ডি.ডি., ১৯৬৫ : ১১৩)।

৪.৫

ইতালির রেনেসাঁস

ভূমিকা

আমরা এই অধ্যায় এখানে যোগ করছি, দেখাতে যে পলাশির যুদ্ধে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে গুণগত ব্যবধান কীভাবে এই রেনেসাঁস তৈরি করল। তারও একশো বছর আগে ক্রুশেডের যুদ্ধ হয়। কিন্তু তখন এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। এই ক্রুশেডের যুদ্ধ নতুন নতুন জিনিস পাবার একটা সুযোগ তৈরি করে দিল—যেমন সিল্ক, বারুদ, ছাপাখানা, অ্যাবাকাস, দাবা, চা, সুতিবস্ত্র এবং আরো অনেক কিছু এশিয়া থেকে ইউরোপে যেতে পারল যুদ্ধের কারণে, একথা ইউরোপের ঐতিহাসিকরাই বলেছেন।

তার পর একটা সময় এল যখন প্রাচ্যে প্রায় কিছুই ঘটল না, অথচ ইউরোপে একটা বড় পরিবর্তন এল। এই পরিবর্তনের চাবিকাঠি হল রেনেসাঁস, যা ইউরোপকে সামন্ততান্ত্রিক থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করল। এক অর্থে এই পরিবর্তন ছিল এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যখন বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন পদ্ধতি পাল্টে গেল। অন্য অর্থে এই পরিবর্তন আনল সত্যকে বুঝবার এক আধুনিক মানদণ্ড, যার ফলে বহু বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারল এবং নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের কাজে লাগল। এখন আর শাসকরা পুরনো যুগের সামন্ত শাসকদের মতো দুর্গে আবদ্ধ থাকল না। বরং নতুন শাসক হল বণিকরা, শিল্পপতিরা, এবং একনায়কতান্ত্রিকরা, যারা শহরে থাকত। জীবনযাত্রা সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হল, যার ভিত্তি অর্থনৈতিক (গ্রিন, ভি.এইচ., ১৯৬৪ : ৩৩, ৪৯; জেকব, ই, ১৯৬০ : ২৪)।

জ্ঞান সংগ্রহ

যখন বাংলাদেশে চৈতন্য মানুষকে ভক্তির পথে যেতে বলছেন এবং জ্ঞান সংগ্রহের বিরুদ্ধে বলছেন এবং ব্রাহ্মণদের অধিকারেই যখন ছিল সমস্ত জ্ঞান, তখন ইউরোপে, রেনেসাঁসের কল্যাণে, ঠিক উল্টো কথা বলা হত। রেনেসাঁসের তারিখ নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক আছে, সম্ভবত ১৩০০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ওটা ঘটেছিল। (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৪)। এই সময় বাংলাদেশে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শার শাসনকাল থেকে মান সিংহের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় মূলত ১২০৪ সালের পরের এবং মোগলরা ভালো করে বসবার আগের সময়ে। ইতালিতে এই পরিবর্তন ১০০ বছরে হয়েছিল, অন্যত্র ২০০ বছরের বেশি নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে একটু বেশি সময় লেগেছে। (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৫)।

রেনেসাঁসের প্রথম মানে ছিল নবজাগরণ এবং রেনেসাঁসের ফলে সনাতনী গ্রিক সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ে। অবশ্য একবার শুরু হলে এই আন্দোলন কোনও মানের মধ্যেই

আটকে থাকে না। যখন সনাতনী গ্রিক চর্চা হচ্ছে তখনও অন্ধ অনুকরণ না করে মানুষ পুরোনো ইতিহাস ঘাটতে শুরু করল। যার প্রতিফলন হল তিন মাত্রায়। রাজনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম—কিছুই বাকি থাকল না (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৬, ৮)।

মধ্য যুগের চিন্তাবিদরা একটি সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথিবীর কথা ভাবতেন। তারা সমস্ত পৃথিবীকে সাতটা ভাগে ভাগ করতেন। যেমন সপ্ত গ্রহ, সপ্ত ধাতু এবং সপ্ত ধর্ম তেমনই ছিল সপ্ত জ্ঞান। পুরোনো জ্ঞানের মন আধুনিক চিন্তা বুঝতে পারত না। মধ্য যুগে অনেক কিছুই বলা হত, পরীক্ষা না করেই। এখন রেনেসাঁসের ফলে থিওলজির বদলে এল ফিলজফি, এবং বিশ্বাসের বদলে জ্ঞান। মাশিলিও ছিল পাডুয়ার একটি শহর, কিন্তু ধরে নেওয়া হত যে, ওখানেই সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা থাকতেন। অবশ্য পাডুয়ার রমরমা অবস্থা ছিল পেত্রাক আবির্ভূত হবার আগে (উইনস্টাইন, ডোনাল্ড, ১৯৬৫ : ৫০; মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৯)।

জ্ঞানের প্রতি বিতর্কমূলক মনোভাব : জ্যোতির্বিদ্যা বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান

রেনেসাঁসের কালে লোকের মধ্যে জ্ঞান সংগ্রহ করবার খিদে তৈরি হল, এবং পুরোনো জ্ঞানকেও—বিশেষ করে রক্ষণশীল জ্ঞান এবং সংগৃহীত জ্ঞান—ওরা নিক্তি দিয়ে মেপে দেখল (এরেনবুর্গ, রিচার্ড, ১৯২৮ : ২২)। যা বলা হবে, স্বর্গীয় জ্ঞান যাই হোক, তা নিঃসংশয়ে না মেনে নিয়ে, প্রত্যেকটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ওরা প্রমাণ চাইল। ভগবান তার বাণী পাঠাবেন কিছু মানুষের মাধ্যমে সেটা ওরা মানতে পারল না (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৫০)। সত্য শুধুমাত্র যুক্তি বা দৃষ্টান্তের আলোকে বিবেচিত হবে। যা পরীক্ষা করা যাবে না, যেমন ভগবান আছেন কি নেই, সেটা বিশ্বাসের ব্যাপার, জ্ঞান বা বিজ্ঞান নয় এবং যুক্তি তর্কের বাইরে।

একটি বক্তব্যকে দৃষ্টান্ত দিয়ে পরীক্ষা করা যায়, বা যুক্তি দিয়ে। এই বিচার এমনভাবে হবে যেন ওই বক্তব্য ভুল হলে ধরা পরে যায়, এবং সত্য হলে গৃহীত হয়। এইভাবে সত্যকেই বড় করে দেখল রেনেসাঁর মানুষ। রেনেসাঁর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, দান্তে আলিঘেরি (১২৬৫-১৩২১)। আলিঘেরি যুক্তিকে ভগবানের ওপর স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন মানুষের মুক্তি যুক্তির মধ্যে রয়েছে (উইনস্টেন, ডোনাল্ড, ১৯৬৫ : ৪৫)।

এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা দিক হল জ্যোতির্বিদ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যদি এই যুদ্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যার কাছে হারত তাহলে ইউরোপে এবং অন্যত্র ধনতন্ত্রের উন্নয়ন হত না। এই যুদ্ধে জিততে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দরকার ছিল, যাতে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক বের করা যায়। কোনও জাহাজ সীমাহীন জলে যখন যাত্রা করল, ওদের বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবী, তার আকার এবং মাথার ওপরের আকাশের অগণিত তারা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান—এই সমস্ত বুঝবার প্রয়োজন ছিল, নাহলে ওই জাহাজ গন্তব্যস্থলের বন্দরে যেতে পারত না।

ওই যুগের এক মহানায়ক ছিলেন, গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি আকাশ দেখতেন তাঁর নিজের তৈরি একটা টেলিস্কোপ দিয়ে, এবং এমন এক সিদ্ধান্তে পৌছন যাতে হইচই

বেধে যায়। ওই টেলিস্কোপে আকাশ দেখে তিনি বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায়, যা কোপারনিকাস আগে বলেছেন, যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এবং চার্চের উল্টো বক্তব্য ভুল। তার বক্তব্য ক্যাথলিক চার্চ মেনে নিল না। তিনি যে কঠিন বিরোধিতার মুখে পড়লেন তার ফলে তিনি পদার্থবিদ্যার আশ্রয় নিলেন। যদিও গ্যালিলিওর বক্তব্য চার্চ মেনে নিল না, কিন্তু ডেসকার্টেস, বেকন এবং অন্যেরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সপ্তদশ শতাব্দীতে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৬, ৮)। জ্ঞান অন্বেষণের এই পদ্ধতি—ধরে নেওয়া যে একটি বক্তব্য সঠিক হলে তা সত্য প্রমাণিত হবে, এবং ভুল হলে তা ভুল বলে পরিত্যক্ত হবে, এবং সব কিছুই পরীক্ষা করে বুঝতে হবে—নিউটন এবং ডারউইন তাদের তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ডারউইন বিস্তারিতভাবে লিখলেন ছোট ছোট প্রাণীদের কথা একটা ছোট নির্জন দ্বীপে গিয়ে এবং তার তৈরি "ন্যাচারাল সিলেকশন"-এর তত্ত্ব গৃহীত হল। তার থেকে আরো গবেষণা হল, বাঁদর থেকে মানুষের বিবর্তনের কাহিনি জানা গেল, যে মানুষের আদি পুরুষ আদম এবং আদি নারী ইভের থেকে মনুষ্য সমাজ জন্ম নিয়েছে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে—আর একটা আবিষ্কার যা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আঘাত দিল। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপের বহু মানুষের মনে ছাপ ফেলেছে।

যে মানুষটি জ্যোতির্বিদ্যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করলেন তার নাম জোভানি পিকো ডেলা মিরানডোলা (১৪৬৩-১৪৮৪), তিনি ছিলেন রেনেসাঁসের জনক ফ্রান্সেসকো পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) যোগ্য উত্তরাধিকারী। মিরানডোলার জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে মন্তব্য ছিল সাংঘাতিক, "জ্যোতির্বিদ্যা বলতে পারে না যে কি করা উচিত এবং কি নয়"। জ্যোতিষীর উপদেশ "হয় ক্ষতিকারক অথবা অপ্রয়োজনীয়"। এই মন্তব্য অতীতের বড় বড় গ্রিক দার্শনিকদের মতো—অ্যারিস্টটল ও প্লেটোও মনে করতেন যে, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তাদের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব এই জন্য ছিল যে, জ্যোতির্বিদ্যার কোনও বক্তব্য পরীক্ষা করে ঠিক বা ভুল যাচাই করা যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা, নৌশাস্ত্র এবং পর্যটন

জ্যোতির্বিদ্যার তুলনায় জ্যোতির্বিজ্ঞান তার বক্তব্য পরীক্ষার সুযোগ দেয়—ঠিক হলে ঠিক, ভুল হলে ভুল (এলটন, জি.আর., ১৯৬৩ : ৪৭, ৫৭-৫৯, ২৯৪)। পরবর্তীকালে অনেক বিতর্কের পর জ্যোতির্বিদ্যার স্থান নিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, যেমন অ্যালকেমির (যার কাজ ছিল অন্য ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা) স্থান নিল রসায়নবিদ্যা, কুসংস্কারের জায়গা নিল বিজ্ঞান, ক্যাথলিক চার্চের প্রতারণা এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা যেন এর ফলে প্রকাশ হয়ে গেল (এরেনবুর্গ, রিচার্ড, ১৯২৮ : ২২)। কেপলার, কোপারনিকাস, এবং গ্যালিলিও পর পর এলেন এবং আকাশ পর্যবেক্ষণ করলেন এবং নৌশাস্ত্রের জন্ম দিলেন। যে জন্ম না হলে কোনও জাহাজ মাঝসমুদ্রে পাড়ি দিতে পারত না।

১৩০০ শতকে ম্যাগনেটিক কম্পাস রেনেসাঁসের আগেই আবিষ্কৃত। এখন অন্য অনেক কিছু আবিষ্কৃত হল। যেমন-রাডার, মানচিত্র তৈরি করবার পদ্ধতি—যা ইতালির

কিছু কারিগর তৈরি করলেন। ১৩৭৫ সালে কাটালানের একজন ভারত এবং চীন সম্পর্কে এমন এক মানচিত্র তৈরি করলেন যার অনেকখানি পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হল—শহর, নদী, উপকূল ইত্যাদি নিয়ে (থম্পসন, এস. হ্যারিসন, ১৯৬৩ : ৩৪৫-৩৪৬, ৩৫১-৩৫২)। এই সমস্ত, কয়েকটি বড়বড় আবিষ্কার হয়। খ্রিস্টোফার কলোম্বাস (১৪৫০-১৫০৬), ফর্দিন্যান্ড ম্যাজেলান, (১৪৮০-১৫২১) ইত্যাদি পর্যটক ঠিক যে বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন সেই বন্দরেই ফিরে এলেন (এলটন, জি.আর., ১৯৬৩ : ২৪৬-২৫০, ২৯১-২৯২)।

নৌশাস্ত্রের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ছাড়াও আরো নানা যন্ত্রপাতি তৈরি হল। কিছু যুদ্ধের প্রয়োজনে, কিছু যোগাযোগের জন্য এবং কিছু জীবন পদ্ধতি ভালো করবার জন্য। ইজিপ্টের লোকেরা সময় মাপত জল থেকে তৈরি এক ঘড়ি দিয়ে, এবং ভারতীয়রা সময় মাপত সূর্যের আলো দিয়ে। কিন্তু ১৪০০ শতকের মাঝামাঝি কাগজ, পার্চমেন্ট বা ভেলামের বদলে ব্যবহার হতে শুরু করল এবং ভেড়া ও বাছুর থেকে ভেলাম আর তৈরি হল না। এই একই সময়ে টেলিস্কোপ এবং বারুদ তৈরি হল, শেষেরটি এল চীন থেকে যেমন কাগজও এসেছিল ওই দেশ থেকে। ১৪০০ শতকের শেষের দিকে এল কামান। (থম্পসন, এস. হ্যারিসন, ১৯৬৩ : ৩৪৫-৩৪৬, ৩৫১-৩৫৩)। মাইক্রোস্কোপ, থার্মোমিটার এবং পেন্ডুলাম ঘড়ি ছিল ১৭০০ শতকের বড় আবিষ্কার (গ্রিন, ভি.এইচ.এইচ., ১৯৬৪ : ৫৩)।

এই সমস্ত আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপকে এক নতুন উচ্চতায় এনে দিল। এর একটা দিক হল পৃথিবী সম্বন্ধে আরো জানা। সমুদ্র পার হয়ে জাহাজ সব দিকে গেল, নতুন নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হল এবং পর্যটকরা দারুণ ঝুঁকি নিয়ে পৃথিবীর এক বড় অংশে গেলেন। পর্যটকদের পেছনে গেলেন ভূগোল যারা জানেন এবং মানচিত্র যারা করতে পারেন তারা। এই ভৌগোলিক ও মানচিত্র বিশারদরা প্রত্যেকটা মরুভূমি ও পাহাড়, মহাদেশ ও সমুদ্র, ছকে ফেললেন। প্রত্যেক দেশের মানচিত্রের রূপরেখা তৈরি করলেন। এর ফলে নতুন ভূগোল চেতনা মানুষের জীবনে এল (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৪৪)। এটা সত্যি যে ওই জ্ঞানকে ব্যবহার করে খৃষ্ট ধর্ম প্রাচ্যে এল, এল সাম্রাজ্যবাদীরা। কিন্তু ওরা যে পারল তার কারণ বিজ্ঞানে ওরা উন্নত ছিল। এখন তারাকে ও চাঁদকে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে বিচার করতে হল, জ্যোতির্বিদ্যায় আর হল না, জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথ বেছে নিতে হল।

প্রেস ও তার স্বাধীনতা

অনেক সময় রেনেসাঁস সাহিত্যে বলা হয় যেন রেনেসাঁস মানবতার সঙ্গে জড়িত। আসলে মানবতা নয়, হিউম্যানিটিস, অর্থাৎ এক শিক্ষার কার্যসূচি ছিল রেনেসাঁর অঙ্গ (গুন্ডারসাইমার, ওয়ারনার. এল., ১৯৬৫ : ৫)। রেনেসাঁস আর যাই করুক না কেন মানুষকে অনেক কিছুই পড়তে বাধ্য করল। তখন সদ্য চীন থেকে ছাপাখানা এসেছে। যারা পড়ত তাদের সংখ্যা কম হলেও, জনমত তৈরিতে তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল (লাভেন, পিটার, ১৯৬৬ : ২৫৪)। আর একটা সংজ্ঞা অনুযায়ী হিউম্যানিস্তা মানে ছিল ল্যাটিন ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষক। পেইডিয়ার মানে ছিল ব্যক্তি মানুষের বিকাশ।

কিন্তু পেইডিয়া ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ১৫, ২৫)। সম্ভবত প্রথম প্রেসের স্বাধীনতা নিয়ে প্রতিবাদ করেন ব্রিটিশ কবি জন মিল্টন, যখন ১৫৪৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রেসকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। (এলটন, জি. আর., ১৯৬৩ : ২০৪)। প্রেস এক নতুন মূল্যবোধের কথা বলল, বিশেষ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং প্রেসের স্বাধীনতার কথা। যতদিন গেল বেশি করে মানুষ প্রেসের কথা লিখল এবং কাগজ পড়বার লোক বাড়ল। পরবর্তীকালে এই মূল্যবোধ ধনতন্ত্রের এক অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াল এবং সমস্ত রকম স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে গেল। এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ চলে গিয়ে ইউরোপ নতুন ভাবে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

এখন আর সামন্ততন্ত্র নয়, বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। ধীরে ধীরে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেতনা এল (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ১৩; এলটন, জি.আর., ১৯৬৩ : ৯৫)। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণার অনেকগুলো তাৎপর্য ছিল (হ্যারিসন, থমসন. এস., ১৯৬৩ : ৪২; গ্রিন, ভি.এইচ.এইচ., ১৯৬৪ : ২৯)।

যদিও ইউরোপীয় দেশগুলো সবাই ছিল খ্রিস্টান, তবু এটা ঠিক হল যে, রাষ্ট্রের ব্যাপারে আইনের শাসন সকলের ওপরে থাকবে। প্রত্যেকে, খ্রিস্টান হোন বা না হোন, সমানভাবে আইনের বিচার পাবেন। প্রত্যেকের ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে, তার পছন্দ মতো, কিন্তু সেই অধিকার বাড়িতে বা গির্জায় সীমাবদ্ধ হবে, আদালত বা অফিসের থেকে অনেক দূরে। রাষ্ট্র এবং ধর্ম সমান্তরাল পথে চলবে, কেউ কারোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, যেন দুটো আলাদা এবং স্বাধীন।

দুরকম আইন থাকবে না—একটা রাজ পরিবারের জন্য এবং অন্যটা সাধারণ মানুষের জন্য। একটাই আইন থাকবে, সকলের জন্য। এই ব্যাপারে সবাই একমত যে, জরুরি অবস্থার সময়, যেমন আর্মাডা অভিযানের সময়, সরকার ঋণ করতে পারবে এবং রাজ পরিবারের করা ঋণ শোধ না করলেও চলবে। পরবর্তীকালে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, রাজা ও প্রজাদের মধ্যে এই পার্থক্য অন্যায়। ১৬২৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন করে এই বাধ্যতামূলক ঋণ বন্ধ করল (এরেনবুর্গ, রিচার্ড, ১৯২৮ : ৩২-৩৬)।

ততদিনে বহু দেশেই পার্লামেন্ট বলবত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজা হবার সময় বা তার বিয়ের সময় যে টাকা কর হিসেবে চাপানো হত, রাজ পরিবারগুলি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না আনতে পারলে যে কর বসাতেন, ততদিনে সেটা অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন তখন করের পরিবর্তে একটা হারে কর দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। ততদিনে লোকে জানে কতটা কর দিতে হবে। বিশেষ করে বাণিজ্য করবার সময় এটা হিসেব করা যেত যে কত কর দিতে হবে এবং বাণিজ্যে লাভ হবে কি না। ততদিনে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান প্রায় সব ইউরোপীয় দেশেই তৈরি হয়েছে।

একইভাবে, আমলাতন্ত্র তৈরি হল, আমলারা সংখ্যায় বাড়ল। এই আমলারা সরকারের সূত্র হিসেবে কাজ করল এবং ধারাবাহিকতা রাখল, যার ফলে সরকার

পাল্টালেও প্রশাসনের রেকর্ড পাল্টাল না। এর ফলেও ধর্ম নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত হল (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৫)। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রাখল আমলাতন্ত্র, কেন না তারা পদ্ধতিগুলো একই রাখল। (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ৫)।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও পার্লামেন্ট

অলিভার ক্রমওয়েল সরকারের উচ্চতম পদে আসীন হলেন এবং ইংল্যান্ডের রাজাকে সরিয়ে সাত বছর ক্ষমতার শীর্ষে থাকলেন। তিনি খুব সাধারণ পরিবার থেকেই এসেছিলেন। জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন এবং আমলাতান্ত্রিক মানুষের শাসনের মধ্যেই "ভালো কর" এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন ক্রমওয়েল (ফারগুসন, আর্থার.বি., ১৯৬৫ : ১৩৪)। তিনি ব্যবহারেব বিচারে একটু গোঁড়া ছিলেন এবং ১৫৪০ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ক্রমওয়েল খুব জনপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু পার্লামেন্টের যে কাঠামো তৈরি করেন, সেটা তাব মৃত্যুর পর টিকে তো থাকেই, বরং ক্রমে শক্তিশালী হয়। তার কয়েক বছর পর বাধ্যতামূলক ঋণ বন্ধ হয় এবং ১৬৪২-৪৯ সালে স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেন্টকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যান (এলটন, জি.আর., ১৯৬৩ : ৯৫-৯৮, ১৯৪)।

পার্লামেন্টারি এবং অন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই চালু হয়। ইতালিতে, যেখানে সবচেয়ে বেশি নগর-রাষ্ট্র ছিল, ক্ষমতা গিয়ে পড়ে এক স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের হাতে, রাজা এবং রাজত্ব উঠে যায়। অবশ্য এই কাউন্সিল আজকের মতো এতটা গণতান্ত্রিক ছিল না। কিন্তু তারা প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য শাসকদের অল্প সময়ের জন্য নির্বাচিত করত। ভেনিসে একটি অলিগার্কি (অল্প লোকের রাজত্ব) চলে, যার সভ্যরা ছিলেন মূলত নাবিক এবং সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নির্বাচিত হতেন।

রেনেসাঁসের নগর-চরিত্র

সেই সময়ে ইটালিতে অনেক নগর-রাষ্ট্র ছিল। সবচেয়ে বড় ছিল দক্ষিণে নাপলি এবং পশ্চিমে মিলান। মধ্যাঞ্চলে রোমও বেশি পিছিয়ে ছিল না। রোমের সঙ্গে প্রায়ই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পোপ-শাসিত ভ্যাটিকানের যুদ্ধ হত। ভেনিস ছিল মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ফ্লোরেন্স হোক বা জেনোয়া, টাসক্যানি হোক বা লম্বার্ড নগর হোক-রাষ্ট্রের বণিকরা তাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। মধ্যযুগের পুরোটা তাদের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রাখতে ওরা বারবার যুদ্ধ করেছেন (হ্যারিসন, থম্পসন.এস, ১৯৬৩ : ৮-১৫, ৩৪)

এই নগর-রাষ্ট্রগুলোতে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার থাকত, তার তাৎপর্য কম ছিল না। ওই নগর পরভোজী-জমিভিত্তিক সামন্ত রাজার দ্বারা পরিচালিত হত না, বরং বণিক শক্তিই বেশি শক্তিশালী ছিল। রেনেসাঁস ছিল তখন নগর কেন্দ্রিক, যেমন লর্ডরা ছিল দুর্গের প্রভু, তেমনই শহর ছিল বণিকদের প্রভুত্বের অধীন (হে, ডেনিস, ১৯৬১ : ৩০)। যখন সামন্ততন্ত্র পাল্টে ধনতন্ত্র এল, এই আন্দোলনে শহরের মধ্যবিত্ত একটা বড় ভূমিকা নিল (মাজিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ১৪)। রক্ত, ঐতিহ্য এবং পারিবারিক সম্পর্কের চেয়ে বড় হল বাজার ভিত্তিক এবং গণতান্ত্রিক সম্পর্ক। পুরনো শাসকরা

দূরে চলে গেল এবং তাদের স্থান নিল ধনতান্ত্রিক শাসকরা। সম্পত্তি এবং মূল্যবোধের সামাজিক পিরামিডের বদলে এল প্রতিযোগিতা এবং টাকার ক্ষমতা। যাদের অতীতে অনেক সামাজিক অসুবিধা ছিল, এখন তারাই বুদ্ধি এবং টাকার বলে অনেক সম্পত্তি করল। যারা এই রেনেসাঁসের নেতৃত্ব দিল, তারা ছিল মূলত ব্যক্তিবাদী এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার—গ্রামে বা শহরে হোক—হয়ে দাঁড়াল ওদের মূল কথা (মার্টিন, আলফ্রেড, ভন, ১৯৬৩ : ২-৪২; পিস্টো, ভি.ডি.সোলা, ১৯৬৬ : ৫)। "সামন্ত সমাজ ও অর্থনীতি তখন পচনের পথে, কিন্তু শহরকে খারাপ জায়গা বলে ভাবে, কিন্তু সেই শহরই তৈরি হল এক নতুন স্পিরিট। শহর মাত্রেই ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, যদিও তারা ছিল চার্চের বিরুদ্ধে। ওরা ধর্মনিরপেক্ষতা, বাণিজ্য এবং লাভকে প্রচুর মূল্য দিত, যে মূল্যবোধ ছিল চার্চের পরিপন্থী" (হ্যারিসন, থম্পসন.এস, ১৯৬৩ : ৪২-৪৩)।

রেনেসাঁসের আগে শহর নিয়ন্ত্রণ করত কাছের সামন্ত প্রভুরা এবং চার্চ। রেঁনেসাস শুরু হবার পর নগরে ভিড় করল বণিক, শিল্পী এবং কারিগররা—ওরা তৈরি করল নিজের মতো করে গেট, প্রাচীর, টাউনহল, বেল, এবং মুদ্রা। সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে জোগাড় করল একটা সনদ, যার মধ্যে শহরের মানুষদের অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ থাকত। শহরগুলো পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে গেল, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ওরা রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত। ওরা ওদের একটা কাউন্সিল তৈরি করে, যার সভ্যরা আসতেন বিভিন্ন গিল্ড থেকে। কাউন্সিল তাদের নিজস্ব আইন তৈরি করত এবং যুদ্ধ ঘোষণা করবার, কর বসাবার এবং মুদ্রা তৈরি করবার অধিকার ওদের ছিল। নাগরিকদের নগর-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হত। এই নগর-রাষ্ট্র যথেষ্ট ছোট ছিল যাতে এক ধরনের দেশপ্রেম তৈরি হতে পারে। শহরের কাগজপত্র নাগরিকদের সঙ্গে নগর-রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড় করে তুলত (জেকব, ই.এফ., ১৯৬০ : ৩২; গ্রিন, ভি.এইচ.এইচ., ১৯৬৪ : ৩১)।

নগর-রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্রে যতটুকু সম্ভব ততটাই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল (হ্যারিসন, থম্পসন, এস., ১৯৬৩ : ৪৩-৪৮)। যদিও শহর পুরোপুরি থাকত শাসকদের নিয়ন্ত্রণে যখন আক্রমণ হত, শহরের নাগরিকরা সবাই এক মাত্রায় ভাবতেন না। ধনশালী উচ্চ মধ্যবিত্তরা, ছোট বণিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। ছোট বণিকরা ছিল দিনমজুর এবং অকুশলী শ্রমিকের সঙ্গে (হ্যারিসন, থম্পসন, এস., ১৯৬৩ : ২২০-২২১)। এদের মধ্যে সংঘাত বাড়ল। যত দৈহিক শ্রমিক শহরে কাজের খোঁজে ভিড় করল এবং ছোঁয়াচে রোগ যত ঘন ঘন হল, বহু মানুষ মারা গেলেন, ততই সংঘাত বাড়ল (উইনস্টেন, ডোনাল্ড, ১৯৬৩ : ১-২)।

ছোঁয়াচে রোগেব মতো এমন অনেক কিছু শহরে ঘটত যাকে দেবদত্ত বলে ব্যাখ্যা করা যেত না। দৈবিক যে পিরামিড ছিল, যার শীর্ষে ছিলেন রাজা, সেটা ভেঙে গেল। কমিউনগুলো বাড়ল, বা কোথাও ক্ষীয়মাণ হল, কোথাও স্বেচ্ছাচারীর হাতে গেল—কিন্তু রাজাহীন কাঠামো পাকা হল। ১৫০০ শতকের মধ্যে ভেনিস ছাড়া সমস্ত বড় শহরেই স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ হল। এই স্বেচ্ছাচারী শাসন অনেক বার বৃদ্ধি পেল এবং অনেক বার হ্রাস পেল। কিন্তু ১৫০০ শতকের শেষে, শেষ পর্যন্ত, স্বেচ্ছাচাবী শাসন বন্ধ হল এবং এক নতুন আলোকোজ্জ্বল পুষ্টিকর যুগের সূচনা হল। আলিঘেবি

দান্তে (১২৬৫-১৩২১), যিনি ছিলেন নরকের কবি, তিনি চাইলেন এমন এক সরকার যা সমস্ত পৃথিবী ধরে মানুষের ওপর রাজত্ব করবে। তিনি বলতেন যে, পৃথিবীব্যাপী ওই সরকার সর্বজনীন মূল্যবোধের সরকার হয়ে উঠবে। ওই সরকার বা সাম্রাজ্য কখনও স্বেচ্ছাচারী হবে না। রেনেসাঁসের অনুগামীরা সাধারণভাবে স্বেচ্ছাচার ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন (উইনস্টেন, ডোনাল্ড, ১৯৬৩ : ৬, ১২, ১৭, ৩৯, ৪৭; মাজ্জিও, জোসেফ, অ্যান্টনি, ১৯৬৫ : ২৯, ৪১)।

স্থায়ী সৈন্যবাহিনী

রাষ্ট্র ছিল ব্যক্তিগত অধিকারের পৃষ্ঠপোষক। এই অধিকার হয় সংবিধানে স্বীকৃত ছিল, অথবা কোনও কনভেনশনে। রাষ্ট্রের চরিত্র এখন পাল্টাল। রাষ্ট্র হল নগরভিত্তিক, কম স্বেচ্ছাচারী, ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর দাঁড়িয়ে এবং সামন্ততান্ত্রিক, পরভোজী উপাদানগুলিকে দূরে সরিয়ে। এর ফলে সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ধারণাও পাল্টাল।

সামন্ততন্ত্রে রাজা, সামন্তপ্রভুদের সম্পদ ও সামরিক শক্তি যখন প্রয়োজন হত তখনই ব্যবহার করতে পারতেন। এই সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিত মাহিনা দেওয়া হত না। যার ফলে খারাপ বেতনভুক সৈন্যরা ভালো যুদ্ধ করত না। এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, মাহিনার পরিপূরক হবে লুণ্ঠন। অন্য সব কিছুর মতো মাহিনাও সবসময় স্থির হত না, নির্ভর করত সামন্তপ্রভুর মানসিক ভারসাম্যের ওপর। সৈন্যরা মাহিনা পেলে যার হোক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধের মার্সিনারিরা যুদ্ধের শেষে অনেক সময় কাজ হারিয়ে রাজপথে ডাকাতি করত, যতক্ষণ না আর একজন নিয়োগকর্তা পেত। যে মার্সিনারিরা যুদ্ধ করত তারা অনেক অত্যাচার করত বা সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে যেত। এখন স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর চিন্তা এল, যার ফলে সৈন্যরা শ্রমিকের মতো নিয়মিত চুক্তি অনুযায়ী মাহিনা পেতেন অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত। এর ফলে রাজাদের আর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে না থাকলেও চলত এবং তাদের ব্যক্তিগতভাবে যাই হোক তার ওপর যুদ্ধের ফলাফল নির্ভরশীল ছিল না (এরেনবুর্গ, রিচার্ড, ১৯২৮ : ২৭-২৮)।

নেশন স্টেটের ধারণা

নেশন স্টেটের ধারণা তখনও আসেনি (এলটন, জি.আর., ১৯৬৩ : ১৪১)। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ লাতিন ভাষার অগ্রাধিকার আর মানতে চাইল না, বরং নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে লাতিনকে সরাতে চাইল। ১৪০০ শতকের শেষ দিকে এই স্থানীয় ভাষার ইতিহাস লেখা হোক, এমন দাবিও উঠল (জেকব, ই.এফ., ১৯৬০: ৩১)। ধীরে ধীরে ধারণা তৈরি হল যে, একটি ভাষায় যারা কথা বলেন তারা একই রাষ্ট্রে বসবাস করবেন। ১২০০ ও ১৩০০ শতকে, মাত্র দুশো বছরের মধ্যে স্থানীয় ভাষা, যেমন ফ্রেঞ্চ, জার্মানি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পোলিশ, চেক ও হাঙ্গেরিয়ান ভাষা লাতিনের স্থান নিল। ধীরে ধীরে একটি জাতীয়তাবাদী ধারণা তৈরি হল (হ্যারিসন, থম্পসন, এস., ১৯৬৩ : ৩৫-৩৬)।

একটি রাষ্ট্র, যার সীমার মধ্যে সবাই এক ভাষায় কথা বলে এবং যার মধ্যে একই কর ব্যবস্থা চালু একটু সময় নিল চালু হতে, কিন্তু লোকে ইতিমধ্যেই তার কথা বলতে

শুরু করল (হে, ডেনিস, ১৯৬১ : ৪)। এর ফলে এক নতুন আনুগত্যবোধ তৈরি হল।

কূটনীতি

যতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক করত রাজা, ততক্ষণ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করা ছিল অপরাধ। এই নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কও ঠিক হত। কিন্তু যখন রাজার ব্যক্তিগত মনোভাব না ধরে দেশের স্বার্থ ভাবা হল তখন জন্মাল কূটনীতি। একটা স্থায়ী কূটনৈতিক কাঠামো তৈরি হল, আমলাতন্ত্রের সঙ্গেই। ক্ষমতার ভারসাম্য বলে একটা ধারণা তৈরি হল, যা ইংল্যান্ড তার মহাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল (চ্যাবোর্ড, ফ্রেডারিকো, ১৯৬৫ : ১১৭; এলটন, জি.আর., ১৯৬৩ : ১৪২)।

অর্থনৈতিক প্রশ্ন

অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো বিতর্কের এক বড় জায়গা নিল। ইতালিয়ানরা বিশেষ করে ফ্লোরেন্সের লোকেরা, জানত টাকা নিয়ে কী করতে হয়—তিনশো বছরের অভিজ্ঞতা ছিল ওদের পিছনে। কিন্তু লাতিন আমেরিকা থেকে এত সোনা বা রুপো এল যা ছিল তাদেরও কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। একইভাবে বলা যায় আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বহির্গমন এক নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করল (এরেনবুর্গ, চার্লস, ১৯২৮ : ২১, ২৩)।

নতুন অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো বাণিজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল। কিছু ধার দিলে কি সুদ নেওয়া পাপ, না বোঝা উচিত যে সুদের কোনও বিকল্প নেই এবং সুদ নিষিদ্ধ করলেও পরে আসবে? এখানে দুই ধরনের ধারের কথা আমরা বলছি—এক, মূলধনের ওপর সুদ যা ব্যবসায় খাটবে এবং দুই, ভোগের ওপর সুদ যা ধার্য করা হয়তো সঙ্গত নয়। মুদ্রার মূল্য অনুযায়ী ধাতব মূল্য ঠিক হবে না, ধাতব বস্তুর আর্থিক অবক্ষয় মেনে নিতে হবে। গরিবদের জন্য একটা আইন দরকার যাতে গরিবও খেতে পরতে পারে, কিন্তু দেখতে হবে যেন গরিবের জন্য তৈরি করা আইন গরিব নয় এবং পরভোজী কোনও ব্যক্তির কাজে না লাগে (এরেনবুর্গ, চার্লস, ১৯২৮ : ৩২, ৪২-৪৩)। ১৫৩৮ সালে গরিবদের জন্য একটা আইনের খসড়া তৈরি হয় এবং গরিবদের জন্য একটা চ্যারিটি তৈরি হয়, যার জন্য স্থানীয়ভাবে কর বসানো হয়। সেই সময়েই প্রথম যার বেশি আয় সে বেশি আয়কর দেবে এই পদ্ধতি চালু হয়। মেনে নেওয়া হয় যে, বড়লোকের কর দেবার ক্ষমতা বেশি। টাকার মূল্য, যার যত বেশি টাকা থাকে তার ততো কমে যায় (এলটন, জি.আর, ১৯৬৩ : ২৭৮)।

সর্বজনীন মানুষ

এই যুগটা বৈশিষ্ট্যকরণের নয়। এমনকী বড় শিল্পীরা, যাদের থেকে বড় শিল্পী আর কখনও পৃথিবীতে হয়নি এবং যারা শিল্প নিয়ে সব কিছু জানতেন, তারাও শিল্প ছাড়া অন্য বিষয়ের খোঁজ খবর রাখতেন। "শিল্প শিল্পের জন্য" এই কথা হয়তো কেউ কেউ ভাবতেন, কিন্তু যারা সত্যি সত্যি হিমালয়ের মতো উঁচু মাপের শিল্পী ছিলেন, তারা তা ভাবতেন না।

রেনেসাঁস একটা যুক্তির যুগ আনল। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো শিল্পীকেও জানতে হল ভূ-তত্ত্ব যাতে তিনি তার শিল্পের প্রয়োজনে ঠিক পাথর খুঁজে পান এবং ব্যবহার করেন। তাকে শরীরতত্ত্ব জানতে হল যাতে, যার প্রাণ আছে এবং কার প্রাণ নেই, তার মধ্যে পার্থক্য শরীরের ভাষা থেকেই জানা সম্ভব। তাকে রসায়নবিদ্যা শিখতে হল যাতে তার আঁকা শিল্প ঠিকমতো উজ্জ্বলতা, বৈষম্য ও বৈপরীত্য দেখাতে পারে। এছাড়া ইতালির একটা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদের ভূমিকাও নিয়েছিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান যথেষ্টই এগিয়ে গিয়েছে। এবার শিল্পও বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সীমানা পাল্টে দিল। অ্যারিস্টটল ও তার সঙ্গীরা ভাবতেন যে হৃদয় রয়েছে স্নায়ু ব্যবস্থার কেন্দ্রে, কিন্তু লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির গবেষণা শরীর সম্পর্কে এই ধারণা পাল্টে দিল (গ্রিন, ভি.এইচ.এইচ, ১৯৬৪ : ৫৩)।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি মাত্র ১৮টা ছবি বড় ক্যানভাসে এঁকেছিলেন। তার সময়ের এক বড় অংশ যেত দুর্গের ছক তৈরি করতে, নানা যন্ত্র তৈরি করতে, অঙ্কেব বিভিন্ন তত্ত্ব প্রমাণ ও ভালো করবার জন্য এবং যুদ্ধের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি নীতি তৈরি করতে। এই দুজন শিল্পীই চাইতেন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে। তাদের কাছে শিল্প বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না (লেভি, মাইকেল, ১৯৭৫ : ২৬৮)। লিওনার্দো নিজেকে মূলত শিল্পী হিসাবেই ভাবতেন, কিন্তু শিল্পীর সংজ্ঞা ছিল যিনি শরীরতত্ত্ব, চারপাশের পরিবেশ, পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্ক জানবেন। তিনি উদারনৈতিক আর্ট এবং কারিগরি আর্টের মধ্যে পার্থক্য করতেন, কিন্তু কোনও শৃঙ্খলাবোধ তার হাত-পা বেঁধে ফেলত না। এমনকী, শিল্পও নয় যা, ছিল শিল্পী হিসেবে তাঁর সবচেয়ে ভালোবাসার বস্তু। তিনি স্বচ্ছন্দে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যেতেন, তার ছবির বিভিন্ন রেখার মতো। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিয়ামক হত তার পেশাদারী মনোভাব।

যখন তিনি খুব ছোট ছিলেন তখন একবার লিওনার্দো চাকরির জন্য একজন শাসকের কাছে আবেদন করেন। মিলানের শাসক ১৪৮৩ সালে তাকে ডাকেন একজন গায়ক শিল্পী হিসাবে। কিন্তু পরিচিতিপত্রে তিনি লেখেন যে, তিনি সেতু তৈরিতে পারদর্শী, যেমন, তালা-চাবি এবং সেচের ক্ষেত্রে এবং নানান যন্ত্র তৈরি করতে পারেন। পরিচিতির শেষ দিকে লেখেন, যেন ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, মার্বেল, ব্রোঞ্জ ও মাটি দিয়ে তিনি মূর্তি তৈরি করতে পারেন এবং যেকোনও মানুষের থেকে ভালো আঁকতে পারেন (হ্যারিসন, থম্বসন, এস, ১৯৬৮ : ৩৪৮-৩৪৯)।

এই সার্বজনীন মানুষের চিন্তার আর একটা দিক ছিল। বুকহার্ডের মতে, এত দিন পর্যন্ত বহির্জগৎ এবং ভেতরের জগতের মধ্যে একটা পর্দা ছিল যা দুই জগতকে আলাদা করে রাখত। এই পর্দা বিশ্বাস দিয়ে, মোহ দিয়ে এবং ছেলেমানুষি দিয়ে মোড়া। ভিতরের জগতের মানুষ ভাবত তার জাতির কথা, পরিবার, পার্টি বা কোম্পানির কথা। রেনেসাঁস এই পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল (জেকব, ই.এফ, ১৯৬০ : ১৮)।

সমসাময়িক বাংলার সঙ্গে তুলনা

ব্রিটিশরা বাংলার সিংহাসনে বসল এই সাড়ে চারশো বছরের রেনেসাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে। যদিও। ক্রুসেডের সময় আফ্রিকা-এশিয়া এবং ইউরোপ সমান সমান ছিল ১৭৫৭ সালে ইউরোপ অনেক এগিয়ে গেল ওদের বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যাকে অবলম্বন করে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, অতীতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা খুব বড় ছিলেন, যেমন নাগার্জুন, বরাহমিহির, এবং আর্যভট্ট। ওরা পৃথিবীর কথা জানতেন, যেমন জানতেন আকাশের কথা এবং ইউরোপের বিজ্ঞানীদের থেকে কোনও অংশে কম জানতেন না। "ব্রাহ্মণরা আকাশ পথে বিচরণকারী বিভিন্ন বস্তুর কথা জানতেন এবং তার ভিত্তিতে রচিত হত বিভিন্ন তারিখ, কবে যজ্ঞ করা যাবে এবং কবে যাবে না ইত্যাদি। তিন হাজার বছর আগে ওরা সৌর বছরকে ৩৬০ দিন দিয়ে ভাগ করেন, এবং প্রতি পাঁচ বছরে একটি অতিরিক্ত মাসের কথা বলেন। ওদের হিসেব ৫১/৪ দিন অবধি সঠিক ছিল" (হান্টার, ডব্লু.ডব্লু, ১৮৮২ : ৫৫)। সৌরজগতের বিভিন্ন বস্তুর গমনাগমন নিয়ে ওদের হিসেবে বেশি ভুল ছিল না। যখন গ্রিকরা ভারতে প্রথম আসেন যোদ্ধা হিসেবে, ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে অনেক কিছু ধার নেন—যেহেতু ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ওদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। দিল্লির যন্তরমন্তরে এবং জয়পুরে ওরা যে বড় সৌরঘড়ি তৈরি করেছিল তা বর্তমানের বিজ্ঞানীরা দেখে অবাক হয়ে যান। কমপিউটার ছিল না, বায়ানারি অঙ্ক ছিল না, তা সত্ত্বেও এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া তাজমহল, কোনারক এবং খাজুরাও-এর জ্যামিতি ছিল অতুলনীয়, যেমন তার শিল্প ভাবে। তারা ওই বিরাট শিল্প কীর্তি ওই জমির উপর তৈরি করতে পেরেছিলেন তার থেকে অনুমান হয় যে কোনও জমি কতটা ভারি জিনিস বহন করতে পারবে সেই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ওদের ছিল। শূন্য ওদেরই আবিষ্কার, এবং নানা আবিষ্কারের মতো এটাও ভারত-আরব স্থলপথে ইউরোপ গিয়ে পৌঁছেছে। আলবেরুনির মতো বহু আরব বিজ্ঞানী ও ভাষ্যকার ভারতের বহু আবিষ্কার আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করছেন, যার মধ্যে আছে দাবা খেলা, তন্ত্রের দর্শন, হাতির ঔষধ ইত্যাদি বহু জিনিস।

ভারতের ইতিহাসের কোনও এক পর্বে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা, যারা এই অগ্রগতির জন্য অনেক কিছুই করেছেন, তারাও প্রায় ১২ বছর শিক্ষার্থী থেকেও প্রায় অর্ধ শিক্ষিত হয়ে যান (কোসাম্বি, ডি.ডি, ১৯৬৫ : ১৭৫)। সবটা হয়তো রুদ্ধ হয়নি, কিন্তু আবিষ্কারের মাত্রা নিশ্চয়ই কমে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয়দের যা দোষ, তার থেকে বেশি দোষ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার, যার মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়েছে। যখন ইউরোপে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের জঠরে বাণিজ্যবাদ জন্ম নিচ্ছে, সেই সময় ভারতে অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেল। উপনিবেশবাদ এলে কিছু জমির হয়তো ব্যবহার ভালো হল, অথবা কৃষি উৎপাদন একটা বাণিজ্যিক ঝোঁক পেল, কিন্তু বড় কোনও পরিবর্তন হল না। গ্রামীণ শিল্প হয়তো হল, কিন্তু সেই শিল্প শহরে ছড়িয়ে পড়ল না। শিল্পজাত সংস্কৃতি গড়ে উঠল না, যার ফলে পুঁজিবাদীদের মতো মনোভাব, অভ্যাস বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল না।

যদি আমরা ভারতের সঙ্গে তৎকালীন ইউরোপের তুলনা করি তাহলে, দেখি, ওদের মধ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যকলাপ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক ছিল। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি কীভাবে রাজতন্ত্রের আগে প্রজাতান্ত্রিক এবং উপজাতীয় ব্যবস্থা কাজ করেছে, কীভাবে রাষ্ট্র তৈরি হল এবং কত রকম বাধা পার হয়ে আমরা তৎকালীন অবস্থায় পৌঁছেছি। এটাও আমরা দেখেছি, যে রাষ্ট্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধাবণ মানুষের হাত থেকে ক্ষমতা আমলাদের হাতে চলে গিয়েছে এবং কীভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়তে বাড়তে চলেছে।

রেনেসাঁসের সমসাময়িক বাংলায় যে সরকারগুলো তৈরি হয় তারা ছিল অস্থায়ী, ব্যক্তিনির্ভর। সম্রাট চারপাশের সবাইকেই সন্দেহ করতেন যে, সে আততায়ী হয়ে উঠতে পারে। এই অবস্থায় প্রাসাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র, সরকার পতন ইত্যাদি প্রচুর হত, তাই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের বিশেষ সুযোগ ছিল না। সেই সময়কার রাজারা, নাসিরুদ্দিন শাহ্ বা ইলিয়াস শাহ্ বা আলাউদ্দিন হোসেন শাহর মতো নৃপতিদের বাদ দিলে, মূলত ছিলেন স্বেচ্ছাচারী তাদের কার্যকলাপের কোনও ব্যাখ্যা কাবোকেই দিতেন না। সেই সময় রেনেসাঁসের ইউরোপে বহু প্রজাতান্ত্রিক সরকার ছিল এবং বাজতান্ত্রিক হলেও পার্লামেন্টের মতো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ছিল, যা ভারতে বিকাশ লাভ কবেনি। ভারতের সৈন্যরা রাজার জন্য যুদ্ধ করত, রাজা মারা গেলে পালিয়ে যেত—দেশের জন্য যুদ্ধ করত না। দেশপ্রেম বা দেশভক্তি ছিল না। যে ক্ষমতায় আসত সে-ই পেত সাধারণ মানুষের আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা রাজা করার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকাই ছিল না।

কর ব্যবস্থা কোনও নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে কাজ করেনি। কর ছাড়াও অবওয়াব ছিল, সকলকেই অবওয়াব দিতে হত। যখন ইউরোপ ওই কর ব্যবস্থা ছেড়ে দিল, এমনকী, যুবরাজদেরও কর দিতে হল, ভারতের নবাবদের উৎসবে এবং অন্য প্রয়োজনে কর দিতে হত। শুধু পরিমাণ নয়, যেভাবে কর আদায় হত তাতে অনেকের আপত্তি ছিল। চুক্তির বাইরে এই যে যখন তখন ভারতে কর দিতে হত সেটা অনেকেই পছন্দ করতেন না।

রাজ্যের কোনও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। যুদ্ধের সময় সামন্তপ্রভুদের বলা হত তাদের সৈন্যবাহিনীকে সম্রাটের সমর্থনে নিয়ে আসতে। যুদ্ধের পর অনেক সময়েই এই সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া হত, কাজেই সৈন্যদের কৃষি বা ডাকাতি করার বেশি বিকল্প ছিল না, যতক্ষণ না আর একটা যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর কথা, যারা নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন, যুদ্ধ থাক বা না থাক, ভাবাই হত না। একমাত্র ইথিওপিয়ার হাবসি সৈন্যদের দিয়ে একটা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী একবার করা হয়েছিল। হাবসিরা যেহেতু বিদেশি, ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, কে রাজা হচ্ছে বা না হচ্ছে এই ব্যাপারে ওদের কোনও মাথাব্যথা হবে না। যেহেতু হাবসিরা ছিল মূলত খোজা, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ওদের হাতে প্রাসাদের মহিলারা সুরক্ষিত হবে। এই খোজাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ওদের বড় আমলা করা হল। ঘটনা হচ্ছে, এমনকী, খোজারাও রাজনৈতিক ক্ষমতা চাইল এবং সাত বছর বাংলা শাসন করল। যখন হাবসিদের এই অভ্যুত্থান দমন করা হল, তখন ওদের স্থায়ী সৈন্যবাহিনীও তুলে দেওয়া হল।

১৫৭৫ সালে, যখন মোগলরা, শেষ পর্যন্ত বাংলায় ক্ষমতা দখল করল, তখন এক বড় সময় ওদের দিতে হল বিদ্রোহ দমন করতে। রেনেসাঁস পরবর্তী যুগে মোগলরা অবশ্য বদলি হতে পারে এমন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন। রাজা টোডরমলের সাহায্য নিয়ে মোগলরা ভূমি ব্যবস্থা ঢেলে সাজালেন। কিন্তু তা হতে হতে রেনেসাঁস পার হয়ে গেল। এই দুটি ক্ষেত্রেই মোগল আমলাতন্ত্র ও রাজস্ব ব্যবস্থা উত্তর ভারতে যতটা সুষ্ঠুভাবে চালু হয়, ততটা সুষ্ঠু হয় না বাংলা বা অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলে, যতদিন না ব্রিটিশরা ভারতের কর্ণধার হন। এমনকি তৎকালীন ইতিহাসের এক বড় অংশ আমরা জানতে পারি চীন বা আরব সূত্র থেকে।

রেনেসাঁসের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ। কিন্তু বাংলায় শেখায় আগ্রহ ছিল না। এর কারণ হতে পারে চৈতন্যদেবের জ্ঞান পরিহার বা ভক্তিবাদ। চৈতন্য বিশ্বাস করতেন যে, বহির্জগৎ সম্পর্কে জানবার কোনও প্রয়োজন নেই। ভক্তি এবং ভালোবাসা দিয়েই সমস্ত কিছু জয় করা যায়। যেখানে ইউরোপীয়রা মহাদেশ থেকে মহাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং মানচিত্র তৈরি করেছেন, সেখানে ভারতীয়দের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ ছিল না। চারপাশের থইথই করা জলে কোনও আগ্রহ দেখাননি তারা। খোলা সমুদ্র ভারতীয়দের টানেনি। ওরা কেবল এক উপকূলের বন্দর থেকে আর এক উপকূলের বন্দরে গিয়েছেন।

ভারতীয়রা জ্ঞান সম্পর্কে কোনও সমালোচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেননি। বরং সংস্কৃত টোলে বা আরবিক মাদ্রাসায় বিশ্বাস এবং কুসংস্কার শেখানো হত। বাংলাদেশ ছিল এক ধর্মীয় রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা তখনও আসেনি। সবকিছুরই বিচার হত ধর্মের মানদণ্ডে। রাজার দরবারে যে আদত মানা হত, যেমন সম্রাটের পা চুম্বন করা, তা কখনও আত্মমর্যাদা বাড়াতে পারে না। এই রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ায় সৃজনশীল কিছু তৈরি হতে পারে না।

যদিও বেশ কিছু নতুন শহর তৈরি হল ভারতে। সেগুলি কিন্তু প্রাসাদের অধীনই থাকল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বড় হতে পারল না। বণিকরা বা কারিগররা বিভিন্ন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বটে, কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে, নৃপতির ব্যক্তিগত মনোভাব এবং স্বেচ্ছাচার-ই ছিল চূড়ান্ত কথা।

৪.৬

পলাশির সাজানো যুদ্ধ

ভূমিকা

১৭৫৭ সালের যুদ্ধ খানিকটা আজকালকার সাজানো ক্রিকেট ম্যাচের মতো। শুধু একটা বড় পার্থক্য আছে। সাজানো খেলায় যারা "জেতে" তারা যে দল "হেরে" যায় তাদের ভালো খেলোয়াড়দের ঘুষ দেয়। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের নামে যে খেলাটা ঘটল, সেখানে যে দল হেরে গেল তাদের বড় খেলোয়াড়রা কিন্তু ঘুষ নিল না। বরং তারাই যে দল "জিতল" তাদের বড় খেলোয়ারদের জেতায় উৎসাহ দেবার জন্য ঘুষ দিল। এই ক্ষেত্রে ঘুষের গতিপথ পাল্টে গেল কেন?

এরকম বহু প্রশ্ন বহু দিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছে। কী করে একটা সামান্য কোম্পানি, যাদের লক্ষ্য ব্যবসা করা এবং লাভ করা, এত দূর থেকে এল, ভারতের মতো এত বড় একটা দেশের দখল পেল? সমস্ত যুদ্ধটাই যেন রহস্যময় এবং অবাস্তব। বাস্তব শুধু নবাবের বিশ্বস্ত মীরমদন ও মোহনলালের মৃত্যু। বাকি সৈন্যরা সবকিছু লক্ষ্য করল, অপেক্ষা করল, কিন্তু যুদ্ধ করল না। এই যুদ্ধে কামানগুলো ঠিক সাজানো হল, অশ্বারোহীরা ছুটে যেতে তৈরি, ঝলমলে বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে এখনই যেন একে অপরকে আঘাত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, যুদ্ধ শেষে এক পক্ষকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হল, অন্য পক্ষ পালিয়ে গেল সব কিছুই ঘটল শুধু যুদ্ধ হল না। ফার্মিঙ্গার পরে মন্তব্য করলেন "বাংলায় যদি তলোয়ারের যুদ্ধে জয় হয়ে থাকে, ইতিহাস তার খবর রাখে না, কিন্তু তলোয়ার খাপ থেকে না বেরোলেও ইংরেজদের জয়ের কারণ হল" (ফার্মিংগার, ওয়ালটার কেলি : ১,৭ (ভূমিকায়)।

আরও একটা রহস্য আমার মাথায় বহুদিন রয়েছে। এই যুদ্ধের এক বছর আগে নবাব সিরাজউদৌল্লা কলকাতায় ব্রিটিশদের হারিয়ে দিলেন। ওরা পালিয়ে জাহাজ নিয়ে বেশ কিছু দূরে বজবজের কাছে ফলতায় ঘাঁটি গাড়ল।[১] সেখানেই তারা থাকল, মাদ্রাজ থেকে ব্রিটিশ সৈন্যরা যোগ দিল, ক্লাইভ এলেন এবং কলকাতা আবার দখল করলেন। যেটা রহস্য, সিরাজ তাদের পিছনে ধাওয়া করে যে সামান্য ব্রিটিশ সৈন্য কলকাতার যুদ্ধের পর বাকি ছিল, তাদের শেষ করে দিলেন না কেন (ভার্মা, ডি.সি., ১৯৭৬ : ৩৭)? তিনি কি মূর্খ ছিলেন? তিনি কি জানতেন না যে ফলতার ব্রিটিশরা মাদ্রাজ এবং লন্ডন থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে? কাছেই বজবজ দুর্গ, যার কাজ নদীর ওই অংশের রক্ষণাবেক্ষণ করা, পুরোপুরি নিশ্চুপ রইল। ক্লাইভ যখন ফলতা থেকে সৈন্য নিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা করে এসে কলকাতা দখল করলেন, তখন কেউ একজন কেন বাধা দিল না? যখন এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বার সিরাজদৌল্লা কলকাতা জয় করতে এলেন, তখন সামান্য কয়েকটি সংঘর্ষের পরেই তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন কেন?[২] তিনি কি হঠাৎ ব্রিটিশদের ভয় পেয়ে গেলেন, না জানতে পারলেন ওর সেনাপতিরা সবাই বিশ্বাসঘাতক? না, আফগান নেতা আহমদ শাহ্ আবদালী তার রাজ্যের পশ্চিম অংশে

আতঙ্কের সৃষ্টি করেছেন জেনে সেই বিপদটাকেই বড় বলে মনে করে পশ্চিমে যুদ্ধ যাত্রা করলেন? ব্রিটিশরা নদী বা জলপথে এত ভালো যোদ্ধা জেনেও প্রশ্ন থেকে যায়, নদী থেকে জমিতে, মানে পলাশিতে, যখন ওরা নামলেন, তখন ওদের বিরুদ্ধে কেন একটা বুলেটও খরচ হল না? আরও প্রশ্ন থেকে যায়, ব্রিটিশরা কি না চাইতেই হঠাৎ জিতে গেল, না এর পেছনে কোনও পরিকল্পনা কাজ করেছে (মার্শাল, পি.জে., ১৯৮৭ : ৯১)?

এই সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যেকটার জবাব দেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু আমরা এইটুকু বুঝি যে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ ভালো মানুষ ছিলেন, না খারাপ মানুষ ছিলেন, সেটা কোনও প্রশ্ন নয়। অনেক বড় ঐতিহাসিক প্রশ্ন হল : যাঁরা নবাবের চারপাশে ছিলেন তারা প্রায় সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেলেন কেন? কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা? বিশ্বাসঘাতকরা কি ভেবেছিল যে ব্রিটিশদের কাছ থেকে তারা যেটা পাবে, সেটা নবাব দিতে পারবেন না বা দেবেন না। ওই যুদ্ধে ব্রিটিশরা কী কী নীতিহীন, সুবিধাবাদী কাজ করেছেন তার তালিকা বানিয়ে কী লাভ যখন আমরা জানি ওই নীতিহীনতা এবং সুবিধাবাদ ওদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। কী ঘটেছে, কে ঘটিয়েছে এই সব না জেনে ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটনার মানে বুঝতে গেলে এক বৃহত্তর পটভূমিকায়, এমনকী বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিচার করতে হবে।

এই অধ্যায়ের ছটি অংশ। প্রথম অংশ ভূমিকা। দ্বিতীয় অংশ ১৬৯০ অবধি নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশদের সংঘর্ষের বিবরণ। তৃতীয় অংশে আমরা এই সংঘর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার একটা সম্পর্ক বিচার করছি; এই অংশটাই এই অধ্যায়ের মূল, ব্রিটিশরা যে শেষ পর্যন্ত জিতল তার কারণ বাণিজ্য। চতুর্থ অংশে আমরা, পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয়লাভের যে কারণগুলো বলা হয়, তার সবগুলো নিয়েই আলোচনা করছি। পঞ্চম অংশে থাকছে কতকগুলো সামরিক প্রশ্ন, যার মধ্যে থাকছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : এই যে আড়াইশো বছর ধরে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, তা সত্ত্বেও ভারতীয় জিনিস নিয়ে কোনও ভারতীয় জাহাজ কেন ইউরোপের কোনও বন্দরে পৌছল না? সর্বশেষ অংশে আমরা পলাশির যুদ্ধ এবং তার আগের ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করছি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ

প্রায় প্রথম দিন থেকেই, নবাবের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক খারাপ থেকেছে। মোগল সম্রাটরা মনে করতেন যে, ব্রিটিশরা সম্মান দিয়ে বা সমীহ করে কথা বলতে পারে না, ওদের স্বভাব রূঢ়। অন্য দিকে, ব্রিটিশরা বলত, একজন রাজা চুক্তিগতভাবে যা তার প্রাপ্য তার থেকে বেশি কেন চাইবেন? সম্পর্ক খারাপ হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল, সম্রাটের বাণিজ্যিক ফরমানের দুটো ব্যাখ্যা। ব্রিটিশদের যে ফরমান সম্রাট দিয়েছিলেন, সেটা কি শুধু বহির্বাণিজ্যের জন্যে, না আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও তার আওতায় আসবে? এই ফরমান নিশ্চয়ই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী কি পারবেন ব্যক্তিগত কারণে, তার ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রয়োজনে, ওই ফরমান ব্যবহার করতে (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩১০)? এই ফরমানের কি কোনও অস্তিত্ব ছিল, না সবটাই ইংরেজদের বানানো (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ :

২ ফুটনোট, ৩, ২৬-২৭ ফুটনোট)।

সংঘর্ষের আর একটা কারণ ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ী বা মহাজনদের থেকে কোম্পানির ধার করা। কাশিমবাজার শাখাব যখন প্রধান ছিলেন জব চার্নক, তখন অনেক ধার শোধ করেননি। আদালতও যখন ব্যাপারটা নিয়ে জব চার্নককে সাহায্য করল না, তখন কারাবাস এড়াতে তিনি কাশিমবাজার থেকে হুগলি ছুটে এলেন। তারপর ১৬৮৬ সালে দুই পক্ষের মধ্যে যে একটা বড সংঘর্ষ হল, অনেকে মনে করেন তার অনেক কারণেব মধ্যে একটা বড় কারণ হল এই হার। তৃতীয় কারণ, নবাবের মাঝে মাঝে জোর কবে টাকা আদায় কবার অভ্যাস। এছাড়াও ইংরেজরা নবাবের শত্রুগোষ্ঠের কিছু মানুষকে ওদের দুর্গে আশ্রয় দিয়েছিল। এই ব্যাপারটা সিরাজ ভালো চোখে দেখেননি।

১৬৬০—১৬৮০ . ছোটখাটো সংঘর্ষ

১৬৬০ সালে কোম্পানির সঙ্গে তৎকালীন নবাব মীরজুমলার সংঘর্ষ হল। মীরজুমলা চাইলেন যে বিহারের সোরার বাণিজ্য পুবোপুরি যেন ব্রিটিশরা তাকে হস্তান্তর করে। ব্রিটিশবা এই অনুরোধ মানতে অস্বীকার করলে, মীরজুমলা পাটনা থেকে নৌকো করে সোবা আনা বন্ধ করলেন। পাল্টা, হুগলির ব্রিটিশ এজেন্ট মীরজুমলার একটা নৌকো দখল করলেন এই অভিযোগে যে, নবাবের কাছ থেকে তাদের অনেক টাকা প্রাপ্য। অবশ্যই নবাবের নৌকো দখল করা ছোটখাট ব্যাপার নয়। মীরজুমলা হুমকি দিলেন যে, নৌকো তৎক্ষণাৎ না ছেড়ে দিলে এবং ক্ষমা না চাইলে তিনি সমস্ত ব্রিটিশ কারখানা গোলা দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবেন। স্বভাবতই এই হুমকির প্রত্যুত্তরে কোম্পানি নিজেকে গুটিয়ে নিল, নৌকো ফিরিয়ে দিল এবং ক্ষমা চাইল (ভট্টাচার্য, সুকুমার, ১৯৬৯ : ১০; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৭৫ : ৩৫-৩৬)। পরের বছর, ১৬৬১ সালে, যখন কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্য করবার নতুন চার্টার পেল, তখন সেই চার্টারে যোগ হল যে কোম্পানি প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে পারে এবং তাদের কারখানা রক্ষা করবার জন্য প্রহরী রাখতে পারে (ভার্মা, ডি. সি., ১৯৭৬ : ৮)।

১৬৮০ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তার বাবার দেওয়া ফরমান বাতিল করে দিয়ে সমস্ত ব্যবসায়ীর ওপর শতকরা দু ভাগ শুল্ক আরোপ করলেন, মুসলমান না হলে আরও অতিরিক্ত ১.৫ ভাগ। সোরার বাণিজ্য বন্ধ করা হল (গোপাল, রাম, ১৯৬৩ : ২৪) সম্রাটের রাগের কারণ ওরা কথা না শুনে দুর্গ বাড়ানোর চেষ্টা করছিল। ১৬৮২ সালে এই নিয়ে হুগলির ইংরেজ প্রধান এবং মোগল সম্রাটের বাণিজ্যিক অফিসারদের মধ্যে একটা ছোটখাট সংঘর্ষ হল। যখন এই সংবাদ লন্ডনে পৌঁছল তখন হেড অফিস নির্দেশ দিল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যেক কারখানাকে দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করতে হবে। হেড অফিস মতামত দিল যে, হুগলির থেকে চট্টগ্রামকে রক্ষা করা সহজ এবং দুর্গ করার কাজ ওখানে হতে পারে।

চাইল্ডের ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রথম সুপারিশ করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একদা প্রধান, স্যার এডওয়ার্ড উইন্টার। তিনি বলেন ওদের বুঝিয়ে

দিতে হবে যে মোগলরা যেমন স্থলে শক্তিশালী, তেমনই আমরা জলে শক্তিশালী (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৩৯)। সেই সময়ে তার বক্তব্য সবার পছন্দ হয়নি এবং উইন্টারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার বদলে অন্য একজনকে প্রধান করে পাঠানো হল। জাহাজ থেকে নামতে না নামতেই উইন্টার তাকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তিন বছর আটকে রাখলেন (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৪০-৪৩)। যদিও শেষ অবধি তাকে চলে যেতেই হল, তাহলেও কোম্পানির ইতিহাসে এই বিদ্রোহ এক আশ্চর্য ঘটনা। তার থেকেও আশ্চর্য ঘটনা, উইন্টারকে সরানো হলেও শেষ পর্যন্ত তার বক্তব্যই কোম্পানির নীতি হয়ে দাঁড়াল।

১৬৮১ সালে, স্যার জোসিয়া চাইল্ডের নেতৃত্বে, কোম্পানি "এগিয়ে চলার নীতি" নিল, যার মর্মার্থ, ভারতে কোথাও একটি অসামরিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। জোসিয়া চাইল্ড চাইলেন, "ওই জায়গায় এত খাজনা এবং আয় তৈরি করতে, যার মাধ্যমে ভারতে ভবিষ্যতের সবসময়ের জন্য একটি বড়, শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ইংরেজ ডোমিনিয়ান তৈরি করা যায়" (গোপাল, রাম, ১৯৬৩ : ২৫-২৬)। ১৬৮২ সালে, এই প্রয়োজনে চট্টগ্রাম দখল করার কথা কোম্পানির চিঠিপত্রে প্রায়ই উঠত শুরু করল এবং এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত রাজা দ্বিতীয় জেমসের অনুমোদন লাভ করলো (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫২ ভূমিকা)।

সেই সময়ে ভারতবর্ষের কোম্পানির প্রধান ছিলেন উইলিয়াম হেজেস। হেজেস চাইলেন এই ভাবনাকে খানিকটা উস্কে দিতে। তবে হেজেস চাইলেন, চট্টগ্রাম নয়, সামরিক এবং বাণিজ্যিক দুটো দিক দিয়েই আরও ভালো হবে যদি সাগরদ্বীপ দখল করা যায়। এই দ্বীপ গঙ্গার মোহনার কাছে এবং হেজেস বললেন যে এই দ্বীপ দখল করতে গিয়ে যদি এক বছরের আয় ও বাণিজ্য নষ্ট হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। কোম্পানির লন্ডন কোর্ট এইপ্রস্তাব গ্রহণ করল না, তবু ধারণাটা একটু একটু করে ব্রিটিশদের মনে ধরল (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : খণ্ড ২, ১১৭, ১২১, ১৩৩, ১৩৯, খণ্ড ২, ২২-২৪; উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ৮৯)।

১৬৬৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি স্যার জোসিয়া চাইল্ড আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে লিখলেন যে, মোগল সরকার ভেঙে পড়ছে। তাই তারা যখন তখন আমাদের ফ্যাক্টরি দখল নিচ্ছে, গঙ্গায় আমাদের নৌকো আটকাচ্ছে এবং জোর করে টাকা আদায় করছে। ওরা থামবে না যতক্ষণ না, "আমরা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারি আমাদের শক্তি কতটা, ন্যায় এবং সত্য আমাদের পক্ষে।" এই কথা থেকেই বুঝি, যে কোম্পানি ক্ষমতা দেখাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫২ ভূমিকা)।

চট্টগ্রাম দখলের প্রস্তুতি : ১৬৮৬

সেই মতো ছয় কোম্পানির একটি স্কোয়াড্রন সাজানো হল। এই সময়ে যে নিয়ম ছিল সেই অনুযায়ী, হুগলিতে কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক এই দখলদারি বাহিনীর নেতৃত্বে থেকে কর্নেল হলেন। যদিও নবাবকে একটা নরম ভাষায় চিঠি পাঠানো হল, ঠিক হল যে, বিভিন্ন বিষয়ে অমিল হলে চট্টগ্রামে ওই দখলদারি বাহিনি যাবেই এবং "দখলদারি সৈন্যরা চট্টগ্রামে নামবে এবং সেখানকার শহর দুর্গ এবং অঞ্চল শক্তি দেখিয়ে দখল

করবে।" অবশ্য স্কোয়াড্রন পাঠানোর নির্দেশে বলা হল যেন যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন মহিলা, শিশু, নির্দোষ মানুষের গায়ে হাত না পড়ে এবং কোনও ধর্মকে অসম্মান না জানানো হয়। সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হল চট্টগ্রামকে দখল নেওয়ার পর যথাসম্ভব শক্তিশালী করতে। জব চার্নককে এই অঞ্চলের গভর্নর করা হল। এই নির্দেশে বলা হল, "মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি এবং সংকল্প নিতে হবে।" অবশ্যই ব্রিটিশরা অযথা রক্তপাত বা ধর্ষণ হোক সেটা চায় না। কিন্তু এই যুদ্ধ ব্রিটিশদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কোনও উপায় রাখেনি। মাত্র দুটো পথ রয়েছে; "হয় আমাদের বাণিজ্য গোটাতে হবে অথবা মুক্ত তরবারি নিয়ে ব্রিটিশ জাতির অধিকার ও সম্মানের জন্য সংগ্রাম করতে হবে" (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫২ ভূমিকা, এডওয়ার্ডস, মাইকেল, ১৯৬৩ : ১৮)।

সংঘর্ষে যাবার ক্ষেত্রে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল। কাশিমবাজারের কাজি জব চার্নকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উত্তমর্ণের ৪৩ হাজার টাকা দাবির আবেদন গ্রহণ করলেন। জব চার্নক অনেক চেষ্টা করেও এই রায় পাল্টাতে পারলেন না। কারাবাস এড়াবার জন্য জব চার্নক তখন হুগলি গেলেন। হুগলিতে গিয়ে শুনলেন যে, লন্ডন থেকে একটি স্কোয়াড্রন আসছে, যাতে থাকছে ১২টা জাহাজ, ২০০ কামান এবং ৬০০ লোক (ভার্মা, ডি.সি., ১৯৭৬ : ১০-১১)। মাদ্রাজ থেকে আসার সময় আর চারহাজার লোক ওদের সঙ্গে যোগ দেবে। এই স্কোয়াড্রনের নেতৃত্বে থাকছেন ভাইস অ্যাডমিরাল নিকলসন। এই স্কোয়াড্রন প্রথমেই যাবে ওড়িশার বালেশ্বরে, এবং সেখান থেকে কিছু লোক নিয়ে যাবে চট্টগ্রাম। ওদের উদ্দেশ্য হবে শহর, দুর্গ, অঞ্চল দখল এবং দুর্গ তৈরি। আরাকানের রাজার সঙ্গে সদ্ভাব তৈরি, তারপরে হুগলি প্রত্যাবর্তন (গোপাল, রাম, ১৯৬৩ : ২৫)। এই আশাবাদী পরিকল্পনা প্রথম গণ্ডগোলে পড়ল যখন জাহাজগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং ভাইস অ্যাডমিরাল নিকলসন মাত্র তিনটি জাহাজ নিয়ে হুগলিতে হাজির হলেন।

হুগলিতে মোগলদের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ

ইতিমধ্যেই নবাবের লোকরা ২০০-৩০০ অশ্বারোহী, ৩০০০-৪০০০ সৈন্য এবং ১১টা বড় কামান নিয়ে হুগলির ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি ঘিরে ফেলেছে। ১৬৮৬ সালে ২৯শে অক্টোবর যখন দুজন ব্রিটিশ সৈন্য কিছু জিনিস কিনতে বাজারে গেল তখন, বাদানুবাদের পর, একজন পালিয়ে গেল কিন্তু অন্যজন মরণাপন্ন অবস্থায় সেখানে পড়ে রইল। নবাবের লোকরা কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে এবং তার চারপাশের বাড়িগুলোতে আগুন দিল। সেই রাতটা, ব্রিটিশদের মতে, ভয়ংকর। সারা রাত যুদ্ধ চলল এবং ব্রিটিশরাও চন্দননগরের ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে ওদের কামান দখল করল, একটা মোগল জাহাজও দখল করল, যা চোখে পড়ল তাতেই আগুন জ্বালিয়ে দিল। ব্রিটিশদের মতে, এই সংঘর্ষে ৬০ জন মোগল সৈন্য মারা গেল কিন্তু ব্রিটিশদের পক্ষে মারা গেল মাত্র দুজন। যাই হোক, ডাচদের মধ্যস্থতায় পরের দিন একটা শান্তি চুক্তি হল। কিন্তু ইংরেজরা ভয় পেল যে, মোগলদের একটা বড় সৈন্যবাহিনী এইদিকে আসছে। জব চার্নক ঠিক করলেন যত শীঘ্র পারেন, হুগলি ছেড়ে নদীর ওপারে সুতানুটিতে আশ্রয় নেবেন। তিনি ঠিক করলেন যে, তাঁর কাছে যে ১৪০০ ব্যাগ

সোরা আছে, সেটা বিক্রি হলেই আর হুগলি থাকবেন না। ইতিমধ্যে ভাইস অ্যাডমিরাল নিকলসন বালেশ্বরে তিনটি মোগল জাহাজের দখল নিয়েছেন (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫২-৫৪ ভূমিকা)।

এইসব শুনে, আতঙ্কিত নবাব ঢাকায় সমস্ত ইংরেজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। ইংরেজদেরও ধারণা হল যে, ডাচেরা মধ্যস্থতার নাম করে নিজেদের বাণিজ্য বাড়াবার চেষ্টা করছে। অবস্থা আরও খারাপ হল, কেন না প্রায়ই ইংরেজ জাহাজগুলোতে জল ঢুকতে শুরু করল (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫৬ ভূমিকা)। ভালোর দিকে ছিল, হুগলির মোগল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করতে শুরু করল। ওরা হয়তো ভয় পেল এই ভেবে যে, ইংরেজরা চলে গেলে বাণিজ্যিক লোকসান হবে।

যদিও এই সংঘর্ষ পরে মিটে গেল এবং ব্রিটিশদের হুগলি ফিরে যাবার অনুমতি মিললো, ওদের ঔপনিবেশিক আশা কিন্তু ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকল। কোম্পানি ঠিক করল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওরা চট্টগ্রাম রওনা হবে, এবং সঙ্গে কিছু বিশিষ্ট লোককে নজরবন্দি হিসাবে নেবে। মূল সমস্যা হল যে, চট্টগ্রাম দখল করতে গেলে ৫০০-৬০০ লোক চাই এবং একই সংখ্যক ঘোড়া এবং অশ্বারোহী চাই (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫৭ ভূমিকা)।

চট্টগ্রাম দখলের এই প্রস্তাবে জব চার্নকের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তাঁর ধারণা হল তিনি এর মধ্যেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হুগলিতে একটা সমঝোতায় এসেছেন, যা, ওই সব ঘটনায় ভেস্তে যেতে পারে। ১৬৮৬ সালে, ৯ই ডিসেম্বর তিনি জোসিয়া চাইল্ডকে লিখলেন, ওই সংঘর্ষের পর হুগলির কর্তৃপক্ষরা খুব নরম সুরে কথা বলছেন। ওরা ভয় পাচ্ছেন যে, আমরা ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে চলে যেতে পারি। তার বিশ্বাস নবাবের কাছ থেকে বেশ কিছু দাবি আদায় করা যাবে এবং বাণিজ্য করবার ফরমানও পাওয়া যাবে। তিনি আরও লিখলেন, "চট্টগ্রাম দখলের কথাটা যদি না বলা হত তা হলে হয়তো আমরা আরও কিছু আদায় করতে পারতাম।" তারপর চট্টগ্রাম পরিকল্পনার স্পষ্টাপষ্টি বিরোধিতা করে তিনি বললেন যে, এই পরিকল্পনা সম্রাটকে রাগিয়ে দিতে পারে, ব্রিটিশ বাণিজ্যের ক্ষতি করতে পারে। "এই ঘটনা সম্রাটকে কতটা রাগিয়ে দেবে আমরা জানি না, হয়তো এর ফলে বাংলায় আমাদের সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে"। (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫৮)।

ব্রিটিশদের ক্ষতিপূরণ দাবি

ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৬৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার একটা ক্ষতিপূরণের তালিকা তৈরি করল, যার মধ্যে ওদের সমস্ত রকম লোকসানই ধরা আছে; লুণ্ঠন, এজেন্টকে বন্দি করে রাখা এবং কারখানা থেকে বার করে দেওয়া এবং তিনটে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য ২০ লাখ।

এজেন্ট ও তার লোকদের হুগলিতে বন্দি রাখা—৩ লাখ টাকা।

ফ্যাক্টরি জ্বালিয়ে দেওয়া—৩ লাখ টাকা।

ফ্যাক্টরি এবং বাড়ি ঘরদোরের খরচ ("যদি আমরা বাংলা ছেড়ে যাই")—১লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ মানুষ এবং ২০টা জাহাজের জন্য—২০ টাকা।

এই রকম আরও অনেক কিছু। স্বভাবতই তারা মোগলদের যা ক্ষতি করেছেন সেটা হিসেবের মধ্যে এল না। এই নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হল তখন ইংরেজরা আরও ১২টি দাবি যোগ করল, যার মধ্যে চারটি।

(ক) হুগলিতে ট্যাকশাল বসানো।

(খ) শুল্ক বিনা বাণিজ্য।

(গ) মালদার কারখানা আবার নতুন করে তৈরি।

(ঘ) ঋণের ব্যাপারটা বিবেচনা করা (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৫৯-৬০ ভূমিকা)।

যখন আলোচনা চলছে তখন খবর এল যে, নবাব কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি দখল করে তার জিনিসপত্র ২৩ হাজার টাকায় নিলাম করে দিয়েছেন। ওদের ১২ দফা দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল। নবাব ভয় দেখিয়ে লিখলেন যে, বাদশা নির্দেশ দিয়েছেন ইংরেজদের বাংলা থেকে বের করে দিতে। এই অবস্থায় ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৮৭ তে, জব চার্নকও খানিকটা দেশপ্রেম দেখিয়ে লিখলেন, এখন শান্তি হবে তলোয়ার হাতে নিয়ে' প্রতারণাময় মোগলরা আর কোনও ভাষা বুঝবে না (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৬৫ ভূমিকা)।

ব্রিটিশরা কতটা সত্যি সত্যি ক্ষতিপূরণের জন্য দরকষাকষি করছিল এবং কতটা চট্টগ্রাম দখল নেবার জন্য সময় কিনছিল বলা শক্ত। ১৬৮৭ সালের ১৮ই মে, স্যার জোসিয়া চাইল্ড একটা চিঠিতে লিখলেন যে, এই আলোচনার মাধ্যমে মুরদের কিছুদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখছেন, চট্টগ্রাম দখল করার পরিকল্পনা তার মন থেকে মুছে যায়নি। ব্যাপারটা ঘনীভূত হল যখন জানা গেল যে, নবাব শায়েস্তা খাঁ তার বক্সী আবদুল সামাদকে দুই হাজাব ঘোড়া দিয়ে পাঠিয়েছেন আক্রমণ হানবাব জন্য। এই শুনে জব চার্নক সঙ্গে সঙ্গে সুতানুটি ছেড়ে গঙ্গায় জাহাজে গিয়ে রইলেন। পথে, প্রতিহিংসা নিতে তিনি নবাবের লবণ গৃহ এবং উল্টোদিকে থানায় যে দুর্গ ছিল তা গুঁড়িয়ে দিলেন। তারপর রওনা দিলেন হিজলি দ্বীপের দিকে। মেদিনীপুরের সংকীর্ণ রসুলপুর নদী যেখানে গঙ্গায় মিলেছে সেখানেই এই দ্বীপ, সাগরদ্বীপের কাছে। জব চার্নক ওই দ্বীপে পৌছতে না পৌছতেই প্রচুর ইংরেজ সৈন্য মারা গেল বা মরণাপন্ন হল। খবর এল সুতানটি, হুগলি ও বালেশ্বর সামাদের কামানে ধ্বংস হয়েছে (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯: ৬২-৬৩, ৬৫ ভূমিকা)।

হিজলি দ্বীপের সংঘর্ষ : ১৬৮৭

জব চার্নকের যা হিসেব ছিল তার থেকে বেশ কিছুদিন বেশি হিজলিতে থাকতে হল, মে এবং জুন, ১৬৮৭ পর্যন্ত। জব চার্নকের সঙ্গে ছিল ৪২০ জন মানুষ, কারও স্বাস্থ্য ভালো নেই, এক সংকীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ এবং রসুলপুর নদীতে জল এত কম যে, নৌ-যুদ্ধে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার মতো অবস্থা নেই। হিজলিতে অবস্থান কালে এক বড় সমস্যা ছিল রসদ জোগাড় করা। এই প্রয়োজনে, নিকলসনের নেতৃত্বে, ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রায়ই দ্বীপের বাইরে যেতে হত রসদ সংগ্রহের জন্য, কখনও বালেশ্বরে কখনও বা স্থানীয়

নৌকো লুণ্ঠন করে। ফেরার পথে প্রায়ই নবাবের সৈন্যরা ওদের আক্রমণ করত, যার ফলে কিছু লোক মারা যেত বা আহত হত। এমনই একটি সংঘর্ষে ১৭ জন ব্রিটিশ সৈন্য মারা গেল, যে সংখ্যাটা ওই ছোট বাহিনীর পক্ষে বেশ বড়। স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, শুধুমাত্র একজন জমিদার বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। মূল বাংলা ভূ-খণ্ডের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না। কোম্পানির সৈন্যদের কাছে মাংস এবং মাছ ছিল, স্থানীয় নৌকো আক্রমণ করে কিছু চাল পাওয়া যেত। ব্রিটিশ সৈন্যরা মারা যেতে শুরু করলেন। যাঁরা প্রথমে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ২০০ জন মারা গেলেন এবং সব সময় ১৮০-২০০ জন অসুস্থ থাকতেন। কিছু সামরিক সাফল্য সত্ত্বেও সামগ্রিক অবস্থা ছিল প্রতিকূল, বিষন্ন। এই দ্বীপ রক্ষা করার জন্য ১০০ জনের মতো সুস্থ মানুষ ছিল এবং ২৬ জন কর্পোরালের মধ্যে মাত্র ৪ জন বেঁচে ছিলেন ওদের নেতৃত্ব দিতে। অন্য দিকে সামাদের নেতৃত্বে ছিল ৭০০ মানুষ এবং ২০০ ঘোড়া (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৬৫-৬৭ ভূমিকা)।

স্বভাবতই ব্রিটিশদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যেও রাতের পর দিন, দিনের পর রাত, অবিশ্রান্তভাবে সামাদের কামান গর্জন করে চলেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো ব্রিটিশ প্রতিরোধ গুটিয়ে যেত। কিন্তু সামাদের ভাবনা ছিল অন্যরকম। সংঘর্ষের ষষ্ঠ দিনে তিনি ব্রিটিশদের একটি সন্ধি প্রস্তাব দিলেন এবং কাউকে ওর সঙ্গে এসে কথা বলতে বললেন। ব্রিটিশরা তখন এই অসম্ভব অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে যে কোনও শর্তেই রাজি। কিন্তু তিন দিন আলোচনার পর যে চুক্তি হল, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। সামাদ ওদের অনুমতি দিলেন নিরাপদে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে। সংঘর্ষের ১১তম দিন হিজলির ছোট দুর্গ হস্তান্তর হয়ে ব্রিটিশের হাত থেকে মোগলদের হাতে পৌঁছল। ব্রিটিশরা এই দ্বীপ ছাড়ল বন্দুক, বুলেট, কামান এবং সমস্ত রকম রসদ নিয়েই। এর সঙ্গে ড্রাম বাজল, ফ্ল্যাগ উড়ল। হিজলি থেকে চার্নক উলুবেড়িয়ায় গেলেন। এইভাবে ওই শতাব্দীর সব চেয়ে বড় সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটল (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৬৭ ভূমিকা)।

চট্টগ্রাম দখলের ব্যর্থ চেষ্টা

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের, ২১শে জুলাই নবাব তার পরোয়ানায় বললেন, যে, ইংরেজদের ব্যবহার ছিল শয়তানের মতো। ওরা মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করেছে, জাহাজ দখল বা লুঠ করেছে এবং ৩ হাজার কামানের গোলা ফাটিয়েছে, তবু মহত্ত্ব দেখিয়ে তিনি ওদের বাণিজ্য করবার অধিকার দিচ্ছেন, হুগলিতে ওরা ফিরতে পারে অথবা সুতানুটি বা উলুবেড়িয়ায় যেতে পারে, ব্রিটিশদের ১২দফা দাবি গ্রহণের প্রশ্ন আসে না। ৫০০ জন খুন হবার পর, যার মধ্যে ১৪ জন কোম্পানির কর্মচারী, ৬ জন মহিলা ও বাকিরা ভারতীয় বা মিশ্র। ৬ জন লেফটেন্যান্টের মধ্যে ৪ জন নিহত, এই অবস্থায় যারা বেঁচে আছেন তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন। পরে যখন ভারতের পশ্চিম সীমান্তে, সুরাটে যুদ্ধ শুরু হল, তখন নবাব কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। চার্নক, লন্ডন কেন্দ্রের মতে, ভেড়ার মতো ব্যবহার করলেন, অনেক গাল শুনলেন এবং দুর্বল চিত্তে মোগলদের এক বড় ক্ষতিপূরণ দিলেন (হেজেস, উইলিয়াম,

১৮৮৭-৮৯ : ৬৯-৭০, ৭২ ভূমিকা)।

তার পরই একটা বড় পরিবর্তন হল। লন্ডনের কেন্দ্র হিজলির সংঘর্ষ থেকে কিছু শিখল না। তারা চাইল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চার্নক চট্টগ্রাম পৌঁছে যান। চার্নকও এখন দেখাতে চাইলেন যে, তিনি দুর্বল নন, যুদ্ধে ভয় পান না। তিনি লিখলেন যে, যত দিন পর্যন্ত বাংলায় দুর্গ না করা হচ্ছে, বম্বে বা ফোর্ট সেন্ট জর্জের মতো, তত দিনই চেষ্টা করে যাবেন। লন্ডনের কোর্ট চাইল যে, আরাকানের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, পুরো গঙ্গা নদী ধরে, মোগলদের নৌকার ওপর আক্রমণ চালাতে এবং তার সঙ্গে কোম্পানি ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা মিলে সমস্ত রকম ঝামেলা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৭৩-৭৫ ভূমিকা)।

চার্নকের জবাব, লন্ডনের কোর্টের কাছে যতটা জোরালো হবে বলে প্রত্যাশা ছিল ততটা হল না। ১২ ডিসেম্বর, ১৬৮৭, তারা এক চিঠিতে জানাল, জব চার্নক একজন "দুর্বল ও চিন্তাহীন মানুষ" এবং দুর্গ করার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন না বলে সমালোচিত হলেন। ২৭শে আগস্ট, ১৬৮৭, তারা আর একটা চিঠিতে বলল যে, চট্টগ্রাম নিয়ে তাদের নির্দেশ "নানা অজুহাত দেখিয়ে" জব চার্নক মানেননি। হিজলির সাহসিক সংগ্রামের জন্য কোনও কৃতিত্ব না দিয়ে বলা হল যে, ওখানে এত ইংরেজ সৈন্যের মৃত্যুর কারণ তার ভ্রান্তি। তাকে বলা হল উলুবেড়িয়ায় দুর্গ বানাবার বন্দোবস্ত করতে, মালদা এবং কাশিমবাজারে আবার ফ্যাক্টরি খুলবার জন্য আলোচনা করতে এবং নদীপথে হুগলি পর্যন্ত আসতে পাইলটের ব্যবস্থা করতে (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৭৩-৭৫ ভূমিকা)।

আমরা যারা পরের ঘটনাগুলো জানি, তাদের কাছে মজার ঠেকবে, চার্নককে সমালোচনা করা হল যে, তিনি উদ্যোগী কম এবং সুতানুটি বলে একটা জায়গা সম্বন্ধে অনর্থক উৎসাহী। যাই হোক, লন্ডনের কোর্ট চার্নকের এত সমালোচনা করার পরেও, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৮৮ সালে, একটা চিঠি লিখলেন, যা পড়ে মনে হতে পারে যে, কখনও কখনও উদার এবং অনুগ্রহী মনোভাব নিয়েও পুরনো বিশ্বস্ত ভৃত্যের আবদার তারা শুনেছেন। সেই চিঠিতে লন্ডনের কোর্ট লিখছেন, "যখন সুতানুটি তার এত পছন্দ, আমরা ওখানেও একটা ফ্যাক্টরি করবার অনুমতি দিচ্ছি।" এই লিখেই লন্ডনের কোর্ট হয়তো ভাবলেন, বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে গেল, তাই এটাও যোগ করলেন, "এই ফ্যাক্টরি যত কম খরচে করা যায় তত ভালো, এবং কয়েক বছরের মধ্যেই এই ফ্যাক্টরি যেন এমন লাভ দেয় যে, সমস্ত খরচ উঠে আসে" এই সঙ্গে সুতানুটিকে উলুবেড়িয়া থেকে বেশি পছন্দ করার জন্য ওরা এক হাত নিল জব চার্নককে। "আপনার শহর উলুবেড়িয়ায়, আমরা শুনলাম, যথেষ্ট গভীর জল আছে, যেখানে ডক করা যেতে পারে, বড় জাহাজ আসতে পারে, এবং জায়গাটা নাকি স্বাস্থ্যকর।" সেন্ট জর্জের (পরবর্তীকালে যেটা মাদ্রাজ শহরের রূপ নিল) প্রধানকে উদ্দেশ করে ওরা লিখল, "কোর্ট চার্নককে তার পছন্দ করা জায়গা ছেড়ে চট্টগ্রাম যেতে বলছে এবং অতর্কিত আক্রমণের পর চট্টগ্রাম দখল নিয়ে ওই শহরকে আমাদের ব্যবসার কেন্দ্র করতে"। ওরা সেন্ট জর্জের প্রধানকে লিখলেন, চার্নক যদি চট্টগ্রামে না যেতে চান অন্যেরা যেন তাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা চট্টগ্রাম চলে যান। এমনকি বললেন চার্নক যেখানে বসতি করতে চান, (অর্থাৎ

সুতানটী যা পরে বর্তমান কলকাতার রূপ নিল।) সেটা একটা "বড় ভুল"। হয়তো, লন্ডনের কোম্পানী ভাবলেন, "আমাদের প্রয়োজনে উঠে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কমে এসেছে" (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৭৩-৭৭ ভূমিকা)।

জব চার্নক সুতানুটিতে ১৬৮৭ সালের শেষ থেকে প্রায় এক বছর থাকলেন। ততক্ষণে, তার মনে হল যে লন্ডন কোর্ট চট্টগ্রামের যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়েছে। সেই ধারণা ভুল। লন্ডনের কোর্ট চট্টগ্রাম ভোলেনি, এজেন্ডা ঠিক আছে। সুতানুটিতে তাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য চার্নককে না জানিয়ে, কোর্ট অফ লন্ডন ঠিক করল যে, একটা ফ্রিগেট (এক ধরনের যুদ্ধ জাহাজ) পাঠাবেন। এই ফ্রিগেটের ক্যাপ্টেন হলেন কোম্পানি মহলে "গরম মাথা, ভুল মাথা, হিংসুটে এবং শূন্য, পালক ঢাকা মগজ" ক্যাপ্টেন হিথ বলে একজন। এর আগে প্রতিবার যুদ্ধে চার্নকই প্রধান ছিলেন, এবার তাকে সরিয়ে রেখে হিথকে কমান্ডার করা হল (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৭৬ ভূমিকা)।

১৬৮৭ সালে, ২৪শে ডিসেম্বর, হিথের ৯টি জাহাজের বাহিনী বালেশ্বর ধ্বংস করে চট্টগ্রামের দিকে এগোল। কিন্তু এর আগেও যেটা বিভিন্ন অভিযানে ঘটেছে, ভুল করে জাহাজগুলো হাজির হল আরাকানে। ২০শে জানুয়ারি হিথ আরাকানে পৌঁছলেন মাত্র দুটো জাহাজ নিয়ে, বাকি জাহাজগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু ২৯শে জানুয়ারি-ই আরাকান ছেড়ে পাততাড়ি গোটাতে হল। আরাকানের রাজা ব্রিটিশদের লোক দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন না, তবে রসদ এবং জিনিসপত্র দিয়ে এই আক্রমণকে সাহায্য করতে তার আপত্তি ছিল না। নিরাশ হয়ে হিথ ফোর্ট সেন্ট জর্জে ফিরে এলেন বালেশ্বর হয়ে। বালেশ্বরে, পরে চার্নক লন্ডনের কোর্টকে অভিযোগ করলেন যে, হিথ ওখানকার পার্শিয়ান গভর্নমেন্টকে শুধু শুধু অবমাননা করেন, গভর্নরের নারী বন্ধুকে হত্যা করেন, একজন হিজড়েকে বন্দি করেন, অনেক দামি জিনিস দখল করেন, বেশ কিছু মেয়ে এবং শিশুকে বিভিন্ন বাড়ি থেকে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করেন এবং চার্চে আশ্রয় নেওয়া কিছু খ্রিস্টান মেয়েকে ধর্ষণ করেন (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৮০-৯০ ভূমিকা)।

শেষ পর্যন্ত হিথ ২১শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম রওনা হলেন। কিন্তু চার্নক এবং অন্যরা তাকে উপদেশ দিল যেন শহর দখল করবার ঝুঁকি না নেন। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্যবাহিনী বড় ছিল না—১১৫ জন ইউরোপীয়ান এবং ১৬৯ জন পোর্তুগিজ মার্সেনারি। সংখ্যাটা এত কম যে, ওই শক্তি নিয়ে ভরসা করে আক্রমণ করা যায় না। এইভাবে হিথ "বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরলেন কিছুই না করে।" চার্নকের মতে "আমাদের জাতিকে এর ফলে অবমাননা সহ্য করতে হল, আমাদের চুক্তিগুলোর কোনও মানে থাকল না এবং বাংলার বাণিজ্য আবার দখল করা শক্ত হয়ে উঠল" (হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৮৬ ভূমিকা)।

এইভাবে চট্টগ্রাম দখল করবার, সেখানে দুর্গ করবার, এবং এই শহরকে ওদের ব্যবসা ও সামরিক কাজের কেন্দ্র করবার ঔপনিবেশিক স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটল। তবে একটা জিনিস হল, যার গুরুত্ব ইতিহাসে আরও বেশি। ১৫ মাস মাদ্রাজে কাটিয়ে জব চার্নক ১৬৯০ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় বারের জন্য সুতানুটি এলেন। সেখানেই গড়ে উঠল ভারতের সবচেয়ে বড় শহরের একটা, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী (হেজেস,

উইলিয়াম, ১৮৮৭-৮৯ : ৮৭ ভূমিকা)।

এইখানেই ব্রিটিশদের সঙ্গে মোগলদের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটল না। ১৬৮৯ সালে আবার ঝগড়া হল, সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্ত ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বললেন, ইংরেজরা ক্ষমা চাইল, সম্রাট ক্ষমা করলেন, ওরা পরের বছর ফিরে এল (হান্টার, ডব্লু.ডব্লু., খণ্ড ৩ : ৩০০-৩০১; খণ্ড ৫ : ৪৫-৪৬; খণ্ড ৬ : ১১২; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৭৫ : ৩৮-৩৯; এডওয়ার্ডস, মাইকেল, ১৯৬৩ : ১৮)। তার পর কয়েক বছরের মধুচন্দ্রিমা। ৯০-এর দশকে শোভা সিংহ-এর ঘটনার পর ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ বানাবার অনুমতি পেলেন এবং ১৬৯৮ সালে তিনটি গ্রামের জমিদারি পেলেন। কিন্তু ১৭০১ সালে আবার সম্রাট ঔরঙ্গজেব খেপে গেলেন, যখন ইউরোপিয়ান জলদস্যুরা মক্কাগামী হজ যাত্রীদের ওপর ঝামেলা করল। সম্রাট সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন। ব্রিটিশদের পক্ষে সৌভাগ্যের, এই ঘোষণা পুরোপুরি কার্যকরী করা হল না। এখানে দান, ওখানে ঘুষ, এইসব দিয়ে ব্রিটিশরা তাদের বাণিজ্য চালিয়ে গেল। কোম্পানিও সুরাটমুখী এবং পারস্যমুখী সমস্ত "মুর" জাহাজের যাতায়াত অবরোধ করল, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সম্রাটের ওপর চাপ দিল যাতে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৭৫ : ৪০; উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ১৬০-১৬২)।

পরের কয়েক বছর কিছু ছোট সংঘর্ষ হল, ১৭২৩ সালে, পরে ১৭২৭ সালে গন্ডগোল হল ভাগলপুরের সোরা বাণিজ্যে মোগলদের হস্তক্ষেপ নিয়ে। ইংরেজরা, ঔদ্ধত্য দেখিয়ে, হুগলি নদী অবরোধ করল। আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় শেষ অবধি ঝামেলা মিটলেও , এখানে ওখানে কিছু পয়সা ঢালতে হলেও, এই ঘটনায় ইউরোপীয় ঔদ্ধত্য দৃশ্যমান হল। আবার গন্ডগোল বাধল ১৭৮৪ সালে, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুটো আর্মেনিয়ান জাহাজ দখল করল, প্রত্যুত্তরে নবাব আলিবর্দি খাঁন ইংরেজদের সমস্ত ফ্যাক্টরিতেই পাহারা বসালেন। শেষ পর্যন্ত কোম্পানি নবাবকে ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিল, আর্মেনিয়ানদের দিল ২০ হাজার টাকা (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩৪, ৩৮-৩৯)।

প্রথম দিকে এই সমস্ত শক্তির দ্বন্দ্বে ইংরেজরা পরাজিত হলও, সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ওদের মাথা থেকে গেল না। ব্রিটিশদের প্রথম লক্ষ্য ছিল দুর্গ তৈরি, কিন্তু মোগলদের অনুমতি মিলছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা সুযোগ এল শোভা সিংহ-এর ঘটনায়, সেটা আগেই লিখেছি। চন্দ্রকোনার রাজা এই শোভা সিং একজন আফগান যোদ্ধার সাহায্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বাংলা দখল করে ফেলেন। এর পরেই সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সম্মতি আসে, কলকাতায় দুর্গ করার। যদি দুর্গ করবার সম্মতি পেতে দেরি হয়, সেই নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। ১৭৪০-এর দশকে বর্গি আক্রমনের সময়, দুর্গ তৈরির কাজ অনেকখানি এগোয় (মার্শাল, পি.জে., ১৯৭৬ : ৭; এডওয়ার্ডস, মাইকেল, ১৯৬৩ : ২২; ভট্টাচার্য, সুকুমার, : ১, ৩; রামগোপাল, ১৯৬৩ : ৩৯; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩১৩, মার্শা, ভি.সি., ১৯৭৬ : ১৯)।

বাণিজ্য ও সংঘর্ষ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা মোগলদের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষের এই স্বল্প উপস্থাপনার মধ্যে দুটো বড় বিশেষত্ব বেরিয়ে আসে। এক, যেভাবে ইংরেজরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং রূঢ় ব্যবহার করেছে বা চিঠিতে যে ভাষায় গালাগালি করে নবাবের উল্লেখ করেছে, সেটা আশ্চর্যজনক এবং সামান্য একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনভিপ্রেত। বিশেষ করে লন্ডন থেকে যে চিঠিপত্র লেখা হত, তার ভাষা এবং ভঙ্গি থেকে বোঝার উপায় ছিল না যে একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর এক বড় সাম্রাজ্যের শাহেনশার সম্পর্কে কথা বলছে। ওই চিঠিপত্র পড়েই, এটা পরিষ্কার যে ওই কোম্পানির দৃষ্টি হিসেবের খাতায় আবদ্ধ ছিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশেষত্ব আরও অবাক করার মতো। বাংলার নবাবকে বারবার অপমান করা হচ্ছে, তার নৌকা দখল করা হচ্ছে, তার বাহিনী আক্রান্ত হচ্ছে, যখন খুশি তার দুর্গ দখল হচ্ছে বা দপ্তর লুঠ হচ্ছে, কিন্তু তবু তিনি এক আশ্চর্য সহ্যশক্তি বিদেশি ব্যবসায়ীদের প্রতি দেখাচ্ছেন। এদের গুন্ডামির জন্য ক্ষতিপূরণ তো চাওয়া হলই না বরং কোম্পানির এত সাহস যে, তারাই কয়েক দফা ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসল। প্রতিবারই ক্ষতিপূরণের সঙ্গে রইল তাদের বাণিজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি। বেশ কয়েকবার হয়েছে, বিশেষ করে হুগলি, হিজলি, বা চট্টগ্রামের যুদ্ধের পর, সম্রাট চাইলে সেখানেই ওরা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তবুও সামান্য ধমকে নবাব ওদের ছেড়ে দিয়েছেন। কেন?

এই অদ্ভুত ব্যবহারের একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। সমস্ত সংঘর্ষ সত্ত্বেও মোগলরা চাইত যে ওরা ভারতবর্ষে থাকুক এবং বাণিজ্য করুক। ইউরোপীয় বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট টাকা আসত, কিছুটা বুলিয়নের রূপে সোজাসুজি। খানিকটা ওদের কার্যকলাপের ফলে যে সামগ্রিক অর্থনীতি পুষ্ট হত ওদের মাধ্যমে। সেই কারণেই মোগলরা যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। যখন ওদের ধৈর্য্যের সীমা ভেঙেছে কেবল তখনই সশস্ত্র আক্রমণ করেছে—যেমন ১৬৩২ সালে পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধে বা ১৬৮৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে—ওরা চেষ্টা করেছে একটি ইউরোপীয়ান শক্তির বদলে অন্য ইউরোপীয় শক্তি আনতে অথবা কিছু দিন পরে সব কিছু ভুলে যেতে, যেন কিছুই হয়নি। ১৬৩২ সালে পোর্তুগিজরা পর্যুদস্ত হবার পর ডাচ এবং ইংরেজদের ডাকা হল এবং ১৬৮৭-র পর একই কারণে ডাচ ও ফরাসিদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার শুরু হল। এটা বোঝা গেল যে, কোনও না কোনও ইউরোপীয় বাণিজ্য সংগঠনকে ওদের দরকার, ওদের বাদ দিলে চলবে না। ১৬৩৪ সালে ইংরেজরা পিপলি ও বালেশ্বরে বাণিজ্য করবার সনদ পেল সম্রাটের কাছ থেকে, ১৬৩২ সালে পোর্তুগিজদের হারাবার পরেই (গোপাল, রাম, ১৯৬৩: ২৩-২৪)।

ব্রিটিশদের ১৬৮৭ সালের সশস্ত্র কার্যকলাপ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ভালো লাগেনি। ওদের ঔদ্ধত্য দেখে সম্রাট অবাক হয়ে যান এবং ব্রিটিশদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু রাগ পড়ে গেলে হিসেব করে দেখলেন ওদের বাণিজ্য কীভাবে রাজস্বকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করছে। মোগল শাসকরা ভয় পেলেন যে, ব্রিটিশরা বাণিজ্য ছেড়ে চলে যাবে, কাজেই মাত্র তিন হাজার টাকা বার্ষিক মূল্যে ওদের

আবার বাণিজ্য শুরুকরার অনুমতি দিলেন (চিচেরভ, এ.আই, ১৯৯৬ : ১০২)। আর একটা ভয়ছিল যে, ব্রিটিশ নৌবহর হজ যাত্রীদের ওপর হামলা করতে পারে। ভয় ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বন্দরে ব্রিটিশ নৌবহর ভারতীয় জাহাজের বিরুদ্ধে যাবে। সেই ভেবে সম্রাট ওদের ক্ষমা করলেন এবং কর্মচারীদের হুকুম দিলেন যেন ওদের বাণিজ্যে বাধা দেওয়া না হয় (উইলসন, সি.আর., ১৮৯৫ : ১২২-১২৩; চিচেরভ, এ.আই, ১৯৯৬: ১০২)।

আমরা কাগজপত্র পড়ে জানি যে, শুধু ইংরেজ নয়, এমনকি ডাচ, ফরাসি বা দিনেমারদের সম্রাটের সনদ পেতে অসুবিধা হয়নি। ওদের বাণিজ্য করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্তে এক মোটা টাকার বিনিময়ে। প্রায় নিয়ম করেই ওদের অনুমতি আসত (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১২৪-১২৫)। মোগলরা ওদের টাকায় এবং বুলিয়ানে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, মাঝে মাঝে ওদের ঔদ্ধত্য, বিশেষ করে নদীতে এবং সমুদ্রে, ওরা সহ্য করত (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ৪৩)।

ব্রিটিশ এবং ডাচদের এত স্পর্ধা বেড়েছিল যে, একাধিকবার ওরা ভাগীরথী নদীর মুখ আটকেছে, নবাবের জাহাজ আটকেছে। এমনকি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৮৭ সালে বৃটেন থেকে একটা নৌবহর পর্যন্ত নিয়ে আসে। এত কাণ্ডের পরেও ইউরোপীয়ানদের বাণিজ্য করবার অনুমতি মিলেছে, যেন কিছুই হয়নি।

১৭০৬ সালে দুই বছর কাশিমবাজারের ডাচ কারখানা বন্ধ থাকবার পর মুর্শিদকুলি খান, বাংলার দেওয়ান, সম্রাটকে লিখলেন যে, এর ফলে জমির ব্যবহার তুঁত চাষ থেকে সরে গিয়ে কম লাভজনক চাল এবং ডাল তৈরিতে লেগেছে—যার ফলে রাজস্ব কমছে। দেওয়ানের চিন্তার কারণ ছিল এই, যেখানে তুঁতের জমির খাজনা ছিল বিঘা পিছু তিন টাকা, সেখানে চাল এবং ডালের খাজনা ছিল ০.৭৫ এবং ০.৩৭ টাকা (প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫ : ২৫)।

পশ্চিম উপকূল গুজরাটের শাসক যুবরাজ খুররম, যিনি পরে সম্রাট শাহজাহান হন, বিদ্রোহ করবার পর ভারতীয় জাহাজের ওপর রাজকীয় সাহায্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে এবং লোহিত সাগর এলাকায়। এই সময়ে ডাচ এবং ইংরেজরা যথেচ্ছভাবে ভারতীয় জাহাজ আক্রমণ করে, এই যুক্তিতে যে, ওরা ডাভোলে পোর্তুগিজদের সঙ্গে বাণিজ্য করছিল (দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪ : ৪৯৫-৪৯৮)।

ব্যাপারটা অন্য রকম হত, যদি ইউরোপের বণিকরা ভারতে জাহাজ নিয়ে না এসে ভারতীয় বণিকরাই তাদের জাহাজে করে টেক্সটাইল নিয়ে গিয়ে ইউরোপের বন্দরে বিক্রি করত। নানা কারণে সেটা হয়নি। এই অবস্থায় ইউরোপের বণিকদেরই বাংলার শাসকরা স্বাগত জানান। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে এবং বিরোধ হলেই ভয় দেখিয়েছে, ভারত ছেড়ে চলে যাবে। ওদের অন্যায় দেখলেও সরকার অল্প শাস্তি দিতেন, সরকার চাইতেন না যে ওরা চলে যাক।

পলাশিতে ব্রিটিশরা এত ক্ষুদ্র শক্তি হয়েও যে জিতল তার এক বড় কারণ বাণিজ্য। সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি বাণিজ্য করতে এবং লাভ করতে চেয়েছে, কিন্তু ওদের স্পষ্ট ধারণা ছিল, ভূখণ্ডের ওপর সামরিক অথবা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে লাভ করা

যাবে না বা বাজার দখল করা যাবে না। ওদের "ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য" পোর্তুগিজ এবং ডাচদের মতোই ব্রিটিশরাও, উপকূলের আফ্রিকা হোক বা মশলা দ্বীপ হোক, দুর্গ গড়তে এবং সৈন্য রাখতে চেয়েছে। বহু ক্ষেত্রে, ভারত এবং অন্যত্র, ওরা অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কোনও না কোনও ভারতীয় রাজার বা যুবরাজের পক্ষ নিয়ে, প্রক্সি যুদ্ধ করেছে, যাতে সেই বাজার ওরা দখল করতে পারে।

এইসব ক্ষেত্রে যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি প্রতিযোগীদের হটিয়ে দেওয়া। কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে ওরা ভালো যোদ্ধা হিসেবে খুব নাম করল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ, বেইলির ভাষায়, সর্বভারতীয় সামরিক বাজারে নিজেদের নিয়োজিত করল (বেইলি, সি.এ., ১৯৮৮ : ৪৮)। এই সামরিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল বাণিজ্যিক কারণে। ডাচেরা অ্যাম্বিয়নে ব্রিটিশদের হারিয়ে দিল, তার আগে পোর্তুগিজদের, যাতে ইন্দোনেশিযার বাজারে ওদের একচেটিয়া সম্পদ ব্যবহার সম্ভবপর হয়।

ইউরোপীয়রা জানত যে, এটা সামরিকভাবে সম্ভব। স্প্যানিশরা মেক্সিকো দখল করে ১৫১৯ সালে, হার্নান কর্টেজের নেতৃত্বে মাত্র ৬০০ লোক নিয়ে, যদিও অ্যাজটেক সৈন্যবাহিনী ছিল অনেক বড়। ১৫৩০ সালে ফ্রান্সিসকো পিজারো মাত্র ২০০ মানুষ নিয়ে পেরু দখল করেন। পোর্তুগিজরা ১৫০০ সালে পেড্রো আলভারেস কাবরালের নেতৃত্বে ওখানকার সীমাহীন সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে, খুব সহজেই ব্রাজিল জিতে নেয় অল্প লোক নিয়ে। ব্রাজিল ভারতের মতো কোনও প্রাক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, কোম্পানিগুলো তাদের সরকারের কূটনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য পুরোপুরি পায়। বহু ক্ষেত্রে পোপও সাহায্য করেন, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায়। ব্রিটিশরাও একচেটিয়া বাণিজ্যের জন্য যুদ্ধ করেছে এবং ইউরোপীয ও স্থানীয় শাসকদের হারিয়েছে।

১৬৮৭ সালে এটা কাজ করেনি মোগল সাম্রাজ্য তখন মধ্য গগনে এবং বাংলায় ব্রিটিশদের দুর্গ বা অন্য সামরিক ব্যবস্থা ছিল না, যাকে ভিত্তি করে ওরা সমরোদ্যোগ নিতে পারে। ১৭৫৭ সালে, সাত দশক পরে, এটা সম্ভব হল নানা কারণে। ততক্ষণে মোগল সাম্রাজ্য প্রায় অস্তমিত, নাদির শাহ্ ও আহমদ শাহ্ আবদালীর মতো আক্রমণকারীরা বাইরে থেকে এবং মারাঠারা ভিতর থেকে ওদের ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। বাংলার সঙ্গে দিল্লির যে নাড়ির সম্পর্ক ছিল, সেটাও আর ততদিনে বজায় থাকেনি। আলিবর্দী খান একজন স্বাধীন শাসকের মতোই দিল্লিকে রাজস্ব দেওযা বন্ধ করলেন (বোল্টস, উইলিয়াম, ১৭৭২ : খণ্ড ১, ৫)। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাংলার নবাবেব যখন নিজের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হল, তখন সম্রাট বা অন্য কোনও শাসক তাকে সাহায্য করলেন না। বারবার মারাঠাদের আক্রমণ ওদের দুর্বল করে ফেলল এবং অন্য কারণের মধ্যে, ব্রিটিশ টেক্সটাইল বাণিজ্য খুব বাড়ল।

১৬৮৭ সালে ইংরেজদের একজন জমিদারই ছিলেন বন্ধু, ১৭৫৭ সালে অবস্থা পাল্টে গেল-প্রায় সবাই ওদের পক্ষ নিল। সাত দশকের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটল, বহু মানুষ ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেললেন। ওরা অবশ্যই ভুল করলেন। কেন না ব্রিটিশরা ক্ষমতা পেয়ে প্রথমেই ভারতবর্ষের শিল্প সম্ভাবনা ধ্বংস করলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের সবাইকে এক এক করে, আইনের পথে হোক বা বে-আইনিভাবে

হোক, সরিয়ে দিলেন। এটা অবশ্য আসল কথা নয়, মূল কথা হল যে, ১৭৫৭ সালের প্রথমার্ধে ভারতের পুঁজিপতিরা বা অন্যরা নিজেদের স্বার্থকে এবং ব্রিটিশ স্বার্থকে এক করে দেখেছিলেন।

পলাশির যুদ্ধের অন্যান্য ব্যাখ্যা

অনেক সময় পলাশির যুদ্ধের ক্লাইভের জয়লাভকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই অংশে আমরা সেই বক্তব্যগুলোর কিছু পর্যালোচনা করছি।

নবাবের চরিত্র

কেউ কেউ বলেন, নবাবের চরিত্র ছিল ক্লাইভের জয়লাভের এক বড় কারণ। এই ধরনের আলোচনা সাধারণত এ ধরনের গ্রন্থে থাকে না। পলাশির মতো একটা বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, কোনও ব্যক্তির চারিত্রিক কারণে ঘটতে পারে না। কেন সবাই তরুণ নবাবকে ছেড়ে অন্য পক্ষে গেল, তার ব্যাখ্যার জন্য নবাবের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব বিচার্য হতে পারে না। নবাবের চরিত্রের জন্য, খুব বেশি হলে বলব যে, ঘটনার গতির বিন্যাস পাল্টেছে, এর বেশি নয়। যেহেতু নবাবের পক্ষে-বিপক্ষে, বহু ঐতিহাসিক অথবা সাম্রাজ্যবাদী বা দেশপ্রেমিক মানুষ কথা বলেছেন, তাই চরিত্রগত আলোচনা আমরা পুরোপুরি বাদ দিতে পারি না।

হিল নবাবের আত্মগরিমা ও লিপ্সার কথা উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন কীভাবে ইংরেজরা ওর সঙ্গে ব্যবহার করেছিল। যেভাবেই হোক, ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল যে, পুরনো নবাবের নাতি এই সিরাজ কখনই নবাব হবে না, তাই ওদের কারখানায় সিরাজকে ঢুকতে দেয়নি। সিরাজ নবাব হবার পর, সাধারণত সামন্ত রাজারা যা উপহার পেয়ে থাকেন ইংরেজরা তাকে তা দেয়নি (হিল, স্যামুয়েল.সি, ১৯০৫, প্রথম খণ্ড : ৫৩ ভূমিকায়)।

সম্ভবত দুপক্ষই কিছু সত্যি কথা বলেছেন। জাঁ ল, যিনি কাশিমবাজারের ফরাসি কারখানার প্রধান ছিলেন, পলাশির যুদ্ধে সিরাজের সমর্থনে মার্চ করে যান, অবশ্য তার যাবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, তার আত্মজীবনীতে সিরাজ সম্বন্ধে যা বলেন, অন্তত কিছু সত্য তার মধ্যে আছে। এমনকী, তিনিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, "এই আত্মবিভোর যুবকের সরকারি প্রশাসন চালাবার মতো কোনও প্রতিভা নেই, যদিও অন্যরা তাকে ভয় পায়।" তিনি আরও বলেন যে, সিরাজ মাঝেমাঝে উদার হলেও তার প্রবণতা হিংস্র এবং লোভী হওয়ার দিকে। এই মন্তব্য, যা সিরাজের এক বন্ধুস্থানীয়র কাছ থেকেই এসেছে, কোনও ঐতিহাসিকেরই পাঠকের কাছ থেকে গোপন করা উচিত নয়, যাতে পাঠক নিজেই সব দিক ভেবে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে পারে (হিল, স্যামুয়েল. সি., ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ১৭৩)।

জাঁ লয়ের মন্তব্য এখানেই শেষ হয় না। তিনি আরও বলেন, "উত্তরাধিকারী ছিল সিরাজদৌল্লা বলে একজন সাধারণ চেহারার ২৪-২৫ বছরের যুবক। আলিবর্দী খানের মৃত্যুর আগেই তার চরিত্র সম্পর্কে আমরা কিছু আভাস পেয়েছিলাম। আসলে তিনি ছিলেন বিকৃত রুচির একজন হিংস্র মানুষ। হিন্দু মেয়েরা গঙ্গায় স্নান করত। সিরাজদৌল্লা

ওদের মধ্যে সুন্দরী কাউকে দেখলে বা গুপ্তচরের মুখে শুনলে, তাদের ছোট নৌকায় তুলে পালাবার চেষ্টা করতেন। নদীতে যখন প্রচুর জল, ফেরি নৌকা উল্টে দিয়ে সাঁতার না জানা শিশু, মহিলা ও পুরুষদের চিৎকার শুনতে ভালোবাসতেন। আলিবর্দী খান যদি কাউকে সরিয়ে দিতে চাইতেন, সিরাজকে ডাকতেন এবং নিজে সেই বাড়ি বা বাগান বা শহর থেকে পালিয়ে যেতেন যাতে আর্তচিৎকার তাকে শুনতে না হয়। প্রত্যেকে সিরাজদৌল্লার ভয়ে কাঁপত। কেউ কেউ ভাবত যে, তিনি নবাব হলে বেশি সংবেদনশীল হবেন। কলকাতা দখলের সময়কার ভয়ঙ্কর দৃশ্য মনে করলে আমরা বুঝি নবাব হয়ে তিনি কি করেছেন" (হিল, স্যামুয়েল.সি., ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ১৬২)।

সিরাজের পক্ষে বলা যায় যে, জাঁ লয়ের মন্তব্য, যা অন্যদের থেকে শোনা, ঠিক না হতেও পারে। নবাবের বন্ধু এবং ব্রিটিশ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও জাঁ ল একজন ইউরোপীয় বর্ণ বিদ্বেষীও ছিলেন। চৌধুরীর যুক্তি হল যে, আগে যা ব্যবহারই তিনি করুন, নবাব হবার পর পাল্টে গয়েছিলেন। যখন ইংরেজদের কাশিমবাজার কারখানা দখল করলেন, তখন ওই কারখানার কোনও কিছু ছোঁননি এবং টাকা চাননি। তিনি হলওয়েলের তথাকথিত "ব্ল্যাক হোল"-এর ব্যাপারে দায়ী ছিলেন না এবং বিনা শর্তে হলওয়েলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বরং ব্ল্যাক হোলের ঘটনার জন্য দায়ী রাজা মানিকচাঁদকে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিলেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং তার কথা অনুযায়ী মদ ছেড়েছিলেন। হয়তো অল্প বয়সে মেয়েদের পিছনে লাগতেন, কিন্তু নবাব হবার পরে নয়। গর্ববোধ নিশ্চয়ই তার ছিল, কিন্তু ইংরেজদের প্রতি কোনও বিদ্বেষের ভাব ছিল না। অবশ্যই রাজা হিসেবে তার দায়িত্ববোধ ছিল (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭ এ : ৯৩-৯৯, ১০২)।

বরং বলা যায় যে, ইংরেজদের ব্যবহারই ভালো ছিল না। ওরা সাধারণত খারাপ ব্যবহার করত, যেটা রাষ্ট্রের প্রধানের প্রতি করা উচিত নয় (হিল, স্যামুয়েল সি, ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ১৫৪, ১৬৫)। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ড্রেকের চিঠিপত্র যে কোনও রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষে ছিল অপমানকর এবং আত্মসম্মানহানিকর (হিল, স্যামুয়েল সি, ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ১৫৪, ১৫৫)। সিরাজকে যদি তার চরিত্র এবং মনোভাবের জন্য দায়ী করতে হয় তাহলে ড্রেকের ব্যবহারও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।

নবাবের সঙ্গে বিরোধ

নবাবের ব্যক্তিগত চরিত্রের থেকেও বড় কথা হল যে, কোম্পানির বিরুদ্ধে তার অভিযোগগুলো সঠিক ছিল কি না। আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী, ও দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রয়াসী খোজা ওয়াজিদকে ১লা জুন, ১৭৫৬ সালে, সিরাজ নিজেই যে তিনটি ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ তা নিয়ে লিখেছেন :

"আমি তিন কারণে ইংরেজদের দেশ থেকে বের করে দিতে চাই। এক, নিয়ম ভেঙে তারা দুর্গ করেছে এবং দুর্গের চারপাশে খাল কেটেছে। দুই, নবাবের দেওয়া দস্তক ঠিক মতো ব্যবহার করেনি, যার ফলে নবাবের রাজস্ব যা হতে পারত তার থেকে

কম হয়েছে। তিন, ওরা নবাবের কিছু প্রজাকে আশ্রয় ও প্রতিরক্ষা দিয়েছে। নবাব ওদের হিসেব দিতে বলেছিলেন এবং তার সামনে হাজির হতে বলেছিলেন যাতে আইন এড়িয়ে ওরা পালিয়ে না যেতে পারে। ওরা যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এইসব অভিযোগের প্রতিকার করবে এবং নবাব জাফর খানের সময় যেমন বাণিজ্য করত তেমনি নিয়ম মেনে চলবে, তাহলে আমি ওদের ক্ষমা করব এবং এখানে থাকতে দেবো। না মানলে, ওদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে" (হিল, স্যামুয়েল, সি, ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ৪)।

মূল প্রশ্ন ছিল কোম্পানির কেল্লা বানানো নিয়ে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কেন কোম্পানির বেতনভুক কর্মীরা নবাবের দস্তক ব্যবহার করবে এবং কোনও টাকা দেবে না (এডওয়ার্ডস, মাইকেল, ১৯৬৩ : ২৩; চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩৩)।[৪] এই বিরোধ নবাবের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরায়। এমনকী পলাশির যুদ্ধের পরেও সমতা আনতে নবাব মীরকাশিম, যিনি ইংরেজদের সমর্থন নিয়ে মীরজাফরের বদলে নবাব হন, সমস্ত আভ্যন্তরীণ কর তুলে নিলেন যাতে দুই পক্ষই সমান হয়। এর ফলে নবাব মীরকাশিমকে সরিয়ে দেওয়া হয় (মুখার্জি, রামকৃষ্ণ, ১৯৫৮ : ১৭৯)। এই দ্বন্দ্বের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যে, কেন রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণ দাস ৫৩ লক্ষ টাকা চুরি করে ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় পায়।

সিরাজ ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নবাব হিসাবে সফল ছিলেন কি না, এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা একমত নন। কিন্তু উনি যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন সেইগুলো নিয়ে দ্বিমত ছিল না। একজন আত্মসম্মানী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সিরাজ এই প্রশ্নগুলো তুলেছিলেন। একজন সন্দেহজনক অপরাধীকে তার হাতে দেওয়ার দাবি করার মধ্যে কোনও ভুল নেই। সকলে জানত যে, ইংরেজরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের দস্তক ব্যবহার করতে দেয় এবং আইন লঙ্ঘন করে ১৭৫৪ সাল থেকে দুর্গ বানাতে শুরু করে। হিলও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই তিনটি অভিযোগের পিছনে কারণ ছিল। হিল অবশ্য এটাও বলেছেন যে, তার কোনও হিংসাত্মক কাজ করা সঠিক হয়নি (হিল, স্যামুয়েল সি, ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ১৫৪; প্রথম খণ্ড ৫৪, ৫৫)।

ইংরেজরা নায়ক হতে চেয়েছিলেন কি?

পলাশি কি হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা, যার জন্য ব্রিটিশরা প্রস্তুত ছিলেন না, না ইংরেজরা ভূখণ্ড দখল করবার কথা সবসময় ভাবতেন? ভারতের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য কি হঠাৎই ওদের হাতে এল? মার্শালের মতে, এই ব্যাপারে ব্রিটিদের হস্তক্ষেপ যেন কিছুটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩০৭)। ১৬৮৭ সালের দ্বন্দ্বের যে বিবরণ আমরা ওপরে দিয়েছি, তার থেকে প্রমাণ হয় যে, ব্রিটিশরা এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই দ্বন্দ্বকে, মার্শালের মতো, আমরা বলতে পারি না যে, "স্থানীয় উদ্যোগে" ঘটেছিল এবং লন্ডনের অফিস বা ব্রিটিশ সরকার কোনও রকম উৎসাহ দেননি। এটা আশ্চর্যের, সুশীল চৌধুরীর মতো একজন দেশপ্রেমী ঐতিহাসিক বলেছেন যে, পলাশির যুদ্ধ ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ অফিসাররা তাদের নিজেদের উদ্যোগেই ঘটিয়েছেন এবং এই ব্যাপারে তারা সুযোগ নিয়েছেন যে, লন্ডনে খবর যেতে প্রায় ছয় মাস লাগবে (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭ এ : ১১৮)।

ব্রিটিশরা ভারতে আসার পরেই, যেটা আমরা আগে দেখেছি, ওদের মনে ভারত দখল করবার স্বপ্ন জাগে। এছাড়া ওদের মনে কালো চামড়ার মানুষের প্রতি একটা অসম্মানের ভাব ছিল। ওরা ভাবত যে, কালো চামড়ার মানুষ পিছিয়ে পড়া। আমরা দেখেছি যে, পোর্তুগিজরা, ব্রাজিলের অভিজ্ঞতাও তাই, দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে শিকারী বাহিনী পাঠাত, এবং উপকূলবর্তী মানুষ, তাদের ঘরের নারী ও সন্তানদের সমস্ত পৃথিবীর বাজারে বিক্রি করত। পোর্তুগিজরা পশ্চিম ভারতে সাম্রাজ্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। অবশ্য, গোয়া এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল ওরা দখল করে (গ্রে, এডওয়ার্ড, ১৮৯২ : ১০-১২)। উপকূলের কিছু দ্বীপ বাদ দিয়ে, পূর্ব ভারতে পোর্তুগিজরা উপনিবেশ বানাতে পারেনি, কিন্তু যোদ্ধা হিসাবে ওরা খুব নাম করে এবং বহু বিবদমান যুবরাজ ও শাসক বাংলার সর্বত্র ওদের সাহায্য নেন (ক্যাম্পোজ, জে.জে.এ., ১৯১৯ : ৩৯-৪২)। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল, জোসিয়া চাইল্ডের ১৬৮৭ সালের সাম্রাজ্যবাদী মন্তব্য, লাতিন আমেরিকায় স্প্যানিশ এবং পোর্তুগিজ অভিজ্ঞতা থেকে এই যে, একটি সুশৃঙ্খল ছোট বাহিনীও তার থেকে অনেক বড় কিন্তু প্রশিক্ষণ পায়নি এমন বাহিনীকে হারাতে পারে।

পলাশির যুদ্ধের আগে ওরা জানত না যে ওরা জিতবে, এমনটা বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে "বিপ্লবের সম্ভাবনা", একটু একটু করে ওদের মাথায় আসে (মার্শাল, পি.জে., ১৯৮৭ : ৯১)। বেইলিও একই ধরনের মন্তব্য করেন; "ক্লাইভের যুগে হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা বিপ্লব"। কিন্তু ক্লাইভ যখন মাদ্রাজ থেকে ফলতা আসেন তখনকার বিবৃতিগুলো একথা বলে না। ক্লাইভ একটি ঔপনিবেশিক উত্তরণ চেয়েছিলেন, জানতেন যে সেটা করা সম্ভব।

১৭৪৬ সালে, মানে পলাশির প্রায় ১১ বছর আগে, জেমস্ মিল নামে একজন ইংরেজ যুদ্ধবাজ, জার্মান সম্রাটকে এই ধরনের একটি অভিযান সংগঠিত করতে বলেন; "১৫০০, খুব বেশি হলে ২০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং তাদের খাবার নিয়ে এই অভিযান করা যায়"। যদিও, যে সংখ্যা তিনি বলেন তা খুবই অবাক হবার মতো, কিন্তু ক্লাইভের বিজয়ী সৈন্য এত কমই ছিল (বোল্টস্, উইলিয়াম, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট এ : ১৭)। তার হিসেবের ভিত্তি ছিল তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা ; "হিন্দুস্থানের পুরো দেশ এবং মহান মোগলদের শাসন, এখন দুর্বল ও প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়েছে। এটা আশ্চর্যের যে, ইউরোপের কোনও শাসক, তাদের নৌশক্তি বিচার করে, ভাবেননি যে এক ধাক্কাতেই মোগল শাসককে পরাজিত করে ওই দেশ দখল করা সম্ভব। দখল করলে ওই দেশের অপর্যাপ্ত সম্পদ ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়, যা ব্রাজিল বা পেরুর খনি অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি।"

"মোগল দরবারের অবস্থা এখন খুব খারাপ। ওদের সামরিক অবস্থা আরও খারাপ। নৌশক্তি নেই বললেই চলে, যা দিয়ে ওরা উপকূল রক্ষা করবে। তার ফলে ওই সাম্রাজ্য, যত বড়ই হোক, একটার পর একটা বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দেশের বন্দর এবং নদীগুলো যে কোনও বিদেশি শক্তি ব্যবহার এবং দখল করতে পারে। যেভাবে স্প্যানিশরা আমেরিকার নগ্ন ভারতীয়দের পরাজিত করেছে" (বোল্টস্, উইলিয়াম, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট এ : ১৬-১৭)।

এমনকি জাঁ ল, সিরাজের ফরাসি বন্ধু, তিনিও বলেছেন যে, সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি যদি একত্র হয় তাহলে তিনশো বা চারশো ইউরোপিয়ান, সঙ্গে কিছু সিপাই, একজন নতুন নবাবকে মসনদে বসাতে পারে। অবশ্য অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল, তিনি এমন একজন নতুন নবাব চেয়েছেন যিনি ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি বলেন যে, "প্রত্যেকেই একটা পরিবর্তন চাইছে" (হিল, স্যামুয়েল সি, ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ১৭৩)।

এটা শোনা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল স্কটের বাংলা দখলের একটা পরিকল্পনা ১৭৫৪ সাল থেকেই ছিল (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭ এ : ১১৬)। একজন মন্তব্য করেন, "কখনও একটা ষড়যন্ত্র এমনভাবে সকলের সামনে আলোচিত হয়নি। ইউরোপীয়ানরা যেমন, তেমনই মুসলমানরাও এই ষড়যন্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেছে"। তিনি যোগ করেন, তা সত্ত্বেও নবাব এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন না। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের থেকে তিনি কতটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন এটা তারই প্রমাণ (হিল, স্যামুয়েল সি, ১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড : ২৫১)

বেসরকারি ব্যবসায়ীরা কি দায়ী ছিল?

এই বক্তব্য এমন একজন ঐতিহাসিকের, যিনি, অন্যদের থেকে অনেক বেশি লিখেছেন পলাশিব যুদ্ধ নিয়ে। এই বক্তব্য তিনি ঠাট্টা করে লেখেননি বরং গুরুত্ব দিয়েই বলেছেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা। ১৭৫৪ সালে যে কুড়িটি ইংরেজ নৌকো কলকাতায় পৌঁছেছিল তার মধ্যে আটটিই ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের যারা ৫০২০ টন মাল বহন করত। ডঃ সুশীল চৌধুরীর মতে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরাই নাকি পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন, কিন্তু তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণ দেখাননি। সিরাজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের বন্ধু ছিলেন না, তার পূর্বজরাও ছিলেন না। যদি অতীতে কোনো ষড়যন্ত্র না হয়ে থাকে তবে এখন কেন হবে? এই ব্যাপারে ডঃ সুশীল চৌধুরী কোনও মতামত দেননি (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭এ : ১১৭-১১৮)।

একইভাবে সুশীল চৌধুরী সামরিক বাহিনীর কিছু অফিসারের কথা বলেছেন, ক্ষমতায় এসে সিরাজ যাদের কোণঠাসা করেন এবং মীরমদন, মোহনলাল এবং খোজা আবদুল হাজিদের সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে কোনও সাক্ষ্য বা প্রমাণ তিনি হাজির করেননি (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭এ : ১২৪)। তাঁর বহু লেখায় চৌধুরী বলেছেন যে, বাংলা ছিল মোগলদের কাছে স্বর্গ বিশেষ। কিন্তু কেন তাদের সমর্থকরা পালিয়ে গেল, সেকথা তিনি বলেননি।[৫]

হিন্দুরা কি দায়ী ছিল?

হিলের বক্তব্য, হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ এই মুসলমান সরকারের পতনের এবং যুদ্ধের একটা বড় কারণ। বহু শতাব্দী ধরে মুসলমান শাসন চলার পর হিন্দুরা চেয়েছিলেন এমন কাউকে যারা এই অবস্থা থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে পারবে ইউরোপিয়ানরা। সেই ভূমিকা পালন করেছেন (হল স্যামুয়েল, ১৯০৫, প্রথম খণ্ড : ৫২)। ব্রিজেন কে গুপ্ত

এমনকী, এও বলেছেন যে, পলাশি যুদ্ধের আগে হিন্দুদের মধ্যে আগের যুগে ফিরে যাওয়ার পক্ষে একটা জনমত তৈরি হয়, ইংরেজরা তার সুযোগ নেয় (গুপ্ত, ব্রিজেন কুমার, ১৯৬৬ : ৩০)। করিমের বক্তব্য, হিন্দুদের মধ্যে একটা অভিজাত সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল যারা সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে (করিম, কে এম, ১৯৯৭এ : ৬৯)

এই কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বহু হিন্দুর মধ্যে এই ধরনের মনোভাব ছিল, কিন্তু সিরাজকে হিন্দু-বিরোধী এই অপবাদ দেওয়া যাবে না। সিরাজের চারপাশে যারা ছিলেন তাদের সাত জনের মধ্যে একজনই ছিলেন মুসলমান, তিনি মীরজাফর, বক্সী (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭এ : ১২৪)। এছাড়া ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই ছিলেন—যেমন জগৎ শেঠ এবং উমিচাঁদ ছিলেন তেমনি মীরজাফর, লতিফ এবং অন্য সেনাপতি ও জমিদাররাও ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা এদের সমর্থন ছাড়া জিততে পারত না এবং পলাশির যুদ্ধে সবচেয়ে উপকৃত হন মীরজাফর, যিনি ধর্মে মুসলমান।

ভারতের বণিকদের নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কোনও কারণ ছিল না

আলোচনার এই অংশটায় চৌধুরীর যুক্তি বোঝা শক্ত। তিনি বলছেন কাজের কোনও অংশে ভারতের বণিকদের এবং ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ এক হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই অংশটা খুবই ছোট। ঢাকায় তাদের বাণিজ্যিক জীবনে ইউরোপীয় বাণিজ্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল, অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক স্বার্থ এক জায়গায় খুব বেশি মেলেনি। তাদের অধিকাংশ অর্থ এসেছে অন্য সূত্র থেকে। আমরা অন্যত্র আলোচনা করে দেখেছি যে, ইউরোপীয় বাণিজ্য সম্পর্কেও এই যুক্তি সঠিক নয়। যদি সত্যি হত তাহলে কেন তারা ওই বিশেষ সময়ে ইংরেজদের সমর্থন করল (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭এ : ১১৯-১২০)।

এই ষড়যন্ত্র কি ইংরেজদের ঔপনিবেশিকবাদেরই একটি অংশ না ভারতের আভ্যন্তরীণ সংকট প্রসূত।

চৌধুরীর লেখায় একটা ঝোঁক আছে, ইংরেজদের ঔপনিবেশিকবাদের তত্ত্বের পাশাপাশি ভারতের আভ্যন্তরীণ সংকটকে তুলে ধরা এবং তারপর বলা যে প্রথমটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ষড়যন্ত্রীদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বড় নয়। তিনি ভাবেননি যে, এই দুটিই সত্য হতে পারে (চৌধুরী সুশীল, ১৯৯৫ : ৫)।

আভ্যন্তরীণ সংকটকে ছোট করে দেখাতে গিয়ে তিনি মারাঠা হানা ও উদ্বৃত্ত লুণ্ঠনকে ছোট করে দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এই ব্যাপারে যত অর্থ সংগৃহীত হত তা মুরশিদ-পরবর্তী শাসক ১৯২৮ সালে নবাব সুজাউদ্দিনের অবওয়াবের থেকে কম (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ২১)।

দেশ চেতনা ছিল না

একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে, ভারতের মানুষের জাতীয় স্তরে কোনও দেশাত্মবোধ ছিল না, স্থানীয় স্তরে ছিল। আমাদের যেটা যোগ করা দরকার, যে নেশন রাষ্ট্র ও দেশ সম্বন্ধে ধারণা এমনকী, ইউরোপেও নতুন। প্রাক্-ধনতন্ত্রের যুগে তার থেকে বড় ছিল রাজা বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্র গড়ে ওঠার পর, এবং একটি

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা তৈরি হবার পর, রাজা এবং দেশের প্রতি আনুগত্য তৈরি হল। অবশ্য ইতালির রেনেসাঁসের সময় আমরা দেখেছি কীভাবে একটা শহরের প্রতি আনুগত্য গড়ে উঠতে পারে।

বাংলায় কখনও কেন্দ্রীভূত শাসন ছিল না। এমনকী, পাল বা সেনেরা, আজকে যাকে আমরা বাংলা বলি, তার মাত্র এক অংশে রাজত্ব করতেন। তাদের রাজ্যের এক বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, প্রায় স্বাধীনভাবে, কিছু জাতি ও সম্প্রদায়। ১২০৪ সালে শাসক তুর্কি-আফগানরা ভূখণ্ডের এক বড় অংশ অন্যদের দিয়ে শাসন করত, আমরা তা জানি।[৬]

মোগলরা চেষ্টা করেছিল জাতীয় স্তরে একটা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং সেই জন্য ওরা এই শাসনের মাথায় চাপিয়ে ছিল একটি অভিজাত, বদলি করা যায় এমন আমলা বাহিনী, বাংলায় আকবরের সেনাপতিরা, আনুগত্য বা রাজস্ব সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন না থাকলে, সামন্ত রাজাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতেন (রায়চৌধুরী, তপন কুমার, ১৯৫৩)। সাধারণ মানুষ ওদের প্রত্যক্ষ শাসকদের কথাই ভাবত এবং বহুদূরে গৌড়, বা ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে কী ঘটছে তাই নিয়ে মাথা ঘামাত না (পিরেস, ৮৯)। যুদ্ধ হত, রাজারা আসতেন যেতেন, বংশ টিকত বা হারত, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার, ওপর কোনও রেখাপাত করত না।

প্রাসাদ অভ্যুত্থান প্রায়ই ঘটত। যে শাসককে হত্যা করতে পারত সে-ই শাসক হয়ে যেত। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসও ঘটত।[৭] যেমন, হিন্দু রাজা গণেশ মারা গেলেন স্বাভাবিক কারণে, তখন বাংলার শাসকদের ক্ষেত্রে তা অস্বাভাবিক ছিল। গণেশ তাঁর ছেলে যদুকে উত্তরাধিকারী করে যেতে পারলেন, কী অবস্থায় আমরা জানি না। একজন হিন্দু শাসক কী করে পরাক্রান্ত মুসলমান অভিজাতদের শাসন করলেন, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। কম আশ্চর্যের নয় যে, ইথিওপিয়া থেকে আনা হাবসী ক্রীতদাসরা সাত বছর শাসন করল। রাজপুতানার ঘটনার মতো এখানে আমরা খুব বেশি সাহসী প্রতিরোধের কথা শুনিনা। শুধুমাত্র বারোভূঁইয়াদের কথা শুনি—যেমন প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁন বা কেদার রায়—যারা মোগলদের প্রতিরোধ করেছিলেন (রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯৮ : ষষ্ঠ অধ্যায়)।

পলাশির যুদ্ধ শুধুমাত্র ক্লাইভ এবং সিরাজদৌল্লার দ্বন্দ্ব নয়, ইংরেজ বা ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে বাঙালি বা ভারতীয়দের যুদ্ধের বিবরণ নয়, বলতে গেলে দুটি যুগের বা দুটি উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব—ক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্র এবং নবীন ও গতিশীল ধনতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। যারা ইংল্যান্ড থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিল তারা খুব ভালো ছাত্র ছিল না। ভালো ছাত্ররা ওখানে প্রচুর চাকরি পেত, যারা পেত না তাদের একটা অংশ ভারতে আসত (মার্শাল, পি.জে., ১৯৭৬ : ১৭-২০)। ওদের মধ্যে অনেকে ডানপিটে প্রকৃতির ছিলেন, অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসতেন। তাছাড়া ওরা এমন একটা সমাজ থেকে ভারতে আসে, যে সমাজ ১০০ বছর কি তারও বেশি এগিয়ে এবং ইতালির রেনেসাঁসের অভিজ্ঞতাবলে সমৃদ্ধ। ইউরোপীয় সমাজ ভারতের থেকে ঠিক সেই মুহূর্তে বেশ কিছুটা এগিয়েছিল।

লর্ড ক্লাইভ তাঁর চরিত্র দিয়ে ভারত ও ইউরোপীয় সমাজের পার্থক্য টেনে দিয়েছিলেন। স্কুলে ছাত্র ভালো নয় এবং অল্প বয়সে নানা ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন

লর্ড ক্লাইভ। তিনি ছিলেন একজন বদমাস ও সাহসী সামরিক নেতার সংমিশ্রণ, একজন লোভী ও অসাধু লোক যার সাহসের কোনও পরিসীমাই ছিল না। পলাশির যুদ্ধের আগে দাক্ষিণাত্যে ফরাসিদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো যুদ্ধে জিতেছিলেন, পরবর্তীকালে দেশের উত্তরাংশেও তিনি একটার পর একটা যুদ্ধ জেতেন, যাব মধ্যে ছিল মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে এক অভিযান (হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৯০৩ : ১৭৮-১৭৯; বেইলি, সি.এ., ১৯৮৮ : ৪৫)।

১৬৯০—১৭৭৫—পলাশির যুদ্ধ

পলাশির যুদ্ধ নিয়ে এত লেখা হয়েছে যে, ওই যুদ্ধের রূপরেখা সকলেরই জানা, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এই সময়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বাণিজ্যিক প্রসার ও কলকাতায় কেল্লা তৈরি করা

এই ঘটনাব আগে প্রায় পাঁচ দশকে কোনও বড় সংঘর্ষ হয়নি। শোভা সিংহের ঘটনা কলকাতায় কেল্লা তৈরি করতে সাহায্য করল। যে কেল্লা ছিল তাকে কেন্দ্র করেই শহর গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেই কেল্লা কতটা মজবুত সেই নিয়ে প্রশ্ন ছিল। অরম এই নিয়ে লেখেন, "নদী, দুটো জায়গায় যোগ হয়ে ক্রেসেন্ট সৃষ্টি করেছে; তার একটা পেরিনের বাগান, আর একটা সুরম্যানের বাগান, এই দুটোর মধ্যে দূবত্ব প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এই ক্রেসেন্টের গভীরতম অংশে, দুই জায়গার মাঝখানে, রয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম, যা, ইংল্যান্ডের বহু পুরনো বাড়ির চেয়ে কম মজবুত"। ব্রিটিশ বাণিজ্য বাড়ল, ১৭৪০ সালে ডাচদের ছাড়িয়ে গেল। বাণিজ্য যত বাড়ল শহর বাড়ল, সুন্দর এবং বিত্তবান হল। চুম্বকের মতো বহু মানুষকে এই শহর কাছে টানল। শহরে প্রথম থেকেই সাদা এবং কালো অঞ্চলের মধ্যে ভাগ ছিল। ইউরোপীয়ানরা জাঁকজমক করে বেশ ভালোভাবেই নিজেদের অংশে বড়বড় বাড়িতে থাকত, বাড়ির চারপাশ ছিল বাগান ঘেরা।

১৬৮৭ সালে, মেদিনীপুরে সংঘর্ষ যখন হয় তখন ব্রিটিশদের একজন মাত্র বন্ধু ছিল। যত গ্রামীণ সমাজে বাণিজ্য ঢুকল, তত, এক বড় অংশ ব্যবসাদার, দালাল, ফোড়ে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক বৃত্তে ঢুকে পড়ে ওদের বন্ধু হয়ে গেল। অবশ্যই ভাষা একটা মস্ত বড় বাধা ছিল, ব্রিটিশদের ভারতীয় কায়দায় কাজ করাটা বুঝতেও সময় লাগল। সমস্ত ইউরোপিয়ান কোম্পানি তখন কাজ করত একজন মুখ্য এজেন্টের মাধ্যমে। ১৭৪১ সালে চেষ্টা হল কোনও মুখ্য এজেন্ট না রেখে সরাসরি গোমস্তাদের সঙ্গে কাজ করবার, তাদের দাদন দেবার এবং তাদের কাছ থেকে জিনিস সংগ্রহ করবার।

ব্রিটিশ এবং অন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসাদার ও সুদখোরদের সম্পর্কটা যে সবসময় সাধু ছিল এমন নয়। অনেক সময়ই ওদের মধ্যে ঝগড়া হত, অবিশ্বাস গড়ে উঠত এবং উত্তাপ বাড়ত। কিন্তু দুপক্ষই জানত যে, একজনকে ছেড়ে আর-একজনের চলবে না। এই কথাটা স্পষ্ট করে সকলেরই জানা ছিল। যারা গ্রামের উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, শহরে মাল কিনত এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের হাতে জিনিসগুলো পৌঁছে দিত, তারা সবাই জানত। তারা জানত যে ওদের জীবিকার

সঙ্গে ব্রিটিশ উপস্থিতির একটা সম্পর্ক আছে। এছাড়া বড় ব্যবসাদাররা, যেমন, উমিচাঁদ বা আর্মেনিয়ান খাজা ওয়াজিদ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাবের কোনও ঝগড়া হলে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করত।

নবাবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যে নবাবের সম্পর্ক ভালো ছিল তার দুটো কারণ ছিল। প্রথম কারণ, নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সম্রাটের দেওয়া সনদের ব্যবহার পছন্দ করেননি। কোম্পানির ধারণা ছিল যে এই সনদের ফলে আর অতিরিক্ত কোনও মাশুল না দিয়েই ওরা বাণিজ্য করতে পারে। নবাবের মতামত ছিল যে, শুধু বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বিনা মাশুলে বাণিজ্য করবার অধিকার ওদের রয়েছে। কিন্তু দেশের মধ্যে বাণিজ্য করলে ওদের অতিরিক্ত মাশুল দিতে হবে। দ্বিতীয়ত নবাব মানতে রাজি ছিলেন না যে, এই সনদ দেখিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাও মাশুল না দিয়ে চালাবেন।

কিছু কিছু দ্বন্দ্ব ছিল ছোট মাত্রার। ১৭২৩ সালে এবং আবার ১৭২৭ সালে কোম্পানি গোঁয়ার্তুমি করে হুগলি নদী অবরোধ করল যেহেতু নবাবের সঙ্গে ভাগলপুরে সোরার বাণিজ্য নিয়ে কিছু মতানৈক্য ছিল। পরে আর্মেনিয়ান বণিকদের মধ্যস্থতায় সমস্যা মিটলেও বোঝা গেল যে, ইউরোপীয় বণিকদের ঔদ্ধত্যের কোনও সীমা নেই। ১৭৪৮ সালে এক দ্বন্দ্বের পর ইংরেজ কোম্পানি দুটো আর্মেনিয়ান জাহাজ দখল করল এবং উল্টো দিকে আলিবর্দী খানও ওদের সমস্ত গুদামে প্রহরী বসিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়ে একটা রফা করতে হল, যার মধ্যে ২০ হাজার পেল আর্মেনিয়ানরা।

মারাঠা আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র

সব মিলিয়ে, কখনও উপরে কখনও নীচে একটা সম্পর্ক ওদের ছিল। ১৭৪০-এর দশকে মারাঠা আক্রমণ বাঙালি সমাজে এবং অর্থনীতিতে, বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে, একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করল। ১৭৪১ সাল থেকে প্রতি বছরই, মারাঠাদের আক্রমণ হত। প্রতিবারই সে আক্রমণ মুর্শিদাবাদের দোরগোড়ায় পৌঁছত, প্রতিবারই কিছু টাকা নিয়েই ওরা ফেরত যেত। এই আক্রমণ ইংরেজদের আর একটা অজুহাত তৈরি করে দিল কেল্লা গড়বার। কলকাতার চারপাশে মারাঠা খাল তৈরি হল, যার উপর এখন সার্কুলার রোড তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে এই সমস্ত আক্রমণে ৪০ হাজার মানুষ খুন হল, মারাঠাদের প্রচুর টাকা দিতে হল, ফলে রাজকোষে টান পড়ল। নবাব বাধ্য হলেন ইউরোপীয় কোম্পানি এবং বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করতে। ফলত জোর করে যাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হত তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলেন নবাবের বিরুদ্ধে।

এই দুটো ব্যাপার, ভবিষ্যতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতের মুঠোয় এনে দিল। নবাব অতীতের এক অধ্যায় যিনি জোর করে টাকা আদায় করেন, এমন ধারণা তৈরি হল, এবং কয়েক বছরের মন্দা ফসল—সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম যে, যার কিছুমাত্র প্রভাব রয়েছে তিনি নবাবের শত্রু হয়ে গেলেন পলাশির যুদ্ধের

বহু আগেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলো খোলাখুলি ভারত দখল করবার কথা বলতে শুরু করল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সিরাজের বদলে আলিবর্দী খান থাকলেও এই অসন্তোষের বহ্নি সামলানো যেত না। সেনাপতি মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, আর একজন বড় সেনাপতি এবং সামন্ত রাজারা, জগৎ শেঠ এবং ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, এরা সকলেই নবাব বিরোধী চক্রান্তে যোগ দিলেন, নতুন নবাবের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকলেও তার থেকে বড় ছিল ওদের ধারণা, যে নবাবের জাহাজ ডুববে।

পলাশির যুদ্ধ

দ্বন্দ্বের প্রথম কারণ ছিল অনুমতি না নিয়ে কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির কেল্লা বানানো। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সিরাজ মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার মধ্যের ১৫০ মাইল দূরত্ব মাত্র ১১ দিনে পার হয়ে কলকাতার দখল নিলেন। তার সঙ্গে ছিল ৫০ হাজার লোক, ১৫০টি উট ও হাতি। ১৭৫৬ সালের ২৪শে জুন সিরাজদৌল্লা একদিনের যুদ্ধের শেষে কলকাতার দখল নিলেন কিন্তু ইংরেজদের পিছু তাড়া করে ফলতা অবধি গেলেন না অথবা কাছের বজবজের দুর্গকে বললেন না ইংরেজ সৈন্যদের অবশিষ্ট অংশকে নদীর ওই ভাগ থেকে সরাতে।

এর একটা কারণ হতে পারে এই যে, সিরাজ ওদের পরাজিত করতে চেয়েছিলেন, জখম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাক এটা চাননি। কোম্পানির বাণিজ্য বাংলার অর্থনীতিতে যথেষ্ট সাহায্য করত—বুলিয়ন আনত, দেশ প্রাচুর্যে ভরে উঠত এবং রাজস্ব বাড়ত। কলকাতায় তার জয়লাভের চার দিন পর, ২৮শে জুন তিনি কোম্পানির প্রধান পিগটকে একটা চিঠি লিখে বলেন যে, তার আক্রমণ কোম্পানির বিরুদ্ধে নয়, কোম্পানির কলকাতার প্রধান মিঃ ড্রেকের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রবার্ট ক্লাইভ ১৫ই ডিসেম্বর ফলতায় নামলেন মাদ্রাজ থেকে। তিনি কোনও আনুষ্ঠানিক সামরিক প্রশিক্ষণ না নিয়েই কর্নেল হয়েছিলেন। তার সঙ্গে ৫২৮ জন পদাতিক, ১০৯ জন গোলন্দাজ, ৯৪০ জন ভারতীয় সিপাই এবং ১৬০ জন লস্কর ছিল। এছাড়া ছিল ২৬৪টি কামান, এবং ১২টি মাঠে বসিয়ে দাগাবার কামান। তার সঙ্গে ছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন যার পাঁচটা জাহাজে ২০ থেকে ৬০টা কামান ছিল। ২রা জানুয়ারি ১৭৫৭ তারিখে তিনি কলকাতা দখল করলেন বিনা বাধায়। নদীর ওপারে থানার কেল্লা তার আগেই দখল হয়েছে। হুগলি কেল্লা দখল হল তারপরে। বজবজের প্রধান মানিকচাঁদ সম্ভবত নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তে শামিল ছিলেন। কেন না ছটি মাস তিনি ইংরেজদের ফলতায় থাকতে দিলেন এবং নিশ্চিন্তে সেখান থেকে চলে যেতে দিলেন। লর্ড ক্লাইভ ১১ই অক্টোবর, কলকাতা দখলের প্রাক্কালে, এক চিঠি দিয়ে লন্ডনকে বললেন, যার মর্মকথা তাঁর দৃষ্টি কলকাতার অনেক বাইরে নিবদ্ধ; "এই অভিযান কলকাতা দখল করেই শেষ হবে না। আমি চাই কোম্পানির সম্পত্তি এবং আয় সবসময়ের জন্য নিশ্চিন্ত করতে"।

তৃতীয় পর্যায়ে সিরাজ আবার এলেন কলকাতায়, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ সালে, ৪০ হাজার পদাতিক, ১৮ হাজার অশ্বারোহী, ৪০টা কামান এবং ৫০টা হাতি নিয়ে।

কিছুদিন থেকেই তিনি ফেরত গেলেন—কেন গেলেন সেটা বোঝা গেল না। এই ব্যাপারে দুটো ব্যাখ্যা আছে। ব্রিটিশ পক্ষ থেকে বলা হল যে, নবাব ভয় পেয়ে গেলেন, যেহেতু ক্লাইভ খুব ভোরে তার তাঁবুতে অতর্কিত আক্রমণ করে সকলকে হকচকিয়ে দিলেন। অন্য ব্যাখ্যা হল যে, আফগান যোদ্ধা আহ্মদ শা আবদালী ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশে আক্রমণ করেন ওই সময়ে, তাকে ঠেকাতে তিনি পশ্চিম দিকে ছুটে যান-ইংরেজদের সঙ্গে যাহোক তাহোক একটা চুক্তি করে। ব্যাখ্যা যাই হোক, ৯ই ফেব্রুয়ারি দুপক্ষে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন। ব্রিটিশদের পক্ষে এর থেকে দরাজ চুক্তি হতে পারে না। তাদের কেল্লা করবার অধিকার দেওয়া হল, রাজার সনদ মেনে যেভাবে খুশি বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হল। যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সঠিক হয় তাহলে মনে হতে পারে তিনি ব্রিটিশদের আবদালীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষ হিসাবে দেখেছেন। তিনি ইংরেজদের সামরিক সাহায্য চান এবং তার জন্য মাসে ১ লাখ টাকা করে দিতে রাজি হন।

এত দরাজ চুক্তিও ব্রিটিশদের খুশি করল না। ওরা ততদিনে রক্তের স্বাদ পেয়েছে এবং অল্পে সন্তুষ্ট নয়। কলকাতার যুদ্ধ, নবাবের ফিরে যাওয়া এবং অধিকাংশ শর্ত মেনে নেওয়াতে ব্রিটিশ ভাবমূর্তি বাড়ল এবং ক্লাইভের পরিচিতি হল একজন "অপরাজেয়" সেনাপতি হিসেবে। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের যেমন অনুভূতি হয়েছিল যে, আজ হোক কাল হোক মুসলমানরা বাংলা দখল করবেই, ঠিক তেমনই অনুভূতি এবার দেখা গেল—আজ হোক কাল হোক ইংরেজরা বাংলা দখল করবেই। ১লা মে ১৭৫৭ মীরজাফরের কাছ থেকে প্রস্তাব এল, তাকে নবাব করা হলে তিনি ইংরেজদের সমর্থন করবেন। নবাবের সৈন্যবাহিনীর দুই নম্বর সেনাপতি রাজবল্লভও সেই কথা বললেন।[৮]

আশ্চর্য ব্যাপার হল, মীরজাফরই ব্রিটিশদের ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করলেন তিনি ইংরেজদের একটা খালি কাগজ ও সিল পাঠালেন এবং বললেন ওরা যা খুশি লিখতে পারে, তাতে কোনও আপত্তি নেই। নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজদেরই উচিত ছিল মীরজাফরকে ঘুষ দেওয়া যাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। একমাত্র উমিচাঁদকে ইংরেজরা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল—কিন্তু এই ঘুষ, ২ মিলিয়ন পাউন্ড, দিত নতুন নবাব, ইংরেজরা নয়। শেষ অবধি ওই ঘুষটাও দেওয়া হল না, যেহেতু কর্নেল ওয়াটসনের সই অন্য কেউ নকল করে ওই দলিলে দিয়েছিল।

পলাশির চূড়ান্ত যুদ্ধে ক্লাইভের ছিল ৬১৩ জন ইউরোপিয়ান পদাতিক, ১০০ জন ইউরেশিয়ান সৈন্য, ১৭১ জন গোলন্দাজ, যার মধ্যে ৫৭ জন ছিল জাহাজি। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলা থেকে ২১০০ জন ভারতীয়কে নেওয়া হয়েছিল। ১৪ জুন ক্লাইভ কাটোয়া দখল করলেন, কিন্তু মীরজাফরের চিঠি না পেয়ে আর অগ্রসর হতে চাইলেন না। ব্রিটিশদের কোনও অশ্বারোহী ছিল না, তাই বীরভূমের রাজার কাছে ১০০ থেকে ২০০ ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার চাওয়া হল। ক্লাইভ মারাঠাদের সঙ্গেও কথা বললেন।

শেষ পর্যন্ত যখন তিনি কাটোয়া থেকে নদী পার হয়ে নদীর ধার ঘেঁসা এক শিকারির আস্তানায় আশ্রয় নিলেন, লক্ষবাগ নামে এক আম্রকুঞ্জে, তখন তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ৩৫ হাজার অশিক্ষিত, সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত, বিক্ষুব্ধ, অনিয়মিত পারিশ্রমিক পাওয়া

সৈনিক, যাদের সেনাপতিরা তাদের কলজে ইতিমধ্যেই শয়তানের কাছে বেচে দিয়েছে। ১৫ হাজার পাঠান অশ্বারোহী যুদ্ধে শিক্ষিত ছিল কিন্তু ওদের ব্যবহারই করা হল না। ৫৩টা কামান ছিল ফরাসি তত্ত্বাবধানে। ক্লাইভ জানতেন যে, যদি নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা তার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে, তিনি পরাজিত হবেন এবং পুরোপুরি ধ্বংস হবেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বিশ্বাসঘাতকরা ইংরেজদের ঠকাল না।[১৫] রাজদুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান এবং মীরজাফর তাদের সৈন্যদের সরিয়ে রাখলেন, যুদ্ধই করলেন না। মীরমদন ও মোহনলাল যুদ্ধ করে মারা গেলেন। অশ্বারোহীরা এল না, কামান গর্জে উঠল না। পরদিন ভোর পাঁচটায় যুদ্ধ শেষ হল। নবাবের ৫০০ জন লোক মারা গেলেন, নবাব পালালেন। ইংরেজ পক্ষে চার জন ইউরোপিয়ান মারা গেল, ৯ জন আহত হল, ১৪ জন ভারতীয় সিপাহী মারা গেলেন এবং ৩৬ জন আহত হলেন।[১]

যুদ্ধ শেষ হবার পর যা ঘটল তা কম লজ্জার নয়। গতকালেও নবাব, এখন প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নৃশংসভাবে নিহত হলেন। ক্লাইভ মীরজাফরের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড পেলেন। তার কাউন্সিলের প্রত্যেকে পেলেন ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার পাউন্ড। সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনী নিজেদের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা বাটোয়ারা করে নিল। সাধারণ মানুষ গ্রাহ্যই করল না কে নবাব। দেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণা তখন তৈরি হয়নি, দেশপ্রেম বলে কোন জিনিস কেউ জানে না। যারা সমাজের মাথা তারা নতুন ব্যবস্থায় কে কতটুকু আদায় করতে পারবেন তা নিয়েই ব্যস্ত রইলেন, কোনও লজ্জা পেলেন না। যখন ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে ঢুকলেন তিনি ওখানকার ধনীলোকদের কাছে মীরজাফরের থেকেও বড় সম্বর্ধনা পেলেন। মুর্শিদাবাদের লোকদের কোনও ভুল হয়নি, ওরা জানতেন যে, আসল প্রভু কে। ক্লাইভ খুব উৎসাহের সঙ্গে লন্ডন অফিসে চিঠি লিখে বললেন যে, তিনি এক নতুন শহর দখল করেছেন। একটু বাড়িয়েই বললেন যে, এই শহরের লোকসংখ্যা এবং ধনদৌলত লন্ডনের থেকেও বেশি। তিনি বললেন, "মুর্শিদাবাদ খুব বড়, ধনবান ও জনবহুল শহর, লন্ডনের মতোই। তফাত এই যে, এই শহরের মানুষ লন্ডনের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ধনবান"। এরপরে তিনি যা বললেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, "ওখানকার লোকেরা যদি ইউরোপিয়ানদের ধ্বংস করতে চাইত, তাহলে লাঠি এবং পাথরই যথেষ্ট ছিল"।

[হান্টার, ডব্লু. ডব্লু, নবম খণ্ড : ৬৩]

এইভাবে আম্রকুঞ্জের ভেতরে, প্রায় কাফকার লেখার মতো, শেষ হল এই আলো-আঁধারি যুদ্ধ। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ-ধনতন্ত্রের শুরু হল।

মন্তব্য

১. বজবজে সিরাজের ৮০০ লোক ছিল, সঙ্গে কুড়িটা ভালো বন্দুক এবং ৫০-৬০ জন পোর্তুগিজ সৈন্য ("যারা কুলির থেকে ভালো কিছু ছিল না", ব্রিটিশ মতে)। (ভার্মা, ডি.সি., ১৯৭৬ : ৩৮)।

২. সিরাজের ১০০০ লোক ছিল কলকাতায় এবং ২০০ ছিল উল্টো পাড়ে, থানায়, তাদের হাতে ছিল ১১টি বন্দুক, ৪টি টু-পাউন্ডার্স, ২৪টা ওয়ান-পাউন্ডার এবং এরমধ্যে ৬টা কাজের উপযুক্ত ছিল না। এছাড়া ৪ জন পোর্তুগিজ বন্দুকধারী ছিল, যা দিয়ে ক্লাইভকে ঠেকানো যেত। (ভার্মা, ডি.সি. ১৯৭৬ : ৩৮)।
৩. একথা পশ্চিম উপকূলের ক্ষেত্রেও সত্য যে, শাসকরা ইউরোপীয়দের নানা রকম সুবিধা দিতে রাজি ছিল, কেন না, বাণিজ্য মানেই রাজস্ব (প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮ : ১২৪-১২৫)।
৪. সম্রাটের সদন টাঁকশাল বা দস্তকের ব্যবহার অনুমোদন করেনি। এই সনদ অনুযায়ী সপ্তাহে তিনদিন পয়সা দিয়ে টাঁকশাল ব্যবহার করা যেত, যদি তা রাজার স্বার্থের বিরোধী না হত (চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫ : ৩২-৩৩)।
৫. কিছু ঐতিহাসিক, সত্য ঘটনা দেখলেও তার মর্ম বোঝেন না এবং সত্যকে হিসেবে রাখেন না। কিছু ঐতিহাসিক বলেন যে, বাঙালিরা নাকি নৌযুদ্ধে খুব ভালো ছিল, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারেন না কেন তারা পোর্তুগিজ আক্রমণকারীদের কাছে এবং পরবর্তীকালে অন্য ইউরোপীয় শক্তির কাছে নৌযুদ্ধে হেরে যায় (রহিম, এম.এ., ১৯৫৭, খণ্ড ১ : ২০-২৩)। যাই হোক বাংলার নৌশক্তির কিছু বিবরণ আমরা পাই, যেমন "রঘুবংশে" প্রাক মৌর্য যুগে। এছাড়া কুমারপাল ও বিজয় সেনের রাজত্বকালে কিছু নৌযুদ্ধের বিবরণ আমরা পাই (মজুমদার, আর.সি., এবং রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১ : ২৭৯)।
৬. বেইলির মতে, এটা ঠিক নয় যে, তাদের কোনও দেশাত্মক বোধক মৌলিক চেতনা ছিল না। অবশ্য ওদের সেই ভূস্থলের পরিসীমা সম্পর্কে ধারণা ছিল না (বেইলি, সি.এ. ১৯৯৮ : ১৮)।
৭. "ওরা এখন পাসের (সুমাত্রার) আদবকায়দা ৭৪ বছর ধরে মানে। যে শাসককে খুন করতে পারে, সেই শাসক হয়। ওরা বিশ্বাস করে যে, ভগবান চেয়েছে বলেই ওরা রাজা হতে পেরেছে। রাজারা তাই অল্প দিনই থাকে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আবিসিনিয়ানরাই শাসক, যেহেতু রাজার কাছেকাছেই ওরা থাকে। এটা এমনভাবে হয় যে, রাজ্যে কোনও অস্থিরতা ঘটে না। বণিকেরা শান্তিতেই থাকে। বাবা থেকে ছেলে সবাই এটা মানে, এইভাবেই সব কিছু হয়। পাসে থেকে ওরা এই আদবকায়দা শিখেছে"। (পিরেস, টোম, ১৯৪৪ : ৮৮-৮৯)।
৮. এই চুক্তিতে দশ দফা ছিল : ক) সমস্ত গ্রান্ট এবং সুবিধা যা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে তা থাকবে; খ) ব্রিটিশদের সঙ্গে সমস্ত রকম আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক সমঝোতা বিরাজ করবে; গ) কোম্পানিকে ১০০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে; ঘ) সমস্ত ফরাসি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে; ঙ) ইউরোপীয় অধিবাসীদের ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে; চ) হিন্দুদের ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে; ছ) উমিচাঁদকে ২০ লক্ষ দেওয়া হবে; জ) মারাঠা খালের সমস্ত জমি, নদী থেকে লবণ হ্রদ পর্যন্ত, কুলপি অবধি, কোম্পানির জমিদারিকে দেওয়া হবে; ঝ) ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য কিছু রাখা হবে, যখন তাদের ব্যবহার করা হবে; ঞ) কোনও স্থায়ী দুর্গ বানাতে দেওয়া হবে না। উপরের এই দশ দফা মীরজাফর নবাব হবার ৩০ দিনের মধ্যে পূরণ করবেন। কোম্পানি অঙ্গীকার করল যে, মিরজাফরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে। স্বভাবতই এই চুক্তি ছিল একপেশে এবং একজন বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে। এছাড়া এ ছিল এক মিথ্যা চুক্তি, কেননা সত্যি সত্যি উমিচাঁদ ২০ লক্ষ টাকা পাননি। এছাড়া এই চুক্তিতে সৈন্যবাহিনী, নৌযোদ্ধাদের এবং লর্ড ক্লাইভকে কিছু কিছু করে দেবার কথা ছিল (এডওয়ার্ডস, মাইকেল, ১৯৭৬ : ১৩০-১৩১)। হান্টার মন্তব্য করেন, "ক্লাইভ বাংলা ছেড়ে যখন চলে যান তখন

বাংলায় কোনও সরকারি ব্যবস্থা রেখে যাননি, বরং এমন অবস্থা করেছেন যে, ব্রিটিশদের নাম করে ভয় দেখিয়ে প্রচুর টাকা নেওয়া যেত" (হান্টার. ডব্লু.ডব্লু., ১৯৩০ : ১৮৩-১৮৪)।

৯. কোলকাতার ১৭৫৭ সালের দ্বন্দ্বে ব্রিটিশরা হারায় ২৭ জন সৈন্য, ১২ জন নাবিক, এবং ১৮ জন সিপাহী এবং সিরাজদৌল্লার বাহিনীর ১৩০০ জন মারা যান (ভার্মা, ডি.সি., ১৯৭৬ : ৪১-৪৩)।

৫

গ্রন্থপঞ্জি

আগরওয়ালা, ভি. এস, (সম্পাদিত), ১৯৫৩, ইন্ডিয়া অ্যাজ নোন টু পাণিনি (এ স্টাডি অফ দি কালচারাল মেটেরিয়াল ইন দি অষ্টাবাবি), ইউনিভার্সিটি অফ লখনউ, লখনউ।

আহমেদ, কামারুদ্দিন, ১৯৬৭, এ সোসাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, বোশেন আরা আহমেদ, ঢাকা।

আহমেদ, ওয়াকিল, ১৯৯৭, "বেঙ্গল লিটারেচার ইন এইটিস্থ সেঞ্চুরি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ : এ স্টাডি অফ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি মোগল ইমপিরিয়াল সিস্টেম, খণ্ড-৩, খণ্ড-৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।

আকমাম, আফরোজ, ১৯৯৪, 'মহাস্থান—দি আর্লিয়েস্ট আরবান সেন্টার ইন বাংলাদেশ", দেবলা মিত্র (সম্পাদিত), এক্সপ্লোরেশন ইন আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।

আলভি, হামজা, ১৯৭৫, 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি কলোনিয়াল মোড অফ প্রোডাকশন", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, স্পেশাল নাম্বার, আগস্ট।

আলভি, হামজা, ১৯৮২, 'ইন্ডিয়া ট্রানজিশন টু কলোনিয়াল ক্যাপিটালিজম", আলাভি প্রমুখ।

আলতেকার, এ. এস, ১৯৭২, স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, মইলাল বারানসিদাস, (প্রথম প্রকাশন ১৯৫৮), দিল্লি।

আলম, জাভিদ, ১৯৯৩, পৃ ২২৮,

মৃণাল মিত্র (সম্পাদিত), কন্টিনিউটি অ্যান্ড চেঞ্জ, এ এস.২, সিমলা, ১৯৯৩।

আমিন, সমির এবং রবিন কোহেন, ১৯৭৭, ক্লাসেস অ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাগলস ইন আফ্রিকা, আফ্রোরাফিকা পাবলিশার্স, যবা, লাগোস, নাইজেরিয়া।

বাডেন পাওয়েল, বি. এইচ, ১৯১৩, এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ইটস অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, উইথ এ স্কেচ অফ ল্যান্ড টেনার্স, ক্লারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড।

বাগচী, কাননগোপাল, সুনীলকুমার মুন্সী এবং রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ১৯৭২, দি ভাগীরথী-হুগলি বেসিন, শৈলেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, কলকাতা।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র, ১৯৭১, "ডেভলপমেন্ট অফ রিলিজিয়াস আইডিয়া", মজুমদার, আর. সি (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১ (হিন্দু কাল), এন. ভি.

পাবলিকেশনস, লোহানিপুর অ্যান্ড পাটনা।

বেইনস, এডওয়ার্ড, ১৯৬৬, হিস্ট্রি অফ কটন ম্যানুফ্যাকচারার্স অফ গ্রেট ব্রিটেন, আগাস্টাস এম. কেলি, নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড ফ্রাঙ্ক কাস, লন্ডন।

ব্যানার্জি, জিতেন্দ্র নাথ, ১৯৭১, 'আইকনগ্রাফি', মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১ (হিন্দু কাল), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর অ্যান্ড পাটনা।

ব্যানার্জি, এস. সি, ১৯৮৮, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ তন্ত্র লিটারেচার, নয়া প্রকাশ, কলকাতা।

বারবোসা, ডুয়ার্টে, ১৫১৮, দি বুক অফ ডুয়ার্টে বারবোসা, অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ কান্ট্রিস বর্ডারিং অন দি ইন্ডিয়ান ওসেন অ্যান্ড দেয়ার ইনহ্যাবিট্যান্টস, রিটন বাই ডুয়ার্টে বারবোসা, ১৫১৮, পোর্তুগিজ থেকে অনুদিত, মানসেল লঙওয়ার্থ ড্যামস্ অনুবাদ করেন, খণ্ড-১ অ্যান্ড ২ হ্যাকলুৎ সোসাইটি, লন্ডন।

বতুতা, ইবন, ১৯২৯, ট্রাভেলস ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা, ১৩২৫-৫৪, ব্রডওয়ে ট্রাভেলার্স, জর্জ রটলেজ অ্যান্ড সন্স, (ট্রান্সলেটেড বাই এইচ. এ. আর জিব), লন্ডন।

বেইলি, সি. এ, ১৯৮৮, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড দি মেকিং অফ দি ব্রিটিশ এমপায়ার, দি নিউ কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড -২, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ।

বেইলি, সি. এ, ১৯৯২, রুলার্স, টাউন্সমেন অ্যান্ড বার্যার্স - নর্থ ইন্ডিয়া সোসাইটি ইন দি এজ অফ ব্রিটিশ এক্সপেনসন : ১৭৭০-১৮৭০, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি।

বেল, স্যামুয়েল ১৯৬৪, ট্রাভেলস্ অফ ফা-হিয়েন অ্যান্ড সাসাঙ-ইয়ান, বুদ্ধিস্ট পিলগ্রিমস্ ফ্রম চায়না টু ইন্ডিয়া (৪০০ এডি অ্যান্ড ৫১৮ এডি), চাইনিজ থেকে অনুদিত, স্যামুয়েল বেল দ্বারা, সুশীল গুপ্ত, (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯), লন্ডন।

বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, ১৯৬৯, ট্রাভেলস্ ইন মোগল এমপায়ার, এ রিভাইসড্ অ্যান্ড ইমপ্রুভ্ড এডিশন, ইরভিন ব্রুকস অনুদিত আর্চিবাল্ড কন্সটেবল, (প্রথম প্রকাশন ১৮৯১), এস চন্দ অ্যান্ড কোম্পানি, দিল্লি।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ১৯৭০, দি ইন্ডিয়ান থিওগনি, এ কমপারেটিভ স্টাডি অফ দি ইন্ডিয়ান মাইথোলজি ফ্রম দি বেদাস টু দি পুরানস্, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৫০, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা বুক হাউস, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশন।

ভট্টাচার্য, বি, ১৯৭৯, আরবান ডেভালপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া—সিন্স প্রি-হিসটোরিক টাইমস্, জইন বুকস্, দিল্লি।

ভট্টাচার্য, জে. বি, ১৯৮৭, "ডিমাসা স্টেট ফর্মেশন ইন ক্যাচার", সুরজিৎ সিনহা (সম্পাদিত), ট্রাইবাল পলিটিক্স অ্যান্ড স্টেট সিস্টেমস্ ইন প্রি-কলোনিয়াল ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, সিএসএসএস, কে. পি বাগচী, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, পি. কে, এবং বি. এন. মুখার্জি (ইডিএস), ১৯৮৭, আর্লি হিস্টোরিকাল পার্সপেকটিভ অফ নর্থ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং।

ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ, ২০০০, "প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য" রণবীর চক্রবর্তী, কুনাল

চক্রবর্তী, এবং অমিত বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস—অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারক গ্রন্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, সুকুমার, ১৯৬৯, দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড দি ইকনমি অফ বেঙ্গল, ফ্রম ১৭০৪ টু ১৭৪০, ফারমা কে. এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা।

বিশ্বাস, দিলীপ কুমার এবং ভট্টাচার্য, অমিতাভ (সম্পাদিত), ১৯৯৩, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, (বাংলায়), অধ্যায় ৫ (হিস্ট্রি), ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বুক বোর্ড, কলকাতা।

বিশ্বাস, কৃষ্ণা, ১৯৯৫, দি স্কাল্পচারাল আর্ট অফ অ্যান্সিয়েন্ট বেঙ্গল (বঙ্গ এবং সমতট), রামানন্দ বিদ্যা ভবন, কলকাতা।

ব্লিন, জর্জ, ১৯৬৬, এগরিকালচারাল ট্রেন্ডস ইন ইন্ডিয়া, ১৮৯১-১৯৪৭, আউটপুট, অ্যাভেলিবিলিটি অ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি, ফিলাডেলফিয়া।

বোল্টস, উইলিয়াম, ১৭৭২-৭৫, কনসিডারেশনস অন ইন্ডিয়া অ্যাফেয়ার্স, পার্টিকুলারলি রিগার্ডিং দি প্রেজেন্ট স্টেট অফ বেঙ্গল, অ্যান্ড ইটস্ ডিপেন্ডেনসিস, খণ্ড-৩, জে. আলমন অ্যান্ড পি. এল্মসলি, লন্ডন।

বসরাপ, এসথার, ১৯৭০, উওম্যান'স্ রোল ইন ডেভালপমেন্ট, অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, লন্ডন।

বাউরি, টমাস, ১৯০৫, এ জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ কান্ট্রিস রাউন্ড দি বে-অফ-বেঙ্গল, ১৬৬৯ টু ১৬৭৯, এডিটেড বাই স্যার রিচার্ড কর্নাক টেম্পেল, কেমব্রিজ, হাকলুইট সোসাইটি।

ব্রীগস, জন্, ১৮২৯, হিস্ট্রি অফ দি রাইস অফ দি মাহোমেডান পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, টিল দি ইয়ার (সম্পাদিত) (১৬১২ সালে মাহমেদ কাসিম ফেরিস্থার পারসিক থেকে অনুদিত), খণ্ড-১-৪, খণ্ড-৪, লঙম্যান, রিস, ওর্ম, ব্রাউন, অ্যান্ড গ্রিন, লন্ডন।

বুচানন, ড্যানিয়্যল হাউসটন, ১৯৬৬, দা ডেভলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিস্টিক এন্টারপ্রাইজ ইন ইন্ডিয়া, ফ্রাঙ্ক কাস অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪)।

বুচানন, হ্যামিলটন, ফ্রান্সিস, ১৮৩৩, এ জিওগ্রাফিক্যাল, স্টাটিসটিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ দি ডিস্ট্রিক্ট, অ্যাজ জিলা অফ দিনাজপুর ইন দি প্রভিন্স, অর সুবা, অফ বেঙ্গল, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা।

বায়ার্স, টি. জে., ১৯৮৩, "হিসটোরিক্যাল পার্সপেকটিভ অন শেয়ারক্রপিং", জার্নাল অফ পেজেন্ট স্টাডিস, খণ্ড: ১০, নং-২-৩, জানুয়ারি-এপ্রিল।

ক্যাম্পোস, জে. জে. এ, ১৯১৯, হিস্টোরি অফ দি পোর্তুগিজ ইন বেঙ্গল - উইথ ম্যাপস অ্যান্ড ইলাসট্রেশন, বাটারওর্থ অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৩১, বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম, ১৯৩৩।

চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র, ১৯৮৭, "এরিয়ানাইসেশন অফ নর্থ বেঙ্গল", মুখার্জি, বি. এন, অ্যান্ড ভট্টাচার্য, পি. কে (সম্পাদিত), আর্লি হিস্টোরিকাল পার্সপেকটিভ অফ নর্থ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, দার্জিলিং।

চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, ১৯৯৭, দি আর্কিওলজি অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সিটিস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি।

চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, ১৯৯৪, "এ নোট অন দি ইউস অফ মেটালস্ ইন এনসিয়েন্ট বেঙ্গল", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২ ও ৩, ডাইরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।

চক্রবর্তী, পি. সি, ১৯৭১, "ইকনমিক কন্ডিশনস্", মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু পিরিয়ড), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর অ্যান্ড পাটনা।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত, ১৯৮৫, বৈষ্ণভিজম ইন বেঙ্গল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

চক্রবর্তী, রণবীর, ১৯৯৪, "বঙ্গসাগর সন্তনদারিক্যা : রিভেরাইন ট্রেড-সেন্টার অফ আর্লি মিডিভাল বেঙ্গল", দেবলা মিত্র (সম্পাদিত), এক্সপ্লোরেশনস ইন আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।

চন্দ্র, বিপান, ১৯৬৯, "রিইন্টারপ্রিটেশন অফ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি", মরিস, মরিস ডি, মাৎ সুই তরু চন্দ্র, বিপান, অ্যান্ড রায়চৌধুরী, টি, ১৯৬৯, ইন্ডিয়ান ইকনমি ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি : এ সিমপোসিয়াম, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুস্থান পাবলিশার্স, দিল্লি।

চ্যাটার্জি, অঞ্জলি, বেঙ্গল ইন দি রিজিয়ন অফ ঔরঙ্গজিব, ১৬৫৮-১৭০৭, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৭

চ্যাটার্জি, ভাস্কর, ১৯৮৭, "প্লেস অফ কাজাঙ্গলা ইন আর্লি হিসটোরিকাল পার্সপেকটিভ অফ নর্থ বেঙ্গল", বি. এন. মুখার্জি অ্যান্ড পি. কে. ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), আর্লি হিসটোরিকাল পার্সপেকটিভ অফ নর্থ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, দার্জিলিং।

চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, ১৯৭০, দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফ দি বেঙ্গল লাঙ্গুয়েজ, লন্ডন, অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, (প্রথম প্রকাশ কলকাতা ইউনিভার্সিটি, ১৯২৬)।

চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, ১৯৭১, "রাইস অফ ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ", ইন মজুমদার, আর. সি. (ইডি), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু পিরিয়ড), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর অ্যান্ড পাটনা।

চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, ১৯৭৪, কিরাতা-জানা-ক্রিতি-দি ইন্দো-মঙ্গোলয়েডস্; দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দি হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ ইন্ডিয়া, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ।

চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, ১৯৮২, দি ভাইরাস 'ম্যাটার্স' ইন নিউ অর মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটারেচার অ্যান্ড দি রোমান্স অফ মিডিয়াভাল বেঙ্গল (গৌড় বঙ্গ রামায়ণ কথা) , দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, অমল কুমার, ১৯৭৭, স্লেভারি ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৭৭২-১৮৪৩, গোল্ডেন ঈগল পাবলিকেশনস, লন্ডন।

চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৪, "আরবান সেন্টারস্ ইন আর্লি বেঙ্গল : আর্কিওলজিকাল পার্সপেকটিভস", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২ ও ৩, ডাইরেকটরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ১৯৯৭, দি মেকিং অফ আর্লি মেডাইভাল ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি।

চৌধুরী, সুশীল, ১৯৭৫, ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গল ১৬৫০-১৭২০, ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা।

চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৫, ফ্রম প্রসপারিটি টু ডিক্লেইন : এইটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, মনোহর,

দিল্লি।

চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭এ, "নবাব সিরাজৌদ্দলা অ্যান্ড ব্যাটেল অফ পলাশি", ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, খণ্ড ৩, প্রথম অধ্যায়,

চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭বি "জেনারেল ইকনমিক কন্ডিশনস আন্ডার দি নবাব", ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, খণ্ড ৩, দ্বিতীয় অধ্যায়।

চৌধুরী, সুশীল, ১৯৯৭ সি, 'ইউরোপিয়ান কোম্পানিস অ্যান্ড এক্সপোর্ট ট্রেড ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, ১৭০৪-১৯৭১, দ্বিতীয় অধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।

চিচেরভ, এ. আই, ১৯৯৬, ইন্ডিয়াস ইকনমিক ডেভালপমেন্ট ইন দি সিক্সটিন্থ—এইটিন্থ সেঞ্চুরিস, আউটলাইন হিস্ট্রি অফ ক্রাফ্‌ট অ্যান্ড ট্রেড, পিপ্লাইস পাবলিশিং হাউস, নিউ দিল্লি।

চাইল্ড, ভি, গর্ডন, ১৯৬৫, ম্যান মেকস হিমসেল্ফ, গ্রাইন ড্যানিয়েল, লন্ডন।

চৌধুরী, কীর্তি নারায়ণ, ১৯৬৫, দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি—দি স্টাডি অফ অ্যান আর্লিয়ার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ১৬০০-১৬৪০, ফ্রাঙ্ক কাস অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

চৌধুরী, কীর্তি নারায়ণ, ১৯৭১, দি ইকনমিক ডেভালপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডার দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৮১৪-১৮৫৮, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।

চৌধুরী, আর. ডি, ১৯৮৭, "নর্থ বেঙ্গল : বি গেটওয়ে অফ দি স্প্রেড অফ আর্যান কালচার ইন আসাম অ্যাস উই নো ফ্রম আর্কিওলজিকাল এভিডেন্স", মুখার্জি, বি. এন., অ্যান্ড ভট্টাচার্য, পি. কে. (সম্পাদিত), আর্লি হিসটোরিকাল পার্সপেকটিভ অফ নর্থ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, দার্জিলিং।

কোলব্রুক, এইচ. টি, ১৮০৪, রিমার্কস অন দি হাসব্যান্ড্রি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কমার্স ইন বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

ক্লিসেন, হেনরি, জে. এম. এবং পিটার স্কালনিক (সম্পাদিত), ১৯৭৮, দি আর্লি স্টেট, মৌটন পাবলিশার্স, দি হাজিউ, প্যারিস, নিউইয়র্ক।

দাস, গিরীন্দ্রনাথ, ১৯৯৮, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

দাস, রাহুল পিটার, ১৯৯৭, এসেস অন বৈষ্ণবিজম ইন বেঙ্গল, ফারমা কে. এল. এম, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৮২, "ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড দি ট্রেড ইন ইন্ডিয়ান ওসিয়ন", তপন রায়চৌধুরী এবং ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), দি কেমব্রিজ ডেকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (১২০০-১৭৫০ সাল), কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ।

দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৯৪, মার্চেন্ট অফ মেরিটাইম ইন্ডিয়া, ১৫০০-১৮০০, ভেরিওরাম, আমস্টারডাম।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ১৯৮৪, "শেয়ারক্রপিং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিউরিং দি কলোনিয়াল পিরিয়ড", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, রিভিউ অফ এগরিকালচার মান্থার, ৩১শে মার্চ।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ১৯৮৪এ, "এগরিকালচারাল লেবার আন্ডার কলোনিয়াল, সেমি-

ক্যাপিটালিস্ট অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট কন্ডিশনস—এ কেস স্টাডি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, সেপ্টেম্বর, ৩০।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ১৯৮৪বি, "মোড অফ প্রোডাকশন অ্যান্ড দি এক্সটেন্ট অফ পেসেন্ট ডিফারেন্টশন ইন প্রি-ব্রিটিশ বেঙ্গল", সোসাল সায়েনটিস্ট, আগস্ট।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ১৯৯৭, "দি নিউ পলিটিক্যাল ইকনমি : এ ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল, উইকলি, জানুয়ারি ২৫।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ২০০১এ, "পলাশি - দি ইনসাইড স্টোরি অফ এ বেট্রাল", কে. এন. পানিকর, টেরেন্স জে বায়ারস, অ্যান্ড উৎসা পটনায়েক (সম্পাদিত), দি মেকিং অফ হিস্ট্রি—পেপার প্রেজেন্টেড টু ইরান হাবিব, তুলিকা, নিউ দিল্লি।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ২০০১বি, "ট্রেড ইন প্রি-কলোনিয়াল বেঙ্গল", সোসাল সায়েন্টিস্ট, মে-জুন।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ২০০১সি, "বেঙ্গল ইন দি মিডল এজেস এজ দিস থ্রু ফরেন আই', 'বেঙ্গল স্টাডিজ', রমা দত্ত, ক্লিনটন সিলি এবং জুলফিকর খান (সম্পাদিত), এ কালেকশন অব এসেস, অ্যালায়েড পাবলিশার্স, দিল্লি, ফেয়েটভিল স্টেট ইউনিভার্সিটি।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব, ইন প্রি-কলোনিয়াল বেঙ্গল", মনোগ্রাফ সিরিস, সি.ইউ.ই.এস, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, জে. এন., ১৯১৪, বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি এ. ডি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, রত্তন, ২০০১, সাম অ্যাসপেক্ট অফ দি পলিটিকাল ইকনমি অফ বেঙ্গল—১৬৬০ এ.ডি. টু ১৭৬২ এ.ডি, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলকাতা, আনপাবলিশড্ পি. এইচ. ডি. থিসিস।

দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৪৬, অবস্‌কিওর রিলিজিয়াস কাল্টস অফ বেঙ্গল, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ১৯৫০, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজম, ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, শশী ভূষণ, ১৯৫৭, অ্যাসপেক্টস অফ ইন্ডিয়ান রিলিজিয়াস থট, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

দত্ত রজত, ১৯৯৯ "মার্কেটস, বুলিয়ন অ্যান্ড বেঙ্গল'স কমার্শিয়াল ইকনমি : অ্যান এইটিন্থ সেঞ্চুরি পার্সপেক্টিভ", প্রকাশ, ওম অ্যান্ড ডেনিস ল্যামবার্ড (সম্পাদিত), কমার্স অ্যান্ড কালচার ইন দি বে অফ বেঙ্গল, ১৫০০-১৮০০, আই.সি.এস.এস.আর, মনোহর, দিল্লি।

দে, এস. কে, ১৯৭১, "সাংস্কৃট লিটারেচার", মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর অ্যান্ড পাটনা।

দে, লালবিহারী, ১৯৬৯, বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ, এডিশনস ইন্ডিয়ান, কলকাতা।

দেবাহুতি, ডি, ১৯৯৮, হর্ষ—এ পলিটিকাল স্টাডি, তৃতীয় সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ড্যুমন্ট, লুই, ১৯৭০, রিলিজিয়ন, পলিটিক্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া—কালেকটেড পেপারস ইন ইন্ডিয়ান সোসিওলজি, মাউটন, প্যারিস অ্যান্ড দি হ্যাজিউ।

দত্ত, চিন্ময়, ১৯৮৬, "ইন্ট্রোডাকটরি নোটস—বি", খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬, মেমোরিস অফ গৌড় অ্যান্ড পান্ডুয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার, কলকাতা।

ইটন, রিচার্ড এম, ১৯৯৩, দি রাইস অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফন্টায়ার, ১২০৪-১৭৬০, ইউনিভার্সিটি অফ কালিফোর্নিয়া প্রেস, বার্কেলে, লস অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড লন্ডন।

এডওয়ার্ডস, মাইকেলস, ১৯৬৩, দি ব্যাটেল অফ পলাশি অ্যান্ড দি কংকোয়েস্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, বি টি ব্যাটসফোর্ড।

ইগেলিং, জুলিয়াস (অনূদিত) এবং ম্যাক্স মুলার (সম্পাদিত), ১৮৮২, সতপথ ব্রাম্মনা, ক্লারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড।

এরেনবুর্গ, রিচার্ড, ১৯২৮, ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফাইনান্স ইন দি এজ অফ রেনেসাঁস - এ স্টাডি অফ দি ফাগার্স অ্যান্ড দেয়ার কানেকশনস, (সম্পাদিত), জার্মানি থেকে অনূদিত—এইচ.এম লুকাস, ফ্রাঙ্ক কাস, লন্ডন।

এলিয়ট, হেনরি মায়ারস্ এবং জন ডাসন, ১৮৮৬, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওয়ন হিস্টোরিয়ানস, খণ্ড ৮, ডব্লু.ডব্লু. অ্যালেন অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

এলটন, জি. আর, ১৯৬৩, বেনেসাঁস অ্যান্ড রিফর্মেশন, ১৩০০-১৬৪৮, (সম্পাদিত), ম্যাকমিলান, নিউ ইয়র্ক।

এঞ্জেলস, ফ্রেডারিক, ১৯৭২, দি ওবিজিন অফ ফ্যামিলি, স্টেট, অ্যান্ড প্রাইভেন প্রপার্টি ইন দি লাইট অফ রিসার্চ লুইস এইচ মরগানেব জার্মানি থেকে অনূদিত—অ্যালেক ওয়েস্ট, লওবেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, লন্ডন।

এরডোসি, জর্জ, ১৯৮৫ "দি অরিজিন অফ সিটিস ইন দি গ্যাঞ্জেস ভ্যালি", দি জার্নাল অফ দি ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অফ দি ওরিয়েন্ট, খণ্ড ২৮, নং ১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

এরিং, ডি, "দি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টায়ার এজেন্সি", ১৯৭২, সিং, কে সুরেশ (সম্পাদিত), দি ট্রাইবাল সিচুয়েশন ইন ইন্ডিয়া, আই.আই.এ.এস, সিমলা।

ফর্গুসন, আর্থার বি, ১৯৬৫, দি আর্টিকুলেট সিটিজেন অ্যান্ড দি ইংলিশ, রেনেসাঁস, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ডারহাম।

ফার্নানডেজ, ওয়ালটার, "ফরেস্টস অ্যান্ড ট্রাইবালস্ : ইনফরমাল ইকনমি, ডিপেন্ডেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রাডিশনস", মৃণাল মিরি (সম্পাদিত), কনটিনিউটি অ্যান্ড চেঞ্জ, আই.আই.এ.এস, সিমলা, ১৯৯৩।

ফার্মিংগার, ওয়ালটার কেলি, ১৯১৭, "হিস্টোরিকাল ইন্ট্রোডাকশন টু দি বেঙ্গল পোর্শন অফ দি ফিফ্থ রিপোর্ট", ফারমিঙ্গার, ওয়ালটার কেলি (সম্পাদিত), দি ফিফ্থ রিপোর্ট অফ দি সিলেক্ট কমিটি অফ দি হাউস অফ কমন্স অন দি অ্যাফেয়ার্স অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ২৮ জুলাই, ১৮১২, হাউস অফ কমন্স, লন্ডন।

ফস্টার, উইলিয়াম (সম্পাদিত), ১৯২১, আর্লি ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, ১৫৮৩-১৬১৯, হামফ্রে মিলফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।

[illegible] রিচার্ড জি, ১৯৭১, কিন, ক্রেন, রাজা অ্যান্ড রুল, স্টেট-হিন্টারল্যান্ড রিলেশনস্ ইন প্রি-ইনডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ও.ইউ.পি, বোম্বে।

ফ্রেডারিক, আগাস্টাস, ১৮৯০, দি এমপ্যারর আকবর : এ কন্ট্রিবিউশন টুওয়ার্ডস দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ইন দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি, ফ্রেডারিক আগাস্টাস, কাউন্ট অফ নোয়ার, অনূদিত এবং কিছুটা সংশোধিত, অ্যানেট বেভারিজ দ্বারা, কলকাতা, থাক্কার স্পিংক অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন ট্রুনার অ্যান্ড কোম্পানি।

ফ্রেডারিক, সিজার, ১৫৮৮, "দি ভয়েজ অ্যান্ড ট্রাভেল : দি এম. কেইসর ফ্রেডারিক, মারচেন্ট অফ ভেনিস, ইনটু দি ইস্ট ইন্ডিয়া, দি ইনডাইস অ্যান্ড বিয়ন্ড দি ইনডাইস, রিটন অ্যাট সি ইন দি হারকিউলেস অফ লন্ডন : কামিং ভ্রম তুর্কী, দি ২৫ মার্চ, ১৫৮৮, ফর দি প্রফিটেবল ইনট্রাকশন অফ মার্চেন্টস অ্যান্ড অল আদার ট্রাভেলার্স ফর দেয়ার বেটার ডাইরেকশন অ্যান্ড নলেজ অফ দোজ কান্ট্রিস", অনুবাদ, থমাস হিকক, রিচার্ড জনস এবং এডওয়ার্ড হোয়াইট, লন্ডন।

গ্যাডগিল, ডি. আর, ১৯৭১, দি ইনডাস্ট্রিয়াল ইভলিউশন অফ ইন্ডিয়া, ইন রিসেন্ট টাইমস ১৮৬০-১৯৩৯, বোম্বে।

গাঙ্গুলী, কিশোরী মোহন, ১৯৯৩, দি মহাভারত অফ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ভইসা, মুন্সীরাম মনোহরলাল, নিউ দিল্লি।

ঘোষ, এ, ১৯৭৩, দি সিটি ইন আর্লি হিস্টোরিকাল ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডি, সিমলা।

ঘোষাল, এইচ. আর., ১৯৬৬, ইকনমিক ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৭৯৩-১৮৩৩, কলকাতা।

ঘোষাল, ইউ. এন., ১৯৭২, কনট্রিবিউশনস টু দি হিস্ট্রি অফ দি হিন্দু রেভিনিউ সিস্টেম, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা।

গোপাল, লালানজী, ১৯৮০, অ্যাসপেক্টস অফ হিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ভারতী প্রকাশন, বারাণসী।

গোপাল, এস., ১৯৪৯, দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল অ্যান্ড ইটস রেজাল্টস, জর্জ অ্যালেন এবং আনউইন, লন্ডন।

গোস্বামী, নিরঞ্জন, ১৯৯৪, "আর্কিওলজিক্যাল অ্যাকটিভিটিস ইন বেঙ্গল টিল ১৯৬৭", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২, ৩, ১৯৯৩-১৯৯৪, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডাইরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, কলকাতা।

গ্রিন, ভি.এইচ.এইচ., ১৯৬৪, রেনেসাঁস অ্যান্ড রিফর্মেসন—এ সার্ভে অফ দি ইউরোপীয়ান হিস্ট্রি বিটুইন ১৪৫০ অ্যান্ড ১৬৬০, এডওয়ার্ড আর্নল্ড, লন্ডন।

গ্রে, এডওয়ার্ড (সম্পাদিত), ১৮৯২, দি ট্রাভেলস্ অফ পেট্রো ডিলা ভেল ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড ১-২, হাকলাউট সোসাইটি, লন্ডন।

গুহ, অমলেন্দু, ১৯৮৭, "দি আহোম পলিটিক্যাল সিস্টেম : অ্যান এনকোয়ারি ইনটু স্টেট ফর্মেশন ইন মেডিভাল আসাম : ১২২৮-১৮০০", সুরজিৎ সিনহা (সম্পাদিত), ট্রাইবাল পলিটিক্স অ্যান্ড স্টেট সিস্টেম ইন প্রি-কলোনিয়াল ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, সি.এস.এস.এস., কে পি বাগচী, কলকাতা।

গুহ, অমলেন্দু, ১৯৯১, মিডিইভাল অ্যান্ড আর্লি কলোনিয়াল আসাম—সোসাইটি, পলিটি অ্যান্ড ইকনমি, সেন্টার ফর দি স্টাডিস ইন সোসাল সায়েন্স, কলকাতা।

গুহ, বি. এস., ১৯৪৪, রেসিয়াল এলিমেন্টস ইন দি পপুলেশন, হামফ্রে মিলফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড পামফ্লেটস অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স, নং

২২।
গুওয়ারসাইমার, ওয়ারনার এল, ১৯৬৫, (সম্পাদিত), দি ইটালিয়ান রেনেসাঁস, প্রেনটিস হল ইন্স, ইংলেউড ক্লিফস, নিউ জার্সি।
গুপ্ত, ব্রিজেন কে, ১৯৬৬, সিরাজদৌল্লা অ্যান্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৭৫৬-৫৭, ব্যাকগ্রাউন্ড টু দি ফাউন্ডেশন অফ ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, লেইডেন, ই. জে. ব্রিল।
গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪ "জৈনজিম ইন বেঙ্গল", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২, ৩, ডাইরেক্টোরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।
গুপ্ত, চিত্ররেখা, ১৯৯৪এ, "ল্যান্ড মেজরমেন্ট অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম ইন বেঙ্গল আন্ডার দি সেনাস", দেবলা মিত্র (সম্পাদিত), এক্সপ্লোরেশন ইন আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।
হাবিব, ইরফান, ১৯৬৩, দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া (১৫৫৬-১৭০৭), এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বম্বে।
হাসান, পারউইন, ১৯৯৭, "আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ : এ স্টাডি অফ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি মুঘল ইমপেরিযাল সিস্টেম, খণ্ড ৩, তৃতীয় অধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।
হে, ডেনিস, ১৯৬১, দি ইটালিয়ান রেনেসাঁস ইন ইটস হিসটোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।
হাজরা, আর. সি., ১৯৬৩, স্টাডিস ইন দি উপপুরানস, খণ্ড ২, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।
হাজরা, আর. সি., ১৯৭৫, স্টাডিস ইন পৌরাণিক রেকর্ডস অন হিন্দু রিটস অ্যান্ড কাসটমস্, মতিলাল বারানসিদাস, দিল্লি, পাটনা এবং বেনারস, প্রথম প্রকাশন ১৯৪০।
হেজেস, উইলিয়াম, ১৮৮৭-১৮৮৯, দি ডাইরি অফ উইলিয়াম হেজেস—ডিউরিং হিস এজেন্সি ইন বেঙ্গল; অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন হিস ভয়েজ আউট অ্যান্ড রিটার্ন ওভারল্যান্ড (১৬৮১-১৬৮৭), খণ্ড ১-৩, ১৮৮৭-৮৯, (অ্যাড এডিটেড বাই কলোনেল হেনরি ইওল), হাকলাউট সোসাইটি, লন্ডন।
হিল, স্যামুয়েল সি, ১৯০৫, বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, এ সিলেকশন অফ পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট পেপারস্ ডায়ালিং উইথ দি অ্যাফেয়ার্স অফ দি ব্রিটিশ ইন বেঙ্গল ডিউরিং দি রেইন অফ সিরাজদৌল্লা, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়, জন্ মুরে, লন্ডন।
হোবাবাম, এরিক, ১৯৭৮, ইনট্রোডাকশন টু দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অফ কার্ল মার্ক্স অ্যান্ড ফ্রেডারিক অ্যাঞ্জেলস্, ভেরসা, লন্ডন।
হপকিনস্, ই ওয়াশবার্ন, ১৯৬২, "ফ্যামিলি লাইফ অ্যান্ড সোসাল কাসটমস্ অ্যাজ দে অ্যাপিয়ার ইন দি সূত্রস", ই. জে. র‍্যাপসন (সম্পাদিত), দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, এস চন্দ অ্যান্ড কোম্পানি, দিল্লি।
হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৮২, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান পিওপিল, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।
হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৬৮, দি অ্যানালস্ অফ রুরাল বেঙ্গল, স্মিথ, এলডার, অ্যান্ড

কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৫, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ১, ২৪ পরগনা জেলা এবং সুন্দরবন, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৫, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ২, নদিয়া এবং যশোর জেলা, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৩, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলা, (হাওড়া সহ) ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৪, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৫, ঢাকা, বাখারগঞ্জ, ফরিদপুর, এবং ময়মনসিংহ জেলা, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৬, চিটাগঞ্জ হিল ট্র্যাক্ট, চিটাগঞ্জ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল সহ, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৭, মালদহ, রংপুর, এবং দিনাজপুর জেলা ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৮, রাজসাহি এবং বগুড়া জেলা, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ৯, মুর্শিদাবাদ এবং পাবনা জেলা, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৮৭৬, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, লন্ডন, খণ্ড ১০, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলা, ট্রাবনার অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., ১৯০৩, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান পিওপিল, ক্ল্যারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড, ২৩তম প্রকাশন।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), ১৯৯৭, হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, খণ্ড ৩।

আয়েঙ্গার, কে রঙ্গস্বামী, ১৯২১, দি কামসূত্র (অথবা দি সায়েন্স অফ লাভ) অফ শ্রী বৎসায়না। অনুবাদক, আয়েঙ্গার, পাঞ্জাব সাংস্কৃট বুক ডিপোট, লাহোর।

জেকব, ই. এফ, ১৯৬০, (সম্পাদিত), ইটালিয়ান রেনেসাঁস স্টাডিস, ফেবার অ্যান্ড ফেবার, লন্ডন।

ঝাঁ, গঙ্গানাথ (সম্পাদিত), ১৯২৬, মনু-স্মৃতি : দি ল্য অফ মনু, উইথ দি ভায়সা অফ মেধাথিথি, পঞ্চম অধ্যায়, কলকাতা ইউনিভার্সিটি (ডিসকোর্স ১০)।

কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, ১৩২৫, বি. এস, চৈতন্য-চরিতামৃত (সম্পাদক অতুল গোস্বামী), কলকাতা।

কলহান, ১৯৭৭, রাজতরঙ্গিনী—দি সাগা অফ দি কিংস অফ কাশ্মীর, অনুবাদক রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিত, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, নিউ দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ।

কালিদাস, ১৯৮৪, ওয়ার্কস অফ কালিদাস, দ্বিতীয় অধ্যায় (কবিতা), সম্পাদিত এবং ভূমিকাসহ। এছাড়া অনূদিত এবং ভূমিকা সহ সি আর দেভাধর, রঘুবংশ, মোতিলাল বানারসিদাস, দিল্লি।

কালিদাস, ১৯৯১, রঘুবংশ, সম্পাদিত এবং অনূদিত—নন্দরগাইকার, জি আর, দি রঘুবংশ অফ কালিদাস, তৃতীয় প্রকাশন, গোপাল নারায়ণ, বোম্বে।

ক্যানে, পি. ভি (সম্পাদিত), ১৯৬৫, দি হর্ষকারিতা অফ বাণভট্ট, এর সঙ্গে আছে বহু নোটস্, মোতিলাল বানারসিদাস, দিল্লি, পাটনা, বেনারস, দ্বিতীয় সংস্করণ।

কাঙ্গলে, আর. পি. (সম্পাদিত), ১৯৬৩, দি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, অ্যান ইংলিশ ট্রানস্লেশন উইথ ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড এক্সপ্ল্যানেটরি নোটস্, খণ্ড ১, ২, ৩, ইউনিভার্সিটি অফ বোম্বে, বোম্বে।

কান্টাওয়ালা, এস. জি, ১৯৬৪, কালচারাল হিস্ট্রি ফর দি মৎস্যপুরাণা, এম. এস. ইউনিভার্সিটি, বরোদা।

করিম, আবদুল, ১৯৫৯, সোসাল হিস্ট্রি অফ দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল (ডাউন টু ১৫৩৮), দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ঢাকা।

করিম, আবদুল, ১৯৬৪, ঢাকা—দি মুঘল ক্যাপিটাল, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, পাবলিকেশন নং ১৫, ঢাকা।

করিম, আবদুল, ১৯৯৭, "সুবা বাংলা : এ স্টাডি অফ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি মুঘল ইমপিরিয়াল সিস্টেম", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় অধ্যায়, খণ্ড ১, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।

করিম, কে. এম, ১৯৯৭, "সোসাল স্ট্রাকচার আন্ডার দি নবাবস্" সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ : এ স্টাডি অফ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি মুঘল ইমপিরিয়াল সিস্টেম, তৃতীয় অধ্যায়, খণ্ড ৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।

ক্যারি, জন্ উইলিয়াম (সম্পাদিত), ১৯৮৪, দি লাইফ অ্যান্ড করেসপন্ডেন্স অফ চার্লস্, লর্ড ম্যাটকেল্ফ, স্মিথ এলডার, লন্ডন।

কিথ, আর্থার বেরিডেল, ১৯১৭, "ইন্ডিয়া", লুইস হার্বার্ট গ্রে (সম্পাদিত), দি মাইথোলজি অফ অল রেসেস, খণ্ড ৬, মার্শাল জনস্ কোম্পানি, বস্টন।

কিথ, আর্থার বেরিডেল, ১৯২৩, বুদ্ধিস্ট ফিলোজফি—ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন, ক্ল্যারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড।

কিথ, আর্থার বেরিডেল (সম্পাদিত), ১৯৬৯, ঐতরেয় আরণ্যক, ক্ল্যারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড।

খান, আবিদ আলি, ১৯৮৬, মেমোরিস অফ গৌড় অ্যান্ড পাভুয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার, কলকাতা।

খান, আকবর আলি, ১৯৯৭, "গোল্ডেন বেঙ্গল : মাইথ অ্যান্ড রিয়েলিটি", ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, খণ্ড ৩।

কোসাম্বি, ডি. ডি., ১৯৭৫, অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, পপুলার প্রকাশন, বোম্বে।

কুমার, ধর্মা, ১৯৯২, ল্যান্ড অ্যান্ড কাস্ট ইন সাউথ ইন্ডিয়া : এগ্রিকালচারাল লেবার ইন ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি ডিউরিং দি নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি, মনোহর, নিউ দিল্লি।

লেন, ফ্রেডরিক সি, ১৯৬৬, ভেনিস অ্যান্ড হিস্ট্রি, বাল্টিমোর।

ল, বি সি, ১৯৭৬, হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, এস এস পাবলিশিং, দিল্লি, (প্রথম প্রকাশন ১৯৮২)।

লেভি, মাইকেল, ১৯৭৫, হাই রেনেসাঁস, পেঙ্গুইন বুকস্, হারমন্ডস্ওয়ার্থ, ইংল্যান্ড।

লিউই, গানটার, ১৯৬৪, "সাম থিওলজি অ্যাবাউট টাইরানি", লিওনা গাবেল্, রুথ কেনেডি, রুথ ডব্লু. কেনেডি, গানটার লিউই, সিডনি আর. পাকার্ড ও অ্যাল্প সালভাডোর, দি রেনেসাঁস রিকনসিডার্ড—এ সিমফোসিজম, স্মিথ কলেজ স্টাডিস ইন হিস্ট্রি, খণ্ড ৬৪, নর্থদাম্পটন, ম্যাসাচুসেটস।

লামব্রেরাস, লুই গিলারমো, ১৯৯৯, "চাইল্ড অ্যান্ড দি আরবান রেভোলিউশন : দি সেন্ট্রাল অ্যান্ডিয়ান", প্রকাশ, ওম ও ডেনিস ল্যামবার্ড (সম্পাদিত), কর্মাস অ্যান্ড কালচার ইন দি বে-অফ-বেঙ্গল, ১৫০০-১৮০০, আই.সি.এস.এস.আর, মনোহর, দিল্লি।

মহালিঙ্গম, টি. ভি, ১৯৫৫, সাউথ ইন্ডিয়ান পলিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাড্রাস, ম্যাড্রাস।

মহাপাত্র, বিমল চন্দ্র, ১৯৯৫, বুদ্ধিজিম অ্যান্ড সোসিওইকনমিক লাইফ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া—উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু বেঙ্গল অ্যান্ড ওড়িষ্যা (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি), ডি. কে. প্রিন্টওয়ার্ল্ড, নিউ দিল্লি।

মা হুয়ান ইং-ইয়াই-শেং-লান, ১৯৭০, দি ওভারঅল সার্ভে অফ দি ওসানস্ শোর্স, চীন ভাষা থেকে অনূদিত, এবং ফেং চেং-চুন কর্তৃক সম্পাদিত, সঙ্গে ভূমিকা, নোট এবং পরিশিষ্ট যোগ করেছেন হাকলয়েট সোসাইটির জে.ভি.জি মিলস্, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কেমব্রিজ।

মেইন, হেনরি, ১৮৯০, ভিলেজ কমিউনিটিস ইন দি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, জন্ মারে, লন্ডন।

মেজর, আর এইচ. (সম্পাদিত), ১৮৫৭, ইন্ডিয়া ইন দি ফিফটিন্থ সেঞ্চুরি—বিইং এ কালেকশন অফ ন্যারেটিভস অফ ভয়েজেস টু ইন্ডিয়া ইন দি সেঞ্চুরি প্রিসিডিং দি পোর্তুগিজ ডিসকভারি অফ দি কেপ অফ গুড হোপ, হাকলয়েট, সোসাইটি, লন্ডন।

মজুমদার, ডি. এন, ১৯৬১, রেস অ্যান্ড কালচারস্ অফ ইন্ডিয়া, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, লন্ডন।

মজুমদার, ডি. এন, এবং রাও, সি. আর, ১৯৬০, রেস এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট অ্যান্ড এশিয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

মজুমদার, আর. সি, (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর এবং পাটনা।

মজুমদার, আর. সি., ১৯৭১এ "দি পলাশ", মজুমদার আর. সি. (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু কাল), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর ও পাটনা, অধ্যায় ৬।

মজুমদার আর. সি., এবং ডি. সি. গাঙ্গুলী এবং আর সি হাজরা, ১৯৭১বি, "সোসাইটি", মজুমদার, আর সি (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ) , এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর এবং পাটনা।

মজুমদার আর. সি., এবং ডি. সি. গাঙ্গুলী, ১৯৭১সি, "বেঙ্গল আউটসাইড বেঙ্গল", মজুমদার, আর সি (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর এবং পাটনা।

মজুমদার শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯২৭, এম. সি ক্রিন্ডেল অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, অ্যাজ

ডাইরেক্টেড বাই টলেমি, কলকাতা।

মণ্ডল, পরেশচন্দ্র, ১৯৯৭, "স্যান্সকৃট লিটারেচার", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ : এ স্টাডি অফ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি মুঘল ইমপিরিয়াল সিস্টেম, খণ্ড ৩, তৃতীয় অধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।

ম্যানরিক, ফ্রে সেবাস্টিয়ান, ১৯২৭, ট্রাভেলস অফ ফ্রে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক, ১৬২৯-১৬৪৩, হাকলাউট সোসাইটি, খণ্ড ২, চায়না, ইন্ডিয়া ইত্যাদি, দ্বিতীয় পর্ব, নং এল এক্স।

ম্যারেটিনা, সোফম্না এ, ১৯৭৮, "দি ক্যারেক্টার অফ আর্লি স্টেট-লাইক ফর্মেশনস ইন দি হিল ডিস্ট্রিক্টস অফ নর্থইস্ট ইন্ডিয়া", হেনরি জে এম ক্ল্যাসেন এবং পিটার স্কালনিক (সম্পাদিত), দি আর্লি স্টেট, মওটন পাবলিশার্স, দি হগ্, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক।

মার্শাল, পি জি, ১৯৭৬, ইস্ট ইন্ডিয়ান ফরচুনস্ : দি ব্রিটিশ ইন বেঙ্গল ইন দি এইটিন্থ সেঞ্চুরি, ক্ল্যারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড।

মার্শাল, পি জে, ১৯৮৭, বেঙ্গল : দি ব্রিটিশ ব্রিজহেড, দি নিউ কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিযা, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ১৭৪০-১৮২৮, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ।

মার্টিন, অ্যালফ্রেড ভন, ১৯৬৩, সোসিওলজি অফ দি রেনেসাঁস, ইনট্রোডাকশন বাই ওয়ালেস কে ফার্গুসন, হারপার এবং রো, নিউইয়র্ক।

মার্টিন, এম, ১৯৭৬, দি হিস্ট্রি, অ্যান্টিকুইটস, টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্টাটিসটিক্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, খণ্ড ৩, ১৮৩৮, দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ, কসমো পাবলিকেশনস।

মার্ক্স, কার্ল, ১৯৬৪, স্মলার কালেকশন—প্রি-ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিক ফর্মেশনস্ (অনুবাদ করেছেন জ্যাক কোহেন এবং সম্পাদনায় এরিক হবস্‌বাম), লরেন্স উইশার্ট, লন্ডন।

মার্ক্স, কার্ল এবং এফ এঙ্গেলস, ১৯৫৯, দি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, ১৮৫৭-১৮৫৯, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো।

মার্ক্স, কার্ল এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, ১৯৭৯, প্রি-ক্যাপিটালিস্ট সোসিও-ইকনমিক ফর্মেশনস্ : এ কলেকশন, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো।

ম্যাটসুই, তরু, ১৯৬৯, অন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি—এ রিভিউ অফ এ রেনটারপ্রিটেশন, ইন মরিস, মরিস ডি, ম্যাটসুই, তরু, চন্দ্র, বিপিন এবং রায়চৌধুরী টি, ইন্ডিয়ান ইকনমি ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি : এ সিম্পোজিয়াম, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুস্থান পাবলিশার্স, দিল্লি, পিপি ১৭-৩৩।

মাজিও, যোসেফ অ্যান্টনি, ১৯৬৫, রেনেসাস অ্যান্ড রেভলিউশন—দি রিমেকিং অফ ইউরোপিয়ান থট, প্যান্থন বুকস্, এ ডিভিসন অফ র‍্যানডম হাউস, নিউইয়র্ক।

ম্যাকক্রিন্ডেল, জে ডব্লু., ১৮৭৯, দি কমার্স অ্যান্ড নেভিগেশন অফ দি ইরিথ্রেন সি : বিইং এ ট্রানস্লেশন অফ দি পেরিপ্লাস মারিস এরিথ্রী একজন অনামী লেখকের লেখা, অ্যাকাউন্ট অফ দি ভয়েজ অফ নিয়ার্কহস, ফ্রম দি মাউথ অফ দি ইন্ডাস টু দি হেড অফ দি পার্সিয়ান গাল্ফ, ভূমিকা, মন্তব্য ও সূচিসহ, থ্যাকার স্পিংক অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

ম্যাক্‌ক্যাচিয়ন, ডেভিড জে, ১৯৭২, লেট মেডিভাল টেম্পেলস্ অফ বেঙ্গল, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

মিনহাজু-এস সিরাজ, ১৯৬৯, "তাবাকাত আল নাসিরি", এলিয়ট, হেনরি মায়ারস্ এবং জন ডাসন, ১৮৮৬, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওয়ান হিস্টোরিয়ানস, খণ্ড ৮, ডব্লু. ডব্লু. অ্যালেন অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন।

মস্টার, মাইকেবল ডব্লু., ১৯৯৪, "আর্ট অ্যান্ড হিন্দু অ্যাসেসিটিজিম : শিব অ্যান্ড বিষ্ণু অ্যাজ মাস্টার্স অফ যোগা", দেবলা মিত্র (সম্পাদনা), এক্সপ্লোরেশনস ইন আর্ট অফ অর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস্, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা। মিয়ামু, ক্লড।

মিত্র, দেবলা, ১৯৭১, বুদ্ধিস্ট মনুমেন্টস, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

মিশ্র, বি. বি, ১৯৬১, দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাস—দেয়ার গ্রোথ ইন মডার্ন টাইমস্ ও. ইউ. পি., লন্ডন।

মরিস, মরিস ডি, ১৯৬৯, 'টুওয়ার্ডস এ রিইন্টারপ্রিটেশন অফ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি", মরিস, মরিস ডি, ম্যাটসুই, তরু, চন্দ্র, বিপিন এবং রায়চৌধুরী, টি, ইন্ডিয়ান ইকনমি ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি : এ সিমপোজিয়াম, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুস্থান পাবলিশার্স, দিল্লি।

মরিসন, ব্যারি এম, ১৯৬৯, "রিজিয়ন অ্যান্ড সাব-রিজিয়ন ইন প্রি-মুসলিম বেঙ্গল", কফ ডেভিড (সম্পাদিত), বেঙ্গল রিজিওনাল আইডেন্টিটি, এশিয়ান স্টাডিস সেন্টার, মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ল্যান্সিং, মিচিগান।

মরিসন, বেরী এম, ১৯৭০, পলিটিক্যাল সেন্টারস অ্যান্ড কালচারাল রিজিয়নস ইন আর্লি বেঙ্গল, দি অ্যাসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিস, দি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা প্রেস, টাসকন।

মুখার্জি, অমিতাভ, ১৯৬৮, রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন অফ বেঙ্গল, ১৭৭৪-১৮২৩, রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।

মুখার্জি, বি. এন, ১৯৮২, "কমার্স অ্যান্ড মানি ইন দি ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড সেন্ট্রাল সেক্টরস্ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (সি. এ. ডি. ৭৫০-১২০০)", ইন্ডিয়ান মিউসিয়াম বুলেটিন, খণ্ড ১৭।

মুখার্জি, বি. এন, ১৯৯২, কয়েন্স অ্যান্ড কারেন্সি সিস্টেম ইন গুপ্ত বেঙ্গল, হরমন পাবলিশিং হাউস, নিউ দিল্লি।

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, ২০০০, বঙ্গ, বাংলা ও ভারত, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল, ১৯৪১, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ১৬০০-১৮০০, হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, এলাহাবাদ।

মুখার্জি, রামকৃষ্ণ, ১৯৫৮, দি রাইস অ্যান্ড ফল অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ভার্লাগ, বার্লিন।

মুখার্জি, রিলা, ২০০০, "বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতির উদ্ভব ও বিকাশ", রণবীর চক্রবর্তী, কুনাল চক্রবর্তী এবং অমিত বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস—অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারক গ্রন্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মুখার্জি, এস. সি., ১৯৯৪, "এক্সকাভেশনস্ অ্যাট বানেসভর ডাঙ্গা, ডিস্ট্রিক্ট বর্ধমান, ওয়েস্ট বেঙ্গল", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২, ৩, ডাইরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা।

মামফোর্ড, লুইস, ১৯৮৪, দি সিটি ইন হিস্ট্রি, ইটস ওরিজিন, ইটস ট্রান্সফরমেশন, অ্যান্ড ইটস প্রসপেক্ট, পেঙ্গুইন বুকস্, হারমন্ডসওয়ার্থ, ইউ. কে.।
নাথান, মির্জা, ১৯৩৬, বাহারিস্তা আই ঘাইবি, এ হিস্ট্রি অফ দি মুঘল ওয়ারস ইন আসাম, কুচবিহার, বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড ওড়িশা ডিউরিং দি রিজাইম অফ জাহাঙ্গীর অ্যান্ড শাহজাহান, পারসিক থেকে অনূদিত ডঃ এম. আই বোরা দ্বারা, গভর্নমেন্ট অফ আসাম, গৌহাটি।
ওল্ডহাম, ডব্লু বি, ১৯৮৪, সাম হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড এথিক্যাল অ্যাসপেক্টস্ অফ দি বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, কলকাতা।
ও' লিয়ারি, ব্রেনডান, ১৯৮৯, দি এশিয়াটিক মুড অফ প্রোডাকশন, ওরিয়েন্টাল ডেসপোটাইজিম, হিস্টোরিক্যাল মেটারিয়ামিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড (ইউ. কে.) অ্যান্ড কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্ (ইউ.এস.এ.)।
পাল, অনিল চন্দ্র, সঙ্গীতা রায়, ন্যায়ানন্দ চক্রবর্তী, সুস্মিতা গুহ এবং প্রকাশ চন্দ্র মাইতি, ১৯৯৬, প্রি-হিস্ট্রি অফ দি শুশুনিয়া হিল কমপ্লেক্স অ্যান্ড দি সুবর্ণরেখা ভ্যালি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডাইরেকটরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস্, কলকাতা।
পান্ডে, রাজবালি, ১৯৬২, হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড লিটারেরি ইন্সক্রিপশন, চৌখাম্বা সাংস্কৃট সিরিজ অফিস (নং ২৩), বারাণসী।
পারগিটার, এই ই, ১৯২২, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল ট্রাডিশন, মোতিলাল বানারসিদাস, দিল্লি, বারাণসী এবং পাটনা।
পার্লিন, ফ্রাঙ্ক, "প্রোটো-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড প্রি-কলোনিয়াল সাউথ এশিয়া", পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, কর্পাস কৃষ্টি কলেজ, অক্সফোর্ড, নং ৯৮, ফেব্রুয়াবি, ১৯৮৩।
পিন্টো, ভি ডি সোলা, ১৯৬৬, দি ইংলিশ রেনেসাঁস, ১৫১০-১৬৮৮, দি ক্রেসেট প্রেস, লন্ডন।
পিরেস, টোম্, ১৯৪৪, দি সুমা ওরিয়েন্টাল অফ টম্ পিরেস অ্যান্ড দি বুক অফ ফ্রান্সিসকো রড্রিগেজ, পোর্তুগিজ থেকে অনুবাদ করেছেন আর্মান্ডো কোর্টেসাও, দ্বিতীয় সিরিজ, হাকলাউট সোসাইটি, লন্ডন।
প্লিনি (প্লিনিয়াস সেকানডাস), ১৯৬২, দি হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড, কমনলি কল্ড দি ন্যাচারাল হিস্ট্রি, অনুবাদ করেছেন ফিলিমন হোল্যান্ড, সংকলিত এবং পরিচয়ে পল্ টার্নার, সার্দার্ন লিনয়েস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ম্যাকগ্রো হিল বুক কোম্পানি, নিউইয়র্ক, টরেন্টো এবং লন্ডন।
পোলো, মার্কো, ১৯৯৩, দি ট্রাভেলস্ অফ মার্কো পোলো—দি কমপ্লিট ইউল-কর্ডিয়ার এডিশন, ডোভার পাবলিকেশনস আই.এন.সি., নিউইয়র্ক।
প্রকাশ, ওম, ১৯৮৫, দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড দি ইকনমি অফ বেঙ্গল, ১৬৩০-১৭২০, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন, নিউজার্সি।
প্রকাশ, ওম, ১৯৯৮, ইউরোপিয়ান কমারশিয়াল এন্টারপ্রাইস ইন প্রি-কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, দি নিউ কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।
প্রকাশ, ওম এবং ডেনিস লাম্বার্ড (সম্পাদিত), ১৯৯৯, কমার্স অ্যান্ড কালচার ইন দি বে-অফ-বেঙ্গল, ১৫০০-১৮০০, আই.সি.এস.এস.আর, মনোহর, দিল্লি।
প্রসাদ, বেণী, ১৯২৮, থিওরি অফ গভর্নমেন্ট ইন দি স্টেট ইন অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল

বুক ডিপো, এলাহাবাদ।
প্রেসকট, উইলিয়াম এইচ, হিস্ট্রি অফ দি কংকোয়েস্ট অফ পেরু, খণ্ড ২, ১৯৬৬।
কানুনগো, কালিকা রঞ্জন, ১৯৭৩, "মুসলিম কংকোয়েস্ট অফ বেঙ্গল", সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম পিরিয়ড (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিকা পাটনা।
কানুনগো, কালিকা রঞ্জন, ১৯৭৩এ, "বেঙ্গল আন্ডার দি মামলাকস্ : ১২২৭-৮৭", সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম পিরিয়ড (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিকা পাটনা।
কানুনগো, কালিকা রঞ্জন, ১৯৭৩বি, "বেঙ্গল আন্ডার দি হাউস অফ বালবা", সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম পিরিয়ড (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিকা পাটনা।
রহিম, এম. এ, ১৯৮২, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, খণ্ড ১ এবং ২, বাংলা অ্যাকাডেমি, ঢাকা, (সোসাল অ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল থেকে অনুবাদ করেছেন মহম্মদ আসাদুজ্জামান এবং ফজল রাবি)।
রাম গোপাল, ১৯৬৩, হাউ দি ব্রিটিশ অকিউপাইড বেঙ্গল : এ কারেকটেড অ্যাকাউন্ট অফ দি ১৭৫৬-৬৫ ইভেন্টস, লন্ডন : এশিয়া।
রাভেনস্টিন, এস জি (অনুবাদ ও সম্পাদনা), এ জার্নাল অফ দি ফার্স্ট ভয়েজ অফ ভাস্কো-ডা-গামা, ১৪৯৭-৯৯, হাকলাউট সোসাইটি, লন্ডন।
রায়, অমিতা, ১৯৯৪, "সাম রিফ্লেকশনস অন দি টেরাকোটা আর্ট অফ বাংলাদেশ অন দি বেসিস অফ দি আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স ফ্রম দি থার্ড সেঞ্চুরি বি.সি. টু দি ইলাভেন্থ সেঞ্চুরি এ. ডি", দেবলা মিত্র (সম্পাদিত), এক্সপ্লোরেশনস ইন আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ দি সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।
রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৮৬, "ইন্ট্রোডাকশন—সি", খান আবিদ আলি, ১৯৮৬, মেমোরিস অফ গৌড় অ্যান্ড পান্ডুয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার, কলকাতা।
রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯৯, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশ নগরবিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন, অনিরুদ্ধ রায় এবং রত্নাবলী চ্যাটার্জি (সম্পাদিত), মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।
রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯৪, "আর্কিওলজিক্যাল রিকনসেন্স অ্যাট দি সিটি অফ গৌড় : এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২, ৩, ডাইরেকটরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।
রায়, অনিরুদ্ধ, ১৯৯৮, অ্যাডভেনচারার্স, ল্যান্ডৌনার্স অ্যান্ড রেবেলস্, বেঙ্গল সি. ১৫৭৫, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি।
রায়, হিমাংশুপ্রভা, ১৯৯৪, "বুদ্ধিজিম অ্যান্ড ট্রেড ইন আর্লি হিস্টোরিক্যাল ইন্ডিয়া", দেবলা মিত্র (সম্পাদিত), এক্সপ্লোরেশন ইন আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।
রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৭১এ, "পেইন্টিং", মজুমদার, আর সি. (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ

বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ), এন. ভি. পাবলিকেশনস, লোহানিপুর এবং পাটনা।
রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৭১বি, "স্থাপত্য", মজুমদার, আর সি. (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ), এন. ভি. পাবলিকেশনস্, লোহানিপুর এবং পাটনা।
রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৩, বাঙালি জাতির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
রায়, নীহাররঞ্জন, ১৯৯৪, হিস্ট্রি অফ দি বেঙ্গল পিপল্ (অ্যান্সিয়েন্ট পিরিয়ড), ভূমিকাসহ অনুবাদ : জন্ ডব্লু উড্, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।
রায়, রত্নালেখা, ১৯৭৯, চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগরেরিয়ান সোসাইটি, ১৭৬০-১৮৫০, মনোহর, দিল্লি।
রায়চৌধুরী, এইচ. সি, ১৯৫৩, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।
রায়চৌধুরী, তপন কুমার, ১৯৫৩, বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর—অ্যান ইন্ট্রোডাকটরি স্টাডি ইন সোসাল হিস্ট্রি, এ মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।
রায়চৌধুরী, তপন কুমার, ১৯৬৫, "দি অ্যাগরেরিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া", এনকোয়ারি, নিউ সিরিস, খণ্ড ২, নং ১, স্প্রিং।
রায়চৌধুরী, তপন কুমার, ১৯৬৯, "এ রিইন্টারপ্রিটেশন অফ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি", মরিস ডি. মরিস, মাৎসুই তারু, চন্দ্র বিপন, এবং রায়চৌধুরী, টি, ইন্ডিয়ান ইকনমি ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি : এ সিম্পোজিয়াম, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুস্থান পাবলিশার্স, দিল্লি।
রেনেল, জেমস্, ১৯৭৬, মেমোয়ার্স অফ এ ম্যাপ অফ হিন্দুস্থান, (প্রথম সম্পাদনা ১৭৯৩), পুনর্মুদ্রণ, ইন্ডিয়ান, কলকাতা।
রীস, ডেভিডস্, সি. এ. এফ, ১৯৬২, "ইকনমিক কন্ডিশনস্ অ্যাকোয়াডিং টু আর্লি বুদ্ধিস্ট লিটারেচার", ই. জে. র‍্যাপসন (সম্পাদিত), দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, এস চন্দ অ্যান্ড কোম্পানি, দিল্লি।
রীস, ডেভিডস্, টি ডব্লু, ১৯৬২, "দি হিস্ট্রি অফ দি বুদ্ধিস্টস্", ই. জে. র‍্যাপসন (সম্পাদিত), দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, এস চন্দ অ্যান্ড কোম্পানি, দিল্লি।
রিসলে, এইচ এইচ, ১৯৬৯, দি পিপল্ অফ ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশন, ডব্লু ক্রুক সম্পাদিত, ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত ১৯১৫, দিল্লি।
রায়, অসীম, ১৯৮৩, দি ইসলামিক সিনক্রেটিস্টিক ট্র্যাডিশন ইন বেঙ্গল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন।
রায়, ইন্দ্রানী, ১৯৯২, "ফরাসি কোম্পানি ও বাংলার বণিক (১৬৮০-১৭৩০)", রায়, অনিরুদ্ধ এবং চ্যাটার্জি, রত্নাবলী (সম্পাদিত), মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, (বাংলা), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।
রায়, নীরোদ ভূষণ, ১৯৭৩, "রাইস অফ দি ইলিয়াস শাহি ডাইন্যাসটি" সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম পিরিয়ড (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিকা, পাটনা।
রাসেল, রাল্ফ, ১৯৯২, দি পারসুট অফ উর্দু লিটারেচার—এ সিলেক্ট হিস্ট্রি, জেড বুকস্, লন্ডন।
সাচু, এডওয়ার্ড সি, ১৯৬৪, আলবারুনিস ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, ২, এস চন্দ অ্যান্ড কোম্পানি,

দিল্লি।
সালিম, গোলাম হুসেন, ১৯৭৫, রিয়াজ-আস-সালাতিন, অনুবাদ করেছেন আব্দুস সালাম, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা (১৯০২—এশিয়াটিক সোসাইটি)।
সান্যাল, চারুচন্দ্র, ১৯৬৫, দি রাজবংশিস অফ নর্থ বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন, ১৯৮৭, "মালভূম", সুরজিৎ সিন্‌হা (সম্পাদিত), ট্রাইবাল পরিটিক্স অ্যান্ড স্টেট সিস্টেমস্ ইন প্রি-কলোনিয়াল ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, সি.এস.এস.এস, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি।
সরস্বতী, সরসী কুমার, ১৯৭১, "আর্কিটেকচার, স্কাল্পচার, পেইন্টিং", মজুমদার আর. সি. (সম্পাদিত), ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১ (হিন্দু যুগ), এন. ভি. পাবলিকেশনস্, লোহানিপুর এবং পাটনা।
সরকার, হিমাংশু কুমার, ১৯৮৭, "ইন সার্চ অফ দি পঞ্চনগরী বিশ্ব", বি. এন. মুখার্জি অ্যান্ড পি. কে. ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), আর্লি হিস্টোরিক্যাল পার্সপেকটিভ অফ নর্থ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, দার্জিলিং।
সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), ১৯৭৩, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম যুগ (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিকা, পাটনা।
সরকার, জগদীশ নারায়ণ, ১৯৭২, ইসলাম ইন বেঙ্গল (থার্টিন্থ টু নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি), রত্না প্রকাশন, কলকাতা।
সরকার, জগদীশ নারায়ণ, ১৯৭৩, মীর জুমলা ইন বেঙ্গল : ১৬৫৯-১৬৬৩, সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম যুগ (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিকা, পাটনা।
সরকার, জগদীশ নারায়ণ, ১৯৯৭, "মুঘল কালচারাল হেরিটেজ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ : এ স্টাডি অফ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি মুঘল ইমপিরিয়াল সিস্টেম, খণ্ড ৩, তৃতীয় অধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা।
সরকার, এস. এস., ১৯৫৪, দি অ্যাবওরিজিনাল রেসেস অফ ইন্ডিয়া, বুকল্যান্ড, কলকাতা।
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, ১৯১০, রামচরিতম অফ সন্ধ্যাকর নন্দী, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
স্কফ, উইলফ্রেড এইচ, (টিকাসহ অনুবাদ করেছেন), ১৯৭৪, দি পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রেন সি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্রেড ইন দি ইন্ডিয়ান ওসান বাই এ মার্চেন্ট অফ দি ফার্স্ট সেঞ্চুরি, ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট কর্পোরেশন, মুন্সীরাম, মনোহরলাল, দিল্লি।
সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৫৪, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।
সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩, বৃহৎ বঙ্গ, খণ্ড ১, ২ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৫ সালের প্রকাশনা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
সেন, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৩, "দি পোর্তুগিজ ইন বেঙ্গল", সরকার, যদুনাথ (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল : মুসলিম যুগ (১২০০-১৭৫৭), অ্যাকাডেমিয়া এশিয়াটিক, পাটনা।

সেন, সুকুমার, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৮, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ১, (১৯৭৮, ষষ্ঠ সম্পাদনা) এবং ২ (১৯৭৫, তৃতীয় সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), ১৯৯৩, কবিকঙ্কন বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, কলকাতা।
সেন, সুকুমার, ১৯৯৩, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশন (বাংলা) ১৯৫১।
সেনগুপ্ত, গৌতম, ১৯৯৪, 'ইস্ট ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার : ফর্মেটিভ সেঞ্চুরিস'', দেবলা মিত্র (সম্পাদিত), এক্সপ্লোরেশন ইন আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ এশিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস্, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা।
সেনগুপ্ত, গৌতম (সম্পাদিত), ১৯৯৪, প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ২, ৩, ১৯৯৩-৯৪, ডাইরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস্ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল।
সেন-মজুমদার, গায়ত্রী, ১৯৮৩, বুদ্ধিজিম ইন অ্যান্সিয়েন্ট বেঙ্গল, নভনা, কলকাতা।
সেন-মজুমদার, গায়ত্রী, ১৯৮৫, ''বুদ্ধিজিম ইন অ্যান্সিয়েন্ট বেঙ্গল অ্যাজ নোন ফ্রম চাইনিজ সোর্সেস'', দাশগুপ্ত, কল্যাণ কুমার (সম্পাদিত), ১৯৮৫, বুদ্ধিজিম - আর্লি অ্যান্ড লেট ফেসেস, সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডি, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।
শর্মা, আর এস, ১৯৮৭, আর্বান ডিকে অফ ইন্ডিয়া, সি এডি ৩০০-সি আই ০০, মুন্সীরাম মনোহরলাল, দিল্লি।
শর্মা, আর এস, ১৯৬৫, ইন্ডিয়ান ফিউডালিজিম, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, কলকাতা।
শরিফ, আহমেদ, ১৯৯২, ''বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান'', রায়, অনিরুদ্ধ এবং চ্যাটার্জি রত্নাবলী (সম্পাদিত), মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কে পি বাগচী, কলকাতা।
সিংহ, এস. ডি, ১৯৬৬, ''রয়্যাল ওনারশিপ অফ ল্যান্ড ইন দি বৈদিক পিরিয়ড'', সরকার, ডি. সি (সম্পাদিত), ল্যান্ড সিস্টেম অ্যান্ড ফিউডালিজিম ইন অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ কলকাতা, কলকাতা।
সিনহা, এন কে, ১৯৬৮, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ফ্রম পলাশি টু দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট, খণ্ড ১, ২, ফার্মা কে. এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা।
সরকার, ডি. সি, ১৯৬৬, ''ল্যান্ড সিস্টেম'', সরকার, ডি. সি (সম্পাদিত), ল্যান্ড সিস্টেম অ্যান্ড ফিউডালিজিম ইন এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ কলকাতা, কলকাতা।
সরকার, ডি. সি, ১৯৮৫এ, '' দি বুদ্ধ ইন দি ব্রাহ্মনিক্যাল প্যান্থিয়ন অ্যান্ড সাম রিলেটেড প্রবলেমস্'', দাশগুপ্ত, কল্যাণ কুমার (সম্পাদিত), ১৯৮৫, বুদ্ধিজিম—আর্লি অ্যান্ড লেট ফেসেস, সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডি, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার, ইউনিভার্সিটি অফ কলকাতা, কলকাতা।
সরকার, ডি. সি, ১৯৮৫, ১৯৮৫বি, দি কন্যাকুব্জা গৌড় স্ট্রাগেল, ফ্রম দি সিক্সথ টু দি টুয়েলফ্‌থ সেঞ্চুরি, এ. ডি, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
জোবার্গ, গিডিয়ন, ১৯৬০, দি প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি অফ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ফ্রেস প্রেস,

নিউইয়র্ক, অ্যান্ড কলিয়র—ম্যাকমিলন, লন্ডন।

সৌফা, ম্যানুয়েল ডি ফারিয়া ওয়াই, ১৬৯৪, দি হিস্ট্রি অফ দি ডিসকভারি অ্যান্ড কংকোয়েষ্ট অফ ইন্ডিয়া বাই দি পোর্তুগিজ, ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ক্যাপ্টেন জন স্টিভেন্স, সি ব্রোম, সাইন অফ দি গান, ওয়েষ্ট এন্ড অফ সেন্ট পলস্, ১৬৯৪, খণ্ড ৩, লন্ডন।

সাউদল, আইডান ডব্লু, ১৯৫৩, আলুর সোসাইটি : এ স্টাডি অফ দি প্রসেস অ্যান্ড টাইপস্ অফ ডোমিনেশন, কেমব্রিজ, ডব্লু হেফার অ্যান্ড সন্স, ১৯৫৩।

শ্রীনিবাস, এম. এন, ১৯৭১, "স্যান্সকৃটাইজেশন", মেটখাল্ফ, টমাস আর (সম্পাদিত), মডার্ন ইন্ডিয়া : অ্যান ইন্টারেকটিভ অ্যান্থোলজি, ম্যাকমিলান, লন্ডন।

স্টিন্সগার্ড, নীলস্, ১৯৭৩, দি এশিয়ান ট্রেড রিভলিউশন অফ দি সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি—দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিজ অ্যান্ড দি ডেকলাইন অফ দি ক্যারাভ্যান ট্রেড, দি ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, শিকাগো এবং লন্ডন।

স্টুয়ার্ট, চার্লস, ১৯৭১, দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ফ্রম দি ফার্স্ট মহামেডান ইনভেশন আন্টিল দি ভারচুয়াল অফ দ্যাট কান্ট্রি বাই দি ইংলিশ এ. ডি. ১৭৫৭, ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স, দিল্লি।

স্টিভেন্স, ভ্যালেরি জন্, ১৯৭৩, আলজেরিয়া অ্যান্ড দি সাহারা—এ হ্যান্ডবুক ফর ট্রাভেলার্স, লন্ডন।

সুব্রহ্মনিয়াম, সঞ্জয়, ১৯৮৭, "নোটস্ অন দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল ট্রেড", ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ, ২৪, ৩।

তরফদার, মমতাজার রহমান, ১৯৬৫, হুসেন শাহি বেঙ্গল—১৪৯৪-১৫৩৮ এ.ডি. : এ সোসিওপলিটিক্যাল স্টাডি, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান পাবলিকেশন নং ১৬, ঢাকা।

তরফদার, মমতাজার রহমান, ১৯৬৫, ট্রেড, টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটি ইন মিডাইভাল বেঙ্গল, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফব বেঙ্গল স্টাডিস, আই সি এইচ এস সিরিয়াস ১২, ঢাকা।

ট্যাভারনিয়ার, জন্ ব্যাপটিস্টা, ১৯৮৪, ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড ২, বুক ১, মসেস পিট অ্যাট দি এঞ্জেল, সেন্ট পলস্ চার্চইয়ার্ড, লন্ডন।

টাওনি, আর. এইচ, ১৯৮০, রিলিজিয়ন অ্যান্ড দি রাইস অফ ক্যাপিটালিজম, পেঙ্গুইন বুকস্, হারমন্ডওয়ার্থ (ইউ. কে.)।

ঠাকুর, বিজয় কুমার, ১৯৮১, আর্বানাইজেশন ইন অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, অভিনব পাবলিকেশনস্, নিউ দিল্লি।

থাপর, রমিলা, ১৯৭৮, অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সোসাল হিস্ট্রি : সাম ইন্টারপ্রিটেশনস্, ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লি।

থাপর, রমিলা, ১৯৮৪, ফ্রম লাইনেজ টু স্টেট—সোসাল ফর্মেশনস্ ইন দি মিড-ফার্স্ট মিলেনিয়াম বি.সি. ইন দি গঙ্গা ভ্যালি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বোম্বে, দিল্লি, কলকাতা, ম্যাড্রাস।

থম্পসন, এস হ্যারিসন, ১৯৬৩, ইউরোপ ইন রেনেসাঁস অ্যান্ড রিফর্মেশন, রুপার্ট হার্ট-ডেভিস, লন্ডন।

ভন লিয়ার, জে. সি., ইন্দোনেশিয়ান ট্রেড অ্যান্ড সোসাইটি, হ্যাগ-ব্যানডাং, ১৯৫৫।

ভার্তেমা, লুডোভিকো ডি, ১৮৬৩, দি ট্রাভেলস্ অফ লুডোভিকো ডি ভার্তেমা ইন ইজিপ্ট, সাইরিয়া, আরাবিয়া ডের্সাটা অ্যান্ড আরাবিয়া ফেলিক্স, ইন পার্সিয়া, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইথিওপিয়া, এডি ১৫০৩ টু ১৫০৮, ইতালীয় থেকে অনূদিত ১৫১০ সালে, জন উইনটারের ভূমিকা এবং নোটস্ ও পরিচয় সহসম্পাদিত—জর্জ পার্সি ব্যাজার, হাকলাউট সোসাইটি, লন্ডন।

ভার্মা, ডি. সি., ১৯৭৬, পলাশি টু বাক্সার : এ মিলিটারি স্টাডি, কে. বি. পাবলিকেশনস্, নিউ দিল্লি।

ভাইগাস, ফিলিপ, ১৯৯২, "ল্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড ট্রাইবাল স্ট্রাগেল ফর সারভাইভাল", ওয়ালটার ফার্নান্ড (সম্পাদিত), ন্যাশনাল ডেভালপমেন্ট অ্যান্ড ট্রাইবাল ডিপ্রাইভেশন, ইন্ডিয়ান সোসাল ইন্সটিটিউট, নিউ দিল্লি।

ওয়াটার্স, টমাস, ১৯৬১, অন ইয়ান চোয়াং'স ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া (এডি ৬২৯-৬৪৫), তাঁর মৃত্যুর পর আর ডব্লু রাইস ডেভিডস্ এবং এস ডব্লু রাশেল কর্তৃক সম্পাদিত এবং মানচিত্র অঙ্কনে ভিনসেন্ট এ স্মিথ্, মুন্সিরাম মনোহরলাল, দিল্লি, ১৯৬১ (প্রথম প্রকাশন ১৯০৪ নালন্দায়)।

ওয়েবার, ম্যাক্স, ১৯৩০, দি প্রোটেসট্যান্ট এথিক অ্যান্ড দি স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম, অনুবাদ করেছেন ট্যালকট পারসন্স, আর. এইচ ট্যানওয়ের ভূমিকাসহ, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, লন্ডন।

উইনস্টেন, ডোনাল্ড, ১৯৬৫ (সম্পাদিত), দি রেনেসাঁস অ্যান্ড দি রিফর্মেশন, ১৩০০-১৬০০, দি ফ্রি প্রেস, নিউইয়র্ক।

উইলকক্স, উইলবার, ১৯২৮, দি রেস্টোরেশন অফ এন্সিয়েন্ট বেঙ্গল, কলকাতা।

উইলসন, সি. আর., ১৮৯৫, দি আর্লি অ্যানালস্ অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, বিইং দি বেঙ্গল পাবলিক কলসালটেশন ফর দি ফার্স্ট হাফ অফ দি এইটিন্থ সেঞ্চুরি, খণ্ড ১, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

উইটফোগেল, কার্ল এ, ১৯৫৭, ওরিয়েন্টাল ডেস্পোটিজম—এ কমপারেটিভ স্টাডি অফ টোটাল পাওয়ার, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হেভেন, এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।

উড্, মার্টিন উইলিয়াম, ১৮৬২, ল্যান্ড ইন ইন্ডিয়া-হোয়েয়াব ইজ ইট? ফিলিপ এস, কিং, লন্ডন।